প্রবর্তক

পাক্ষিকপত্র ও সমালোচন

সম্পাদক—শ্রীমণীন্দ্রনাথ নায়েক

দ্বিতীয় বর্ষ

১৩২৩—১৩২৪

বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র

কর্ম্মকর্ত্তা—শ্রীরামেশ্বর দে

প্রবর্ত্তক-কার্য্যালয়
বোড়াইচণ্ডিতলা, চন্দননগর

বর্ণানুক্রমিক সূচী

বিষয় পৃষ্ঠা

অ

অগ্নি-স্তোত্র ২
অধ্যাত্ম যুদ্ধ ১৬১
অধ্যাত্ম বিপ্লব ২৮১
অন্তঃ-প্রেরণা ৩৫৩
অন্তরীণ ২৭৩
অহঙ্কার ১৯৩

আ

আমাদের আশা কি ? ২১
আবাহন ১

উ

উঠে এসো (কবিতা) ২৫৫
উৎসর্গ ২১২
উৎসব ১৫৭
উন্মাদ ১১০

এ

একজন "মুক্তিপ্রাপ্ত" নজরবন্দীর আত্মহত্যা ৩০০
একটি রূপক গল্প ১১

ক

কংগ্রেস ৩৬২
কলির সত্য ২৪৪
কালী (কবিতা) ৩৫২
কুড়োন চিঠি ৩৮২

গ

গতি-নির্দ্দেশ ৪৯
গান ১৭৬

চ

চণ্ডীদাস ১৭৩, ১৮৮
চিন্তা-গুচ্ছ ১৩০
চিন্তা-চুম্বক ১৭৯
চিন্তা-বীথী ২২৭, ৩০৮
চির নবীন ! ২২৫

জ

জগৎ (কবিতা) ৩৩৫
জাগরণ ৮১
জাতীয় শিক্ষা ৩৭৭
জানা ও অজানা ৩৭৪
জীবনের খেলা ২৩৬

ঠ

ঠাকুর রামকৃষ্ণ পাট ২৯

ত

তপঃ তপঃ তপঃ ৩৩৭
তপস্যা ২৪১
তিনটি কথা ১৬৩
ত্যাগের কথা ৮৬, ১৫০, ২৬৫

দ

দরকার ৩৪৪
দেবজাতি ১৪৫

বিষয় পৃষ্ঠা

ধ

ধর্ম্ম ৪
ধর্ম্ম ৯৭
ধর্ম্মপ্রচারে রবীন্দ্রনাথ ৬৮
ধর্ম্মপ্রচারে রবীন্দ্রনাথ ১৩২

ন

নর নারায়ণ ১১৮
নারী-পূজা ১১৩
নিত্যের খেলা ৩২৫
নিশীথ চিন্তা ৩০৫
নূতন মানুষ ২৮৯

প

পন্থা ১৭৭
পাগলের চিঠি ৯৩, ২৮৫
পূর্ণযোগ—
  যোগের স্বরূপ ৮
  হঠযোগ ২৬
  রাজযোগ ৪৬
  জ্ঞানযোগ ৭৫
  ভক্তিযোগ ৯০
  কর্ম্মযোগ ১০৬
  বৈদিকযোগ ও তান্ত্রিকযোগ ১৮৫
  পূর্ণযোগের স্বরূপ ২২১
  পূর্ণযোগের কার্য্যপ্রণালী ৩১৫
  পূর্ণযোগের ফল ৩৫৯
প্রবর্ত্তকের উত্তর ৪৩
প্রবর্ত্তকের পাগলের প্রতি ১২৪
প্রাণের দায় ২৯৫
প্রেম ৬৫

ভ

ভবিষ্যতের ইঙ্গিত ১৬৭
ভাব-কুসুম ৩৭১

ম

মনোরঞ্জনের প্রয়াণ ১২৭
মহাজন পন্থা ১১৫
মহাপ্রলয় ১৯৬
মহাবাক্য সংগ্রহ ৩৫, ৮৩

র

রবীন্দ্রনাথ ও দেশনত্ব ২১৫
রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম ৩৪০
রাজসিক উত্তেজনা ১৬৬

ল

লীলা ১২২, ১৫৪, ১৭০, ২০৪, ২৫১
২৬৯, ৩৩০, ৩৬৫

ব

বর্ণাশ্রম ৯৯
বর্ষশেষে ৩৬৯
বাঙ্গালী সৈন্তিক (কবিতা) ১৫৯
বাঙ্গালী সৈনিক ৩১৭
বাংলার কথা ১৯৯
বাংলার দলাদলি ২৫৭
বীর-পূজা ১০২
বীর-বাণী ১২৯
বৈদিক অঞ্জলি ২৯২
বৈদিক চিন্তা-প্রসূন ৫২, ৬৭
১৪৭, ২৬২
ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ৩৫৫
ব্রহ্মতেজ ১৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
শ	
শিক্ষা	৩৩
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি	৮০, ২০৮
স	
সঙ্ঘ	২৪৭
"সভার" আত্মহত্যা	৩২৬
সন্ন্যাসীর কথা	২৩০
সন্ন্যাসীর প্রভাব	৫৪
সমতা	২৭৭
সমালোচনা	১২৮, ২২৪, ২১২, ২৮৮, ৩৩৫
সমালোচনার "সাহিত্য"	২৫৩
স্বর্গং ব্রজেৎ	৭৮
"সাংঘাতিক সিদ্ধান্ত"	৩১০
সাধক ৺ নলিনচন্দ্র	৩২০
সাধকের পত্র	১৮২, ৩২৮
স্পষ্টকথা	১৯
হ	
হিমারণ্যের চিঠি	৩৯
হিমারণ্যের চিঠি সম্বন্ধে	৬৯
"হোমরুল"	২০৯

Printed at SADHANA PRESS, CHANDERNAGORE.

প্রবর্ত্তক—২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

আবাহন।

ওগো নূতন বর্ষ, ওগো অনাগত—তোমায় অভিবাদন করি। তুমি অনন্ত কালনাট্যের এক ক্ষুদ্র গর্ভাঙ্ক, তোমার পরতে পরতে আমাদের ভাগ্যচক্রের কত আলেখ্য অঙ্কিত আছে—কত আশা কত নিরাশা, কত সুখ কত দুঃখ, কত সম্পদ কত বিপদের ছবি আছে। দিনের পর দিন যাবে তোমার নূতন তুলির রঙীন ছবিগুলি জীবনের সম্মুখে ধরে দেখাবে—কখন আশায় উৎফুল্ল হব, কখন বা অভাবনীয় বিপদের সূচনা দেখিয়ে নিরাশায় আচ্ছন্ন কর্‌তে চেষ্টা কর্‌বে—এমনি করে সুখে দুঃখে, হাসি কান্নায় দীর্ঘ বৎসর কেটে যাবে। তারপর তুমি আবার পুরাতন হবে, নুতন এসে তোমার স্থান অধিকার কর্‌বে—ইহাই তোমার স্বাভাবিক গতি। আজ তুমি এসেছ—তোমায় অভিবাদন করি।

যোগসাধনায় যে সিদ্ধিলাভ করেছে তার কাছে তুমি নূতন নও, সে তার ভবিষ্যদৃষ্টি দিয়ে তোমার সবখানি দেখ্‌তে পাচ্ছে—সমুদ্রের তরঙ্গ কাটিয়ে নাবিকেরা তাদের ক্ষুদ্র তরীখানি যেমন করে সাগরবক্ষে নিয়ে যায়—যোগদৃষ্টিশালী ভারতের মহাত্মাগণ তেমনি করে অবহেলে তোমার অতিক্রম করে চলেছে। অনন্ত মহাকালের বুকে একস্থানে ভারতের স্বর্ণযুগটীর কথা লেখা আছে, সেই দিনটি লক্ষ্য করে তুমি এসেছ দুরাগত্‌কে কাছে এনে দেবার জন্য—তোমায় অভিবাদন করি।

সমুদয় জগতের ভাগ্যাকাশ ঘন ঘটাচ্ছন্ন, বরষের শেষে বিদ্যুৎ বিকাশের মত শান্তির আভাষ মুহূর্ত্তে প্রকাশ হয়ে মুহূর্ত্তেই বুঝি মিলিয়ে যায়, অহঙ্কারের জাগ্রত-মূর্ত্তি ধূলিশায়ী না হলে স্থায়ী শান্তি অসম্ভব—তাই সমগ্র মিত্রশক্তি প্রলয় হুহুঙ্কারে মেদিনী কম্পিত করে তুলেছে—হে নববর্ষ মনুষ্যজাতির হৃদয় হতে হিংসাবৃত্তি মুছে দিয়ে চিরশান্তি ফিরে দেবে—তাই তোমায় অভিবাদন করি।

তোমায় অভিবাদন করি। কঠোর তপঃপরায়ণ ভারতবাসীর জন্য আজ তুমি কি সিদ্ধি এনেছ? তোমার আগমনে কোটী কোটী নরনারী কৌতূহল-নয়নে তোমার পানে দৃষ্টিপাত কর্‌ছে, নূতনের আশায় উৎফুল্ল হয়ে ভারতের

নানাজাতি একত্র একক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তোমার দান মাথাপেতে নেবে বলে উৎকণ্ঠিত হয়েছে—সে দানে তার হৃদয় পূর্ণ কর আশার পথ উজ্জ্বল হোক্—শুভের পথ, মঙ্গলের পথ, উন্নতির পথ—ভারতের অবারিত হোক্।

হে বিধাতার লিপিবাহক নববর্ষ, সারা পৃথিবীর ভাগ্যনিয়ন্তৃরূপে আজ আমাদের কুটীর দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছ—প্রতিদিন জগতে তুমি নূতনবার্ত্তা শোনাবে, কখন ভৈরবগর্জ্জনে মনুষ্যজাতির হৃদয় দুরু দুরু কাঁপিয়ে তুল্‌বে, কখন বা রমণীকণ্ঠ নিঃসৃত মধুর সঙ্গীতের মত ললিতস্বরে তাদের হৃদয় মুগ্ধ কর্‌বে, কখন প্রলয়ঙ্কর বীভৎস চিত্রখানি উন্মুক্ত করে পৃথিবীতে ভীষণাবর্ত্তের সৃষ্টি কর্‌বে, কখন বা অমৃতশীতল কণ্ঠের আশ্বাসবাণী আলাপ করে মানবের হৃদয় মধুর রসে ভরিয়ে তুল্‌বে—কে জানে তোমার ভবিষ্যৎ কালগর্ভে কি আছে? আমরা যারা স্বর্ণযুগের আশায় মহাঋষির মধুর রাগিনীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছি তাদের তুমি সুপথে পরিচালিত কর। আমরা জানি আমাদের কাতর কণ্ঠ বিধাতার হিরণ্ময় সিংহাসন হতে প্রতিহত হয় নাই, তাঁর অপার্থিব করুণা মাথায় বয়ে তুমি আজ আমাদের নিকটে এসেছ—মর্ত্ত্যের সুখদুঃখ হাসিকান্না ভুলিয়ে দাও, ভুলিয়ে দাও সকল প্রকার নীচতা, সঙ্কীর্ণতা, দীনতা—পৃথিবীর নীচ আকর্ষণ হতে মুক্ত করে আমাদের মানুষ করে দাও, দেবতা করে দাও—আমরা তোমায় অভিবাদন করি।

অগ্নি-স্তোত্র

যজ্ঞভূমি পরিষ্কৃত, বর্হি আস্তীর্ণ—ওই যে হোতা আসনে প্রতিষ্ঠিত। সখাবৃন্দ! প্রকৃতির কর্ম্মসঙ্কুল এ বিরাট অরণ্যে সমিধের অভাব কোথায়? যে যাহা পাও কুড়াইয়া একত্রিত কর। মথিত কর অরণি—এস, সমিদ্ধ প্রেরণারাজি যজ্ঞকুণ্ডে নিক্ষেপ কর ॥ ১ ॥

প্রবৃত্তি সকলের সংঘর্ষে ওই যে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিতেছে। বিশ্বের আকাঙ্খা শক্তির আলোকে লেলিহান করিয়া তুলিয়াছে—বায়ুমুখে অগ্নির রক্তবর্ণ সপ্তজিহ্বা ঊর্দ্ধে ছুটিয়া চলিয়াছে ॥ ২ ॥

রুদ্রমূর্ত্তি অগ্নির ক্রোধতাম্র নয়ন হইতে উষ্ণ ধূমরাজি উদ্‌গীর্ণ হইতেছে। অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক বিপর্য্যস্ত প্রায়। মহর্লোকে কাহার আসন টলিয়াছে? ॥ ৩ ॥

স্থিতধী হও, সখাগণ। লয়ে এস তোমাদের প্রণতি—উৎসর্গ কর আপনাকে। অগ্নি হোতৃশ্রেষ্ঠ, তোমাদিগকে লইয়া চলিয়াছে মহত্তের বৃহতের উদার আলোকে। ঋতমূর্ত্তি শক্তি তোমাদের মধ্যে অবতীর্ণ ॥ ৪ ॥

আন তোমাদের শোভন মতি। অটুট শ্রদ্ধার পরশে শক্তিকে সম্মার্জ্জিত কর। সদাসন্তুষ্টির বিমলঅঞ্জন পরাও তাহার নয়নে। তপঃতপ্ত অগ্নি জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিয়াছে—ধূমের অন্ধকার ঘুচিয়া যাইতেছে ॥ ৫ ॥

অন্ধকারের গর্ভেই আলোক নিহিত। আকাঙ্খার গর্ভেই শক্তির বীজ। কামনার গর্ভেই শুদ্ধ ভোগের প্রতিষ্ঠা। নিশার কোলেই উষা পরিবর্দ্ধিতা ॥ ৬ ॥

অগ্নির শিখা উষার নয়নে প্রতিভাত। স্বর্গের হিরন্ময় দুয়ার আজ উন্মুক্ত—জগতের পর জগত ফুটিয়া উঠিতেছে। দেবগণ একে একে আবির্ভূত হইতেছেন। অগ্নির আহ্বান রব অন্তরীক্ষ ভেদিয়া স্বর্লোকে প্রতিধ্বনিত হইতেছে ॥ ৭ ॥

ওই যে আসিয়াছেন বরুণ মিত্র। বরুণ আমাদিগকে পাশবিমুক্ত করিয়াছেন—অন্তর আমাদের বিশুদ্ধ, বৃহতের অসীমে আমরা প্রসারিত। মিত্র আমাদিগকে মিলিত করাইয়াছেন বিশ্ববস্তুর সহিত—বিশ্বহৃদয় হিল্লোলিত এক বিরাট ঐক্যতানে ॥ ৮ ॥

ওই যে অর্য্যমা—বীরহৃদয়ে সুমহৎ আকাঙ্খা, আমাদের সকল প্রেরণাকে উদ্‌যুক্ত করিতেছেন ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর লোকে আরোহণ করিতে, বৃহৎ হইতে বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে। আসিয়াছেন ভোগমূর্ত্তি ভগ—আজ আমরা গুহানিহিত সকল রসের আস্বাদন পাইতেছি ॥ ৯ ॥

উষার অঙ্কে কে ওই নবজাত শিশু—বালকিরণে তাহার মুখমণ্ডল হেমাভ? সূর্য্য উদিত—জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত আমরা দেখিয়াছি সত্য, ঋতের ধর্ম্মে আমরা গড়িয়া উঠিতেছি। ইলাদেবী আমাদের দৃষ্টি খুলিয়া দিয়াছেন। সরস্বতী আমাদের এই সত্যমন্ত্রে অধিষ্ঠিত ॥ ১০ ॥

বজ্রধারী ইন্দ্র জাগ্রতলোকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন সেই দিব্যজ্ঞান। বৃত্র আর আবরিত করিবে না আমাদের দীপ্তমতি, আমরা আজ ধীমান। আমাদের মধ্যে সে মনীষিরাজ যে প্রবুদ্ধ ॥ ১১ ॥

মরুৎগণ জাগরিত—সুমনা ইন্দ্রের দ্যুতি লইয়া খেলিতেছে চিন্তারাজি—তাহাদের তড়িৎ বিলসনে অজ্ঞানের তমোরাশি ছিন্নভিন্ন হইয়া খসিয়া পড়িতেছে ॥ ১২ ॥

অশ্বখুরাঘাতে অদ্রিপার্শ্ব বিস্মিত করিয়া কে অতীন্দ্রিয় বায়ুভরে ছুটিয়া চলিয়াছে? ভূতশরীর বিদীর্ণ করিয়া আনন্দের সোমধারা ওই দিগন্তে উৎসারিত। তীব্র উন্মাদক মধুস্রোত প্রতি রন্ধ্রে তরঙ্গে তরঙ্গে বিক্ষোভিত ॥ ১৩ ॥

অমৃতের পুত্রগণ! তক্ষকপ্রবর ঋভু অমৃত হইতে আমাদিগকে উৎকীর্ণ করিয়া তুলিতেছেন—অমৃতসত্তা দিয়াই আমাদের জীবনের প্রতি অঙ্গ মূর্ত্ত ও পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে ॥ ১৪ ॥

চিৎশক্তির কবিদৃষ্টিদ্বারা আজ আমরা ঋতকর্ম্মা পৃথ্‌ভোগী। সপ্তভুবনে সপ্তসম্পদ মহীয়ান্ হইয়া প্রতিষ্ঠিত ॥ ১৫ ॥

ধর্ম্ম

আমরা মানুষকে অনুসরণ করিতে বলি ধর্ম্ম, জগতে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহি ধর্ম্মরাজ্য। কিন্তু এই ধর্ম্মের অর্থ কি? হিন্দু যিনি তিনি তাঁহার শাস্ত্রবাক্য যথাযথ মানিয়া চলাই ধর্ম্ম মনে করেন। অর্থাৎ নিত্যকর্ম্মপদ্ধতিতে যে বিধিনিষেধাদি লিপিবদ্ধ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদনুসরণ করাই ধর্ম্ম। ধার্ম্মিক হইতেছেন তিনি যিনি সন্ধ্যা আহ্নিকাদি করিয়া থাকেন, নিয়মিত সময়ে ভগবানের নাম জপ করেন, পানে আহারে বিহারে সকল কর্ম্মে শাস্ত্র বিরুদ্ধ কিছু করেন না, এক কথায় যিনি আচার সম্পন্ন। বর্ত্তমানে আমরা অবশ্য ধর্ম্ম কথাটিকে ঠিক এই অর্থে ব্যবহার করিতে চাহিতেছি না, বাহিরের আচারের মধ্যে, বিশেষ জাতিগত কোন বিধিনিয়মের মধ্যেই উহাকে আর আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টিত নহি। ইহার একটা বিশ্ব জাগতিক রূপই খুঁজিয়া লইতে প্রয়াসী হইয়াছি। ধর্ম্ম অর্থে তাই আমরা কেহ বুঝিতেছি কতকগুলি নৈতিক গুণাবলী, যেমন অহিংসা অস্তেয় দয়াদাক্ষিণ্য ত্যাগ সংযম—যাহা সকল মানুষের পক্ষেই প্রযোজ্য, যে সকলের চর্চ্চা করিয়া মানুষ একটা কিছু উন্নত জীব হইয়া উঠিতে পারে। ধার্ম্মিক হইতেছেন তিনি যিনি সাধু। কর্ম্মপ্রিয়

রজঃপ্রকৃতি ইউরোপের সংস্পর্শে আসিয়া এই ভাবটিকেও কেহ আবার কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছেন। ধর্ম্ম হইতেছে কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন। জীবনের যে নানা বিভাগ, তাহার প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক কর্ত্তব্য আছে। যে যে বিভাগের অন্তর্ভুক্ত তাহার সেই বিভাগীয় কর্ম্মগুলি কোন কিছু বাধা না মানিয়া অন্য কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া সম্পন্ন করিয়া যাওয়াই ধর্ম্ম। প্রকৃতপক্ষে ইহা নীতিশাস্ত্রের কথা, কিন্তু নীতিশাস্ত্র যখন পালন করি ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া, ভগবানেরই প্রীতির জন্য করিতেছি এই ধারণা হৃদয়ে গাঁথিয়া, তখন তাহা আর কেবল নীতি নহে তাহা ধর্ম্মই।

কিন্তু আমরা নবীনযুগের সাধক আমরা যে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইতে চাহিতেছি তাহা এই সকল হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু। আচার ও নীতির যে আবশ্যকতাই থাকুক না কেন তাহা মানুষের একান্ত গভীরতম জিনিষটি নহে। আচার ও নীতি বাহিরের বস্তু, মানুষের উপর আরোপিত হইয়াছে মাত্র—তাহা তাহার নিজের ইচ্ছাতেই হউক আর অনিচ্ছাতেই হউক। এ সকল মানুষ অনুসরণ করে জোর করিয়া, তাহার অন্তরতম অন্তরের সহিত ইহাদের সহজ নৈসর্গিক সম্বন্ধ নাই। প্রধানতঃ ইহাদের সৃষ্টি হইয়াছে সমাজকে সমষ্টিকে সংহত রাখিবার জন্য, সহজ সুচারুরূপে পরিচালনা করিবার জন্য। আবার আচার ও নীতির সহিত যে ভগবানের নাম জুড়িয়া দেই তাহার যে কোন প্রকৃত সার্থকতা আছে তাহাও নহে। ভগবানের নাম না লইলে যেন নয় তাই নাম লই। অনেকে তাই ভগবানের স্থান খুঁজিয়া পায় না, আচার নীতিই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট। ইহার কারণ ভগবানের উপর আমরা স্থান দিয়াছি মানুষ, মানুষের নিয়মাবলী। কাজেই এ দৃশ্য বিরল নহে যে যথার্থতঃ ভগবৎভাবসিদ্ধ মহাপুরুষ এই নিয়মাবলীর মধ্যে আর আপনাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছেন না, ভাগবত প্রেরণার মধ্যে আর মানবীয় বিধানের মধ্যে একটা একান্ত বৈপরীত্যই ফুটিয়া উঠিতেছে। সময়ে এই বাহিরের চাপ এত অতিমাত্র হইয়া উঠিয়াছে যে সাধারণ মানুষকেই দেখি মানুষের সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে, পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য স্বেচ্ছাচারকেই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে।

আমরা চাই সেই ধর্ম্ম যাহার প্রতিষ্ঠা ভগবান, ভগবানের ইচ্ছাশক্তি। সমাজ আমাকে বলিতেছে "শূদ্র তুমি তোমার ধর্ম্ম পরপদ সেবা, ব্রহ্মজ্ঞানে তোমার অধিকার নাই," দেশ বলিতেছে "দেশের সন্তান তুমি তোমার আর কোন কর্ম্ম নাই, দেহ মন ধরিয়া দিবে দেশের কার্য্যে"। আমি কিন্তু এ সকল কিছুই শুনিব

না, আমি শুনিব আমার মধ্যে ভগবানের বাণী, আমার আত্মার স্বতঃস্ফুরিত প্রেরণা আমাকে কোন্‌দিকে চালাইয়া লয়। যদি আদেশ পাই "তোমার কোনই কর্ম্ম নাই, যাও পর্ব্বত-গহ্বরে সমাধিমগ্ন হও" তবে সকল কর্ত্তব্য, সমাজের দেশের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহাই করিতে হইবে। যদি আদেশ হয় দেশের জন্ত দশের জন্ত সঙ্কুল যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড় তবে তদ্‌ব্যতিরেকে আমার অন্য গতি নাই। অন্তরে ভগবানকে জাগরিত করিয়া ধরা, তাঁহার অঙ্গুলি সঙ্কেতে চলাই প্রকৃত ধর্ম্ম। জীবনের, কর্ম্মের, প্রয়াসের আর কোন মানদণ্ড নাই। আমার আত্মায় ভগবান কোন্ শক্তিরূপে আবির্ভূত তাহাই চিনিব তাহাকেই সর্ব্বতোভাবে প্রকটিত করিব। তাহা আচার-বিরুদ্ধ নীতি-বিরুদ্ধ হইতে পারে কিন্তু ভগবানের বিরুদ্ধ নহে। এইটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

কিন্তু প্রশ্ন উঠিবে মানুষের সমাজের নিয়ম মানুষকে যদি এই ভাবে পদদলিত করিয়াই চলিতে হয় তবে মানবজাতি মানবসমাজ টিকিবে কি করিয়া? নীতি ও আচার জগতের সাধনপদ্ধতিতে যে আদৌ স্থান পাইয়াছে ইহাতে কি বুঝিতে হইবে না উহা ভগবানেরই ইচ্ছা? ইহাই কি সত্য নয় সমাজের আচার নীতি হইতেছে ভগবানের সমষ্টিগত ইচ্ছা আর তোমার নিজের অন্তরের যে প্রেরণা যাহাকে ভাগবত প্রেরণা বলিতেছ—ভাগবত প্রেরণা বলিয়া স্বীকার করিলেও তাহা হইতেছে ভগবানের ব্যষ্টিগত ইচ্ছা? সমষ্টিগত যে ভাগবত ইচ্ছা তাহাই ত মহত্তর, ব্যষ্টিগত ভাগবত ইচ্ছার উচিত তাহার অনুগত হইয়াই চলা। আমাদের উত্তর ব্যষ্টির ও সমষ্টির যে দ্বন্দ্ব তাহা কেবল মানুষেরই মধ্যে, ভগবানের মধ্যে এইরূপ কোন দ্বন্দ্ব নাই, থাকিতেও পারে না। এই দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হইয়াছে তখন যখন মানুষ মানুষের জন্য নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছে, মানুষের যে অহংকার পরিচালিত অপরা প্রকৃতি তাহাকেই কেবল যখন মানুষ চিনিয়াছে। ভগবত চৈতন্যে ব্যষ্টি ও সমষ্টি পরস্পর পরস্পরের মধ্যে বিধৃত। ব্যষ্টির যে সহজ প্রেরণা যে পূর্ণতা তাহার মধ্যে সমষ্টির সহজ প্রেরণা ও পূর্ণতাই প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতেছে। ব্যষ্টি হইতেছে বৃত্তের কেন্দ্র, সমষ্টি সেই একই বৃত্তের পরিধি। আচার ও নীতির যে প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহা ভগবানেরই ইচ্ছা, কারণ যাহা কিছু আছে বা হয় তাহা আর কাহারও ইচ্ছায় নয়। কিন্তু এই ইচ্ছা খেলিয়াছে মানুষের এপারের স্তরটি লইয়া---ইহার মধ্যে ভগবানের স্বরূপ সত্তাটি নাই।

সকল মানুষই যদি আপনার ভগবানকে চিনিতে পারে, আপন অন্তরাত্মার প্রেরণায় ইসারায় চলিতে পারে, তবে কোথাও কোন দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ ফুটিয়া উঠিবে

না। সমাজ মানবজাতি চলিবে বিধাতার পরম সমন্বয় বিধৃত বিধানের মধ্য দিয়া। সকল মানুষ যদি নিজ নিজ অন্তরের ভাগবত আদেশ পালন করিয়া চলে তবে ভগবানের বিশ্বজাগতিক সমষ্টিগত যে বিচিত্র লীলা তাহাও চলিবে অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যে-মণ্ডিত হইয়া। মানুষের বিধান কখনই জগৎকে তেমন সুচারুরূপে অব্যর্থ ফলপ্রসূ করিয়া পরিচালিত করিতে পারিবে না। বিধান যখন শুধু পুস্তক নিবদ্ধ নহে, তাহাকে কার্য্যকরী করিতে যখন আইন আদালত সমাজের শাসন প্রয়োজন হয় না তখন মানুষ নিজেই নিজের ধর্ম্ম পালক এবং সেইজন্য সকলের সমগ্রেরই ধর্ম্মপালক।

এই ধর্ম্ম কেহ সৃজন করিতে পারে না। যে নিগূঢ় প্রেরণায় এক, বহুরূপে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িয়াছে, যাহার শাসনে নিখিল সৃষ্টি চলিয়াছে, যাহা শাশ্বত সনাতন তাহাই ধর্ম্ম। ইহার প্রতিষ্ঠা তুরীয়লোকে, ভগবানের বিজ্ঞান লোকে বিরাট চৈতন্য মধ্যে। ইহারই নাম সত্যলোক—যেখানে সত্য সত্ত্ব, সত্য কর্ম্ম সকল বস্তুর অন্তরাত্মার প্রকৃতি। বাহিরে স্থূলে অথবা মন বুদ্ধির মধ্যে যে বিধান যে শৃঙ্খলা তাহা এই গভীরতর উচ্চতর বিধান ও শৃঙ্খলার বিকৃতি বা ছায়া মাত্র। এই যে সত্য বিধান এই যে সত্য শৃঙ্খলা মানুষ দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পারে ইহার রূপ, দিব্যশ্রুতিতে শুনিতে পারে ইহার নাম। ঋষিদিগের আখ্যা তাই দ্রষ্টা শ্রোতা। কিন্তু কোন্ মর্ত্ত্যজীব এই সনাতন ধর্ম্মকে জন্ম দিতে অথবা রচনা করিতে সাহসী হইবে? মানুষের সকল কর্ত্তব্য তাহার অধঃস্তরের প্রকৃতিটি উপরে উঠাইয়া এই সমুচ্চের মধ্যে সংগ্রথিত করিয়া দেওয়া, অত্রের যে ব্যর্থ শৃঙ্খলা প্রয়াস তাহার পরিবর্ত্তে অমুত্রের অব্যর্থ অদন্ধ সামঞ্জস্যকেই প্রকটিত করিয়া ধরা। মন বুদ্ধি আবেগ বাসনা যে ধর্ম্ম রচনা করে সে ধর্ম্ম খণ্ডিত ধর্ম্ম, যেন গোধূলির অস্পষ্ট ছায়াপাত। আমরা চাই অনন্তের চৈতন্যে, বৃহতের মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডে আত্মার যে অঙ্গ সঞ্চালন রেখায় রেখায় স্ফুট, স্ফুরিত, পরিপূর্ণ।

পূর্ণ-যোগ

(১)

যোগের স্বরূপ

মানুষে ভগবানের স্পর্শ—ইহারই নাম যোগ। এখানে ভগবান্ অর্থে আমরা যাহাই বুঝি না কেন তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। মানুষ হইতে উচ্চতর বৃহত্তর বিশ্বজনীন অথবা তুরীয় একটা কিছু জাগ্রত সত্তা এইটুকু স্বীকার করিয়া আরম্ভ করিলেই যথেষ্ট। ভক্তের সহিত ভগবানের, অহংএর সহিত ঈশ্বরের, জীবের সহিত শিবের, আত্মার সহিত পরমাত্মার—এমন কি বৌদ্ধমত অনুসরণ করিয়া সংস্কারের সহিত শূন্যের—আমরা সেই একই সংযোগের কথা বলিতে পারি। মূল কথা এই সংযোগ, এই সম্বন্ধ স্থাপন, উহা হইতেই যোগসাধন আরম্ভ। কিন্তু এই সাধনার প্রণালী, গতি, পরিণতি সব নির্ভর করে মানুষ আপনার কোন্ ভাগে কোন্ ক্ষেত্রে ভগবানের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে বা হইতে চাহিতেছে, তাহার কোন্ অঙ্গে ভগবানের স্পর্শ পড়িয়াছে।

কারণ মানুষ বিশুদ্ধ অমিশ্র অখণ্ড একটি বস্তু নয়। সে বিভিন্ন ও বিপরীত গুণাবলীর সমষ্টি, প্রকৃতির সকল স্তর তাহার মধ্যে গ্রথিত, সৃষ্টির সকল স্রোতই তাহার মধ্যে বহমান। আমরা স্পষ্টই লক্ষ্য করিতে পারি প্রধানতঃ তিনটি স্তর একটির উপরে আর একটি বিন্যস্ত রহিয়াছে। প্রথম দেহ আর দেহকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে যে জীবনীশক্তি বা প্রাণশক্তি। দ্বিতীয়, মন—বুদ্ধি বিচার চিন্তা ভাবুকতা প্রভৃতির খেলা এই উর্দ্ধতর ক্ষেত্রে। তৃতীয় ও উর্দ্ধতম ক্ষেত্র হইতেছে অধ্যাত্মবোধ যাহার স্বরূপ বিজ্ঞানময়, আনন্দময়—যাহা অমৃতত্বের অধিষ্ঠান। বর্ত্তমানে মানবপ্রকৃতি এখনও এই আত্মাকে সজ্ঞানে চিনিতে পারে নাই, সে তাহার মনের খেলার মধ্য দিয়াই আভাসে ইঙ্গিতে ইহাকে বোধ করিতেছে। কিন্তু উহাই সৃষ্টির চরম লক্ষ্য। দেহ ও প্রাণ লইয়া মানুষের পশুভাব, মন বুদ্ধি লইয়া মানুষের মানুষভাব আর তুরীয় জ্ঞান আনন্দ লইয়া মানুষের দেবভাব বা সিদ্ধভাব। বিবর্ত্তনের গতি চলিয়াছে পশুভাব হইতে মানুষভাবে, মানুষভাব হইতে দেবভাবে ক্রমে ক্রমে আরোহণ করিতে।

ভারতবর্ষে যে নানা সাধনপন্থা প্রচলিত আছে তাহাও মানুষের এই ত্রিধা ভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে স্তরে স্তরেই সজ্জিত। প্রথম হঠযোগ। হঠযোগের ক্ষেত্র মানুষের সর্ব্ব নিম্ন স্তর। শরীর ও প্রাণশক্তিকে কেন্দ্র করিয়া উহার মধ্যেই ভগবানের স্পর্শ অনুভব করা হঠযোগের উদ্দেশ্য। তারপর রাজযোগ মানুষের দ্বিতীয় স্তরের উপর স্থাপিত। সমস্ত মনটি, মনের কোন বিশেষ বৃত্তি বা খেলা নয় কিন্তু মনের যে মূলপ্রকৃতি সেই মানসসত্তা অথবা চিত্ত দ্বারাই রাজযোগ মানুষকে সাধনমার্গে নিয়ন্ত্রিত পরিচালিত করিতেছে। রাজযোগ কেন্দ্রীভূত মানুষের সূক্ষ্মদেহে। সর্ব্বশেষে মানুষের আধ্যাত্মিক বৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সেই মার্গত্রয়—(১) জ্ঞানযোগ (২) ভক্তিযোগ (৩) কর্ম্মযোগ। জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মপ্রেরণা (ইচ্ছাশক্তি will) মনের এই তিনটি প্রকরণ। জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগ যথাক্রমে এই তিনটির একটির উপর নির্ভর করিয়া উহার সাহায্যে মানুষকে ভাগবতসত্তায়, সচ্চিদানন্দে পরিণত করিতে চায়। মার্গত্রয়ীর কেন্দ্র মানুষের স্থূল দেহও নয়, সূক্ষ্ম দেহও নয়, তাহা হইতেছে আত্মা, জীব বা পুরুষ। জ্ঞান প্রেম অথবা শক্তির মধ্য দিয়া আত্মার সহিত পরমাত্মার, জীবের সহিত ভগবানের, পুরুষের সহিত পুরুষোত্তমের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপনই ত্রিমার্গের অধ্যাত্মযোগ।

এই ভিন্ন ভিন্ন সাধনপন্থার সার্থকতা কি, অভাব কি, গুণ কি, দোষই বা কি তাহা বিচার করিবার পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথমে স্পষ্ট নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন সাধনার উদ্দেশ্য কি, যোগের লক্ষ্য কি? কারণ একমাত্র উদ্দেশ্য দ্বারাই উপায়ের সফলতা বা নিষ্ফলতা বিচার সম্ভব। কোন সাধনমার্গের উপযোগীত্ব কোথায়, অনুপযোগীতা কোথায় তাহা স্থির করিতে হইবে কি লক্ষ্য করিয়া আমরা সাধনা করিতে চলিয়াছি। যোগসাধনার দুইটি লক্ষ্য আমাদের সম্মুখে—কৈবল্যমুক্তি আর জীবনমুক্তি। মায়াবাদীগণের মত জগৎকে যদি শুধু মরীচিকা শুধু দুঃস্বপ্ন বলিয়া জানি, বৌদ্ধদিগের মত মানুষকে, সৃষ্টিকে যদি "ক্ষণিক বেদনা"-সমষ্টিরূপেই গ্রহণ করি তবে জগতে থাকিতে আমরা চাহিব না—কোনরূপে এই দুঃস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিতে পারিলেই আমাদের নিঃশ্রেয়স, দীপশিখার মত কোনরূপে নির্ব্বাপিত হইয়া যাওয়াই পরম পুরুষার্থ। জীবনকে মুছিয়া দিয়া, জগতের সহিত সকল সম্পর্ক শূন্য হইয়া উহাদের অতীতে কোন কিছুতে অথবা কিছু-না'র মধ্যে মিশিয়া মিলাইয়া যাওয়াই কৈবল্যমুক্তি। ইহাই যদি আমাদের সাধনার

লক্ষ্য হয় তবে এই যে ভিন্ন ভিন্ন সাধনপন্থা তাহাদের পরস্পরের তুলনা বা দোষগুণ বিচার করা উহাদের সমন্বয়ের চেষ্টা করা বিশেষ প্রয়োজন হয় না। যে পন্থাই নির্ব্বাচন কর না কেন, একবার নির্ব্বাচিত করিয়া সেই পন্থা ধরিয়া বরাবর চলিয়া গেলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। উপরে উঠিয়া যাওয়াই যখন একমাত্র লক্ষ্য তখন উপায় রজ্জু হউক, বংশমঞ্চ হউক অথবা প্রস্তরের সোপান হউক তাহাতে কি আসে যায়—কোন প্রকারে পার হইতে পারিলেই ত সব হইল। তবে একথা সত্য, ভিন্ন স্বভাব ভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে কোনও পন্থা কাহারও কাছে সুগম কাহারও কাছে দুর্গম। কিন্তু এইটুকু বিচার করা সাধকের পক্ষে যে বিশেষ কষ্টকর তাহা নয়।

কিন্তু জগতের অর্থ যদি আমাদের কাছে অন্যরূপ বোধ হয়, জগৎ মোহ বা দুঃস্বপ্ন নয়, জগৎ আনন্দময়, জগৎকেই যদি আমরা নিঃশ্রেয়সের আধার বলিয়া জানি, জীবনকে অস্বীকার করিয়া নয়, জীবনকে আলিঙ্গন বদ্ধ করিয়াই যদি আমরা মুক্ত সিদ্ধ হইতে চাই তবে যোগসাধনার এক সম্পূর্ণ নূতন মূর্ত্তি আমাদের চক্ষে ফুটিয়া উঠে। মানুষরূপ যে মন্দির তাহার দেবতা মন্দিরের চূড়ায় যে কেবল অধিষ্ঠিত তাহা নয়, এই মন্দির যে সেই চূড়ায় উঠিবার জন্য শুধু সোপানাবলীর সমষ্টি তাহা নয়। ইহার মধ্যে যতগুলি প্রকোষ্ঠ আছে সবগুলিই দেবতার প্রতিষ্ঠান, দেবতার নিবাস ধাম—সকলগুলি যুগপথ পরিষ্কৃত, পরিমার্জ্জিত রাখিতে হইবে, সকলগুলির মধ্যেই যুগপৎ যজ্ঞকুণ্ড প্রজ্বলিত রাখিতে হইবে। শরীরের অতীত হইবার জন্যই শুধু শরীর নয়, মনের অতীত হইবার জন্য শুধু মন নয়, জ্ঞান প্রেম কর্ম্মের অতীত হইবার জন্যই শুধু জ্ঞান প্রেম কর্ম্ম নয়, ব্যক্তিত্বকে বিনষ্ট করিবার জন্যই শুধু ব্যক্তিত্ব নয়। দেহ মন আর অধ্যাত্মবৃত্তি ভগবানকে পাইবার যে কেবল পন্থা বা উপায়মাত্র তাহা নহে। আমরা যখন বুঝিতে পারি শরীরের পশ্চাতে কেবল যে ভগবান্ তাহা নহে শরীরই ভগবান্, মনের পশ্চাতে শুধু নহে মনই ভগবান্, অধ্যাত্মসত্ত্বার পশ্চাতে শুধু নহে অধ্যাত্মসত্ত্বাই ভগবান্ তখন সকল প্রকার সাধনপন্থারই একযোগে আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করি। শরীর মন আত্মা এই তিনটী স্তরেই আমরা প্রতিষ্ঠিত থাকিব, মানুষের সমগ্রটির মধ্যে ভগবানকে জাগাইয়া তুলিব, আমাদের কোন একটিমাত্র অঙ্গে নয়, আমাদের যাহা কিছু

আছে সকল অঙ্গদ্বারাই ভগবানকে আলিঙ্গন করিব—ইহাই যদি আমাদের যোগের লক্ষ্য তবে শুধু একটি কোন বিশেষ পন্থাই আমাদের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। আমরা চাই অখণ্ড পূর্ণযোগ যাহাদ্বারা আমাদের সকল স্রোতধারায় ভগবান কূলে কূলে ভরিয়া উঠিতে পারেন, আমাদের সকল ক্ষেত্রকেই ফলে ফুলে ফসলে ঋদ্ধিমান করিয়া তুলিতে পারেন। আরও, আমরা শুধু ব্যক্তিগত সিদ্ধি চাহি না, আমরা চাহি বিশ্বমানবেরই সিদ্ধি। বিশ্বমানব যাহাতে শুদ্ধ, মুক্ত, পূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে আমাদের ব্যক্তিগত সাধনা তাহারই প্রতিকৃতি। মানবসঙ্ঘের নির্ব্বাণ আমরা চাহি না, আমরা চাহি যাহাতে সে তাহার অশেষ বৈচিত্র লইয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে। তাহার বর্ত্তমান সকল প্রেরণা সকল প্রয়াস সকল কর্ম্মই থাকিবে শুধু তাহা প্রতিষ্ঠিত হইবে একটা উচ্চতর কিছুর মধ্যে—ভগবানের মধ্যে। ইহা যখন আমাদের উদ্দেশ্য তখন কোন একটি মাত্র বিশেষ সাধনমন্ত্র কিছু সমগ্র মানবজাতির ভিন্নমুখী প্রচেষ্টার উপর চাপাইতে পারি না। তাই আমাদের সকল পন্থার সমন্বয় বাহির করা প্রয়োজন, এমন সমন্বয় যাহা শুধু আমাদের নিজের নিজের নয় কিন্তু নিখিল জীবের মানবজাতির সমষ্টিগত সাধনার পক্ষেই প্রযোজ্য হইতে পারে।

এই পূর্ণাঙ্গ যোগই যখন আমাদের লক্ষ্য তখন এই লক্ষ্যটিকে সম্মুখে রাখিয়া, উহার সাহায্যেই স্থির করিতে হইবে কোন্ যোগপন্থার কতটুকু সার্থকতা, কতটুকুই বা ত্রুটি। তাহার পূর্ব্বে এই বিভিন্ন পন্থার কিছু ব্যাখ্যা, কাহার কি বিশেষ ফল তাহা নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন।

একটি রূপক গল্প

এক যে ছিল ছোট্ট দোয়েল পাখী। নীল অনন্ত আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তার প্রাণ পুলকে পুলকে নাচিয়া উঠিত। বক্ষ তার আনন্দে আনন্দে পোরা। সারাদিন তার গানের আর অন্ত ছিল না, অনন্ত গগনে উড়িয়া উড়িয়া তার আর ক্লান্তি ছিল না, শাখা হইতে শাখান্তরে, বৃক্ষশির হইতে বৃক্ষশিরে, লতামণ্ডপ হইতে লতামণ্ডপে তার নৃত্য করিয়া

বেড়াইয়া বেড়াইয়া আর সাধ মিটিত না। এমনি ছিল সে ছোট্ট দোয়েল পাখী।

একদিন সারাদিনের নৃত্য সারিয়া, গীত গাহিয়া, অনন্ত সুনীল গগনের ছুটাছুটি সাঙ্গ করিয়া যখন সে আপন কুলায় ফিরিয়া চলিয়াছিল তখন তার সাক্ষাৎ হইয়া গেল একটা প্রাচীন গৃধ্রের সঙ্গে। গৃধ্রের তিনকাল গিয়াছে এক কাল আছে। গৃধ্র ক্ষুদ্র দোয়েলকে ডাকিয়া কহিল—"ওরে ক্ষুদ্র পাখী আমার সম্মুখে আসিয়া উপবেশন কর্।" দোয়েল বৃদ্ধের কথা অগ্রাহ্য করিতে পারিল না, বিনীতভাবে গৃধ্রের সম্মুখে গিয়া উপবেশন করিল। গৃধ্র কহিল—"ওরে ক্ষুদ্র, ওরে চপলচিত্ত, কোন্ ধ্বংসের পানে ছুটিয়া চলিয়াছিস্। ওরে দুর্ব্বুদ্ধি কোন্ ভেলাহীন অকূল পাথারে কোন্ দুরাশার আকাঙ্খায় আপনাকে ভাসাইয়া দিয়াছিস্।" গৃধ্রের কঠিন এবং কঠোর বাক্য শুনিয়া ক্ষুদ্র দোয়েলের বক্ষ দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তার জীবনের সমস্ত আনন্দ, সমস্ত পুলক কোন্ আশু বিঘ্নের সম্ভাবনায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। সভয়ে এবং সম্ভ্রমে কহিল—"প্রভু—" কিন্তু আর কোন কথা খুঁজিয়া না পাইয়া শুধুই কাঁপিতে লাগিল। গৃধ্র কহিল—"ওরে মূঢ়, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। আজ আমি তোকে সত্যধর্ম্মে দীক্ষিত করিব। তোর অত্যন্ত সৌভাগ্য যে আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিস্। শোন্—তোর ঐ নৃত্য তোর জীবনকে শুধু পাপে পাপেই পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে—তোর সঙ্গীত অতি জঘন্য কার্য্য—আর তোর ঐ অনন্ত গগনে যে উড়িয়া বেড়ান সেটা অত্যন্ত ভুল।" দোয়েল বলিয়া উঠিল—"ভুল প্রভু!" গৃধ্র কহিল—"ভুল—অত্যন্ত ভুল—আগা হইতে গোড়া পর্য্যন্ত সমস্ত ভুল। এমন ভুল জগতে আর কিছু নাই।" দোয়েল গৃধ্রের সত্যধর্ম্মের সহিত আপনার জীবনকে কিছুতেই মিলাইয়া লইতে পারিতেছিল না তাই তাহা সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিতেছিল না। কিন্তু যাঁহার এত বয়স হইয়াছে যিনি সংসারে এত বৎসর ধরিয়া বাস করিয়াছেন তিনি জ্ঞানবানই হইবেন মনে করিয়া গৃধ্রের কথায় আস্থা স্থাপন করাই সমীচীন মনে করিল। তথাপি একবার প্রশ্ন করিল—"উড়িয়া যে আনন্দ পাই প্রভু।" গৃধ্র কহিল—"ঐ আনন্দই ত ভগবানের পথে অন্তরায়, বিঘ্ন।" ক্ষুদ্র দোয়েল সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল "ভগবান কি, প্রভু?"

গৃধ্র কহিল—"হে বৎস, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ভগবান আনন্দময়। তিনি এই জগৎ সংসার, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন।" গৃধ্রের

এই কথা শুনিয়া দোয়েলের প্রাণ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া উঠিল। দোয়েল কি বলিতে যাইতেছিল গৃধ্র বাধা দিয়া কহিল—“কিন্তু জানিও বৎস সেই এক ভগবানই সত্য আর এ জগৎ সংসার ভুল।” ক্ষুদ্র দোয়েলের মন আবার দমিয়া গেল। গৃধ্র কহিতে লাগিল—“আরও মনে রাখিও বৎস, ভগবান্ abstract এই সত্য, concrete এ তিনি ভুল; abstract এ তিনি আনন্দময়, concrete এ তিনি দুঃখময়। concrete এ যদি কিছু সুখময় আনন্দময় পাও তবে জানিও তাহা শয়তানের খেলা। আরও জানিও বৎস, জীবনে যাহা সহজ যাহা সরল যাহা স্বতঃ তাহাই ভগবানের পথে অন্তরায়। জীবনে যাহা প্রেয় বলিয়া মনে হইবে তাহাকেই বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে কারণ ভগবান্ যিনি তিনি শ্রেয়, প্রেয় নহেন।”

দোয়েল বৃদ্ধ গৃধ্রের কথা ভাল বুঝিতে পারিল না কিন্তু তাহার কথায় তাহার মন প্রাণ অত্যন্ত বিষাদিত হইয়া উঠিল। সে কহিল—“কি করিতে হইবে প্রভু?” গৃধ্র কহিল—“ভুল পথ পরিত্যাগ কর। আর উড়িও না।” দোয়েল জিজ্ঞাসা করিল—“প্রভু আপনি কি কোনদিন উড়েন নাই?” গৃধ্র উত্তর করিল—“উড়িয়াছিলাম বটে। কিন্তু হায় আমাকে সদুপদেশ দিবার কেহ ছিল না। তোমার অতি সৌভাগ্য যে সদুপদেশ প্রাপ্ত হইতেছ।” দোয়েল পুনরায় বলিল—“পক্ষদ্বয় যে উড়িতেই চায় প্রভু।” গৃধ্র কহিল—“তাহার উপায় করিতে হইবে। শোন। আপন আলয়ে ফিরিয়া যাও। এবং তথায় কদলীতন্তুদ্বারা রজ্জু নির্ম্মাণ করিয়া পক্ষদ্বয়কে এমন করিয়া বন্ধন কর যেন আর উড়িতে না পারে। যাও বৎস ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন।”

দোয়েল ক্ষুণ্ণমনে আপন আলয়ে ফিরিয়া চলিল। তাহার চোখের আলোক নির্ব্বাপিত। তাহার হৃদয় হইতে আনন্দের রাশিকে যেন ধীরে ধীরে কাড়িয়া লইল। দোয়েলের জীবন দুর্ব্বিসহ বোধ হইতে লাগিল। হায় জীবন ত দুঃখময়ই। এ জীবন রাখিয়া লাভ কি? এ ব্রহ্মাণ্ড হইতে মুছিয়া যাওয়াই ত সুখকর। দোয়েল আপন কুলায় গিয়া আপনার পক্ষদ্বয়কে বেশ করিয়া বাঁধিল আর জপিতে লাগিল—ভুল, ভুল, ভুল।

সে রজনীতে আর দোয়েলের ঘুম আসিল না। পক্ষদ্বয়ের যন্ত্রণায় এবং দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনায় তার মন ভারাক্রান্ত। সারা রজনী ছট্‌ফট্ করিয়া কাটাইয়া শেষ রজনীর দিকে যখন দোয়েলের চক্ষু একটু বুজিয়া আসিয়াছে

তখন পূর্ব্ব দিগন্তে অঞ্চল ছড়াইয়া অহনাদেবী সিন্ধুতরঙ্গের উপর দিয়া ধীর চরণ বিক্ষেপে ধরার আলস্য জড়তা মুছাইয়া দিতে আসিয়াছেন। উষার স্পর্শে কাননে কাননে লক্ষ কোটী কুন্দ গোলাপ আনন্দের আতিশয্য সহ্য করিতে না পারিয়া গালভরা হাসি লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। অলি গুঞ্জনের আর বিরাম নাই। হাজার বিহঙ্গের কণ্ঠগীতে আর ক্লান্তি নাই! দোয়েল চমকাইয়া চক্ষু চাহিল। মুহূর্ত্তের জন্য সে আপনার পক্ষদ্বয়ের যন্ত্রণা ভুলিয়া গেল। দেখিল সেই অনন্ত উদাত্ত সুনীল গগন তেমনি আছে—বাতাসের মাতামাতি, কুসুমের হাসাহাসি, সহস্র বিহঙ্গমের ছুটাছুটি—সেই সব। দোয়েলের চক্ষুদ্বয় অলক্ষিতে জলে ভরিয়া আসিল—হায় সে যে ভুলপথ পরিত্যাগ করিয়াছে—সে যে সত্যধর্ম্ম আলিঙ্গন করিয়াছে।

এমনি করিয়াই দোয়েলের দিন কাটিতে লাগিল। এমনি করিয়াই প্রতি উষায় সে চক্ষু মেলিয়া চাহে—এমনি করিয়াই তার বক্ষ কাঁপিতে থাকে, পক্ষদ্বয় চঞ্চল হইয়া উঠে, আর চক্ষুদুটী জলে ভরিয়া যায়। দোয়েল মনে মনে বলে—হায় ভগবান্ এমন নিষ্ঠুর কেন? ঐ সুনীল গগনে ছুটিয়া ছুটিয়া ভগবানকে মানা যে অনেক সহজ হইত। ঐ স্নিগ্ধ বাতাসে গলা ছাড়িয়া তার নাম গাওয়া যে অনেক আনন্দ হইত। তবে এ দুঃখ কেন? যাহা চাই তাহা ভগবানের পথে অন্তরায় হইল কেন? যাহা ভালবাসি তাহা মিথ্যা, ভুল কেন? হায় ভগবানের একি নির্ম্মমতা, একি নিষ্ঠুরতা, একি দরিদ্রতা! কিন্তু অভ্যাসে কিনা হয়। ধীরে ধীরে দোয়েলের পক্ষদ্বয় আড়ষ্ট হইয়া আসিল, হৃদয়ের উপর একটা ঘন কৃষ্ণ যবনিকা বিছাইয়া প'ড়িল, প্রাণের স্পন্দন মিশাইয়া গেল। জীবনে রহিল শুধু যাহা অতৃপ্তি, কঠিন দুর্ব্বিসহ জীবন-ভার, আর বিরাট অক্ষমতার ঔদাসীন্য। দোয়েলের দিন কাটিতে লাগিল।

একে একে কত বসন্ত লতায় পাতায়, গন্ধে গানে, ফুলে ফলে, ধরাকে সুসজ্জিত করিয়া আবার বিদায় লইল। একদা এক ফাল্গুনের ফুল্ল প্রভাতে দোয়েলের বোধ হইল যেন তাহার মর্ম্মতলে একটি বহুদিনের রুদ্ধ কবাট খুলিয়া গেল—সেখানে কোন একটী অজ্ঞাতলোকের পদ্মপুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া তাহার সমস্ত জীবনকে তাহারি সুরভীতে মোহিত করিয়া দিল—তাহার চক্ষে যেন কি এক অঞ্জন লাগিয়া গেল। আবার দেখিল এ জগৎ শুধু দুঃখময়ই নয়। এখানেও মাধুর্য্য আছে, সৌন্দর্য্য আছে, আনন্দ

আছে। আর দেখিল এ জগতে স্ত্রী-দোয়েল অপেক্ষা সুন্দর আর কেহ নাই, আর কিছু নাই। কি এক রহস্যময় টানে দিবসরজনী সে তাহার দিকে আকর্ষিত হইতে লাগিল। দোয়েল মনে মনে বলিল স্ত্রী-দোয়েলের সহিত হৃদয় মিলাইতে হইবে। দোয়েল গৃধ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল —"প্রভু আমি বিবাহ করিব।"

"বিবাহ!" গৃধ্র আপনার কর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"কি বলিতেছ বৎস?" দোয়েল উত্তর করিল—"প্রভু আমার বিবাহ করিবার বাসনা হইয়াছে।" গৃধ্র কহিল—"সে কি! এতদিন তোমাকে কোন্ ধর্ম্ম শিখাইলাম! শোন বৎস, স্ত্রী অপেক্ষা মহাপাতকী এ জগতে আর কেহ নাই—ভগবানের পথে এমন বৃহৎ, কঠিন বিঘ্ন আর কিছু নাই—স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া অনন্ত নিরয়গামী হইও না।" দোয়েল জিজ্ঞাসা করিল—"প্রভু আপনি কি কোনদিন বিবাহ করেন নাই?" গৃধ্র উত্তর করিল—"করিয়াছিলাম বটে। কিন্তু হায় আমাকে সদুপদেশ দিবার কেহ ছিল না। বৎস আপনাকে সৌভাগ্যবান মনে করিও। যাও, গৃহে ফিরিয়া যাও। বিবাহের কল্পনা পরিত্যাগ কর। সাধনা কর। ভগবান্ তোমায় সুমতি দিন্।"

দোয়েল হিমাদ্রিসদৃশ পাষাণভার বক্ষে লইয়া আপন আলয়ে ফিরিয়া আসিল। হায় সে কি করিবে? সে যতই স্ত্রী দোয়েলকে অস্বীকার করিতে চাহে ততই তাহার কমনীয় আলেখ্যটী তাহার মানসনয়নে ফুটিয়া উঠে, ততই তাহার রমণীয় মাধুরিমা তাহার অন্তরে অন্তরে নীলিমা রাশি বিচ্ছুরিত করিয়া যায়—আপনার মর্ম্মে মর্ম্মে কে যেন ডাকিয়া ডাকিয়া মিনতি করিয়া বিরাট আকাঙ্খার স্বরে বলে—"আমি চাই গো, আমি চাই"। সে যতই প্রাণপণে উচ্চারণ করিতে থাকে—ভুল, ভুল, ভুল--ততই কে যেন তাহার প্রাণে প্রাণে ঘোষণা করিয়া যায়--"আমি আছি গো আমি আছি"। হায় একি মহাসমস্যা! একদিকে সে, অন্যদিকে ভগবান্। স্ত্রী যদি ভগবানের পক্ষে অন্তরায়—তবে একি বিদ্রোহিতা জীবের! জীবের জন্ম কি শুধু চিরকাল ভগবানের সহিত বিদ্রোহিতা করিতে। নহিলে ভগবান্ যাহা চাহেন না ভগবানের রাজ্যে যাহা ভুল—জীবের তাহারি প্রতি আকাঙ্খা কেন? তাহাতেই তৃপ্তি কেন? হায় কে বুঝাইবে এ সমস্যা?

দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। দোয়েলের আপনার সহিত

আপনার সংগ্রামের আর অন্ত নাই। তাহার জীবনের চারি দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শুধুই যেন নাচিতে লাগিল—বিরাট শূন্যতা, নিষ্ঠুর অকৃতার্থতা আর মর্মন্তুদ ক্রন্দন। দোয়েল আর পারে না। দোয়েলের চক্ষে কালিমা পড়িয়াছে জীবন উদ্দেশ্যহীন মরণ কাম্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দোয়েল গৃধ্রের নিকট উপস্থিত হইল—কহিল—"আমাকে মুক্তি দিন প্রভু। আমাকে বিবাহের অনুমতি দিন।" গৃধ্র দোয়েলকে দেখিল ও বুঝিয়া কহিল—"যাও বিবাহ কর। কিন্তু দেখিও স্ত্রীর সহিত সাবধান হইয়া চলিও। স্ত্রীর প্রতি প্রণয়বান্ হইও না। স্ত্রী-সম্ভোগে আনন্দবোধ করিও না। জানিও তাহা হইলে চির জীবনের জন্য ভগবানকে হারাইবে। দোয়েল গৃহে ফিরিয়া গেল। তাহার জীবনে বহুদিনের পর যেন মরা-গাঙে বান আসিয়াছে। হৃদ্-যমুনার আনন্দ-লহরী প্রাণের কিনারে কিনারে কল কল ছল ছল রব তুলিয়াছে। জীবনের সমস্ত ক্লান্তি সমস্ত অবসাদ মুছিয়া গিয়াছে। দোয়েল যেন আর সে দোয়েল নাই।: সে যেন নবীন জন্ম লাভ করিয়াছে। জীবন ব্যর্থতাকে দূর করিয়া সার্থকতা লাভ করিয়াছে—ক্লান্তিকে তাড়াইয়া শান্তিকে পাইয়াছে—ভ্রান্তির যাপে যেন সে আপনার জন্মসত্ব অধিকার করিয়াছে। দোয়েল বিবাহ করিল।

কিন্তু দোয়েলের সমস্যার আর অন্ত নাই। এ কি পরিহাস জীবনের! এ কি সংগ্রাম জীবে আর ভগবানে! এ কি ভগবানের বিমর্ষ বদন আর জীবের যুগ যুগ ব্যাপী বিদ্রোহিতা! দোয়েল যখন স্ত্রী-দোয়েলকে বুকে করিয়া অতুল সুখ অতুল আনন্দে ডুবিত—প্রাণ কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠিত—ভগবানের অস্তিত্ব তাহার নিকট কতকটা স্পষ্ট হইয়া উঠিত তখনই—তখনই সে ভগবানকে কতকটা বুঝিতে পারিত। কিন্তু হায় জ্ঞানীর উপদেশ এ আনন্দ এ সুখ যে তাহাকে নিরয়গামী করিবারই সাহায্য করিতেছে—তাহাকে ভগবানের নিকট হইতে দূরে লইয়াই ফেলিতেছে। হায় নিষ্ঠুর ভগবান্! দরিদ্র ভগবান্!

যাহা হউক কালক্রমে দোয়েলের অনেক সন্তান সন্ততি হইল। যথা সময়ে তাহারাও বিবাহ করিল। তাহাদেরও আবার সন্তানসন্ততি জন্মগ্রহণ করিল। কিন্তু ইহারা কেহই আর উড়ে না—তাদের পক্ষ সব আড়ষ্ট—কেহই আর গান গাহে না—তাদের কণ্ঠ রুদ্ধ—কেহই আর খেলে না—তাদের হৃদয় আনন্দহীন। ইহারা সবাই আপন আপন কোটরে বাস করে—আর যখন প্রতি উষায় পৃথিবী নবজীবন লাভ করে—যখন স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহে—যখন সহস্র সহস্র বিহঙ্গের কণ্ঠকাকুলিতে কাননভূমি মুখরিত হইয়া উঠে—যখন লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী কুন্দ গোলাপে পুষ্পবীথি হাস্যময় হইয়া উঠে তখন বহু ঊর্ধ্বে উড্ডীয়মান দুই একটি পক্ষীকে দেখিয়া, এরা একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করে—"হা—হা কি ভুল পথেই ওরা চলিয়াছে—কোন্ ধ্বংসের পানেই ওরা ছুটিয়াছে।"

ব্রহ্মতেজ

যার জীবনে সংগ্রাম নাই, সে সমাজের কোন উপকারে আসে না—সেরূপ নিরর্থক জীবন দেখিতে শুনিতে ভাল হইলেও প্রকৃতির সদা আন্দোলিত ধরাপৃষ্ঠে তাহার স্থান নাই। এ পৃথিবী শান্তিনিকেতন নহে, উদ্দাম প্রকৃতির তাণ্ডব নৃত্যে সতত চঞ্চলা, মথিতা, বিত্রস্তা।

ইহার কারণ পৃথিবী যে ধ্বংসের দিকে চলিয়াছে এরূপ কেহ অনুমান করিবেন না। প্রকৃতি আপন পুরুষের অন্বেষণে ব্যস্ত, তিনি আঁতি পাঁতি করিয়া বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতেছেন মাত্র। পৃথিবীর ইতিহাস যতটুকু লোকচক্ষুর গোচর হইয়াছে, তাহা অনুশীলন করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—স্মরণাতীত কাল হইতে এই একই লীলা প্রকটিত হইয়া আসিতেছে।

কত ঝঞ্ঝা, কত বজ্র উল্কাপাত, কত ভূকম্পন, কত যুদ্ধ বিগ্রহ মহামারী দুর্ভিক্ষ, কত অত্যাচার অনাচার উৎপীড়ন যুগে যুগে অনুষ্ঠিত হইয়াছে—কত খণ্ড-প্রলয়—মহাপ্রলয়—কখন আঁধারে ব্রহ্মাণ্ড ডুবিয়া গিয়াছে কখন বা সিন্ধুজলে ধরণী নিমগ্না হইয়াছে কিন্তু এখনও সেই আমি সেই তুমি ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছি যাইতেছি—পাকে পাকে জীবন যায় যায় করিয়াও যায় নাই—অমর আত্মা কঠোর আবর্ত্তনের কেন্দ্রে নিষ্পেষিত হয় নাই, চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া লোপ পায় নাই—মিলন প্রয়াসী প্রকৃতির চক্ষে ধাঁধা লাগাইয়া অনন্ত বিকাশের মাঝে লুকোচুরি খেলিতেছে।

জীবনের সংগ্রাম, সে আমাদের খেলা—এ অমৃতের খেলা, আনন্দের খেলা; আমরা সাধ করিয়াই খেলিতেছি—মুগ্ধ বিপন্ন মোহগ্রস্তই অবসাদ ভোগ করে। আজ খেলিতে আসিয়া যাহারা আপনাদিগকে ক্লান্ত মনে করিতেছেন ‘ভেলামান্

চলে' বলিয়া আমরা তাহাদিগকে সাড়া দিই—আমাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া তাহারা আমাদের নিকটে আসুন—লতা-গুল্ম-বিজড়িত' ছায়া-শীতল বিটপীর কুঞ্জে আবার কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ছেদহীন অবকাশহীন দৌড় দিই নতুবা চঞ্চলা প্রকৃতি আমাদের ধরিয়া ফেলিবে।

এরূপ অবস্থায় পরাভব-স্বীকার-পরায়ণ সামর্থ্যহীন জীবই প্রকৃতির হস্তগত হইতে চাহে। কিন্তু দেখিতে হইবে প্রকৃতির ইচ্ছা কি ? এই অবস্থায় আমাদের লাভ করিয়া যদি তিনি পরিতৃপ্তা হইতেন, যদি তিনি আমাদের কণ্ঠে পরিণয়-মাল্য প্রদান করিয়া পতিত্বে বরণ করিয়া লইতেন—কথা ছিল না কিন্তু তিনি চাহেন অনন্ত শক্তিধর পুরুষকে, মৃত্যুঞ্জয় শিবকে, নির্ব্বিকারচিত্ত মহাযোগী শঙ্করকে ; নতুবা মহাকালী গ্রাস করিয়া ফেলিবেন সংগ্রাম-বিরত অলসকে, কেননা এ পৃথিবী অসমর্থ জীবের জন্য নহে পরন্তু ভোগ সামর্থ্যবান অজেয় অমর শিবের জন্য।

আপনারা কি দেখিতে পান না মরণ ভয়ে ভীত অনিচ্ছায় শত শত জীব শ্মশানকালীর লেলিহান রসনায় সংলগ্ন হইয়া আপনাদের ক্ষুদ্র অস্তিত্ব অকারণ লুপ্ত করিতেছে—আপনারা কি দেখিতে পান না কুহকিনী মায়ামোহে বিভ্রান্ত হইয়া পদে পদে নিরাশার জমাট আঁধার ঠেলিতে ঠেলিতে অবসন্ন হৃদয়ে জীবকুল অজস্র অশ্রুপাতে হৃদয় ভাসাইয়া দিতেছে—আপনারা কি দেখিতে পান না সংগ্রাম-বিমুখ ভীরু কাপুরুষ প্রকৃতির তীক্ষ্ণ শূলাঘাতে জর্জ্জরিত মৃতপ্রায় হইয়া ধুলায় গড়াগড়ি দিতেছে—রোগে শোকে অনুতাপে অবসন্নতায় অমৃতের পুত্রগণ কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত !

ভারতের মোহ দূর করিয়া প্রকৃতির তাড়নায় সে যাহাতে ক্রমাগত দৌড়াইতে পারে তাহার প্রতিকার আমরা করিতে চাহি—পরিপূর্ণ জীবন লাভ না করিয়া শ্রম কাতরতা-পরবশ যাহাতে প্রকৃতির স্মরণাগত না হয় সেই শিক্ষাই প্রচার করিতে চাহি। অমৃতের পুত্র ঋষি অরবিন্দ যেমন বলিয়াছিলেন, "আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার পায়ে আছে---শারীরিক বল নয়, তরবারি বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, জ্ঞানের বল। ক্ষত্রতেজ একমাত্র তেজ নহে ব্রহ্মতেজও আছে।" সেই ব্রহ্মতেজে ভারতের হৃদয় পূর্ণ করিয়া তুলিতে চাই—ইহাতে আমাদের যে যাহাই বলুক তাহা আমরা গ্রাহ্য করিব না।

স্পষ্ট কথা

যাঁহারা বিশ্বমানব জাতির মঙ্গল উদ্দেশ্যে চিন্তান্বিত তাঁহাদের আজ নির্ভীক-চিত্তে স্পষ্ট কথাগুলি খুলিয়া বলিতে হইবে। কপট স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি মুখে রাজভক্তি দেখাইয়া জগতের যে নূতন স্রোতঃ তাহার বিপরীতাচরণ করিতে পারে এবং সাময়িক খ্যাতি, যশঃ, সুখভোগও লাভ করিতে পারে—কিন্তু অনন্তকাল তাহাদের হা হা করিতেই হইবে, ইহাই বিধি-নির্দ্দিষ্ট সনাতন পদ্ধতি।

আজ যাঁহারা তথাকথিত ধর্ম্মান্দোলনে তনুমনপ্রাণ দিয়া যোগদান করিতে প্রয়াসী, যাঁহারা পৃথিবীর দুঃখকষ্ট অনিত্য বলিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন, যাঁহারা দেশের সর্ব্ব প্রকার দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহার প্রতিকার-পরায়ণ নহেন—অনন্ত স্বর্গভোগ তাঁহাদের অদৃষ্টে নির্দ্দিষ্ট হউক ক্ষতি নাই। কিন্তু এরূপ ধর্ম্মলাভ না করিয়া মানব জাতির কল্যাণ চিন্তায় যদি আজন্ম নরকভোগ করিতে হয় তাহাও আমরা শ্রেয়ঃ জ্ঞান করি।

* * *

ভারতে সন্ন্যাসীর প্রভাব একদিন ছিল—আজও যে নাই একথা বলি না। তবে যাঁহারা কেবল পারমার্থিক চিন্তায় ভরপুর, যাঁহারা জগতের কোন সংবাদই রাখেন না—তাঁহারা যে আজ বাঙ্গালীজাতির কর্ণধার হইতে পারেন এ কথায় আমাদের আর বিশ্বাস নাই। মহামতি তিলকের ভাষায় আমাদের বলিতে ইচ্ছা করে,—“ I say the days of wonders are gone. You can not now feed hundreds of people on a few crumbs of bread as Jesus did. The attainment of this object cannot be achieved by a wonder from heaven. You have to do it—These are days of work.

কথাগুলি স্বর্ণাক্ষরে বাঙ্গালী যুবকদের হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখা উচিত। অনির্দ্দিষ্ট কল্পনার মায়া মরীচিকায় উন্মত্ত হইয়া দৌড়াদৌড়ি করিবার যুগ আর নাই—ইহা কঠোর কর্ম্মযুগ—কর্ম্মযোগের মধ্যেই শ্রীভগবান্ এবার পূর্ণ প্রকট। এই কর্ম্মযোগ সাধন করিতে পারিলেই অভাবনীয় বিভূতি

লাভ করিবে—ফুৎকারে আর কিছুই হইবে না, একথা মনে রাখিও।

* * *

আজ বাঙ্গালীর মনের কথা খুলিয়া বলিতে হইবে—স্পষ্ট কথা প্রকাশ করাও বিপদের কথা বলিয়া বসিয়া থাকিলে ভীরুতার পরিচয় দেওয়া হয়। যে ভীরু সে বকধার্ম্মিক, তাহার দ্বারা রাজা প্রজা কেহই প্রকৃত উপকৃত হইবে না। আর ইহাও সত্য, সমস্ত জগতের যে ভীষণাবর্ত্ত, ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার কেন্দ্র বাঙ্গালা দেশের উপরই নির্দ্ধারিত হইবার উপক্রম হইতেছে। আজিকার এই কথা ভাবরাজ্যের হইলেও অচিরেই ইহা বস্তুতন্ত্র হইয়া উঠিবে।

* * *

কিন্তু হায় আজ বাঙ্গালী জাতি উৎকট দমন-নীতিতে আপনাদিগকে বিপন্ন বলিয়া অবধারণ করিতেছে। বিধি-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মফল ভোগ না করিলে যে, জাতির চরিত্র নিষ্কলঙ্ক হয় না—এ কথা জানিয়াও তাহারা আত্ম-বিস্মৃত হইতেছে। এই দারুণ দমন-নীতিতে যে রাজশক্তির অপব্যবহার হইতেছে একথা আমরা বলি না বরং এরূপ নিস্পেষণী-যন্ত্রে পিশিয়া জাতির চরিত্র পরিশুদ্ধ করিতে হয় এবং এইরূপ শুদ্ধ চরিত্রবান্ ব্যক্তিই রাজশক্তির প্রকৃত কল্যাণকারী হইতে পারে। আজ আমরা ধন্ত—যে প্রকৃত অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়াও আমাদের উচ্চ জ্ঞানকে হারাই নাই—আমাদের জ্ঞানালোক দিন দিন উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে। হিংসাবৃত্তি বিদূরিত হইয়া শুভ্র বিশ্বপ্রেমে হৃদয় ভরিয়া উঠিতেছে। বাস্তব জগতের সমৃদ্ধি লাভ করিলে রাজশক্তি একা বাঙ্গালী জাতির সাহায্যেই জগতে অপরাজেয় হইয়া উঠিবে।

* * *

রাজশক্তির অপব্যবহার হইতেছে না বলিলে অনেক রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ আপত্তি করিবেন, কেননা দুষ্ট দমনের কৌশল অবলম্বন করায় অনেক নিরপরাধী প্রকৃত কর্ম্মী হস্তপদ-বদ্ধ হইয়া পড়িতেছে—অবশ্যই একথা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু সত্যের প্রভাব যদি অদমনীয় হয় তবে এই কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়াই তাহাকে ফুটিয়া উঠিতে হইবে—বাংলার কর্ম্মস্রোতঃ যদি ঈশ্বর-অভিপ্রেত হয় তবে ইহা অবরুদ্ধ হইবে না—ইহা প্রমাণ করিতে হইলে বাংলার বর্ত্তমান অবস্থাই স্বাভাবিক এবং বাঞ্ছনীয়।

তাই আজ চাই ভগবানের আদেশে—নির্ভীক ত্যাগী কর্ম্মীর দল যাঁহাদের মধ্যে পৃথিবীর ভোগাকাঙ্খা স্থান পাইবে না—যাঁহারা কপট হিংসা-পরায়ণ নহেন পরন্তু প্রেমিক সরল উদার, মুক্ত শুদ্ধ ভগবদ্‌ভক্ত—পৃথিবীর সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠাকল্পে সহাস্যে জীবন উৎসর্গ করিবেন—যাঁহাদের আগমনে বসুন্ধরা ধন্য হইবে। নানা সংস্কারাবদ্ধ কুটিল কর্ম্মীর দল অপসারিত হউক, এই শুদ্ধ নবীন দল তীক্ষ্ণ কণ্টকময় পথের উপর দিয়াই দিব্যযুগের পুনরাবর্ত্তন করিবেন।

* * *

আমরা ভারতের রাজশক্তি প্রজাশক্তি উভয়কেই সম্বোধন করিয়া বলি, আজ কেবল বুদ্ধির অঙ্গুলি সঙ্কেতে কর্ম্মক্ষেত্রে আগুয়ান হইলে পদে পদে উভয়কেই বিপর্য্যস্ত হইতে হইবে—আজ ফুটাইয়া তুলিতে হইবে জ্ঞানকে—জাতিবদ্ধ সংস্কারের বশবর্ত্তীতায় অহং-অন্ধ হইয়া চলিবার দিন ফুরাইয়াছে—জ্ঞানের প্রদীপ্ত আলোকে প্রতি মানবের ভিতর যে মহত্ত্বের দিব্য প্রদীপ উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিতেছে, তাহা সন্দর্শন করিয়া এই স্বর্গীয় আলোকের মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে বরণ করিয়া লই—এ মিলনে অন্যথা করিলে আমরা যে তিমিরে সে তিমিরেই রহিয়া যাইব।

আমাদের আশা কি ?

মানুষ যখন অসভ্য ছিল, যখন সে পর্ব্বতে কান্তারে ঘুরিয়া বেড়াইত এবং তীরধনুকের দ্বারা বন্যপশু হনন করিয়া তাহার মাংসে আপনার জঠর জ্বালা নিবারণ করিত, তখন তাহার মধ্যে জটিলতা নামক পদার্থটী জন্মলাভের একেবারেই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। তখন তাহার সব ছিল সরল। তাহার মধ্যে কোনখানে কোন অস্পষ্টতার ছায়া ছিল না—তাহার মধ্যে যাহা ছিল তাহা অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই ছিল যাহা ছিল না তাহা একেবারেই ছিল না। বিপরীত ভাবের সংঘর্ষ তাহাকে কোন দিন আকুল করিয়া তুলিত না—চিন্তার মধ্যে হিত অহিত, মঙ্গল অমঙ্গল, পাপ পুণ্য তাহাকে কোন দিন "To be or not to be"র সমস্যায় আনিয়া ফেলিত না। সে মিথ্যা

কথা বলিতে পারিত না। গোপন করিতে জানিত না। তাহার জীবন ছিল দিবসের মত আলোকদীপ্ত,প্রকাশ্য — নিশীথের মত সংগ্রামশূন্য, উদ্বেগহীন। আর তাই সে ছিল সুখী। কিন্তু সুখী হওয়াটাই ত মানুষের সবখানি নয়।

সুখী হওয়াটাই মানুষের সবখানি নয় তাই কোন্ দূর শতাব্দীর কোলে, কোন্ অন্ধকার যুগে—এক শুভ মুহূর্ত্তে মানুষ সন্ধান পাইল—এই যে মৃত্তিকা তাহা জড় নহে—এই মৃত্তিকার রহস্যভেদ করিতে পারিলে তাহা হইতে অমৃত উঠিবে—এই মৃত্তিকাকে আপনার করিতে পারিলে সে কাঞ্চন ফিরাইয়া দিবে। মানবের ইতিহাসে সেই এক চিরস্মরণীয় দিন—যে দিন মানুষ মৃত্তিকার উপর হলফলকের সাহায্যে প্রথম আঁক কাটিল। সেই দিন সেই মৃত্তিকার উপর আঁকের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বুদ্ধির ফলকেও আঁক পড়িল। মানুষের সভ্যতার পত্তন হইল সেই দিন। এই ভগবানের সৃষ্টিতে মানুষের বীরমূর্ত্তি, সাধকমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল সেই দিন—প্রকৃতির উপর তাহার আধিপত্য বিস্তারের আরম্ভ হইল সেই দিন। সেই দিন হইতে মানুষ ধীরে ধীরে উঠিল। ধীরে ধীরে মানুষের পশুভাব দূর হইল। মানুষ মানুষ হইয়া ভগবানের সৃষ্টিকে জয়যুক্ত ও সার্থক করিল।

সেইদিন হইতে যে কত যুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে তাহা কে জানে। মানুষকে কিন্তু আজ আর চেনা যায় না। কে বলিবে যে আজিকার এই বিংশ শতাব্দীর আমরা সেই আদিম অসভ্য বর্ব্বর মানুষের বংশধর? মানুষ আজ চতুর্দ্দিকে তাহার আধিপত্য বিস্তার করিয়া মনুষ্যজীবনকে গৌরবে মণ্ডিত করিয়াছে। তরঙ্গ-সংক্ষুব্ধ সিন্ধুবক্ষের উপর দিয়া সে আপনার রাজপথ পাতিয়াছে। বর্ষা-বারি-ভারাক্রান্তা মেঘে মেঘে লুক্কায়িতা চঞ্চলা সৌদামিনী আজ তাহার বার্ত্তাবাহিনী, তাহার রন্ধনের পাচিকা, তাহার নিশীথের সূর্য্য। জল অগ্নি আজ তাহার হস্তে ক্রীড়নক। মানুষ আজ আর একা নাই। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সহিত সে আপনার সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাইয়াছে। সমস্ত প্রকৃতির সহিত সে সখীত্ব পাতাইয়াছে। মানুষ আজ সভ্য, জ্ঞানী, ধনী, মানী সব। কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হারাইয়াছে একটী জিনিষ—সেটী হইতেছে সেই আদিম অসভ্য মানুষের সুখী অবস্থা। মানুষ আজ ঘোর অসুখী।

সেই যে আদিম অসভ্য মানুষের সহজ, সরল, স্বচ্ছন্দ, সুখময় জীবন সে জীবন আজ রাশি রাশি বিজয়লব্ধ ভোগ্যসম্ভারের ভারে প্রপীড়িত।

বাহিরে যত গৌরব বিস্তার হইয়াছে মানুষের অন্তরে অন্তরে তত গ্রন্থি পড়িয়াছে। মানুষের যত জ্ঞান বাড়িয়াছে তাহার অন্তঃকরণও তত বিভাজ্য হইয়া উঠিয়াছে। মানুষের অন্তঃকরণ আজ সহস্র সন্দেহের তরঙ্গাঘাতে অস্থির, চঞ্চল - হৃদয় শত প্রকার বিপরীত ভাব সমূহের সংঘর্ষে ক্ষত বিক্ষত —আশায় নিরাশায়, হিংসা দ্বেষে, প্রেমে মোহে দোদুল্যমান—মানুষ আজ পৃথিবীর সেই আদিম অসভ্য অধিবাসীদের তুলনায় সহস্রগুণ অসুখী।

কিন্তু মানুষ অসুখী হইবে বলিয়া কি তাহার যাত্রা বন্ধ রহিবে? তাহার চলা ক্ষান্ত রহিবে? তাহার মর্ম্মতল অশ্রুসিক্ত হইবে বলিয়া কি মানুষের মহিমা এ ধরাতলে অফুটন্ত অকীর্ত্তিত রহিবে? না। প্রকৃতির সে প্রতিজ্ঞা নয়। কে কবে দেখিয়াছে যে দুই তীর ভাঙ্গিয়া পড়িবে বলিয়া বর্ষাবারি-প্লাবিতা সাগরাভিসারিকা স্রোতস্বিনী আপনার নৃত্য, আপনার সঙ্গীত থামাইয়াছে? অস্ত্রের ঝন্ঝনায় বাতাস প্রপীড়িত হইবে,—অশ্বপদখুরোত্থিত ধুলিতে আকাশ পিঙ্গ হইবে,—তাই বলিয়া কি নেপোলিয়নের রণ-প্রতিভা গুপ্ত রহিয়া যাইবে? কয় কোটী নরনারী কয়েক বৎসর কাল উদ্বিগ্নতায়, অশ্রুজলে দিবস যামিনী যাপন করিবে বলিয়া, একটী ছোট্ট মানুষ যে কি করিয়া একটী মহাদেশের রাজমুকুটগুলিকে লইয়া শিশুর ন্যায় খেলিতে পারে, তাহা অপ্রমাণিত রহিয়া যাইবে? ইউরোপ অসুখী হইবে বলিয়া কি মানুষের নেপোলিয়নত্ব অসম্ভব রহিয়া যাইবে? না। ঈশ্বরের সে বিধান নয়। তাই মানুষ ছুটিয়াছে, অসুখী হইয়াছে কিন্তু সে আপনাকে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। মানুষের মহত্ত্ব এইখানে। যায় প্রাণ যাক্ কিন্তু উত্তরমেরু আবিষ্কার করিতে হইবে। উত্তরমেরু আবিষ্কার হউক বা না হউক তাহাতে সংসারের কি আসে যায়। সংসারের কিছু আসে যায় না বটে—কিন্তু তাহাতে মানুষের 'মানুষত্ব' বিজয়ী হইতেছে, সার্থক হইতেছে। এই যে উত্তরমেরু আবিষ্কারের উৎসাহ-বহ্নি, দীপ্ত তেজ, জ্বলন্ত প্রতিজ্ঞা, তাহার সম্মুখে মানুষের দীনতা, হীনতা, সংকীর্ণতা প্রভাতের বালার্কের সম্মুখে নীহারিকা-স্তূপের ন্যায় নিগৃহীত হইয়া মানুষকে আপনার গভীরতাকে, শক্তিকে প্রত্যক্ষ করাইয়া দিতেছে। এইখানেই মানুষের বিশিষ্টতা, তাহার সার্থকতা,—নহিলে মানুষ বিড়াল হইলে কোন ক্ষতি ছিল না। তাই মানুষ আপনার অন্তরে অসুখ কুড়াইয়াও আপনাকে বৃহৎ আপনাকে মহৎ করিয়া তুলিতে ক্ষান্ত হয় নাই,

কুণ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু মানুষের এই যে অসুখী অবস্থা—সে অসুখী অবস্থাকেও ত মানিয়া লইলে চলিবে না।

না, মানুষের এই অসুখী অবস্থাকে সনাতন বলিয়া মানিয়া লইয়া বসিয়া থাকিলে ত মানুষের চলিবে না। বাহিরে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়া কি মানুষ আপনার সম্বন্ধে উদাসীন রহিয়া যাইবে—আপনার নিকট পরাজিত হইয়া রহিবে? সমস্ত প্রকৃতিকে আজ্ঞাধীন করিয়া মানুষ কি আপনার অন্তঃকরণের ক্রীতদাস হইয়া আজীবন কাটাইয়া দিবে? যে মানুষ অচিন্ত্যকে চিন্তাগম্য করিবার প্রয়াসে পশ্চাদপদ হয় নাই, জ্ঞানাতীতকে যে জানিবার জন্য যুগ যুগ তপস্যা করিয়া কাটাইয়া দিয়াছে, সে কি আপনার সুখ দুঃখের নিকট চিরকাল বন্দী হইয়া থাকিবে? না, মানুষের সে ধর্ম্ম নয়। মানুষকে পশ্চাৎপদ হইতে ভগবান্ শিখান নাই। কিন্তু উপায় কি?

মানুষের এই যে অন্তরের অসুখ তাহা লইয়া পৃথিবীর আর কেহ তেমন মাথা ঘামায় নাই কিন্তু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না। ভারতবর্ষ এই মানুষের অন্তরটাকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছে এবং বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ মানুষের এই অন্তরে এতখানি ডুবিয়া গিয়াছিল যে মানুষের যে একটা বাহিরের দিক আছে—মানুষের বাহিরে যে একটা দৃশ্যমান জগৎ আছে—একটা ভগবানের সৃষ্টি-লীলা আছে তাহা সে ভুলিয়াই গিয়াছিল, এমন কি সে লীলাকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। অবশ্য এইটা হইতেছে মধ্যযুগের ভারতের কথা। ইহাতে ভগবানের কোন ক্ষতি হয় নাই, জগতের কিছু আসে যায় নাই---অমঙ্গল ও ক্ষতি হইয়াছে তাহাদের যাহারা ভগবানকে মদিরামত্ত স্বপ্নস্রষ্টা বলিয়া তাঁহাকে ফাঁকি দিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু যাহা হউক মানুষের সেই যে অসুখী অবস্থা ভারতবর্ষ তাহার সমাধানের একটা উপায় বাহির করিয়াছিল। এবং সেই উপায়টাই আজ ভারতের ঘাটে বাটে মাঠে, ধর্ম্মোপদেশকের মুখে, নীতিবেত্তার নীতিতে, কথকের কথকতায়, কীর্ত্তনীয়ার কীর্ত্তনে, এখানে ওখানে সেখানে, হাটে বাজারে আপনাকে গম্ভীরভাবে প্রচার করিতেছে। সেই উপায়টী হইতেছে—নিবৃত্তি-পন্থা।

উপদেশক বলিতেছেন এই সংসারই ত দুঃখের কারণ—মানুষের বিজয়লব্ধ শত সহস্র উপকরণের সংস্পর্শে আসিয়া তাহার অভাব হইলেই ত দুঃখের

উৎপত্তি—এই সংসারে ভাই বন্ধু, পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, ভগ্নী ইহাদের সহিত স্নেহবন্ধন বাঁধিয়া রাখিলেই ত দুঃখ ঘটিবার সুযোগ হইয়া রহিল—সুতরাং আগে হইতেই সাবধান হইয়া থাক। মানুষের ঐ শত সহস্র সংগ্রামময় জীবন হইতে, সুখময় ভোগের জীবন হইতে সর্ব্বদা দূরে দূরে থাক। মানুষ তাহার শক্তিতে, তাহার জ্ঞানে এ জগতে যাহাই আহরণ করুক না কেন—সে গৌরবই তাহার হউক, যে মহত্ত্বই সে অনুভব করুক তাহা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিবার শিক্ষা কর। যাহা না হইলে নিতান্ত নয় তাহা লইয়া থাক—চারিটী তণ্ডুল ও একখানি কৌপিন—ইহাতে জীবনে দুঃখের সম্ভাবনা একেবারে কমিয়া যাইবে। ইহাই হইল সেই আবিষ্কৃত উপায়। ইহাই হইল আজিকালিকার ত্যাগধর্ম্ম, সংসার বৈরাগ্য, ভগবানের লীলায় বিমুখতা।

লোটাকম্বল সম্বল করিলেই মনুষ্যজীবন দুঃখ হইতে মুক্ত হইবে কি না আমরা সে বিচার এখানে করিব না, কিন্তু দুঃখ নিরাকরণের ঐ উপায় অবলম্বন করিয়া যদি সমস্ত জগৎ আজ বৌদ্ধ ভিক্ষুতে পরিণত হইয়া যায় তবে মানুষের মনুষ্যত্ব রহিবে কোথায়? মানুষের এই যে অমানুষী ধী, প্রতিভা, জ্ঞান, শক্তি তাহা কি অবশেষে একখানি কৌপীন রক্ষায় এবং চারিটী তণ্ডুল আহরণে পর্য্যবসিত হইবে, আপনাকে সার্থ করিতে থাকিবে? ইহাই কি মানুষের সম্বন্ধে ভগবানের বিধান, নরনারীর প্রতি বিধাতার আদেশ?

আজ এই নবীনযুগের উষার আমাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে কি এক ঈষণা, কি এক প্রেরণা ফুটিয়া উঠিয়াছে—আর অচঞ্চল স্বরে উচ্চারিত হইতেছে- না, না, না, —মানুষের মনুষ্যত্বের সার্থকতা ওপথে নয়। তাই আমরা এক নূতন পথে চলিয়াছি। আমরা মানুষের মনুষ্যত্বের ভিতর দিয়া, তাহার কর্ম্মের ভোগের জ্ঞানের উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়া মানুষের দুঃখ হইতে মুক্তির উপায়, মানুষের অমৃতত্বের পন্থা খুঁজিয়া বাহির করিব। আমরা মানুষকে খর্ব্ব করিতে পারিব না, ভিখারী করিতে পারিব না, গুণহীন করিতে পারিব না। আমরা মানুষের মধ্যের অনন্ত গুণকে মহীয়ান গরীয়ান করিয়া তুলিয়া ভগবানের মানুষ-সৃষ্টিকে সার্থক করিব—আর মানুষের এই মনুষ্য-ধর্ম্মের ভিতর দিয়া বাহির করিব দুঃখ হইতে মুক্তির পন্থা। ইহাই আমাদের আশা। আর ইতিহাস সাক্ষ্য না দিলেও মানুষ তাহার অন্তরের গভীরতম প্রদেশে যে একটা দিব্যযুগের অস্ফুট

স্মৃতি অনুভব করিতেছে—সেই সুদূর বৈদিকযুগে ভারতবর্ষ এই আশাই একদিন সার্থক করিয়াছিল। ইহাই স্বর্ণ যুগ, ইহাই স্বর্গরাজ্য—লীলাচক্রে বার বার এই স্বর্ণযুগই ভাঙ্গিয়াছে, আবার নবীনভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। আজ প্রকৃতির গুপ্ত প্রেরণায় নূতন যুগে নবীনতর আকারে সেই আশাই পুনরায় সফল করিয়া তুলিবে। এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে যাহারা কাণ পাতিয়া আপনার জীবন-দেবতার বাণী শুনিয়াছে, চোখ মুদিয়া আপনার অন্তরস্থিত চিন্ময়ীদেবীর ইঙ্গিত বুঝিয়াছে তাহারা আমাদের এই আশায় অংশীদার হইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিবে না।

পূর্ণ যোগ

(২)

হঠযোগ

প্রকৃতির প্রতিষ্ঠাভূমি যে অন্নময় ও প্রাণময় কোষ, সহজ ভাষায় যাহার নাম দেহ ও প্রাণ, তাহাকে পরিশুদ্ধ বশীভূত করাই হঠযোগের লক্ষ্য। সাধারণ জীবনে মানুষের দেহ ও প্রাণ গঠিত হইয়াছে সেই সাধারণ জীবনের প্রয়োজন হিসাবে। প্রকৃতির বিরাট ভাণ্ডার হইতে একটি ক্ষুদ্র ক্ষীণ ধারা মাত্রকেই আশ্রয় করিয়া আমাদের এই দেহ ও প্রাণ। বংশানুক্রমের ধারা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার ধারা এই দুইটির দ্বারা আমাদের শরীর ও প্রাণের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত খণ্ডিত। শরীর সেই সেই অঙ্গ ততটুকুমাত্র সঞ্চালন করে, প্রাণে শুধু সেই পরিমাণে শক্তির খেলা হয় যাহা নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মজীবনের পক্ষে প্রয়োজন ও পর্য্যাপ্ত, তাহার অধিক কিছু নয়। প্রকৃতি সাধারণ মানুষের শরীর ও প্রাণে যে ধর্ম্ম যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছে হঠযোগ তাহা অতিক্রম করিয়া আর একটি বৃহত্তর ধর্ম্ম আর একটি পূর্ণতর সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে চায়। শরীর শীতোষ্ণ ক্ষুৎপিপাসা রোগ জরা মৃত্যুর দাস, তাহার চির অভ্যাসগত কর্ম্মগুলিরই মধ্যে সে আবদ্ধ, প্রাণে ততটুকু বেগ যতটুকুর জোরে শরীর তাহার আয়ুর বর্ষ শতেকের পারে যাইয়া পৌঁছিতে পারে। হঠযোগী চায়

প্রাণের মধ্যে এমন একটি উৎস খুলিয়া দিতে যাহার সাহায্যে প্রকৃতির অজস্র অফুরন্ত প্রাণশক্তি তাহার ভিতরে বিপুল স্রোতে বহিয়া আসিতে পারে, শরীরের সকল ক্ষুদ্র বন্ধন, যাবতীয় খণ্ডিত সংস্কার ভাসিয়া যাইতে পারে। শরীর ও প্রাণকে সাধারণ জীবনের প্রয়োজনের শুধু উপযুক্ত করিয়াই রাখিতে চায় না। শরীর সুস্থভাবে অনিশ্চিত কাল ব্যাপিয়া থাকিবে, প্রকৃতির অনন্ত জীবনী-শক্তি ধারণ করিবার সামর্থ্য উহাতে থাকিবে।

এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য হঠযোগী দুইটি উপায় লইয়াছে—আসন ও প্রাণায়াম। আসনের দ্বারা শরীরকে অচঞ্চল স্থির হইতে শিক্ষা দেওয়া হয়। সাধারণতঃ শরীর নিতান্ত অস্থির, একটা কিছু না করিয়া থাকিতে পারে না। ইহার কারণ প্রকৃতির প্রাণশক্তির বিরাট সমুদ্র হইতে যে স্রোত শরীরের মধ্যে সর্ব্বদা আসিয়া পড়িতেছে শরীর তাহার সব কিছু ধারণ করিতে পারে না, তাই বিবিধ অঙ্গসঞ্চালনীর মধ্য দিয়া উহা বাহিরে উপছিয়া পড়ে, নানা কর্ম্মাবলী দ্বারা অতিরিক্ত শক্তিটুকু ক্ষয় করিতে আমরা বাধ্য হই। শরীরকে শান্ত নিস্পন্দ করা অর্থ এই প্রাণশক্তি সবটুকু নিজের মধ্যে ধারণ করা। প্রাণশক্তি যদি এইরূপ শরীরের মধ্যে জমাইয়া তুলিতে পারি তাহার ফলে শরীর বলীয়ান, স্বাস্থ্যপূর্ণ কমনীয় হইয়া উঠে। হঠযোগী তারপর নানা প্রকার জটিল প্রক্রিয়া দ্বারা শরীর হইতে সকল ময়লা দূর করেন ও নাড়ীমণ্ডলী পরিশুদ্ধ রাখেন। নাড়ী শুদ্ধির উদ্দেশ্য নিশ্বাস প্রশ্বাসের অবাধ খেলা। এই নিশ্বাস প্রশ্বাস লইয়া যে প্রক্রিয়া তাহারই নাম প্রাণায়াম। প্রাণায়াম অর্থ প্রাণশক্তিকে, প্রাণবায়ুকে সংযত স্ববশীভূত করা। আর নিশ্বাস প্রশ্বাসই হইতেছে প্রাণশক্তির প্রধান স্থূল ক্রিয়া। প্রাণায়ামের দুইটি উদ্দেশ্য। প্রথম আসনের দ্বারা যে কায়াসিদ্ধি হয় তাহাকে আরও পূর্ণতর করা। প্রাণায়ামের ফলে শরীরে প্রাণশক্তি মুক্তভাবে খেলিতে পারে ও সে শক্তির বেগও অনেক বৃদ্ধি পায়; সাধারণতঃ শরীর যে-সকল নিয়মের দাস সে-সকল সে অতিক্রম করিতে পারে। প্রাণশক্তিকে স্ববশে আনিয়া শরীরের দ্বারা যে নানা প্রকার অদ্ভুত কর্ম্ম করা যাইতে পারে—ইহা হঠযোগশাস্ত্রে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া চিরদিন ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। শরীর স্বাস্থ্যে, বীর্য্যে, সৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠে এবং হঠযোগীরা বিশ্বাস করেন তাঁহারা বহুকাল এমন কি অনির্দ্দিষ্ট কাল ধরিয়া জীবন ধারণ করিতে পারেন। প্রাণায়ামের আর এক ফল

উহা সুপ্ত কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করিয়া সাধারণ মানুষের অনভ্যস্ত অপরিচিত নানা প্রকার নূতন বৃত্তি খুলিয়া দেয়—সাধকের মধ্যে উদ্ভাসিত হয় সৃষ্টির অদৃশ্য স্তর, অকল্পিত জগৎ, অদ্ভুত দৃষ্টি অদ্ভুত শক্তি। শুধু তাহাই নয় মানুষের যে সকল সাধারণ বৃত্তি উহাদেরও পরিস্ফুরণ হয়, উহারাও বিপুল শক্তির আধার হইয়া কার্য্যকরী হয়। এই সকল ঐশ্বর্য্য সিদ্ধির জন্য হঠযোগী আরও নানা প্রকার গৌণ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া থাকেন।

হঠযোগের ফল যাহা তাহা আমরা দেখিলাম। সাধারণ মানুষ এই সকলের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হইবে ইহা কিছু আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু প্রশ্ন এই এ সকলের সার্থকতা কি? শরীর না হয় অক্ষয় হইল, অসাধারণ শক্তির আধার হইল কিন্তু মানুষ কেবল ঐটুকুতেই তৃপ্ত হইতে পারে কি? মৈত্রেয়ীর বিখ্যাত কথায়, শুধু চিত্তপূর্ণ হইয়া ফল কি—

যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্?

হঠযোগের এইখানেই মহৎ অভাব। ভগবানকে, অমৃতকে সে অতি সহজেই ভুলিয়া যায়। যোগের যে মুখ্য কথা ভগবানের মধ্যে মুক্ত সিদ্ধ হওয়া হঠযোগী সেটুকু মনে রাখিতে পারেন না, ঐশ্বর্য্যের মোহে তিনি আবদ্ধ হইয়া পড়েন। সেই জন্যই সচরাচর প্রকৃত যোগীদিগের মধ্যে ঐশ্বর্য্যের প্রতি, 'সিদ্ধাই'র প্রতি কেমন একটা সঙ্কোচ; অথবা ভীতি রহিয়াছে আমরা দেখিতে পাই। তাঁহারা বলেন এ সকল ভূত প্রেতের খেলা অথবা পথের প্রলোভন—এ সকল হইতে যত দূরে থাকা যায় ততই ভাল। সাধকের মধ্যে এইরূপ কোন ঐশ্বর্য্যের সঞ্চার হইলে উহাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে তাঁহারা উপদেশ দেন। কিন্তু ইহাও আবার অতি মাত্রা। আমরা ঐশ্বর্য্যও চাহি কিন্তু তাহা হইবে ভগবানের ঐশ্বর্য্য। ভগবৎ উপলব্ধি ও ঐশ্বর্য্য যে যুগপৎ থাকিতে পারে না তাহা নয়। হঠযোগের ভুল এইখানে তিনি যে শক্তির অধিকারী ভগবানকে বিস্মরণ করিয়া তাহা কৃপণের মত নিজের জন্য নিজের মধ্যে লুকাইয়া রাখেন। আমরা যে পূর্ণযোগের কথা বলিয়াছি তাহা জগৎ লইয়া মনুষ্যজাতি লইয়া। আমাদের যোগের ফল বিশ্ববাসীর কল্যাণে জগতের কর্ম্মে নিয়োজিত হইবে। অন্যান্য যোগীদিগের ন্যায় ঐশ্বর্য্য আমরা বর্জ্জন করিতে চাহি না কিন্তু হঠযোগীর মতনও আবার উহাকেই একান্ত করিয়া ধরিব না। তারপর আমাদের যোগের লক্ষ্য

জগতের সহিত সকল প্রকার জাগ্রত সম্বন্ধে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হওয়া। কিন্তু হঠযোগী যে বিরাট জটিল প্রক্রিয়াদিতে মগ্ন তাহা তাঁহার সমস্ত শক্তি ও সময়কে নিয়োজিত রাখে—বাধ্য হইয়া তাঁহাকে জগতের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিতে হয়। অধিকন্তু হঠযোগী ভীষণ কৃচ্ছ্র সাধনার পর যে সকল ফলের অধিকারী হয়েন তাহা যে কেবল হঠযোগের দ্বারাই লভ্য এমন নহে। রাজযোগের দ্বারা তান্ত্রিক সাধনার দ্বারা সেই সকল ফল অনেক সহজে আমরা পাইতে পারি। হঠযোগের দান অনেকখানি সন্দেহ নাই কিন্তু সেজন্য যে পরিমাণ মূল্য সে আদায় করে তাহা নিতান্তই বিসদৃশ। সেই একই মূল্যের দ্বারা আমরা সেই সমস্ত জিনিষ ও আরও মহত্তর জিনিষ পাইতে পারি।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ পাঠ*

সেদিন আমরা ঠাকুরের লীলাস্থান দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলাম। তিনি যখন মর্ত্ত্যজগতে ছিলেন তখন লোকে তাঁহাকে অবতার বলিয়া চিনিতে পারে নাই—যত দিন যাইতেছে, লোকের চক্ষু ফুটিতেছে--ভারতের এমন কোন স্থান নাই যেখানে এক্ষণে রামকৃষ্ণের নাম প্রচার হয় নাই। বাঙ্গালী, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী—সকল লোকের ভিতরেই এখন তিনি বিশেষরূপে পরিচিত।

লেখকের অদৃষ্টে যদিও ঠাকুর রামকৃষ্ণের চরণ দর্শন ঘটে নাই তথাপি ঠাকুরের প্রভাব এত অধিক অনুভব করিয়াছি যে তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। এই যুগাবতার মহাপুরুষের প্রভাব শুধু আমার উপর কেন—ভারত ছাড়াইয়া সুদূর পাশ্চাত্য সভ্যজাতির মধ্যেও বিস্তার লাভ করিয়াছে।

তাঁহার জীবিত অবস্থায় শুধুই যে শিক্ষিত বুদ্ধিমান লোকের উপরেই তিনি আপনার অহৈতুকী করুণা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা নহে, কত নিরক্ষর চাষা ভূষা মাঝি মাল্লার পাল্ তাঁর স্বর্গীয় প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছিল।

যে সকল ইতর ও মূর্খ লোকের সঙ্গে কাঙ্গালের ঠাকুর লীলা করিয়াছিলেন —যে সকল সরল শ্রমজিবী ইতর বাঙ্গালীর সঙ্গে আপনার অমৃত-শীতল কণ্ঠ

* ১৩১৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসে লিখিত।

মিশাইয়া মার নাম গাহিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে একজনের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহার নাম হরিচরণ। সে জাতিতে মালা, গঙ্গায় এখনও সে মাছ ধরিয়া খায়—এখনও সে শূন্য মন্দির পানে তাকাইয়া দাশরথী রামপ্রসাদী সুরে ভাগিরথী বক্ষ কাঁপাইয়া ঠাকুরদের নাম করে—তার বুকের মাঝে এখনও ঠাকুরের করুণাময় মূর্ত্তি আঁকা আছে—এখনও ঠাকুরের নাম শুনিলে কত কথা বলে—প্রাণ খুলিয়া কথা কয়—সে অফুরন্ত কথা কে শুনিবে? সে নিরক্ষর—যে কথা তার বুকে গাঁথা আছে পার ত পড়িয়া আইস। স্বামী সারদানন্দ মাষ্টার যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—তাহা হইতে আরও অধিক জানিতে পারিবে।

এই হরিচরণ, ঠাকুরের চরণতলে বসিয়া কতদিন দেহতত্ত্ব গাহিয়াছে—ঠাকুরের কাণে তাহা যেমন মিষ্ট লাগিত—হরিচরণ দাশরথী রায়ের পাঁচালী গাহিলেও, ঠাকুর অতি মধুর অতি মধুর বলিয়া হরিচরণকে উৎসাহ দিতেন। হরিচরণ বুঝিত না হরিচরণের গানগুলি মধুর, না ঠাকুরের প্রাণটী মধুর; ঠাকুর যে হরিচরণকে ভালবাসিতেন, তাই হরিচরণ যাহা গাহিত ঠাকুরের তাহাই মিষ্ট লাগিত। আমরা হরিচরণের মুখে আরও তিন জন মালার নাম শুনিয়াছি—শ্রীমন্ত, তারক ও দোয়ারী। ইহারা পরলোকে। সকলেই মৎস্য ব্যবসায়ী—ঠাকুরের ভক্ত।

হরিচরণ স্বচক্ষে দেখিয়াছে, কাঞ্চন স্পর্শে ঠাকুরের হাত আপনা আপনি কেমন বাঁকিয়া যাইত—রমণী স্পর্শে ঠাকুরের শরীর শিহরিয়া উঠিত। ঠাকুর শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ—চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে কিছু করিতে হইত না। জগজ্জননী তাঁহাকে লোক শিক্ষার জন্য আনিয়াছিলেন—তিনি যে পথে তাঁহাকে চালাইয়াছিলেন ঠাকুর সেই পথেই চলিয়াছেন। তিনি মাতৃময় ছিলেন। হরিচরণ কতবার ঠাকুরকে গঙ্গার অপর পারে বালিগ্রামে হরিসঙ্কীর্ত্তন সভায় লইয়া গিয়াছে। ঠাকুর হরিচরণের কথা কিছুতেই কাটাইতেন না। হরিচরণ বলে ঠাকুর বলিতেন "হরিচরণ তুই আমায় যেখানে নিয়ে যাবি আমি যাব"। হরিচরণকে দেখিয়া বুঝিলাম, ঠাকুর শুধু মথুর নাথকে ভাল বাসিতেন না—হাজারিকে ভাল বাসিতেন না—নরেন, কালিপদ, শরৎ, বাবুরাম, গিরিশ, মাষ্টারকে ভাল বাসিতেন না—তিনি ভাল বাসিতেন সমাজের চক্ষে অতি হীন হরিচরণকে, মূর্খ সরল দোয়ারীকে, শ্রীমন্তকে, তারককে—কে জানে আরও কত এইরূপ সরল বিশ্বাসী কুটীরবাসী মূর্খ দরিদ্র রামকৃষ্ণের অকপট প্রেমে জর জর হইয়া আছে।

আমরা যখন মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম তখন মায়ের ভোগ হইয়া

গিয়াছে। দুই একজন অতিথি আহারে বসিয়াছে—মন্দিরের লোকজন মায়ের প্রসাদ পাইতে বসিয়া গিয়াছে। কতবার দেখিয়াছি ঠাকুরের পঞ্চবটী বেলতলা, ঠাকুরের ঝাউতলা 'নবদ্'তলা, ঠাকুরের ঘর বারান্দা, কিন্তু প্রতিবারই আমার চক্ষে 'নিত্যনূতন' বলিয়া বোধ হয়। এখনও আমি ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিলে ঠাকুরের পাত্র-সৌরভ অনুভব করি, ঠাকুরের করুণামাখা বাণী শুনিতে পাই—সহস্র কোলাহলের মধ্যে ঠাকুরের সকল কাহিনী আমার নিকট জীবন্ত হইয়া উঠে। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর রামদাদা আসিলেন। ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয়ের পর ইনিই মহামায়ার সেবায়েত হইয়াছেন। ইনি পরমহংস দেবের ভ্রাতুষ্পুত্র। রামদাদা বড় উদার, বড় সরল—তিনি কত কথা কহিলেন—প্রসাদ দিলেন।

অতঃপর আমরা বেলুড় মঠে যাত্রা করিলাম। সেখানে বাবুরাম মহারাজ ছিলেন। ইনি রামকৃষ্ণ দেবের সমসাময়িক—এক্ষণে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া রামকৃষ্ণ নাম প্রচারই জীবনের সাধন করিয়া তুলিয়াছেন।

বাবুরাম মহারাজের জীবনের স্রোত মহাশান্তির দিকে ছুটিয়াছে—ইনি চাহেন একটা মনুষ্যত্ব—একটা মহান্ চরিত্র—যার উপর দাঁড়াইয়া বিশ্বজগতের লোক চীৎকার করিয়া বলিতে পারে যে আমরা মায়ের সন্তান—এই মায়ের সন্তানের ভয় কোথায়? যম ইহাকে পথ ছাড়িয়া দেয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণ লোকের ভিতর দেখিতেন—যদি সেথায় সরলতা থাকে তবে তাহাকে প্রাণের করিয়া তুলিতেন—কে জানে সে মুসলমান আর কে জানে সে খৃষ্টান। প্রাণের মধ্যে অবিশ্বাস থাক্‌তে কেউ তাঁর কাছে আশ্রয় পাইত না। আজ কাল ইংরাজী পড়িয়া মানুষের চরিত্র এক অদ্ভুত প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে—মানুষ বিষম স্বার্থপর হইয়া গিয়াছে—আপনাকে এক সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া বিশ্বজগতের জ্ঞান হইতে বঞ্চিত করিতেছে। এই দেহের মধ্যে মহাশক্তি আছে--আমি হীন নহি, আমি দুর্ব্বল নহি, আমি অপদার্থ নহি—এই জ্ঞান পাকা করিয়া তুলিতে হইবে। বাবুরাম মহারাজ বলেন—দুপাতা ইংরাজী পড়িয়াছি, কোথায় গিয়া পড়িতাম আত্ম অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া যশঃ মানের তরে, ধনসম্পদের জন্ত উন্মত্ত হইতাম। জন্ম জন্ম সুকৃতির ফলে ঠাকুরের নিকট গিয়া পড়িয়াছিলাম—তিনি কি শিখাইলেন? কিছু চাই না—চাই মায়ের করুণা, জগতের ঐশ্বর্য্য যদি মা দিতে চান, তাও লই না—বলি ওমা তোমার চরণে যেন অহৈতুকী ভক্তি থাকে। অনিমা লঘিমা অষ্টসিদ্ধি তুচ্ছ করিয়া মায়ের করুণা লাভ করাই পরম পুরুষার্থ। আজকাল সাধু-

গিরি কেবল চাল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেবল বন্ধ্যা রমণীর পুত্রোৎপাদনের ঔষধ বিতরণ, ক্ষয়কাসের হরিতাল ভস্ম প্রদান, রমণী বশীকরণ প্রভৃতি. অতি তুচ্ছ বিষয় লইয়া সাধুগণ উন্মত্ত লোকও এমনি লঘুচিত্ত হইয়া পড়িয়াছে যে এই সকল পাইলেই সাধু সন্ন্যাসীর প্রতি তাহাদের ভক্তি অবিচল হইয়া পড়ে। যে সন্ন্যাসী ফাঁড়া কাটাইতে পারে না, যে সন্ন্যাসী করকোষ্ঠী দেখিতে জানে না, সে আবার কিসের সন্ন্যাসী? হরি! হরি! এত তুচ্ছ বিষয় লইয়া কি হইবে? চাই মাতৃ-শক্তিকে আপনার ভিতর জাগাইয়া তুলিতে। জানাও আমরা কেউ কেটা নই, আমরা মায়ের সন্তান। আমাদের উপর যমের অধিকার নাই, আমাদের ভয় নাই আমাদের হিংসা নাই, ক্রোধ নাই—আমরা দেবতা, আমরা মহাদেবীর ভক্ত।

স্বামিজী বলিয়াছেন——

উত্তিষ্ঠত: জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত:।

উঠ জাগ প্রাপ্য বরলাভ কর। কে বলে তোমরা পরাজিত পদানত হীনবীর্য্য—জাগাও কুণ্ডলিনী মহাশক্তিকে ভৈরব গর্জ্জনে জগতের লোককে এই অমৃতের সন্ধান প্রদান কর। ইউরোপের অধঃপতন আসিল বলিয়া—এত ভোগের মধ্যে মহাশক্তি তিষ্ঠিতে পারে না। স্বামিজী প্যারীর একটা হোটেলে গিয়া দেখেন—ভূমিতলে যে সকল কার্পেট পাতা আছে তাহা বহুমূল্য, দিয়ালে যে সকল ভেল্‌ভেট মোড়া আছে তাহা সোণার পিন্ দিয়া আঁটা; আবার পিনের মাথায় হীরা বসান। পায়খানা এত সুন্দর সুসজ্জিত যে দেখিলে দরিদ্র ভারতবাসী চমৎকৃত হয়। তাই স্বামিজী আমেরিকার কোন এক ধনী মহিলার শয়ন গৃহের পাপোষে শয়ন করিয়া ভারতের দুঃখের কথা স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন। সর্ব্বরত্নপ্রসবিনী ভারতের সন্তান আমরা ঐ ঐশ্বর্য্যের অধিকারী অনায়াসেই হইতে পারি, কিন্তু আমরা তাহা চাই না চাই বিশ্বজননীর চরণে অকপট ভক্তি। আমরা নই আটাশে ছেলে চোখ্ রাঙালে ভুলি না, যে চরণে ত্রিদিবের সমুদয় বিভব লুঠো-লুঠী সেই চরণের ভিখারী। যে চরণ আশে জড় জগৎ মহেশের বেশে মায়ের চরণতলে বুক পেতে দিয়েছে, ভারতের সন্তান তাহারই উপাসনা করে। অনেক কথা ভাবিতে ভাবিতে আমরা বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৯	১৭	ব্রহ্মে,	ব্রহ্মের
৫৯	১৭	খণ্ডদৃষ্টি লইয়া	খণ্ডদৃষ্টি মাত্র,
৫৯	২৮	যাওয়াই যদি	যাওয়াই—যদি
৫৯	২৮	হয়	থাকে—
৫৯	২৯	লক্ষ্য	লক্ষ্য।
৬০	১১	ত্যাগকে	ভোগকে
৬০	২১	বস্তুপরি	বস্তু পরিহার করিয়া
৬১	২	পরমার্থিক	পারমার্থিক
৬১	৭	যদহরের	যদহরেব
৬১	৭	তদহরের	তদহরেব
৬১	১০	এখনও	কখনও

৬১ পৃষ্ঠায় ২০ লাইনে "দৈবী সামঞ্জস্যের যুগ।" ইহার পর "আমরা ত ত্যাগ চাহি না" ও ২২ লাইনে "খেলা মাত্র।" ইহার পর "আমরা খেলি ত্যাগী হইয়া" বসিবে।

গতি-নির্দ্দেশ

সমগ্র জগৎ যখন নবোদ্যমে বিজয় লালসায় উদ্যোগ পর্ব্বের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া দিল— ভারতবর্ষের মনীষীবৃন্দ—এই জগদ মহালীলায় ভারত কোন্ অংশ অভিনয় করিতে পারে, তাহার চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। জগতের এই মহাপরিবর্ত্তনের পর ভারতের অবস্থা বিপর্য্যয় ঘটিবেই, ইহাতে আর কাহারও সন্দেহ নাই তাই সেও আজ এই মহাযজ্ঞের সমিধ সংগ্রহে উদাসীন নহে। শ্রীরামচন্দ্রের সেতুবন্ধনের সময়ে কাষ্ঠবিড়ালীও যেরূপ তাহার ক্ষুদ্র সামর্থ্য রামকার্য্যে নিয়োজিত করিতে গিয়া নির্য্যাতিত হইয়া পরিশেষে শ্রীরামচন্দ্রের করকমল স্পর্শে আপনাকে পরম চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছিল, ভারতবর্ষও তদ্রূপ এই মহাপর্ব্বে তাহার অকিঞ্চিৎকর দান উৎসর্গ করিয়া রাজশক্তির নিকট সবিশেষ সম্মান লাভ করে নাই—সম্প্রতি ইংলণ্ডের সমর সচিব লয়েড জর্জ্জ যুদ্ধসভায় দুইজন প্রতিনিধি গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষকে কৃতার্থ করিয়াছেন। বিশেষ বাঙ্গালীজাতি এই সম্মান, মহোৎসবে গ্রহণ করিয়াই আপনাদের মনুষ্যজন্ম সার্থক করিতে প্রয়াসী।

এই জগৎ ব্যাপী মহাকুরুক্ষেত্রে ভারতবর্ষের বস্তুগত ঐশ্বর্য্য নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আজ ইংলণ্ডের আবছায়ায় শক্তিশালিনী অষ্ট্রেলিয়া ক্যানেডা, ভারতের তুলনায় ক্ষুদ্র হইলেও, ইংরাজ রাজের যে সহায়তা করিতে সমর্থ হইয়াছে ভারতবর্ষ তাহা পারে নাই। ভারতবর্ষ ইচ্ছা করিয়াই যে এই মহা আহবে আপনার সর্ব্বস্ব বলি দিতে কুণ্ঠিত তাহা নহে, তাহার দিবার কিছুই নাই। এ বৈজ্ঞানিক যুদ্ধ, ইহাতে কেবল নররক্ত পাত করিলেই হইবে না, বিজ্ঞানসম্মত রণ-কৌশলে সম্যক পারদর্শিতা লাভ করা চাই; বিজ্ঞান উদ্ভূত রণতরী, মকরপোত, আকাশযান, বৈজ্ঞানিকক্রিয়াকুশল অস্ত্র শস্ত্রাদিরও প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এই সকল বিষয় হইতে একেবারেই বঞ্চিত, তবে আত্মবলি দিতে পরা-

সুখ নহে—সেদিন ভীরু বাঙ্গালী সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করিয়া এই ধর্ম্মযুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছে। ধর্ম্মযুদ্ধ বলি, কেননা ভগবান এই মহাকুরুক্ষেত্রের আয়োজন করিয়াছেন জগতের বিশেষ পরিবর্ত্তন মানসে, সে পরিবর্ত্তনে পৃথিবী উন্নতযুগের পথেই সমধিক অগ্রসর হইবে।

সেদিন অমৃতবাজার পত্রিকায় পৃথিবীর সবল, সুস্থ ও কার্য্যক্ষম পুরুষের তালিকা সংযুক্ত এক ফর্দ্দ বাহির হইয়াছিল। তাহাতে দেখিলাম জার্ম্মাণ ও অষ্ট্রীয়ার লোক সংখ্যা তিন কোটী মাত্র, তুরস্কের আধ কোটী, আর ব্রিটিশ রাজের এগার কোটী। এই এগার কোটী ব্রিটিশ প্রজার মধ্যে সাড়ে সাত কোটী ভারতের আর দুই কোটী ইজিপ্টের। কি গ্রহ! এই এগার কোটী লোক যদি যুদ্ধ পটু হইত তাহা হইলে ইংলণ্ডকে আজ জগজ্জয়ী হইতে বেগ পাইতে হইত না।

যাউক এই সকল কথা আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, আমরা কেবল পাঠকবর্গকে দেখাইতে চাই ভারতবর্ষ বস্তুগত ঐশ্বর্য্যে সামর্থ্যবান হইয়া ভগবদ্ ইচ্ছায় আজ তাহারা জগতের এই মহা সংগ্রামে মানুষ বলিয়া পরিগণিত হইল না। অনেকের ধারণা, ইংরাজ রাজ ইচ্ছা করিলেই ভারতবর্ষ জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিত—আমরা একথায় বিশ্বাস করি না। দেড় কোটী ইংরাজের ইচ্ছায় এই মহাদেশ পরিচালিত হইতে পারে না, ইহার ভিতর ভগবদ্ ইচ্ছা আছে, আমরা তাহাই আলোচনা করিতে চাই।

ভগবদ্ ইচ্ছা ছিল বলিয়াই য়ুরোপের অপরাপর শক্তি থাকিতেও ইংলণ্ড ভারতবর্ষের শাসক সম্রাট ভাগ্যনিয়ন্তা। এই ইংরাজ অধিকারেই আমাদের জাতি সঙ্ঘবদ্ধ হইবে। যাঁহাদের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, যাঁহারা অন্তদর্শী তাঁহারা অনায়াসেই দেখিতে পাইবেন, বিবিধ অবস্থা বিপর্য্যয়ের মধ্যে পড়িয়াই ভারতবর্ষ আজ মহা জাতিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। বর্ত্তমান রাজ শক্তিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া যাঁহারা ভরতবর্ষকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিতে চাহেন, তাঁহাদের সহিত আমরা একমত হইতে পারি না। ভগবদ্ বিধানেই ভারতের বহির্শক্তি অন্তর্হিত—ভারতবর্ষ যদি অনন্যমনা হইয়া পশুবল দেখাইতেই কৃতসংকল্প হয় তবে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী, এমনকি ভারতবর্ষ যদি কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনে দেহ মন অর্পণ করে, যদি তাহার ফলে পাশ্চাত্য জাতিগণের মত রাজনীতি ক্ষেত্রে বড় বড় অধিকার অর্জ্জন করে তাহাতেও ভারতের ভাবীফল মঙ্গল হইবে না। ভারতবর্ষ ঐশ্বর্য্যহীন হইয়াছে কেন—এতদিন দীনহীন হইয়া সে কোন্ শক্তিতে আপনাকে

পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে—সেই অমূল্য রত্নটাই নিজস্ব এবং আহারই অনুশীলনে ভারতের ভবিষ্যৎ সমুজ্জল হইয়া উঠিবে।

উহা ভারতের সনাতন ধর্ম্ম। আজ এই সনাতন ধর্ম্মের ছত্রতলেই ভারতের জাতি গঠিত হইয়া উঠিবে—ইহাই ভগবদ আদেশ। এই আদেশ পালনের জন্য আমরা সমস্তই নিয়োগ করিতে প্রস্তুত আছি—এই আদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে আমাদের হৃদয়ের প্রতি রক্তবিন্দু উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত হইব না, এই জলন্ত বিশ্বাসে আমাদের কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে, বিলম্ব করিলে চলিবে না—এই মুহূর্ত্তেই আমাদের বাহির হইতে হইবে। আমরা বর্ত্তমান বিভিন্ন কার্য্য-ধারার বিপরীত আচরণ করিব না, দেশের পূর্ণ শক্তিকে কার্য্যে নিয়োজিত করিবার জন্য শ্রীভগবান শীঘ্র শীঘ্র শক্তির শুদ্ধি বিধান করিতেছেন—তাঁর কার্য্যে অন্তরায় না হইয়া ভগবদ নির্দ্দেশিত পথেই আমাদের পরিচালিত হইতে হইবে।

ভারতের বেদ, ভারতের উপনিষদ, ভারতের গীতা, ভারতেব পুরাণ ইতিহাস, ভারতের শিক্ষা দীক্ষা পুনঃ প্রচারিত হউক—পাশ্চাত্যের শিক্ষা ভারতের ভাবে গড়িয়া জীবনোপযোগী করিয়া লও—ভারতের যে বিশেষত্ব তাহারই পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। ভারতের যোগপদ্ধতি, ভারতীয় জীবনের শিক্ষা কেন্দ্র করিয়া তুলিতে হইবে—ভারতে সর্ব্ব প্রথম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা হইবে, পরে চাই স্বরাজ—ভারতের নরনারি দেবতা হউক তবে আসিবে ভোগ ঐশ্বর্য্য, ভারতের দৃষ্টি জগতের প্রলোভনে ভিন্ন দিকে প্রধাবিত হইলে আমরা আবার পিছাইয়া পড়িব।

বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে ভারতে অনেক সংস্কার সমিতি দেখা দিয়াছে, ক্ষতি নাই; কিন্তু ভারতের এই সনাতন ভাব হইতে যে একপদ অন্যদিকে যাইবে তাহার দ্বারা ভারতবর্ষের কোন উপকার হইবে না। ভারত যে আজ জাতি গড়িতে উদ্যত উহা কেবল ভারতবর্ষের জন্য নহে—আজ ধরিত্রী ভারতের এইরূপ জাতিকেই তাহার অস্তিত্বের জন্য আহ্বান করিতেছে। আমাদের কিছু নাই কেবলমাত্র ভগবান আছেন—তাঁর উপর অকপট বিশ্বাস রাখিয়া নবীনদিগকে অগ্রসর হইতে বলি।

বৈদিক চিন্তা-প্রসূন

দেবতা চাহিতেছে সত্যের, জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা। অসুর চাহিতেছে অনৃত অজ্ঞান। মানুষের যে প্রতিষ্ঠানত্রয় দেহ প্রাণ মন সেই পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও স্বর্গের অধিকারের জন্য দেবাসুরে যুদ্ধ, রাত্রি ও দিবায় সংঘর্ষ। অজ্ঞান রাত্রিদ্বারা আবৃত করিয়া অসুর মানুষকে এই ত্রিবিধ বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিবে, না দেবগণ তাহাকে দিবসের আলোকে সম্বুদ্ধ, মুক্ত, অমৃতেরই অধিকারী করিয়া তুলিবে?

* * *

অদিতি যিনি দ্বৈত বিবর্জ্জিতা, ভেদরহিতা—সেই মূল অখণ্ড সত্তা, সেই অসীম পূর্ণজ্ঞানদীপ্তচৈতন্য—হইতেছেন দেবগণের মাতা। আর দিতি বা দনু যিনি কেবল ভেদ করিতেছেন, খণ্ডিত করিতেছেন—সেই সীমাবদ্ধ চৈতন্য, সেই অন্নের সত্বা—হইতেছেন দৈত্য, দানব, দস্যু বা অসুরগণের মাতা। তাই মানুষের অন্তরে অধিষ্ঠিত দেববৃন্দ চলিয়াছে জ্যোতির দিকে, অনন্তের দিকে, ঐক্যের দিকে। আর অসুর সকলের নিবাস অজ্ঞানের গহ্বরে গহ্বরে, তাহাদের নির্গমন শুধু মানুষের জ্ঞান আনন্দ শক্তি সত্তাকে বিচ্ছিন্ন বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিবার জন্য।

* * *

দেবতা সকলের নিবাস স্বর্লোক। পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ—দেহ প্রাণ মনের অতীতে যে তুরীয়, যে সত্যং ঋতং বৃহতের ক্ষেত্র সেইখানে। নিখিলবস্তু যেখানে আপন সত্য সত্তায়, নিগূঢ় সৎবস্তুতে প্রতিষ্ঠিত এবং সেই ঋতের সেই সত্যের স্বতঃ উৎসারিত প্রেরণায়, সনাতন ধর্ম্মে পরিচালিত, বিধৃত। যেখানে সকল বস্তুর সত্তা অসীমে প্রসারিত, তাহাদের লীলা চলিয়াছে অবাধে, ঋজুভাবে, বিপুলগতিতে। যেখানে কোন কিছু খণ্ডিত, ভগ্ন, সীমাবদ্ধ নহে, সবই সম্পূর্ণ, অনবদ্য, সমগ্র আর বিরাট।

* * *

এই স্বর্লোক হইতেছে সূর্য্যের দেহ—সূর্য্য যিনি সত্যের জ্যোতি। স্বর্লোকের উদার প্রসারে সূর্য্যের জ্যোতির্ম্ময় গো-পাল, জ্ঞানের কিরণরাজি বিচরণ করিতেছে। এই সত্যের লোক ইহাই দেবগণের নিজধাম স্বগৃহ, "স্ব দমং"—এখানেই আনন্দ, এখানেই অমৃত। এই জ্যোতির্ম্ময় লোকই

ছিল বৈদিক ঋষিগণের সাধনার লক্ষ্য, প্রাচীন পিতৃগণের আকাঙ্খার ধন। নবীন সাধক ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছেন। উত্তরকালে যাঁহারা আসিবেন তাঁহাদেরও এই লক্ষ্যই।

* * *

অদিতির অখণ্ড জ্যোতি এই দিব্যধাম রচিয়াছে। সেই জ্যোতি হইতে সমুৎপন্ন অদিতির সন্তান দেবতা সকলে সত্যের দ্বারা গঠিত, ঋতের দ্বারা পরিচালিত, বৃহতের দ্বারা বিধৃত এই মাতৃপ্রতিষ্ঠানকে অজ্ঞান, অনৃত, ধর্ম্মসঙ্করের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেছে। দেবতা হইতেছে সত্যের রক্ষী। ব্রহ্মাণ্ডে সত্যের অপ্রতিহত কর্ম্মধারাকে তাঁহারা ধরিয়া রহিয়াছেন, নিখিল-ভুবন, বিশ্ববস্তুকে সত্যের প্রতিমূর্ত্তিতে গড়িয়া তুলিতেছেন।

* * *

এই দেবধাম এক মহান জলধি—মহো অর্ণঃ। এই স্থান হইতে উদ্ভূত হইয়াছে সপ্তস্বসা সপ্ত সিন্ধু, স্বর্গের বৃষ্টিধারা, সত্যের প্রবাহ, জ্ঞানের শক্তি-সঙ্ঘ। দেবগণ ইহাদিগকে মানুষের অন্তর ভেদ করিয়া ছুটাইয়া দিয়াছেন। দস্যু বৃত্র, সেই আবরণকারী, সেই তামসী অজ্ঞানের বাঁধ ভাঙ্গিয়া সিন্ধু-ধারা ছুটিয়া চলিয়াছে, মানুষকে ভাসাইয়া লইয়া প্রতিষ্ঠানের পর প্রতিষ্ঠানে তুলিয়া দিতেছে।

* * *

মুক্ত সিন্ধুধারা যখন মানুষের প্রতিস্তর প্লাবিত করিয়া দিয়াছে তখন দেব সকল, সেই দ্রষ্টা সেই কবিবৃন্দ তাহার অন্ধকারাবৃত মানসগগনে সত্যের কনক লেখা ফুটাইয়া তুলেন, প্রাণরূপ অন্তরীক্ষে সত্যের ভাস্বর মধুমান তৃপ্তিরাজি ভরিয়া দেন, সূর্য্যের সহায়ে এই পার্থিব স্তরটিকেও উদার বিস্তৃতি, পরিপূর্ণতার মধ্যে স্থাপিত করেন, সর্ব্বত্রই তাঁহারা দিব্য-উষাকে সৃষ্টি করিয়া চলেন।

* * *

তখনই মানুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয় ঋতের ঋতু সমুদয়, দিব্য কর্ম্ম-রাজি ‘আর্য্যব্রতানি’। সত্যের ধর্ম্ম তখন তাহার কর্ম্মের নিয়ন্তা। সত্যেরই বাক্ তাহার চিন্তামধ্যে প্রতিশ্রুত। তখনই উন্মুক্ত সত্যের ঋজু ধ্রুব অব্যভিচারী পথ সকল, স্বর্গের সেই সোপান সেই উত্তরণী দেবগণ পিতৃ-গণ যাহা বাহিয়া চলিয়াছেন।

* * *

এই দেবযান, এই পিতৃযান এই অধ্বা, অব্যাহত, সুগম, স্বস্তিপূর্ণ। এই পথে সূর্য্যনেমি পরিক্রমণ করিতেছে। দেবতা সকল পূর্ণ প্রকট হইয়া আমাদের চারিপার্শ্বে রক্ষীরূপে সদা অবস্থিত। জ্যোতির্ম্ময় পিতৃগণ ব্রাহ্মী-মন্ত্রের বলে, সোমমধুর শক্তিতে, যজ্ঞের প্রেরণায় সেই পথে অগ্রসর। ইহাই সেই অধ্বরমার্গ যাহা ক্রমাগত চলিয়াছে পরাক্ষেত্রের বৃহৎ বিস্তারে।

* * *

ইন্দ্রের বজ্র এই পথ কাটিয়া প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে। এই পথে ধাবমান দিব্যবাজী দধিক্রাবা, এই পথে দেবগণের রথনির্ঘোষ প্রধ্বনিত। দেবতার নেতৃত্বাধীনে নিঃশঙ্কে আমরা চলিয়াছি—এই পথে, দেহের, প্রাণের, মনের ক্ষুদ্রতা, কুটিলতা উত্তীর্ণ হইয়া সুরলোকের ঊর্দ্ধতম, সুবিস্তীর্ণ জ্যোতির্ম্ময় লোকত্রয়ে। সেখানে আনন্দে অমৃতত্বে, দেবসত্তার পূর্ণতায় আমরা ভরিয়া উঠি।

* * *

আর তখনি আমরা আমাদের জাগতিক প্রতিষ্ঠান, মানবিক সত্তার মধ্যেই সে দিব্যধামের সে পরাসত্তার শাশ্বত সুবলয়িত অঙ্গবিন্যাসগুলি রচিয়া তুলি। তখনই মানব দেবজন্ম ও মানবজন্ম এই জন্মদ্বয়ের অধিকারী। তখনি সে স্বর্গ মর্ত্ত্যের অধীশ্বর। তখনি সে দিতি ও অদিতিকে যুগপৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। একের মধ্যে সমস্তকে পাইয়াছে, সসীমের মধ্যেই অনন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সন্ন্যাসীর প্রভাব

কিছুদিন হইল 'নায়ক' নবাগত ঠাকুরদাস বাবাজীর পরিচয় দিতে গিয়া অনেকগুলি ভাবিবার কথা লিখিয়াছেন। আমরা তৎ সম্বন্ধে নিজেদের মন্তব্য প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে, নায়কের কথাগুলি কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলে এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

“ভারতবর্ষের সন্ন্যাসী সম্প্রদায় এক অজ্ঞেয় এবং অপূর্ব্বমণ্ডলী। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা শ্রেণী, নানা শাখা থাকিলেও, পরস্পরের মধ্যে

বিরোধবিতণ্ডা চলিলেও, মূলতঃ উহারা এক, এবং এক দল সিদ্ধ মহাপুরুষের পরামর্শে পরিচালিত। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের সমাজ এবং ধর্ম্ম রক্ষাই এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের ঐহিক কর্ত্তব্য। ইঁহারা কেবলই যে সাধন-ভজন করেন, ভক্তিমার্গের পথিক হইয়া সংসার ভুলিয়া থাকেন, তাহা নহে; শ্রীগুরুর আদেশে এক এক সম্প্রদায়কে এক-একটা প্রদেশের সমাজ ও ধর্ম্মের ভার লইতে হয়। ইংরেজের আমলের পূর্ব্বে গৌড়ীয় বৈষ্ণব বৈরাগী এবং তান্ত্রিক শাক্ত সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীই বাঙ্গালার ভার লইয়াছিলেন। ইংরেজের লেখাপড়া এবং সভ্যতা বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গালী ভক্ত এবং সাধক অনেক ছিলেন। তাঁহারাই মূল সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সহিত সম্বন্ধ বজায় রাখিয়া বাঙ্গালা দেশকে ভারতবর্ষের অন্য সকল প্রদেশের সহিত ধর্ম্ম এবং সাধন সূত্রে গাঁথিয়া রাখিতেন। কাল-প্রভাবে, বৈদেশিক শিক্ষা এবং সভ্যতার প্রভাবে ধর্ম্মের অপচয় সকল দেশেই ঘটিয়া থাকে। সেই অপচয় দূর করিবার পক্ষে যাঁহার যোগ্যতা অধিক বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাঁহাকেই সেই দেশের ধর্ম্মপ্রচারের ভার দেওয়া হয়, এমন কি, অনেক সময়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিকে যোগ্যতাসমন্বিত করিয়া পাঠানও হয়। দেশ ও জাতিবিশেষের মতিগতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া কখনও কখনও এক একটা বিশেষ ধর্ম্মপ্রচারের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। শাক্ত সাধকগণের উপদেশে মহানির্ব্বাণতন্ত্রকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সৃষ্টি করেন। তখনকার বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর উপযোগী বলিয়া রাজা রামমোহনের ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু খ্রীষ্টান শিক্ষার প্রভাবে সে ধর্ম্ম ঠিকমত টিকিল না; কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম খ্রীষ্টান ধর্ম্মের হিন্দু সংস্করণ হইয়া দাঁড়াইল। তাহা ভারতীয় প্রকৃতির অনুকূল নহে, ইহা গুরুকুলের মনে দৃঢ় ধারণা হইবার পর গাজীপুরের পাওহারী বাবা এবং তোতাপুরীর শিষ্য ভগবান্ রামকৃষ্ণের প্রভাবে কেশবচন্দ্রই নব-বিধানের আকারে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। তখন ভগবান্ রামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দকে বিভূতি-বান্ করিয়া এক দিকে বেদান্ত ধর্ম্মের প্রচার—ইয়োরোপ ও আমেরিকার মনীষা-সম্মত করিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করিলেন; অন্য পক্ষে ভক্ত সাধকের কৃপায় গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ ভক্তি ও রসতত্ত্বের পথে বাঙ্গালীকে ঘুরাইয়া নিজ নিকেতনের দিকে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সে

চেষ্টার পূর্ণবিকাশ এখনও হয় নাই।

পক্ষান্তরে, ইংরেজীনবীশ বাঙ্গালীর রুচি বুঝিয়া আর একটা চেষ্টা অন্য দিক দিয়া হইতে লাগিল। গুরু নানকের প্রবর্ত্তিত সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে গরীবদাসী সম্প্রদায়ের আচার্য্য দয়ালদাস বাবাজীউ শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনকে শিষ্য করিয়া বাঙ্গালায় হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। দয়ালদাস নিজে ভক্ত ছিলেন, এবং উৎকট সাধকও ছিলেন। বোধ হয়, তিনি ঠিক-মত যোগ্য পাত্র বাছিতে পারেন নাই, তাই শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের পতন হইয়াছিল। বাঙ্গালা ভক্তির ভূমি জানিয়া এখন আবার নূতন চেষ্টা হইতেছে। বাঙ্গালায় এখন এক দিকে অঘোরী বাবা শাক্ত ধর্ম্মের পথ দিয়া চুপেচুপে কাজ করিতেছেন; কাঠিয়া বাবা এবং ভোলা গিরি বৈষ্ণব ধর্ম্মের পথে ভক্ত সাধক গড়িবার চেষ্টা করিতেছেন। অন্য পক্ষে, ঠাকুরদাস বাবাজীউ ধর্ম্ম এবং ভক্তির পথে গুরু নানকের সর্ব্বসমন্বয়ের সাধনা বাঙ্গালায় চালাইবার চেষ্টায় আছেন।" --নায়ক ২৩শে পৌষ, ১৩২৩

যাঁহারা মানুষের মনস্তত্ত্বের কিছু সংবাদ রাখেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন কি সূক্ষ্ম নিয়মসূত্র আশ্রয় করিয়া মানবের চিন্তা-প্রণালী, মানবের বুদ্ধির পরিমাপ-আদর্শ (Standard) এক প্রান্ত হইতে আর প্রান্তে ঘুরিয়া যায়, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে জাতির জীবনাদর্শের বিবর্ত্তন কি পরস্পর বিরুদ্ধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকে। বাঙ্গালীর জাগরণ—ইতিহাসের সেই প্রথম পর্ব্বে, রাজা রামমোহন রায় যখন এদেশে পাশ্চাত্যবিজ্ঞানশিক্ষার প্রতিষ্ঠার সমর্থন করিলেন, এবং ফলে হিন্দু কলেজ স্থাপিত এবং ডেভিড্ হেয়ার, ডিরোজিও প্রভৃতির মন্ত্রশিষ্যগণ দলে দলে বাহির হইয়া নবাগত খ্রীষ্টান সভ্যতাকে সাগ্রহে বরণ করিয়া নির্জ্জীব, প্রাণহীন, গতানুগতিকতা দোষ-দূষিত পঙ্কিল জীবনস্রোতঃকে সচল, সবল, প্রাণময় করিবার উদ্যোগ করিলেন, সে যুগের কথা বঙ্গীয় ইতিহাসপাঠকের অবিদিত নাই। ফলে একটা নিদারুণ প্রাচীনে বিরাগ, নবীনে অনুরাগ, একদিকে অতীতের প্রতি, স্বজাতির প্রতি, ইতিহাসের প্রতি একটা প্রবল ঘৃণা ও অনাস্থা এবং অপরদিকে পরজাতির প্রতি, অভ্যাগতের প্রতি, পাশ্চাত্যের প্রতি অন্ধভাবে আস্থা, আসক্তি ও সর্ব্ববিষয়ে অনুচিকীর্ষা—সে যুগের মনীষিগণের চিন্তাকে শাসিত ও নিয়মিত করিতে লাগিল। বাঙ্গালীর ইতিহাসের সে এক পর্য্যায়। পাদ্রী কৃষ্ণমোহন, মাইকেল মধুসূদন, রামগোপাল প্রভৃতি

ইঁহারাই সেই প্রবল স্রোতের শীর্ষ তরঙ্গমালা।

তার পরবর্ত্তী যুগেই ভীষণ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। একটা উজান-স্রোতঃ বিপরীত দিকে সবেগে প্রবাহিত হইল। এই যুগের প্রধান চেষ্টা হইল—নূতনকে প্রত্যাখ্যান এবং ততোধিক প্রবলভাবে অতীতকে পুনরানয়ন করিবার। প্রাচীন হিন্দুর ভাব, হিন্দুর সংস্কার, হিন্দুর ইতিহাস, হিন্দুর দর্শন, সর্ব্ববিষয়েই সেই প্রাচীনের, সেই বিগতের, সেই অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থা জাগিয়া উঠিতে লাগিল, তাহাকেই ভাল করিয়া বুঝিবার, খুঁজিবার এবং নূতন ভাবে টানিয়া আনিবার, সজীব করিয়া তুলিবারও কিছু কিছু প্রয়াস চলিতে লাগিল। এই যুগেরই প্রধান চিন্তাবীর—রাজনারায়ণ, দেবেন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র এবং স্বামী বিবেকানন্দ।

এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া উভয়েই আতিশয্য থাকে, একদেশদর্শিতা থাকে—উভয়ের মধ্যেই এক একটা বিশেষ দিকে ঝোঁক (Bias) থাকিয়া সত্য সামঞ্জস্যকে কিছু দূরে পরাহত করিয়া রাখিয়া দেয়। এইজন্য উভয় যুগের সকল চিন্তা ও সকল সিদ্ধান্তকে একটু সভয়ে, সবিচারে গ্রহণ করিতে হয়, প্রত্যাখ্যানের কথা বলিতেছি না, সে কথা আসিতেই পারে না, আবার অবিসম্বাদিত ভাবে গ্রহণও নহে পরন্তু প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, ভক্তি সহকারেই সেই সকলের প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া বর্দ্ধিত-অভিজ্ঞতার আলোকে সত্যাসত্য গ্রহণ বর্জ্জন পূর্ব্বক তাহাদিগেরই উপর নূতন সিদ্ধান্ত গঠন করিতে হয়, গভীরতর দৃষ্টি দিয়া তাহাদিগেরই অন্তর্নিহিত সত্য হইতে সত্যতর স্বরূপ ফুটাইয়া তুলিতে হয়—আর এই যে পথ ইহাই সুস্থ, নিরাপদ, বিচক্ষণতার পথ।

তাই যখন বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে ও রচনাসমূহে সন্ন্যাসীর প্রভাব সন্দর্শন করি, তাঁহার প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসের মধ্যে সাধারণ অসাধারণ জীবনানুষ্ঠানসমূহে সন্ন্যাসীকেই নেতৃস্বরূপ দেখিতে পাই, আবার যখন স্বামিজীর মুখে শুনি, "তা যেখান থেকেই এর Origin হোক্, মানবজন্মের Goal হচ্ছে, এই জগৎব্রহ্মঅবলম্বনে ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া, এই সন্ন্যাস গ্রহণই হচ্ছে পরম পুরুষার্থ"। "এই যে সব সন্ন্যাসী দেখ্‌ছিস্ এরাই ভারতের মেরুদণ্ড • • আমরাই কর্ম্মের Fountain head. আমাদের Ideas নিয়েই গৃহীরা কর্ম্মক্ষেত্রে জীবনসংগ্রামে সমর্থ হচ্ছে—তোরা গৃহী, ভাব্‌ছিস্ বুঝি আমাদের উপদেশ না পেলে একদিনও চল্‌তে পারিস—আমরা নিজ জীবনে ধর্ম

প্রতিফলিত করে, তোদের সর্ব্ববিষয়ে উৎসাহিত কচ্ছি—তার বিনিময়ে তোরা দু'মুঠা অন্ন দিচ্ছিস্। সেই অন্ন জন্মাবার প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসিগণের স্নেহাশীর্ব্বাদেই তোদের বর্দ্ধিত হচ্ছে। যে দেশে সন্ন্যাস Institution নাই, সে দেশ ও সে জাতি ধ্বংসমুখে অগ্রসর হচ্ছে; আমরা হাল ধরে আছি; তাই তোদের সংসার-সাগরে নৌকা ডুব্‌ছে না।" "হাজার হাজার বৎসর পরে একটা বিবেকানন্দ আসে ত ভরপুর। * * এই সন্ন্যাস Institution ছিল বলেই বিবেকানন্দ জন্ম গ্রহণ করেছে। দোষ সব আশ্রমেই আছে, তবে অল্লাধিক। দোষ সত্ত্বেও এই আশ্রম সকল আশ্রমের মাথায় পা দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও থাকবে।" ...... তখন এই সকল কথা প্রতিক্রিয়া যুগ (Reactionary-age) সুলভ অতিশয়োক্তি কিনা ভাবিয়া সন্ত্রস্ত ও সতর্ক ভাবেই গ্রহণ করিতে হয়। কারণ সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে সেই প্রতিক্রিয়া স্রোতের তীব্রতা যখন ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল, মানুষের প্রবৃত্তি যখন কিছু শান্ত, স্থির হইয়া আসিল (Balanced) ততই দেশ হইতে সেই সন্ন্যাসমুখী প্রবৃত্তি উঠিয়া যাইবার আরম্ভ করিতেছে; বাংলার ইংরেজীনবীশ সম্প্রদায়ের (প্রতিক্রিয়া প্রভাবাবিষ্ট জনগণ কারণে হউক অকারণে হউক বিপথগামী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে থাকিলেও) মধ্য হইতে সেই সন্ন্যাসাদর্শের প্রতি অনুরাগ যে দিন দিন বর্দ্ধিত না হইয়া ভিন্নমুখী হইতেছে ইহাও সজাগ-দৃষ্টি ঐতিহাসিকের পক্ষে কম কৌতুহলোদ্দীপক বিষয় নহে।

নবযুগের সমাজের নেতৃত্বাসন কি সন্ন্যাসীর প্রাপ্য, এই প্রশ্নের মীমাংসার দিন আজ উপস্থিত হইয়াছে কি না সুধীগণই বিবেচনা করিবেন, কিন্তু দেশের এই সন্ন্যাসানুরাগ হ্রাসের পশ্চাতে যে নিশ্চয়ই কোনও কারণ বিদ্যমান একথা সকলেরই স্বীকার্য্য, এবং সেই কারণ নির্ণয়ের প্রয়াসে যে চিন্তাশীলতার অপব্যয় হইবে না ইহা নিঃসন্দেহ। কারণ নায়কের এ কথা নিশ্চয়ই সত্য "বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর পক্ষে এখন একটা সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে। বাংলার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজ এই সন্ধিক্ষণের কোনও সমাচার রাখেন না, কোনও ভাবনাই ভাবেন না, বাংলার শাক্ত সাধকগণ এখন প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছেন।" এ অবস্থায় "কাজেকাজেই বাংলার ও বাঙ্গালীর ভাবনা সন্ন্যাসি-সমাজের ঘাড়ে সত্য সত্যই পড়িয়াছে" কি না, এইরূপ প্রশ্নের উদয় বাস্তবিকই স্বাভাবিক, হয়ত গুরুতরও বটে।

কারণ কি?. বুদ্ধ যে সন্ন্যাস আশ্রমের মৃতকঙ্কালে প্রাণসঞ্চার করিয়া গিয়াছেন, শঙ্কর যাহাকে অটুট অচলপ্রায় ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, এই সুদীর্ঘ শতাব্দীগুলি ধরিয়া যাহার প্রভাব অব্যাহত অমিশ্রভাবে না হইলেও প্রচুর কল্যাণ ও শুভপ্রসূ হইয়াই আসিয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্র যাহার অনুরাগী, ভারতগৌরব স্বামী বিবেকানন্দ যাহাকে স্পষ্টভাবে উচ্চস্বরে সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রতি এই অনাস্থা—ইহা বিপুল দাম্ভিকতা বটে, কিন্তু দেশে তবু এই অনাস্থা, এই সংশয়ই জাগিতেছে—তাহার কারণ কি?

ইহার কারণ সন্ন্যাসীর যে আদর্শ, তাহা নবীন যুগের মানুষ আদৌ চাহে না। সন্ন্যাসীর আদর্শ কি? সন্ন্যাসীর ধারণা, সন্ন্যাসীর দৃঢ় প্রত্যয়—এই বিপুল জগৎ প্রপঞ্চ, এই বহু, এই ভেদ, এই নানা—ইহা মায়া মাত্র, প্রকৃতিসৃষ্ট স্বপ্ন কুহেলিকা মাত্র। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন--নেতি, নেতি, আছে শুধু এক, আছে শুধু শুদ্ধ, মুক্ত, নির্ব্বিকার, একমেবাদ্বিতীয়ম্, নিরঞ্জন আত্মা। এই বহু, এই ভেদ ইহা ব্যবহারিক দৃষ্টিমাত্র---পরমার্থতঃ কেবল সেই আত্মাই আছেন। সন্ন্যাসীর দৃষ্টিতে একই আছে, বহু স্বরূপতঃ নাই, থাকিলেও তাহা উপেক্ষণীয় ব্যবহারিক সত্ত্বামাত্র লইয়া। নূতন যুগের নয়নে এই দৃষ্টি খণ্ডদৃষ্টি লইয়া একদেশদর্শিতা দূষিত—উপনিষদের ব্রহ্মে, একমেবাদ্বিতীয়ম এই অংশের (বিভাব, aspect) প্রতিই কেন্দ্রীভূত, অপর যে অংশ, "সর্ব্বম্ খল্বিদং ব্রহ্ম" তাহার প্রতি কখনও সর্ব্বতোভাবে কখনও খণ্ডভাবে বিমুখ। এই একদেশদর্শিতা—অক্ষমতা; তাই নূতন যুগের নূতন মানুষ, এই অক্ষমতায় অতৃপ্ত অসম্মত, সে স্বভাবতঃই পূর্ণদৃষ্টির অনুরাগী। আর তাহার মধ্যে যদি ভগবানের ইচ্ছা গুপ্ত থাকে, তবে সেই ইচ্ছাও এই সন্ন্যাসীর খণ্ডদৃষ্টির অনুকূল নহে।

আরও কারণ আছে। সন্ন্যাসী এই আদর্শের উপাসক বলিয়া, তিনি চাহেন চরমে ব্রহ্ম বিলয়ই। তিনি জীবনকে, সমাজকে, জাতিকে সেই আদর্শেরই আলোকে গঠিত করিবেন। ব্যক্তির লয়প্রাপ্তি যেমন তাঁহার ব্যক্তিগত আদর্শ, মানবসঙ্ঘকেও সেই অনির্দ্দেশ্য পরম সত্ত্বার মধ্যে আত্মবিলয়ের পথে লইয়া যাওয়াই যদি তাঁহার সমষ্টিগত প্রয়াণ কিছু হয় তবে তাহার লক্ষ্য "আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়"—ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত জীবনের অতীত হইয়া যাওয়াই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য তাই বৈরাগ্যের উদাস

গম্ভীর সুরই তিনি তুলিয়া থাকেন, ত্যাগমন্ত্রেই তিনি জগৎকে দীক্ষিত করিতে পারেন। এখানেও সেই খণ্ডতা সেই অক্ষমতা। উপনিষদ চাহেন, "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা।" কিন্তু মায়াবাদী সন্ন্যাসী তাহার অর্দ্ধ মন্ত্রই সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন—"ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ"। এ যুগের মানুষ এখানেও এই অর্দ্ধ সত্যে তৃপ্ত নহে, এখানেও সে এই অক্ষমতায় অসম্মত।

ফলতঃ আমাদের এই জাতিটা যুগ যুগ ধরিয়া এই সন্ন্যাসের আব্ছায়াতেই যেন কাটাইয়া আসিয়াছে। জটাজুটধারী, গৈরিকবসনপরিহিত সন্ন্যাসী একটা বিপুল রহস্যের ভার লইয়া বহুদিন ধরিয়া মানুষের মুক্ত স্বচ্ছন্দ জীবনবিকাশের পথে সশঙ্ক সম্ভ্রম আদায় করিয়া দণ্ডায়মান। মানুষ তাহার ভোগ ও কর্ম্ম লইয়া বহুদিন সন্ন্যাসীর পার্শ্বে সঙ্কুচিত ভাবে অবস্থান করিয়াছে, তাহার ত্যাগের সহিত তুলনায় নিজের ত্যাগকে হীনতর বিবেচনা করিয়া নিজেকে ক্ষুদ্র বলিয়া ভাবিয়া আসিয়াছে। ভোগ শুষ্ক হয় নাই, কর্ম্ম ফুরায় নাই, কেবলই সঙ্কীর্ণ ও শীর্ণ হইয়াছে—মানুষ হয় ত্যাগ বৈরাগ্যের পথে চলিয়া গিয়া জগৎকে ছাঁটিয়া ফেলিবার, জীবনকে নিষ্পেষিত ও ধ্বংস করিবার প্রয়াস করিয়াছে, নতুবা সভয়ে, সঙ্কুচিত আশা ভরসা লইয়া কেবলই দুঃখ নিরানন্দময় জীবনের দাস হইয়া দিন অতিবাহিত করিয়াছে। সামঞ্জস্যের, পূর্ণতার যে আনন্দ—তাহা যেন জগৎ হইতে চিরনির্ব্বাসন দণ্ডই ভোগ করিয়া আসিয়াছে।

এই অসামঞ্জস্যেরই বা মূল কোথায়? অহঙ্কারে—সন্ন্যাসীর ত্যাগের অহঙ্কার, ভোগীর ভোগের অহঙ্কার—কিন্তু উভয়ই অহঙ্কার। সন্ন্যাসী সকল বস্তুপরি একটা বিপুল ত্যাগের অহঙ্কারকেই ভগবানের পরিবর্ত্তে আশ্রয় করিয়াছে, সেই অহং-অঞ্জন মাখিয়া বহুকে, ভেদকে, শরীরকে মনকে, কর্ম্মকে, ভোগকে হীনতার চক্ষে দেখিয়াছে, হীনতার মন্ত্র শিখাইয়াছে, হীনতার কলঙ্কে তাহার সর্ব্বাঙ্গ মসীমণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। ভোগীও সেই হীনতার অহঙ্কার বরণ করিয়া লইয়া, ভোগকে, জীবনকে একান্ত ভগবান্ হইতে পৃথক ও হেয় করিয়া দেখিয়াছে, নত মস্তকে, সঙ্কুচিত হৃদয়ে দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করিয়া চলিয়াছে, জীবনের মধ্যে, বিকাশের মধ্যে, সৃষ্টির মধ্যে যে ভগবানের কোনও ঈষণা, কোনও প্রেরণা, কোনও আনন্দের সার্থক কল্পনা থাকিতে পারে এমন আশার বাণী যে বহুদিন তাহার নিকট হইতে সংগোপিত করিয়া রাখা হইয়াছে। ধর্ম্ম, ভগবান্,

আনন্দ যে কেবল ত্যাগের মধ্যেই বর্ত্তমান—জীবনের, প্রকৃতির সকল আয়োজনের নিজস্ব কোনও একটা পরমার্থিক সার্থকতা নাই, উহা যে কেবল ব্যবহারিক, কেবল ব্যর্থ প্রয়াস, চরমে পরিত্যাজ্য, কেবল যতক্ষণ পরিহারে অসমর্থ হইতেছ, ততক্ষণই গ্রহণ করিতে পার, তাহাও যতক্ষণ তুমি না পারিতেছ, ততক্ষণ তুমি করুণারই পাত্র কিন্তু যে মুহূর্ত্তে পার এই বিষম স্বপ্নোদ্গার মুছিয়া ফেল, যাও প্রকৃতির ঘনকৃষ্ণ অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া প্রকৃতির পরপারে চলিয়া যাও, "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ।"—এই প্রকারের মন্ত্রই যে অহর্নিশি সন্ন্যাসী সঙ্ঘ তাহাকে শুনাইয়াছে। সেও এমনি নিজেকে হীন করিয়া ফেলিতে কৃতকার্য্য হইয়াছে, যে এখনও সে সকল মন্ত্র বিচার করিয়া দেখিবার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করিতে পারে নাই।

তাই ইহা বিচিত্র নহে, যে সেই প্রাচীন শৃঙ্খলা, যেটা প্রকৃতপক্ষে স্থায়ী বিশৃঙ্খলামাত্র—তাহাতে মানুষ আর তৃপ্ত নহে—মানুষের পূর্ণ অন্তঃ-[illegible] যুগযুগান্তরের পুঞ্জীভূত সকল ভালমন্দ, ধর্ম্মাধর্ম্মের সকল সংস্কারের বোঝা দূরে ফেলিয়া দিয়া সফল আত্মবিকাশ চাহিবে, তাই অন্ধ তমসাবৃত যবনিকা ভেদ করিয়া অস্ফুটভাবে দূরাগত কোন আলোকের রশ্মিরেখাপাতে কি জানি কি একটা সামঞ্জস্যের দৃশ্য তাহার সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে, যাহাতে সে পুরাতনকে আর কিছুতেই বরণ করিয়া লইতে পারিতেছে না—সে দৃশ্য কি?

সে একটা দৈবী শৃঙ্খলা, দৈবী সামঞ্জস্যের যুগ। আমরা ত ভোগ চাহি না, কারণ আমরা জানি ত্যাগ ভোগ, বন্ধন মোক্ষ—এ সকলই খেলা মাত্র। আমরা খেলি ভোগী হইয়া, আমরা খেলি বদ্ধ ভাবে, আমরা খেলি মুক্ত ভাবে—আমাদের সেই সর্ব্বোত্তম আত্মা, সেই শ্রীকৃষ্ণ তিনিই এই খেলার নায়ক, তাঁহার ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেহ এই খেলা পরিত্যাগ করিতে পারে না। তাঁহারই যখন ইচ্ছা হয়, আমাদের মধ্যে দিয়া অজ্ঞান ভোগ করিবার, আমরা তখনই মনের ভিতর দিয়া সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, ত্যাগ ভোগের দ্বন্দ্ব ভোগ করি—দীর্ঘ যুগ ধরিয়া, শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপিয়া এই খেলার ভূমিকা ত্যাগ করিবার তাঁহার ইচ্ছা হয় নাই। ইহাতে অমঙ্গলের, অশুভের, সঙ্কোচের কি আছে? এ যে তাঁহারই খেলা। জ্ঞানী শুধু অপেক্ষা করেন কখন এই ভূমিকা পরিবর্ত্তনের

ইচ্ছা হইবে!

আজ সেই ইচ্ছাই জাগিয়াছে—ইহাই নবযুগের প্রথম মন্ত্র। ভগবানের চিরদিনই একটী চিহ্নিত দেশ থাকে, সেখানে তিনি সকল ঝঞ্ঝা বিপদের মধ্য দিয়া পরাজ্ঞানকে অল্পাধিক জন সমূহের ভিতরে সংরক্ষণ করিয়া আসেন। বর্ত্তমান চতুর্যুগে সেই চিহ্নিত দেশ আমাদের এই দেবভূমি, এই ভারতবর্ষ। যখন তিনি অজ্ঞানের, হিংসা, দ্বেষ, দ্বন্দ্ব, স্বার্থ, অহঙ্কারের তামসিক ও রাজসিক আনন্দের, এক কথায় কলি যুগের লীলার পূর্ণ ভোগ অভিলাষ করেন, তখনই তিনি ভারতের জ্ঞানভাস্কর ঈষৎ প্রভ করিয়া দেন, তাহাকে দুর্ব্বলতা ও অধঃপতনের গহ্বরে পাতিত করেন যাহাতে সে তাঁহার লীলার অন্তরায় স্বরূপ না হইতে পারে। আবার যখন তিনি চাহেন মৃৎগর্ভ হইতে উঠিতে, মানুষের অন্তঃস্থিত নারায়ণ-রূপে জ্ঞানে শক্তিতে আনন্দে বিভূতিবান্ হইয়া দাঁড়াইতে, তখন তিনি সেই জ্ঞান-ধারা ভারতের উপর ঢালিয়া দেন, তাহাকে সমুন্নীত করিয়া তুলেন, যাহাতে সেই শক্তি, জ্ঞান, আনন্দ সে জগন্ময় বিচ্ছুরিত করিতে পারে। যখন সঙ্কোচের খেলা চলে ভারতের যোগিবৃন্দ জগৎ ত্যাগ করিয়া হিমাদ্রিকন্দরে আত্মমুক্তি ও আনন্দ অথবা ক্ষুদ্র সমষ্টির মুক্তি কল্পেই যোগাভ্যাস করেন; কিন্তু যখন জ্ঞানের লীলা পুনঃ বিকশিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে ভারতের আত্মাও বিকশিত হইয়া উঠে; তাঁহারা আবার বহির্গত হইয়া জগতের জন্যই কর্ম্ম করিতে থাকেন। তখনই আসেন সেই সব রাজর্ষিগণ—জনক, অজাতশত্রু; কার্ত্তবীর্য্য—যাঁহারা বিশ্বসিংহাসনে সমারূঢ় হইয়া মানব সমাজকে জগতের জাতিবৃন্দকে শাসন করেন। ইহারাই নৃপতি, মানব-সমাজের প্রকৃত নেতা এবং পরিচালক।

তবে কি সন্ন্যাসীর সমাজ মধ্যে আদৌ স্থান নাই—সন্ন্যাসীরও চিরদিন প্রয়োজন আছে, জগল্লীলা সন্ন্যাসী ব্যাতিরেকেও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। শুকদেব নারদের মত আবাল ব্রহ্মচারী, সনক, সনন্দ প্রভৃতি চতুঃসনের মত চিরকুমারব্রত দেবর্ষিবৃন্দরূপেও ভগবান্ চিরযুগ লীলা সম্ভোগ করিয়া আসিয়াছেন—কিন্তু ইঁহারা কখনও সমাজকে শাসন করিতে যান নাই, রাষ্ট্রগঠন করিতেন না, জাতির পরিচালন করিতেন না; এ সকল করিতেন রাজর্ষিগণ। রাজর্ষি, দেবর্ষি, ত্যাগী ভোগী, সকলেই যে সেই লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ নানাভাবে, নানারূপে, নানা রস সম্ভোগ করিতেছেন—কলিযুগে সকলই অহঙ্কার দূষিত তাই দ্বন্দ্ব ও অসামঞ্জস্য। নবীন যে মহাযুগ, যাহার শুধু উষারাগই গগনে প্রতিভাসিত

হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে শুধু অহঙ্কার বিসর্জ্জন দিয়া, অনধিকার চর্চ্চা ছাড়িয়া ভগবানের এই যে দেশব্যাপী আলোড়ন, এই বিশ্বব্যাপী জাগরণ তাহাকে সফল করিয়া তুলিতে হইবে। "কালপ্রভাবে এক এক জাতির মধ্যে এক একটা সমাজ বিপ্লব ঘটে, সে বিপ্লব দূর করিবার জন্য নানা সন্ন্যাসী সম্প্রদায় নানাবিধ চেষ্টা করিয়া থাকেন"—'নায়ক' এই যে কথা বলিয়াছেন, ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। সন্ন্যাসী গৃহী, বালক বৃদ্ধ সকলেই এই চেষ্টা করে কারণ ভগবানই সকল করেন, আর সকলেই ভগবানের যন্ত্র। তবে একথা নিশ্চয়ই সত্য দক্ষিণেশ্বরে যে মহাকার্য্যের সূত্রপাত হইয়াছিল তাহা আজিও সম্পূর্ণ হয় নাই, গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ যে প্রয়াস আরম্ভ করিয়াছিলেন, সে চেষ্টার পূর্ণ বিকাশ এখনও হয় নাই—কে করিবে, কবে হইবে, একথা শ্রীকৃষ্ণই জানেন।

ধর্ম্ম প্রচারে রবীন্দ্রনাথ

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয় পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া জাপান ঠিক এই ভাবেরই উত্তর দিয়াছে। স্বামিজী প্রাচ্যের উত্তম তত্ত্ব পাশ্চাত্যের প্রাঙ্গনে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন, য়ুরোপ আমেরিকা তাহা তখন সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল, স্বামিজী ভগবদ্ নির্দ্দেশেই পাশ্চাত্যের রঙ্গভূমে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথ তাহারই অনুকরণ মানসে সেই পুনরুক্তিগুলি অদিনে জাপান ও আমেরিকায় ছড়াইতে বসিয়াছেন—ফলে স্বামিজী দীপ্তদিবাকরের মত দিন দিন সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিলেন—রবীন্দ্রনাথ অস্তগামী সূর্য্যের মত ম্লান হইয়া পড়িতেছেন। Iwano নামক এক ভদ্রলোক স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন "The Japanese are in no mood to take such advice as the poet has been offering them" আবার যখন দেখি তিনি লিখিয়াছেন "It is no wonder that India is not an independent nation, if most of the people there hold to ideas like Tagore" তখন লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট হইয়া যায়।

Japan magazine বলেন "While Japan admire and reverence the poet for his great ability and noble character, she can never afford to be led by his attitude to modern science and civilization, lest she find herself in the place of India. Japan has secured her position in the modern world by adopting a very opposite policy suggested by the Indian poet." এক্ষণে পাঠকবর্গ অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন বিদেশে কবি রবীন্দ্রনাথ কিরূপ সম্মান লাভ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা আছে—সে প্রতিভা ভারতের কাজে নিয়োগ করিলে সোণা ফলিত, কিন্তু তিনি Nobel prize পাইয়া বিদেশে আপনাকে সুপ্রচারিত করিবার উদ্দেশ্যে স্বামিজীর পন্থানুসরণ করিয়াছেন—কিন্তু তাহা সফল হওয়া দূরে থাকুক—ভারতবর্ষের অপদার্থতার দিকটাই প্রকাশ করিয়া সম্ভবতঃ তিনি দেশে ফিরিবেন।

প্রবর্ত্তক—২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা।

প্রেম

সংসার অরণ্যে যখন একটা বুনো ফুলের মত ফুটে উঠেছিলুম তখন কত বন্ধু, তাদের কত গুণ গুণ আনন্দের ধ্বনি আমার চারিরিকে মুখরিত হত—কিন্তু কৈ আমার প্রাণ ত তাতে তৃপ্ত ছিল না। যখন সবাই এসে আমার গুণের কথা বল্‌ত, আমার মান যশের কাহিনী শোনাত তখন মনে মনে হাসতুম্ কেননা তাদের সব কথাগুলোই ভুল—আমার এমন কিছু ছিল না যা নিয়ে আমি গর্ব্ব কর্‌তে পারি।

তবু কিন্তু বন্ধুর অভাব ছিল না, আত্মীয় স্বজনে পরিবৃত হয়ে লোকের চোখে পরমানন্দেই দিন কাটাতুম কিন্তু মর্ম্মে মর্ম্মে যে তুঁষের আগুন জ্বলে থাকত তার দহনে ছট্‌ফট্ করে বেড়াতুম। বিদ্যা যশ ধন মান এসবই ছিল কিন্তু কিসের অভাবে আমি দীন হীন কাঙ্গালীর মত ঘুরে বেড়াতুম তা নিজেই ঠিক কর্‌তে পারতুম না—তখন কে জানে কলঙ্ক সাগরেই আমার তপস্যার ধন আছে!

সে একটা বড়ই অবসাদের দিন। পৃথিবীর ভোগগুলো আমার আশে পাশে ছড়িয়ে থেকে তাদের সন্তাপ দৃষ্টি আমার প্রাণে বর্ষণ কর্‌ছিল—বাণবিদ্ধ হরিণীর মত আমি কাতর হয়ে ঐ উর্দ্ধে, যেখানে অসীম নীলিমা অনন্তের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, সেই দিকে চেয়েছিলুম, সহসা একটা আশার আলো বিদ্যুতের মত আমার চোখ ঝল্‌সে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে একটি অপূর্ব্ব সুর বেজে উঠল—আমার হৃদয় মন আকুল করে সে মুরলী ধ্বনি আমার সামনে এসে বাজ্‌তে লাগল। তখন ভেবেছিলুম স্বপ্ন দেখ্‌ছি, দু'হাতে চোখের পাতা ভাল করে মুছে স্পষ্ট করে চেয়ে দেখ্‌লুম মোহন বাঁশি হাতে এক অপূর্ব্ব পুরুষ মূর্ত্তি। সে অমিয় নিছানি ভুবনমোহন রূপ দেখে সব ভুলে গেলুম, পদমর্য্যাদা স্থান কাল বিচার আচার ধর্ম্ম কর্ম্ম পাপ পুণ্য সমস্ত এক কোরে নিবিড় আলিঙ্গনে তারে শত চুম্বনে লাঞ্ছিত করলুম। তারপর চোখের পলকে সব শেষ হয়ে গেল—কেবল বুকের মাঝে জ্বলন্ত দীপ শিখার মত জেগে রইল সেই আনন্দের স্মৃতিটী।

এই স্মৃতির রেখাটী ধরে তার সঙ্গে আলাপ করে ফেললুম। তন্ময় হয়ে যখনই লজ্জা মান ভয় উপেক্ষা করেছি তখনই আমার হৃদয়-দেবতা আমার সামনে উদয় হয়েছেন কিন্তু কি নির্ম্মম, কি পরুষ, কি উদাস করা তার উপদেশ, মধুর স্বরে কি কঠোর বার্ত্তা বাঁশির মুখে সে ঘোষণা করছে! এই পুরুষের প্রেমেই নাকি যিশু আষ্টে পিষ্টে পেরেক বিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিয়েছে, সক্রেটিশ বিষ পাত্র নিঃশেষে পান করেছে, বৃন্দাবনের রাধারাণী কলঙ্ক সাগরে ডুবে মরেছে—এর প্রেমেই রাজপুত্র বুদ্ধ সাম্রাজ্য ত্যাগ করে পথের কাঙ্গাল হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে, সোণার গৌর সুনীল জলধি গর্ভে প্রবেশ করেছে, রামকৃষ্ণ চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিয়েছে। এই মহা প্রেমিকের সঙ্গ করলে লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়, স্বর্ণকলেবর কালি হয়ে যায়, এ পৃথিবীতে মাথা গুঁজে থাকবার স্থান পাওয়া যায় না। কি সর্ব্বনাশ! আগে যদি জানতুম তবে এমন বিষ সাধ করে পান করতুম না। ওগো তোমার পায়ে পড়ি আমায় ভুলিয়ে দাও, তোমার সৌম্য শান্ত অমৃতময় মূর্ত্তি আমার মন থেকে মুছে দাও, তোমার পাগল করা অমৃত শীতল কণ্ঠের বাণী আর যেন কর্ণে প্রবেশ না করে। হরি হরি এত যে অনুনয় বিনয় সবই ব্যর্থ হল—দেশে দেশে প্রচার হল আমি সেই সর্ব্বনেশেকে ভাল বেসেছি, চারিদিক থেকে উপদেশ তিরস্কার লাঞ্ছনা বৃষ্টি ধারার মত আমার উভয় কর্ণে তীরের মত বিদ্ধ হতে লাগ্‌ল—ভোল, ভোল, ভোল—কিন্তু আর ত ভুল্‌তে পারি না, আর ত তারে হৃদয় আসন হতে নামাতে পারি না—"শ্যাম কলঙ্কিনী জেনেছে সকলে আর কারে করি ভয়?"

আজ আমি কলঙ্কিনী—আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সকলেই আমায় দেখলে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। ঘরের ভেতর চুপ করে বসে আমার কলঙ্কের কথা ভাবি আর আনন্দে সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠে। আজ যে কলঙ্কের ডালি আমার মাথায় উঠেছে, জনে জনে যেন সাধ করে সে কলঙ্কের ডালি মাথায় তুলে নেয়—আমার হৃদয় দেবতার কাছে এই প্রার্থনা দিবানিশি কর্‌ছি।

ওগো তোমরা সবাই আমায় ঘৃণা কর—তোমাদের কৃষ্ণ প্রেমের দায়ে পড়্‌তে হবে না—তবু তোমাদের প্রেমের দু'টো কথা বলি শোন। প্রেম পৃথিবীর স্পর্শে মলিন হয়ে গেছে, এই মরতের মাঝে রক্তমাংসের কুৎসিত আকর্ষণে, রিরিংসার অধিষ্ঠানে প্রেমের আস্বাদ নাই—সেখানে আছে আসক্তি, সেখানে আছে মোহ, সেখানে আছে মৃত্যুর আহ্বান। কৃষ্ণপ্রেম স্বর্গের—

সে জ্ঞানোদ্ভাসিত কৃষ্ণপ্রেমে শিশ্নোদর বৃত্তি সজাগ হয়ে উঠে না, ধমনীতে রক্তের প্রবাহ ছোটে বটে কিন্তু তার গতি ঊর্দ্ধ দিকে, অমৃতের দিকে, সচ্চিদানন্দের দিকে। যদি এই পৃথিবীতে স্বর্গের দুন্দুভি বাজাতে চাও, তবে এই কৃষ্ণপ্রেমেই ইহ সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিতে হবে—এ কালিয় সাগরে ডুব দিতে হবে। এ ছাড়া আনন্দধামে পৌছিবার আর অন্য পন্থা নাই।

বৈদিক চিন্তা-প্রসূন

সৃষ্টির অন্তরালে, তাহার অতীতে, মনের অনধিগম্য, নামহীন রূপহীন আছে এক অজ্ঞেয়—সেই একং সৎ। বস্তুর নিগূঢ়ান্তরাল হইতে প্রকটিত হইয়া এই সৎ জীবের নিকট, ব্যক্তিত্বের নিকট ভগবান বা দেবরূপে ধরা দিতেছেন। দেব স্বয়ং অরূপ কিন্তু তাঁহারই আবার বহুরূপ, অনাম অথচ তাঁহারই বহুনাম, অপ্রমেয় গুণহীন তবুও তিনি আপনার মধ্যে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন সকল জ্ঞান, সকল শক্তি, সকল গুণ, সকল প্রেম।

* * *

তিনিই আদি কারণ ও অন্তিম পরিণতি। তিনিই ভুবনরাজী গঠন করিতেছেন, বস্তু সকল উৎপাদন করিতেছেন। তিনিই জগতের ও জগৎবাসীর পিতা, তিনিই মাতা। তিনিই আবার পুত্র—কারণ, তিনিই সেই দিব্য-সন্তান জগতে যিনি জন্ম লইয়াছেন, জগৎ-জীবের উপচয়ের মধ্য দিয়া আপনাকে ক্রম প্রকটিত করিয়া চলিয়াছেন।

* * *

আমাদের কর্ম্ম, আমাদের জীবনযজ্ঞ হইতে উত্থিত তিনিই সেই জ্ঞানবান বীর্য্যবান তনয়, বন্ধন মোচনকারী পরিত্রাতা, আমাদের নিখিল সংগ্রামের বীরনেতা, আমাদের জ্ঞানের দ্রষ্টা। আমাদের দিবাভাগের সম্মুখে তিনিই সেই শ্বেতবাজী, সমুচ্চের সাগরের প্রতি অস্খলিতপদে নিত্য ধাবমান।

* * *

হংসরূপী জীবাত্মা দেহের ও মনের যে বিস্তৃত প্রতিষ্ঠান তাহা পার হইয়া ঊর্দ্ধমুখে উড়িয়া চলিয়াছে। পথিক সে, যোদ্ধা সে, সত্যের পক্ষে

সে আগুয়ান এই দেবের সন্ধানে। দেবও তাহার জন্য আপন “ত্রিধাতু” সমন্বিত, নিগূঢ়ে বিরচিত অবস্থানে অপেক্ষা করিতেছেন, সেখান হইতে হস্ত দুইখানি প্রসারিত করিয়া তাহার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন।

* * *

দেব আপন স্বরূপে স্বস্থানে রহিয়া গুপ্তভাবে আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছেন। আবার এই স্থানে এই সৃষ্টলোকে বহু দেবতার মূর্ত্তিতে প্রকট হইয়া আমাদের সহায়রূপে সাথে সাথে চলিয়াছেন। তিনি সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র মানুষের সখা এবং প্রণয়ী, তিনিই রাখালরাজা, জ্যোতির্ম্ময় গোরূপধারী অনন্তের উধঃ হইতে দধি, দুগ্ধ—সকল রস সকল আনন্দ দোহন করিয়া দিতেছেন। তিনিই দিব্য আনন্দের, অমৃতত্বের, সোমধারার উৎস, তিনিই স্বয়ং তাহা বিতরণ করিতেছেন।

* * *

আমাদের সত্তার সপ্তধা-বিন্যস্ত সপ্তসিন্ধু হইতে অথবা আমাদের আধার-অদ্রিস্থ জ্যোতির্ম্ময় সোমলতা পেষণ করিয়া আমরা সোমরস বা সোমধারা আহরণ করি। সে অমৃতমদিরা পান করিয়া, তাহারই উন্মাদকতা বলে, আনন্দের মধ্যে, অমৃতত্বের মধ্যে উন্নীত, উপচিত, স্থির-প্রতিষ্ঠ হই।

* * *

দেব এক, দেবতা বহু। দেবতাগণ দেবেরই নানা নাম, তাঁহার এক এক বিশেষ শক্তি বা বিভূতি। দিব্য ভাগবত সত্তার অন্তর হইতে যে আদিম মূল তপঃশক্তিরাজী বিচ্ছুরিত হইয়াছে তাহাই দেব-অনীকিনী। বিশ্বসৃষ্টির বিরাট বৈচিত্র্য দেবেরই অঙ্গ সঞ্চালন। প্রত্যেক অঙ্গের প্রত্যেক গতিভঙ্গিমার যে বিশেষত্ব--যে বিশেষ সত্তা, যে বিশেষ শক্তি, যে বিশেষ চৈতন্য, যে বিশেষ আনন্দ তাহাই এক এক দেবতা।

* * *

দেবতাসকলে বিশ্বসৃষ্টিকে প্রকটিত করিয়াছে, এই বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে তাহারাই আবার প্রকটিত। তাহারা জ্যোতিঃর তনয়, অনন্তের পুত্র। মানুষের মধ্যে তাহারা দেখিতে পাইয়াছে আপনার ভ্রাতা সখা ও সহায়। মানুষের মধ্যে তাহারা আপনাদিগকে উপচিত করিয়া তুলে মানুষকে উপচিত করিয়া তুলিবার জন্য, মানুষের জগৎটিকে তাহাদেরই আলোকে শক্তিতে, সৌন্দর্য্যে ভরিয়া তুলিবার জন্য।

* * *

দেবতাবৃন্দ মানুষকে আহ্বান করিতেছে তাহাদের সহিত মিত্রত্বসূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য, তাহাদের সতীর্থ হইবার জন্য। তাহাদের জ্যোতির্ম্ময় ভ্রাতৃসঙ্ঘের মধ্যে মানুষকে টানিয়া লইতেছে, সেখানে সমুন্নত করিয়া ধরিতে চাহিতেছে। অজ্ঞান ও খণ্ডতার সেনা বাহিনীর বিরুদ্ধে তাহার সাহায্যের অপেক্ষা করিতেছে, তাহাকে সাহায্য প্রদান করিতেছে।

* * *

মানুষ আবার দেবতাবৃন্দকে আপনার যজ্ঞে আহ্বান করিতেছে, আপন প্রেরণাবেগ, আপন শক্তি, আপন সৌমনস্য, আপন তৃপ্তি—জ্যোতির্ম্ময় গাভির দধি দুগ্ধ, সোমলতার পরিশুদ্ধ রসধারা, যজ্ঞীয় অশ্ব, পুরোডাশ ও মধুমদিরা—সমস্তই তাঁহাদিগকে অর্পণ করিতেছে।

* * *

মানুষ দেবতাসকলকে আপন সত্বার মধ্যে, তাঁহাদের দিব্য দানসামগ্রীনিচয় আপন জীবন খেলার মধ্যে মিশাইয়া লইতেছে। সত্য মন্ত্রের দ্বারা সোমমদিরার দ্বারা তাঁহাদিগকে উপচিত করিতেছে। বৈদিক ঋষির কথায়, কর্ম্মকার যেমন লৌহ পিটিয়া গড়ে মানুষও তেমনি তাহার জ্যোতির্ম্ময় দেবসত্বাসকল পিটিয়া অনবদ্যাঙ্গ করিয়া গড়িতেছে।

হিমারণ্যের চিঠি সম্বন্ধে

("ত্যাগের কথা" লেখক লিখিত)

দুরন্ত ঝঞ্ঝার মুখে হিমারণ্য হ'তে একটী পত্র উড়ে এসে "প্রবর্ত্তকে"র বুকে পড়েছে। এই পত্রটির রেখায় রেখায় মাখান রয়েছে বিদ্রূপ, বিরক্তি, রোষ। এতে প্রবর্ত্তকের আজ একটু আনন্দ কর্‌বার কারণ জন্মেছে। কারণ এতে ক'রে প্রবর্ত্তক দেখ্‌বার একটু সুযোগ পেয়েছে যে তার পিছনে একটা শক্তি আপনাকে প্রকাশ ক'রে আছে। সে শক্তি মানুষের নয়—ভগবানের। নইলে ক্ষুদ্র "প্রবর্ত্তক"এর ক্ষুদ্রতর লেখকের, ক্ষুদ্রতম লেখনীর আলাপে হিমাদ্রির মহারণ্যের হৃদয় আজ এমন করে চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌বে কেন?

"হিমারণ্য" জান্‌তে চেয়েছেন আমরা ত্যাগ জিনিষটাকে সঠিক ভাবে বুঝেছি কি না। "প্রবর্ত্তক" ত্যাগ জিনিষটাকে সঠিকভাবে বুঝুক বা না বুঝুক এটা সে বেশ ভাবেই হৃদয়ঙ্গম করেছে যে তার দেশবাসী এই ত্যাগ জিনিষটাকে অত্যন্ত ভুল করেই বুঝেছে। আজ এই বাংলা দেশের অধিকাংশ নরনারীর অন্তরটাতে থানাতল্লাসি ক'রে দেখ্‌লে বোঝা যায় যে ত্যাগকে আলিঙ্গন ক'রে "প্রকৃতিকে জয় করিয়া তাহার অন্তর্গত সর্ব্বশক্তিত্ব পরিস্ফুট করা" ত দূরের কথা মানুষের অন্তরে যে কোন শক্তি থাক্‌তে পারে এ সন্দেহকেও তারা কখনও আপনার মনে স্থান দেয় না। মানুষ যেন ঠুন্‌কো চুড়ীর মত—একটু আঘাতেই ভেঙ্গে যাবে। একটু সংঘর্ষেই চুড়মার হ'য়ে যাবে। এমনি যে মানুষ তার দেহটার সঙ্গে প্রাণটা ত যুক্ত ক'রে রাখ্‌তে হবে। তাই এরা আপনার চারিদিকে গণ্ডীর পর গণ্ডী টেনে অচলায়তনের বিরাট প্রাচীর আকাশ জোড়া ক'রে খাড়া করেছে। তাই এদের মধ্যে যদি কেউ দৈনন্দিন কাজ কর্ম্মের বাহিরে কিছু কর্‌তে যায় তবে সে মূর্খ উপাধি লাভ করে—আর যদি কেউ অসাধারণ কিছু কর্‌বার আশা করে তবে ত সে বদ্ধ পাগল। এই যে এরা সাত্ত্বিকতার নাম দিয়ে গণ্ডারের চাম্‌ড়ার মত পুরু বিরাট তামসিকতার কৃষ্ণাবরণ আপনার সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে ব'সে আছে সেই আবরণকে রাজসিকতার তীক্ষ্ণ তরবারি দিয়ে বিদীর্ণ ক'রে ছিন্ন ভিন্ন কর্‌তে হবে। সে রজঃ যদি অশুদ্ধ রজঃও হয় তবে ক্ষতি নেই। জীবনে গতিই ত আগে আসুক—একবার গতি এলে সে গতি নির্দ্দিষ্ট পথে চালিত করা সম্ভব হবে। যেখানে কোন গতিই নেই সেখানে সেই গতির জন্য পথ নির্দ্দেশ ক'রে দেওয়া Theoryর সৃষ্টি করা মাত্র হবে। যে দেশে লক্ষ লক্ষ নরনারী দুর্ভিক্ষে অনশনে অস্থিচর্ম্মসার হ'য়ে নীরবে জীবলীলা সাঙ্গ ক'রে—যারা, তাদের সে অবস্থা কি ক'রে হল জিজ্ঞেস কল্লে—এক হাতে পেট বুলিয়ে আর এক হাত আকাশের দিকে তুলে ভগবানকে নির্দ্দেশ ক'রে ভগবানকে অপমান কর্‌তে দ্বিধা বোধ করে না—তারা কেবল ত্যাগকে কেন ভগবানকেও যে ভুল বুঝেছে এই আমাদের বিশ্বাস। এবং তাদের কাছে কিছুদিনের জন্য ত্যাগের মহিমা প্রচার না ক'রে উল্টো সুর ধর্‌লে যদি কোন অমঙ্গল হয়, তবে তার চাইতে মঙ্গল হবে অনেক বেশী। আমরা বিষয়টাকে এই ভাবেই বুঝেছি।

সাহিত্য যেমন জাতিকে গড়ে তোলে তেমনি তাকে ব্যক্তও করে বটে। বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে ইংরেজী অনভিজ্ঞ অজ্ঞাতনামা ও জ্ঞাতনামা কবিদের যে সকল পরমার্থ বিষয়ক গান এই বাংলা দেশের পল্লীতে পল্লীতে, সহরে সহরে গীত হ'য়ে এসেছে এবং নরনারীর কাছ থেকে বেশ সমাদর পেয়ে এসেছে, সেই সকল গান যদি কেউ সংগ্রহ ক'রে তাদের উপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে যায় তবে দেশের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা যে কোন্ পথে চলেছে তা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়ে যাবে। এই সকল গানের অধিকাংশের মধ্যেই ব্যক্ত রয়েছে মানুষের এই জীবনের জন্য বিভীষিকাময় ভীতি। মানুষের জীবন যেন মানুষকে নরকের পথেই টেনে এনেছে। মানুষের দেহ, ইন্দ্রিয় অনন্ত নিরয়ের পথে যাত্রী হবার জন্যই যেন তাকে দিবানিশি প্রেরণা দিচ্ছে। কৈ এ সকল গানের মধ্যে ত প্রকৃতি জয় ক'রে যে মানুষের অন্তর্গত সর্ব্বশক্তিত্ব ফুটিয়ে তুল্‌তে হবে তার কোন সুর পাওয়া যায় না। এ যে হতাশার গান, নিরাশার গান, অজ্ঞানীর অনুশোচনা। সুতরাং "হিমারণ্য" যাই বলুন আমাদের দেশবাসী ত্যাগকে আলিঙ্গন ক'রে প্রকৃতি জয় ক'রে তার অন্তর্গত সর্ব্বশক্তিত্ব লাভ কর্‌বার লক্ষ্য আপনাদের সামনে কোন দিনই স্থাপন করে নি।

"হিমারণ্য" বলেছেন "হিন্দুজাতির প্রাণ হচ্ছে ধর্ম্ম।" খুব সত্যি কথা। শুধু হিন্দুজাতি কেন—সমস্ত জাতিরই—আর শুধু মানুষই বা কেন—পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা—সবারই প্রাণ হচ্ছে আপন আপন ধর্ম্মে। এই ধর্ম্মের নাশে সৃষ্টিরও নাশ। এই ধর্ম্ম হতে চ্যুত হলে জীবেরও অমঙ্গল অধঃপতন। কিন্তু গণ্ডগোল কোন্‌খানে? যত গণ্ডগোল ঐ ধর্ম্মের সংজ্ঞা নিয়ে। ধর্ম্ম অর্থ কি? হিমারণ্যের চিঠিতে এই ভাবটাই প্রকাশ পেয়েছে যেন তিনি ধর্ম্ম অর্থে Religion বুঝ্‌তে চান। অবশ্য তাঁর প্রবন্ধ যদি ভুল বুঝে থাকি তবে আমি আনন্দিতই হব। কিন্তু হিন্দুর ধর্ম্ম কি বাস্তবিক Religion. খৃষ্টানের Religion ত রবিবারে ও গির্জ্জায়। হিন্দুর ধর্ম্মও কি সেইরূপ একটা কিছু। হিন্দুর ধর্ম্ম কি তার সমস্ত জিনিষটা নিয়ে নয়। আমার ত মনে হয় হিন্দুর ধর্ম্ম এই সৃষ্টিতত্ত্বেরই সুরে সুরে সুর বাঁধা। তার ধর্ম্ম মানুষের সত্যময় প্রকৃতির ওপরই প্রতিষ্ঠিত। সে প্রকৃতির বিসর্জ্জনের ওপরে নয়। তাই হিন্দুর ধর্ম্ম সনাতন ও সার্ব্বভৌম। কিন্তু আজ দেশের এমনি অবস্থা এসেছে যে ধর্ম্ম বল্‌লে আমরা শুধু

বুঝি—"জপ, তপ, দান, ধ্যান।" তাই আমরা বলি যে "হিন্দুজাতি Politics, Economics বা Scliologyর কথা বললে কিছু বোঝে না।" হিন্দুদের কাছে 'মায়াবাদ, অদ্বৈতবাদ বা ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেরূপ কঠিন তর্কজালই বিস্তার করুন না কেন তাহা তাহাদের নিকট পরিচিত ও সহজ" এ কথা যদি সত্য হয় তবে সেটা খুবই সুখের কথা সন্দেহ নেই কিন্তু "হিন্দুজাতি Politics, Economics or Sociologyর কথা বল্‌লে কিছু বোঝে না" সে জন্য আমি গৌরব বোধ কর্‌তে মোটেই চাই নে। এবং Politics ইত্যাদি বুঝ্‌লে যে মায়াবাদ ইত্যাদি অপরিচিত ও কঠিন হতে বাধ্য তাও মান্‌তে পার্‌ব না। "হিমারণ্য" ভুলে যাচ্ছেন যে হিন্দু আজ যদি রাজনীতি না বোঝে এমন একদিন ছিল যখন তা সে ভাল ক'রেই বুঝ্‌ত—কেবল যে বুঝ্‌ত তাই নয়—সেটা তার ধর্ম্মেরই একটা অঙ্গ ছিল। তবে সে ধর্ম্মের অর্থ ছিল এক, আর আজ কাল ধর্ম্ম বল্‌লে বুঝি অন্যরূপ।

হিন্দু যে আজ Politics ইত্যাদি বুঝে না সেটায় পিছনে হিন্দুর জাতিগত বা জন্মগত কোন অক্ষমতা নেই—এর কারণ যে অত্যন্ত ভাবেই অনৈসর্গিক তা বোধ হয় বলাই বাহুল্য। "হিমারণ্য" Sociology কোন্‌ অর্থে ব্যবহার করেছেন জানি না কিন্তু হিন্দু যে সমাজনীতি বোঝে অন্ততঃ বুঝ্‌ত তা বোধ হয় "হিমারণ্য" স্বীকার কর্‌বেন। আর রাজনীতিটা সমাজনীতিরই একটা বৃহত্তর রূপ নয় কি? মানুষের এবং মানুষের মধ্যে যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধকে আশ্রয় ক'রে গড়ে উঠেছে সমাজনীতি। আর সমাজ এবং সমাজের মধ্যে, জাতি এবং জাতির মধ্যে, দেশ এবং দেশের মধ্যে যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধকে আশ্রয় ক'রে জন্মলাভ করেছে রাজনীতি। দু'এর মূলে একই সত্য। প্রথমটী ব্যষ্টি এবং ব্যষ্টির মধ্যে সম্বন্ধ নিয়ে, দ্বিতীয়টী সমষ্টি এবং সমষ্টির মধ্যে সম্বন্ধ নিয়ে। কিন্তু হিন্দু কি আজ অহিন্দুর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখ্‌বে না? সে কি আবার তার চারিপাশে "অচলায়তন"এর বিরাট প্রাচীর খাড়া ক'রে তুল্‌বে? হিন্দু কি আজ ভিন্ন জাতি ভিন্ন দেশের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই রাখ্‌বে না? এই কি হিন্দুর ধর্ম্ম? এই যদি হিন্দুর ধর্ম্ম হয়—তবে বল্‌ব হিন্দুর এ ধর্ম্ম মানুষের ধর্ম্ম নয়—সুতরাং হিন্দুর ধর্ম্ম সনাতনও নয় সার্ব্বভৌমও নয়—সুতরাং হয় এ ধর্ম্মের নাশ অনিবার্য্য নয় হিন্দুর পতন অবশ্যম্ভাবী। আর যদি

হিন্দু এ সৃষ্টিলীলার বিরুদ্ধাচারী না হয়—যদি হিন্দু এ বিশ্বমানবের বিরাট প্রাঙ্গনে ভগবানের আনন্দলোক দেখ্‌তে পেয়ে থাকে—তাঁর বিরাট ব্রহ্মাণ্ড শতদলের একটা দলের ওপর এ ধরিত্রী স্থাপিত বুঝ্‌তে পেরে থাকে—যদি হিন্দু তার কর্ম্মপ্রেরণা, ভোগপ্রেরণার মধ্যে অমৃতের সন্ধান পেয়ে থাকে তবে তাকে বুঝ্‌তে হবে ঐ Politics, Economics আর Sociologyকে। হিন্দুর ধর্ম্ম বিরাট, উদার, ব্যাপক। সে আলিঙ্গন ক'রে আছে সমস্তকে। হিন্দু আজ এই নবীন যুগে নবীন স্বপ্ন দেখেছে। সে আজ "রূপ সাগরে ডুব দিয়া অরূপ রতন আশা করে"।

আমরা যাকে ভগবানের পূর্ণাবতার ব'লে মানি সেই শ্রীকৃষ্ণ যে কুরুক্ষেত্রের রণপ্রাঙ্গনে অর্জ্জুনের রথ চালিয়ে তাঁকে বিশাল চমূর সম্মুখে স্থাপিত ক'রে বলেছিলেন—"Fight and fall nobly or conquer mightily" সেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ধর্ম্ম যুদ্ধ নামে অভিহিত। কিন্তু সে ধর্ম্ম যুদ্ধ কি একটা Religious war ছিল? সে যুদ্ধকে কি জেহাদ্ বলা যেতে পারে? আমার ত মনে হয় সে যুদ্ধের মধ্যে রাজনীতি ও সমাজনীতির অনেক কথা ছিল। তা সত্ত্বেও হিন্দুর কাছে সেটা ধর্ম্ম যুদ্ধ। তবে সে ধর্ম্মের ব্যাখ্যা ছিল এক এবং আজ কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে আর। হিন্দুর সে ধর্ম্ম ছিল আত্ম-প্রসারণের ধর্ম্ম—সে ধর্ম্ম ছিল মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তির ধর্ম্ম আর আজকার হিন্দুর যে ধর্ম্ম তা অনার্য্যজনোচিত—আর্য্যের নয়।

"এই যে ত্যাগমন্ত্র—যাতে আমাদের কোন মতামত নেওয়া হয়নি" এই কথা "ত্যাগের কথা" প্রবন্ধে লেখা হয়েছিল ব'লে "হিমারণ্য" একটু ব্যঙ্গ করবার প্রয়াস পেয়েছেন এবং বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। বলা বাহুল্য ব্যঙ্গ বিচার নয় আর বিস্ময়ও যুক্তি নয়। সুতরাং এ সম্বন্ধে আলোচনার কিছু দেখ্‌ছিনে। তবে এইটুকু বল্‌ব যে হিমারণ্যের এ বিস্ময় তাঁর একলার নয়—এ বিস্ময় বর্ত্তমানের সমগ্র হিন্দুজাতির। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, যে দেশে বেদ সত্ত্বেও উপনিষদের সৃষ্টি হয়েছিল—উপনিষৎ সত্ত্বেও ষড়্‌দর্শনের আবির্ভাব হয়েছিল—ষড়্‌দর্শন সত্ত্বেও শ্রুতি স্মৃতি রচিত হয়েছিল—সে দেশে এক হিন্দুর ছ'শ শাখা, উপশাখা গড়ে উঠেছে—সে দেশে কারও যে একটা মত থাক্‌তে পারে তা শুন্‌লে বিস্ময় প্রকাশ করি। আর তাই হিন্দু মাছিমারা কেরাণীর মত পূর্ব্ব গতের অনুকরণ ক'রে ক'রে ভিতরের তথ্যটুকু হারিয়ে এখন গায়ে জড়িয়ে বসে আছে—কতগুলা বিধি-নিষেধের আবর্জ্জনা। এই আবর্জ্জনা চাপে

হিন্দুর পুরুষত্ব ঢাকা পড়ে গেছে। পুরুষকে হারিয়ে হিন্দুর প্রকৃতি আজ শক্তিহীনা, সঙ্কুচিতা, অন্তঃপুরবাসিনী, অবগুণ্ঠনবতী। "হিমারণ্য" হয়ত বল্‌বেন—যে তোমরা ত নবীন—তোমাদের একটা মত গঠন করবার স্পর্দ্ধা ত কম নয় তার উত্তরে শুধু এইটুকু বল্‌ব যে—আমরা নবীন বটে—আমরা ক্ষুদ্র হতে পারি—কিন্তু আমরা তুচ্ছ কিছুতেই নই।

পূর্ণ-যোগ

(৪)

মার্গত্রয়ী—জ্ঞানযোগ

রাজযোগের পরবর্ত্তী স্তরে হইতেছে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম এই যোগত্রয়। ইহাদের ক্রিয়া রাজযোগের ন্যায় অন্তঃকরণের সমস্তখানি লইয়া নহে। মনের যাবতীয় প্রকরণ নিয়ন্ত্রিত বশীভূত করিতে ইহারা চেষ্টা পায় না। ইহাদের লক্ষ্য মনের যে প্রধান তিনটি গতি তাহার কোন একটি ধরিয়া তাহারই সহায়ে সমস্ত মানুষটিকে পরিবর্ত্তন করা। সমস্ত মানুষটিকে চারিদিক হইতে ভাঙ্গিবার গড়িবার চেষ্টা না করিয়া, তাহার অন্তরের মূল বস্তুটি ধর, তাহার কেন্দ্রস্থলে আঘাত কর দেখিবে কত সহজেই সে পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে। এই মূল বস্তু, অন্তঃকরণের প্রধান ধর্ম্মরূপে লইয়াছে কেহ জ্ঞান, কেহ প্রেম, কেহ কর্ম্ম এবং সেই অনুসারে তাহাদের সাধনপন্থার নাম হইয়াছে যথাক্রমে জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ। মানুষের এই যে ত্রিবিধ ঈষণা সাধারণ জীবনে তাহাদের গতি স্থূলের, অল্পের, খণ্ডের দিকে, সেই দিক হইতে ফিরাইয়া উহাদিগকে সূক্ষ্মের, বৃহতের, পূর্ণের দিকে, ভগবানের দিকে পরিচালিত করিতে হইবে ইহা হইতেছে মার্গত্রয়ের সাবনার মূল সূত্র। একবার যদি মানুষ তাহার বুদ্ধির কেন্দ্রে অথবা হৃদয়ের কেন্দ্রে অথবা কর্ম্মপ্রেরণার কেন্দ্রে ভাগবত স্পর্শ অনুভব করে তবে ক্রমে অব্যর্থভাবে সকল অন্তর ক্ষেত্রগুলিই সেই স্পর্শে দিব্যপ্রতিষ্ঠান হইয়া উঠিবে। রাজযোগ ও এই মার্গত্রয়ীর মধ্যে আর একটি প্রভেদও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। রাজযোগ শরীর ও মনের সংমার্জ্জন ও সংশোধনের উপর

যতখানি জোর দেয়, ভাগবত সত্তার অধিকারী করিয়া তুলিবার নিমিত্ত শরীর ও মনকে যত কৃচ্ছ্র সাধনার মধ্য দিয়া, নানাবিধ প্রক্রিয়ার সাহায্যে শুদ্ধ, সিদ্ধ, পূর্ণ করিয়া তুলিতে চায় মার্গত্রয় তাহা কিছুই করে না। আসন, প্রাণায়াম বা চিত্তবৃত্তি নিরোধ এ সকল প্রক্রিয়া মানুষকে জোর করিয়া করিতে হয়, আপনার উপর একটা আরোপ করিতে হয়—ইহাদের মধ্যে কেমন একটা কৃত্রিমতা ও সঙ্কীর্ণতার আভাস মিশ্রিত হইয়া আছে। মার্গত্রয় বলে, মানুষকে লও মানুষ হিসাবে, তাহার সহজ স্বাভাবিক অবস্থায় লও। মানুষ চায় জানিতে, ভালবাসিতে, কর্ম্ম করিতে—এই তিনের সাহায্যে কি করিয়া তাহাকে পরিবর্ত্তিত করা যায় তাহাই বিচার্য্য। শরীর ও মনের সে কঠিন ব্যায়ামের প্রয়োজন কি?

রাজযোগের প্রতিষ্ঠা চিত্ত, জ্ঞানযোগের প্রতিষ্ঠা বুদ্ধি। মানুষ জানিতে চায়, এই জানা'র প্রবৃত্তি ধরিয়া জ্ঞানযোগ। লক্ষ্য কি? ভগবান। ভগবানকে পাইতে হইলে আগে চাই ভগবানকে জানা। ভুল জ্ঞান বা অজ্ঞান নাশ করা এবং সত্যের জ্ঞান পাওয়াই তবে সকল সাধনা। সত্যরূপী ভগবান হইতেছে আত্মা। এই আত্মসাক্ষাৎকারই সফল জ্ঞানযোগ। জ্ঞানযোগের দুইটি স্তর, অথবা দুইটি ভাগ। প্রথম হইতেছে বিচার ও বিবেক। সত্যকে জানিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে জানিতে হইবে সত্য কি নয়, ভুল কি? ইহাই বিচার। আমার সম্বন্ধে আমি যতখানি জানিতে পারি অন্য কিছু সম্বন্ধে তেমন জানা সম্ভব নয়। তাই বিচার আরম্ভ আমাকে দিয়া। আমার মধ্যে সত্যবস্তুটি কি? তাহা কি দেহ? না। প্রাণ? না। মন? না। কারণ এ সকলই নশ্বর, চঞ্চল, ক্ষণিক। সত্য অর্থ সৎ যাহা আছে, ছিল, থাকিবে। থাকাই যাহার ধর্ম্ম। যখন এই নেতি নেতি করিয়া ভুল প্রত্যয় নিরসন করি, যখন গভীরভাবে উপলব্ধি করি দেহ প্রাণ মন সত্য নয় ইহাদের অতীতে একটা কিছু আছে যাহা অব্যাভিচারী সত্তা, যাহা সৎ, যাহা সত্য তখন জাগে আমাদের মধ্যে বিবেক। বিবেক এক সহজ প্রেরণাভরে সত্যের ও মিথ্যার পার্থক্য দেখাইয়া দেয়। বিচার করিয়া মিথ্যা প্রতীতি খণ্ডন করিবে। বিবেক সত্যবস্তুর আভাসটি ফুটাইয়া তুলিবে। আভাস কেন না আমার নিগূঢ় সত্য আমিত্বের যে চৈতন্য তাহা একান্ত বুদ্ধিগ্রাহ্য নহে। বুদ্ধির দ্বারা তাহার ভাবমূর্ত্তি পাই মাত্র। এই ভাবকে উপলব্ধির মধ্যে বস্তুতন্ত্র করিয়া তুলাই জ্ঞানযোগের দ্বিতীয় ভাগ। তাহা হইতেছে এই ভাবের

সহিত পরিচিত হওয়া, মনে মনে গাঁথিয়া তুলা, তাহাতে একাগ্র ও তন্ময় হইয়া যাওয়া। জ্ঞানযোগীর ভাষায় বলিতে গেলে, সত্যকে, আত্মাকে পাইতে হইলে চাই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। অবহিত হইয়া শুন সত্যমন্ত্র, সত্যের নাম, তাহার সংজ্ঞা, তাহার পরিচয়, চিন্তাকে মনকে সর্ব্বদা তাহার উপর অর্পণ কর, তাহার মধ্যেই ডুবিয়া যাও। ক্রমাগত এইরূপ সেই পরম বস্তুরই কথ ভাবিতে ভাবিতে, কেবল সৎ সত্তারই প্রতীতির মধ্যে অবস্থান করিতে করিতে বাহ্য প্রতীতি সব আমাদের খসিয়া পড়িতে থাকিবে, দেহ প্রাণ মনের খেলা এই মিথ্যা মরীচিকা স্তিমিত হইয়া আসিবে। ফুটিয়া জাগ্রত হইয়া উঠিবে জাগরত আত্মা। তখন সাধকের অন্য কোন চেতনা নাই, সে তখন তুরীয়ে প্রতিষ্ঠিত, তখনই সে শুদ্ধ মুক্ত বুদ্ধ। জগতের জ্ঞান, ইন্দ্রিয়গ্রামের জ্ঞান হইতে নির্ব্বিশেষ মুক্তিলাভ করিয়া তাহার তখন কৈবল্যপ্রাপ্তি, ব্রহ্মসিদ্ধি।

জ্ঞানযোগের মহৎ দান এই ব্রহ্ম, এই সচ্চিদানন্দ--সেই সৎ যাহাকে আশ্রয় করিয়া সকল সত্তা, সেই চৈতন্য যাহা সকল জ্ঞানের মূল, সেই আনন্দ সুখ দুঃখের মধ্যে যাহা অন্তঃসলিলা ফল্গুপ্রবাহ। জ্ঞানযোগ মানুষকে দেখাইতেছে তাহার গভীরতম আত্মবস্তু, সকল সীমা, সকল খণ্ডতা সকল স্থূলতার অতীতে যে অনির্ব্বচনীয় পূর্ণত্ব, একত্ব, যে নিত্যসত্য, যাহা অপরিণামী, অবিসম্বাদী, শাশ্বত, সনাতন, যেখানে শোক নাই, মোহ নাই, অতৃপ্তি নাই, দ্বন্দ্ব নাই। কিন্তু জ্ঞানযোগের অভাব এইখানে যে মানুষকে তুরীয় অতীন্দ্রিয় বস্তুটির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া তাহার ইহলোকত্রয় তাহার ইন্দ্রিয়গ্রামকে একবারে তুচ্ছ অগ্রাহ্য করিয়াছে। দেহ প্রাণ মনে অসত্য অনৃতের খেলা আছে কিন্তু ইহারা একান্ত অসত্য অনৃত নহে। ইহাদিগকে সচ্চিদানন্দের বস্তুতেই গড়িয়া তুলা যাইতে পারে এ কথা জ্ঞানযোগী ধরিতে পারেন নাই। মূল সত্যকে খুঁজিতে যাইয়া সেই সত্যের যে শাখা প্রশাখাময় ফলফুলে সুশোভিত একটা স্থূল প্রকটমূর্ত্তি আছে তাহা তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। খণ্ডকে সীমাকে তিনি দূর করিয়াছেন কিন্তু সেই সঙ্গে বৈচিত্র্যকেও হারাইয়াছেন। এককে পাইয়াছেন কিন্তু একেরই যে বহুত্ব তাহা হারাইয়াছেন। একীকরণ বুঝিয়াছেন কিন্তু সমীকরণ বুঝেন নাই। পূর্ণযোগের সাধক আমরা এককে চাই, কারণ একেই প্রতিষ্ঠা। কিন্তু সেই এককে ফুটাইয়া তুলিব বহুতে, ব্রহ্মকে জাগ্রত করিব

দেহ প্রাণ মনে। একের ও বহুর, ব্রহ্মের ও জগতের, অতীন্দ্রিয়ের ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে জ্ঞানযোগ যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলিয়া দিয়াছে আমাদিগকে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে, উভয়ের মিলনস্থানটি, সামঞ্জস্যতত্বটী আমাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

জ্ঞানযোগীর ভুল এইখানে তিনি নিজের অস্মিতার মধ্যেই ব্রহ্মকে প্রকট দেখিতেছেন, একান্তভাবে সেখানেই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু নিজের সত্ত্বাকে জগতের কেন্দ্ররূপে না দেখিয়া, জগতের অনান্য বস্তুকে নিজের চৈতন্যের ছায়া বা মায়াখেলারূপে না গ্রহণ করিয়া, যদি অপরের সত্ত্বার মধ্যেও আমরা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে পারি, প্রত্যেক ব্যষ্টিগত চৈতন্যের মধ্যে একই ব্রহ্মের পূর্ণ স্থিতিটি সাক্ষাৎ করি তবে জগতের বাহিরে নয়, জগতের ভিতরেও এই ব্রহ্মকে পাইব। সকল দ্বৈতের মধ্যেই অদ্বৈতের উপলব্ধি দ্বারা বুঝিব জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে মায়াবাদী কল্পিত সে ব্যবধান নাই।

বস্তুতঃ ব্রহ্মসত্ত্বার যে চৈতন্য জ্ঞানযোগী কেবল তাহাই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু চৈতন্যের ধর্ম্ম যে প্রকাশ, বিকীরণ, বিস্ফুরণ অর্থাৎ শক্তি তাহা তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন নাই—চিৎ আর তপঃ একই বস্তু এবং এই তপঃ হইতে সৃষ্টি। শুধু চৈতন্যের দিকেই তিনি জোর দিয়াছেন বলিয়া তিনি পাইয়াছেন নিষ্ক্রিয় বা অক্ষর ব্রহ্ম। কিন্তু চৈতন্যের অন্তরে যে প্রকাশাত্মিকা প্রেরণা যে উদ্গমনশীল শক্তি—স পর্য্যগাৎ—লুক্কায়িত তাহার উপর ধ্যান দিলে আমরা দেখিব ব্রহ্মই কর্ম্মপর হইয়া উঠিয়াছেন, অচল স্থাণুই আপনার অচলত্ব স্থাণুত্ব অব্যাহত রাখিয়া গতির মধ্যে পরিণামের মধ্যে প্রকট হইয়াছেন। ব্রহ্মেরই স্বরূপ সত্ত্বা হইতে এই জগৎ বিস্ফুরিত, তাহার মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত, সচ্চিদানন্দের পরম শান্তিকে ধরিয়াই বিশ্বের শক্তি চঞ্চল, নিত্য লীলায়িত। জ্ঞান যোগ যদি আমরা এইভাবে সাধনা করি তবে একমেবাদ্বৈতং শান্তং শিবং সুন্দরং জগতের প্রতি বস্তুতে, প্রতি গতিভঙ্গিমায় পরিস্ফুট দেখিতে পাইব। আমাদের চিন্তা আমাদের ভোগ আমাদের কর্ম্মজীবনকেও অন্তরের একটা প্রসন্নতা, বিমলতা, স্বচ্ছতা, শান্তির, মুক্তির প্রদীপ্ত চৈতন্য, অখণ্ড জ্ঞানের উপরেই খেলাইয়া তুলিতে পারি। তখন সাধারণ জীবনকে আর পরিত্যাগ করিতে হইবে না, জগতের কর্ম্ম হইতে আর দূরে থাকিতে হইবে না, এই সকলকে ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রাহ্মিস্থিতিরই সুবলয়িত লীলাবিতান করিয়া গড়িয়া তুলিব।

সর্ব্বং ব্রহ্মৈব

“প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি”—মানুষের স্বভাবই বলবান। অতি জ্ঞানবান ব্যক্তিও পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সংস্কার বশে অনেক মন্দ কর্ম্ম করিয়া থাকেন। এই স্বভাবের নিগ্রহ কিরূপে সম্ভব? মানুষের একাদশ ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি—কর্ম্মজনিত যে বন্ধনের অধীন তাহা হইতে মুক্তির উপায় কি?

শ্রীভগবান্ গীতায় এই জটিল রহস্যের কথাই কহিয়াছিলেন—সে রহস্যও “আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ”। এই নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে যোগ সাধনার নিতান্তই প্রয়োজন—ভারতের সর্ব্বোচ্চ যে শিক্ষা তাহা এই যোগের মধ্যেই নিহিত।

মহারথী পার্থ যখন শুনিলেন—সকল জীবকেই কর্ম্ম করিতে হইবে, ত্রিলোকে প্রাপ্তিযোগ্য কোন দ্রব্য না থাকিলেও যোগৈশ্বর্য্যশালী শ্রীভগবানও কর্ম্ম করিয়া থাকেন—পরন্তু গুণময় ইন্দ্রিয়াতীত অন্তঃপুরুষের জ্ঞান লইয়া কর্ম্মাসক্তি পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক লোক শিক্ষার্থে কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ—তখন অর্জ্জুনের মনেও নানা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছিল। অন্য পরে কা কথা।

দ্বন্দ্ব হইতেছে এই যে পঞ্চ ভৌতিক জগদ্ প্রপঞ্চ, ইহাতে অভিভূত না হইয়া জীব অনাসক্ত হইবে কি প্রকারে? কচ্ছপ যেরূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সংহৃত করিয়া রাখে, জীব সেইরূপ ইন্দ্রিয়াদির বহির্বিকাশ রুদ্ধ করিয়া রাখিলেও মনের মধ্যে ইন্দ্রিয়গ্রামের স্বভাব যে স্ফুরিত হইবে না, এরূপ কোন কথা নাই, অতএব নিগ্রহ নীতি অবলম্বন করাও গীতার শিক্ষা নহে। দশদিকে দশ ইন্দ্রিয়কে ছড়াইয়া জগতে কর্ম্ম করিয়াও পরাজ্ঞান লাভ করিতে হইবে—ইহাই শ্রীভগবানের আদেশ।

ইন্দ্রিয়াদির প্রত্যেকের জন্মার্জ্জিত সংস্কার আছে, উহাই উহাদের স্বভাব। এই জন্যই উহারা বহির্ম্মুখী, উহাদের গতি কামের দিকে—অনুকূল ভোগে তৃপ্তি বোধ করে, প্রতীকূল অবস্থায় ক্ষুণ্ণ হয়—ইহাকেই রাগদ্বেষ বলে। যোগী প্রাকাম্য সিদ্ধিলাভপূর্ব্বক স্ব স্ব ইন্দ্রিয়গুলিকে স্বচ্ছন্দানুবর্ত্তী করিয়া ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবে, প্রাপ্ত বস্তুতে আসক্ত হইবে না, অপ্রাপ্ত বস্তুতে লোভ করিবে না। কিন্তু বাসনারতীব্র বিষ মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি হইতে বহিষ্কৃত করিতে না পারিলে এরূপ হওয়া একেবারেই অসম্ভব।

বাসনার লক্ষণ হইতেছে—ভোগের সময় ইন্দ্রিয়গ্রাম যেরূপ হর্ষান্বিত হয়, ভোগান্তে ততোধিক অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। এজগতে স্ব স্ব স্বভাব বশে

যে যাহা করিতেছে তাহাকে তদ্বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ বাধাই মানুষকে তাহার স্বভাবসিদ্ধ যোগপথ হইতে দূরে নিক্ষেপ করে, বুদ্ধির ভেদজনিত সে অবসাদকেই আবার কর্ম্মবন্ধনের প্রেরণা বলিয়া গ্রহণ করে, তাহার অশুদ্ধ স্বভাবের বিনাশে বিলম্ব ঘটাইয়া দেয়। যদি ত্বরিত জীবের কর্ম্ম বন্ধন টুটাইয়া দিতে চাও তবে অবাধে তাহাকে কর্ম্ম করিতে দাও, ইন্দ্রিয়াদির ভোগের মধ্যে তাহার স্বীয় স্বভাবের অন্ত আপনা আপনি বাহির হইয়া পড়িবে, তখন সে ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞানকে বাহির করিবার জন্য স্বভাবতঃই ব্যাকুল হইবে।

কথাটা আরও স্পষ্ট করিয়া বলা উচিত। আমরা বলি মানুষের স্বভাবই বলবান, এই স্বভাবের বিনাশ সাধন একেবারেই অসম্ভব। প্রকৃতির বশীভূত হইয়াই আমাদের ইন্দ্রিয়গণ কর্ম্মানুসরণ করিয়া থাকে, এক্ষণে এই ইন্দ্রিয়গুলি যে আমি নহি এইরূপ একটা অচল জ্ঞানের প্রতিষ্ঠাই আমাদের মুক্তিপথ প্রশস্ত করিয়া দিবে। এইরূপ জ্ঞানার্থী ব্যক্তি প্রাক্তন ক্ষয়ের জন্য যাহা করেন তাহার জন্য কোন মতেই রাগদ্বেষের বশীভূত হইবেন না, ইন্দ্রিয়াদির স্বভাব জয়ের জন্য যতদিন না শুদ্ধি আসে ততদিন স্থিতধী হইয়া দ্রষ্টাস্বরূপ অপেক্ষা করিবেন। এই বাসনার শেষ আছে—পুনঃ পুনঃ হর্ষ ও বিষাদ প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রিয়গ্রাম স্বভাবতঃ নিতান্ত বিপন্নভাবে অন্তঃপুরুষের নিকট মস্তক অবনত করিবেই। এই অন্তঃপুরুষ মানুষের আত্মা—যিনি অদাহ্য, অচ্ছেদ্য, অশোষ্য ; যিনি সর্ব্বগত, শাশ্বত, পুরাণ ; যিনি "বীতরাগভয়ক্রোধঃ"; ইহাই মানুষের সনাতন স্বভাব, এই স্ব স্বরূপকে আবৃত করিয়াছে জীবের অহঙ্কার। দুষ্পূরণীয় অত্যুগ্র কাম অহঙ্কারের তীক্ষ্ণ অস্ত্র, কামনার পথে বাধা আসিলে ক্রোধের উৎপত্তি, এই ক্রোধই মোক্ষপথের নিদারুণ পরিপন্থী।

এই বিপরীত চরিত্রের অবসান আসিবে ভোগে, নিগ্রহে নহে। মানুষের অন্তরতম প্রদেশের যে মহামন্ত্র তাহা অনাহত এবং তাহা মুক্ত, এই অন্তঃপুরুষের স্বভাবই পরিণামে ফুটিয়া উঠিবে জীবের মনে এবং শরীরে ; জীবের এই যে অহঙ্কার, ইহা ব্যাপ্ত হইয়াছে ইন্দ্রিয়ে মনে এবং বুদ্ধিতে। আত্মা কখনও কাহারও দ্বারা আবরিত হন না, তিনি স্বচ্ছন্দ, তিনি আনন্দময়।

ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি আপন স্বভাববশে ত্রিলোকে ক্রীড়া করিতেছেন—সে তাণ্ডব নর্ত্তনে বুদ্ধি মন শরীর কখন হর্ষান্বিত কখন অবসাদগ্রস্ত—ইহাই তাহার অহঙ্কার, এই অহঙ্কার চূর্ণ করিতে হইলে প্রকৃতির খেলা বন্ধ করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে ব্যাকুল হওয়া অপেক্ষা ভগবদ্ আদেশ শ্রবণ করিবার জন্য যোগযুক্ত হওয়াই পরম শ্রেয়ঃকর। তাঁর ইচ্ছা হইলেই সর্ব্বাগ্রে জ্ঞান বিকাশ হইবে, তারপর অহঙ্কারের যে অধিষ্ঠানক্ষেত্র মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণ তাহাদিগকে জ্ঞানগত করিতে হইবে—ইহাই হইবে প্রকৃতির ঊর্দ্ধ গতি। যে প্রকৃতি জীবের ইন্দ্রিয়গ্রাম—মন বুদ্ধিকে লইয়া বহির্ম্মুখী ছিল—সেই প্রকৃতির সাহায্যেই আমরা বুঝিব শরীর অপেক্ষা ইন্দ্রিয়াদি শ্রেষ্ঠ,

ইন্দ্রিয়াদি অপেক্ষা মন এবং মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধির অতীত যে পুরুষ পরাৎপর ব্রহ্ম সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তারপর কামের পরিবর্ত্তে, কামের অধিষ্ঠান ক্ষেত্রে প্রকৃতিই ব্রহ্মকে প্রতিষ্ঠা করিবে, তখন হইবে "সর্ব্বং ব্রহ্মৈব"।

এই "সর্ব্বং ব্রহ্মৈব" জ্ঞান আসিলেই যে মানুষ সমাধিমগ্ন হইবে এরূপ কেহ মনে করিবেন না, পৌরাণিক যুগের এই অন্ধ সংস্কার আমাদের এই সর্ব্বরসাত্মক ব্রহ্মভাবকে খণ্ডিত করিয়াছে। কামের ধর্ম্ম ছিল দ্বন্দ্ব, আসক্তি, অজ্ঞানতা; ব্রহ্মের সনাতন স্বভাব আনন্দ, নির্দ্বন্দ্ব ও নিরাসক্তভাব। এই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের মধ্যেই আমরা খেলা করিব—সে অব্যক্ত অনির্ব্বচনীয় অভাবনীয় ব্রহ্মলীলা আমাদের নিকট একটা প্রহেলিকা মাত্র, কেননা তাহার আস্বাদ আমরা পাই নাই; কিন্তু কোন কালে যে সে আস্বাদ উপভোগ করি নাই একথা বলিতে পারি না—সে অপূর্ব্ব আনন্দ-রাজ্যের সাক্ষী এখনও অপরিণামী আমার আত্মা, অবিনাশী অক্ষয় পরমব্রহ্ম—আজ তাঁহারই আদেশে, তাঁহারই ইচ্ছায় "সর্ব্বং ব্রহ্মৈব" মন্ত্রের সাধন করিয়া এই মরজগতেই অমর জীবনের প্রতিষ্ঠা করিব।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি, শিলচর।

স্বামিজী বলিয়াছিলেন "আমি মুক্তির কথা ভুলিয়া গিয়াছি, বারবার জন্ম পরিগ্রহ করিয়া সংসারের যাবতীয় যন্ত্রণা ভোগ করিব—আমার প্রত্যক্ষ দেবতা—যাহারা অজ্ঞান, যাহারা অন্নহীন, যাহারা দুর্দ্দশাগ্রস্ত তাহাদের পূজা করিতে"। এই মহাবাণী বাঙ্গালীর জীবনে মন্ত্রের মত কার্য্য করিতেছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, ইহার ইংরাজী নাম Ram Krishna Home of Service, Silchar. ইঁহাদের বার্ষিক বিবরণী পুস্তক আমরা পাইয়াছি। এই সমিতির সভাপতি মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু কামিনী কুমার চন্দ। কাছারের প্রবল বন্যায় সময় বেলুড় মঠের শ্রীমৎ স্বামী ভূমানন্দ স্থানীয় কয়েকটি যুবকের সহায়তায় বন্যাক্লিষ্ট নরনারীর দুঃখ বিমোচনে উদ্যোগী হয়েন, এই মহৎ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ১৯১৫ সালে ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে এক সাধারণ সভা করিয়া এই সেবা সমিতি স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা ইহার কার্য্যাদির বিবরণ পাঠে আনন্দিত হইয়াছি। ১৯১৫ সাল হইতে ১৯১৬ সাল এই ১৫ মাসে ৯৬৩।/০ আনা সমিতি কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে; বাড়ী ভাড়া, নৈষ্য-বিদ্যালয়, পুস্তকাগার, সেবাকর্ম্ম প্রভৃতি অনুষ্ঠানে ৮৪২॥১০ খরচ হইয়া সমিতির হস্তে নগদ ১২০৸১০ উদ্বৃত্ত আছে।

এক্ষণে সমিতির সভ্যগণ এই সদনুষ্ঠানের জন্য একটী স্থায়ী আশ্রম নির্ম্মাণ উদ্দেশ্যে জনসাধারণের নিকট আবেদন করিয়াছেন। যাঁহারা মনুষ্যজাতির দুঃখ দুর্দ্দশায় সমবেদনা প্রকাশ করেন, এরূপ ভক্তগণের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষিত হইলে আমরা সুখী হইব।

জাগরণ

ভারত ছাড়া কথা নাই। কবি গাহিয়াছেন, "এই দেশেতে জন্ম আমার যেন এই দেশেতে মরি"! পৃথিবীর সকল জাতিই তাহাদের স্ব স্ব জন্মভূমিকে জীবনের সর্ব্বস্ব বলিয়াই জানে, আজ তাহার অভিব্যক্তিস্বরূপ ফরাসি জাতি স্বদেশ রক্ষার জন্য কেমন অকাতরে জীবন বিসর্জ্জন দিতেছে অবলোকন কর—স্বজাতির মর্য্যাদা, স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য য়ুরোপের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিও হৃদয়ের সবটুকু রক্ত কেমন হাসিমুখে ঢালিয়া দিতেছে একবার লক্ষ্য কর। একবার ভাবিয়া দেখ যাহাদিগকে তোমরা ম্লেচ্ছ বল, অনাচারী বল, তাহারা কত বড় স্বদেশপ্রেমিক, তাহারা পরস্পর কেমন মধুর ভ্রাতৃত্বভাবে বিজড়িত—সমবেদনায় তাহাদের হৃদয় কেমন যুগপৎ ব্যথিত হইয়া উঠে।

দেখ, আমাদেরও দেশ আছে—সে দেশ ভারতবর্ষ। তাই শত মুখে ভারতবর্ষের কথা কহিতে ইচ্ছা করে। যদি একনিষ্ঠ হইয়া মোক্ষের জন্য প্রতিদিন শতবার ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ বলিয়া জপিতে পার, তাহা হইলেও যথার্থ দেশপ্রীতি জাগিয়া উঠে—পবিত্র স্বদেশপ্রেমের বারিস্রোতে মনের কালি মুছিয়া যাইতে পারে। স্বদেশী যুগের পর হইতে দেশপ্রীতি বলিয়া একটা জিনিষ দেশের মধ্যে দেখা যাইতেছে বটে কিন্তু সে প্রেম ধার করা, তাহার ফল বিষময়। ভারতবর্ষের প্রকৃত কল্যাণ তদ্দ্বারা বিশেষ কিছু হইতেছে বলিয়া বোধ হয় না। ভারতবর্ষ আজ পরাধীন বটে কিন্তু সে বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য গতানুগতিক প্রথাটি অবলম্বন করা কতটা যুক্তিসঙ্গত তাহা আজ ভাবিবার দিন আসিয়াছে।

দেশের বৈধ রাজনৈতিক আন্দোলনকারী দল হইতে বিপ্লববাদী দল, সকল শ্রেণীকেই আজ জিজ্ঞাসা করি—যে প্রথায় তাঁহারা ভারতবর্ষের উন্নতি করিতে প্রয়াসী, যাহার জন্য তাঁহারা ইহ জীবনের অনেক ভোগেই জলাঞ্জলি দিতে কৃতসঙ্কল্প—সে প্রথাটা কোথাকার? সে কি ভারতের?

সেকি শ্রীভগবানের প্রত্যাদেশ ? না পরানুকরণের চরম পরাকাষ্ঠা, বিদেশের ইতিহাসঅর্জ্জিত একটা বাহ্যিক জ্ঞান ? আবেগের তাড়নায় মানুষী বুদ্ধির প্রেরণায় ভারতবর্ষের কোন কল্যাণই সম্ভবপর হইবে না ইহা ধ্রুব সত্য ।

ভারতবর্ষের মঙ্গল উদ্দেশ্যে যে প্রবল স্রোতঃ দেশের মধ্যে প্রবাহমান উহা ভারতের নহে, য়ুরোপের দান—তাই তাহা ভারতের উপযোগী নহে । আধুনিক ভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায় বৈদেশিক আন্দোলনের অনুকরণ করিয়া আবার নূতন ভাবে ভারতে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পাইতেছেন তাহার পরিণামও ভবিষ্যতে শুভ হইবে না । ভারতের কি রাজনীতি কি সমাজনীতি কি বাণিজ্যনীতি সমস্তই এক সনাতন ধর্ম্ম স্রোতের অনুগত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে ।

শিক্ষিত ভারতবাসীর নিকট ইহা একটা প্রহেলিকা-স্বরূপ । কিন্তু ইহা সত্য । আজ ভারতবাসী অন্তর্দৃষ্টি হারা হইয়াছে তাই তাহারা আমাদের প্রাচীন ঋষিদিগের গভীর জ্ঞান আয়ত্ত করিতে অসমর্থ—তাহাদের নিকট য়ুরোপের জ্ঞান, য়ুরোপের আদর্শ, য়ুরোপের ইতিহাস বোধগম্য কিন্তু ভারতের অতলস্পর্শী চিন্তা ধারা দুর্জ্ঞেয় রহস্য পূর্ণ । য়ুরোপের সবটাই যেন সত্য, আর ভারতের যাহা কিছু, উপমাত্মক রূপক গল্প মাত্র । হায় পাশ্চাত্য শিক্ষায় ভারতবাসীর কি শোচনীয় অধঃপতন । আজ ভারতের প্রাচীন তত্ত্ব ভারতবর্ষকে বুঝাইতে হইলে য়ুরোপীয় ভাবেই পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে হয়—ইহা অপেক্ষা আমাদের অধিক দুর্গতি আর কি হইতে পারে ?

কিন্তু জগতের প্রতি কার্য্যে একটা প্রতিক্রিয়া আছে । ভারতবর্ষও তাহার নষ্ট ঐশ্বর্য্য পুনরুদ্ধার মানসে জাগিয়া উঠিতেছে । এই জাগরণ এত দ্রুত বেগে ঘটিতেছে, এত স্পষ্ট ভাবে হইতেছে যে পৃথিবীর সকল জাতির দৃষ্টিই সে দিকে পড়িয়াছে । ভারতের এই জাগরণের পশ্চাতে সুনিপুণ অদৃশ্য হস্ত কর্ম্ম করিতেছে, উহা স্বয়ং ভগবানের । ভারতবর্ষ ত একটা নুতন জাতি নয়—ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের মত উলঙ্গ শিশুর মত সে ত প্রকৃতির কুক্ষি হইতে এই নুতন বাহির হইতেছে না । ভারতবর্ষের সেই প্রাচীন সভ্যতা, জগতে যাহার তুলনা নাই—সেই অনন্ত জীবনীশক্তি, যাহা প্রলয়কালেও ধ্বংস হইবার নহে—সেই পুরাতন ভারতবর্ষ ভিন্ন ভিন্ন বৈদেশিক জাতিগণের সংস্রবে আসিয়া অভাবনীয় শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে । ভারতবর্ষ

জাগিতেছে বটে কিন্তু তাহার জাগরণ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই।

ভারতবর্ষ, এখনও আপনাকে জানে নাই, অন্ধের মত সে আপনার বিরাট অঙ্গে হস্ত সঞ্চালন করিতেছে মাত্র। সে যে কত বড়, কত মহান্, কত শক্তিধর তাহা তাহার প্রকৃষ্ট জ্ঞান গোচর হয় নাই। গভীরভাবে এই তত্ত্ব তাহাকে আয়ত্ত করিতে হইবে। যেদিন আমরা আমাদিগকে প্রকৃতরূপে চিনিতে পারিব যেদিন আমরা বুঝিব এবং জানিব আর সেই বুঝা ও জানার ভিত্তি অটল হইবে যে আমরা কে ছিলাম, কি ছিলাম, কি করিব, কি করিতে পারি— যেদিন আমরা আমাদের প্রকৃত পরিচয় পাইব, আমাদের অতীত জীবনের উদ্দেশ্য কি বুঝিতে পারিব, আমাদের ইতিহাস আমাদের ভবিষ্যৎ স্পষ্ট দিবালোকের মত আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হইবে— সেই দিনই বুঝিব ভারতবর্ষের জাগরণ সম্পূর্ণ হইয়াছে— সেই দিনই ভারতবর্ষ সমগ্র জগতের উপদেষ্টা শিক্ষক গুরুরূপে জগৎ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছে। ভারতবর্ষের এই আত্মপরিচয় সর্ব্বাগ্রে লাভ করিতে হইবে—বেদান্তই হউক স্থফি মতই হউক —মন্দির অথবা মসজিদ্—নানক কবির রামদাস চৈতন্য গুরুগোবিন্দ— ব্রাহ্মণ কায়স্থ নমশূদ্র প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিচিত্র বিকাশের সম্যক জ্ঞান লাভ করা চাই এবং প্রত্যেকটির যথাযোগ্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া ভারতের প্রাণ শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে। তাহার পর ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যান্য দেশকেও জানিয়া এবং তাহাদের সহিত আমাদের সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞান ভারতবর্ষকে আয়ত্ত করিতে হইবে। পরন্তু আত্মজ্ঞানের উপরেই অপরাপর জ্ঞানগুলি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে।

মহাবাক্য সংগ্রহ

উপক্রমণিকা

জ্ঞান প্রশস্তি

[৭]

২৭ কিন্তু কোথায় পাইব জ্ঞানের সাক্ষাৎ? কোথায় বা
২৮ বিবেকের অধিষ্ঠান?— মশালের আলোক অন্ধকার গৃহের সকল

পদার্থকে যেমন জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলে, জ্ঞানের আলোকও ঠিক
তেমনি যে কেহ জ্ঞানের দিকে চাহে তাহাকেই জ্যোতির্ম্ময় করিয়া
২৯ তুলে।— জ্ঞানদেবীকে যে ভালবাসে সে সহজেই তাঁহার দেখা পায়,
যে তাঁহাকে অন্বেষণ করে সে তাঁহার সহিত মিলিত হইবেই।—
৩০ জ্ঞান অতি বিরাট অতি মহনীয় সামগ্রী। সকলে তাহার নিকট
আত্মসমর্পণ করিবে ইহাই সে প্রতিনিয়ত চাহিতেছে।

৩১ আমাদের প্রকৃত সত্ত্বাটিকে পাওয়া, তাহাকে সত্যতঃ জানাই
৩২ হইতেছে জ্ঞানীর লক্ষণ।— আমাদের উচ্চতর মহত্তর চিন্তারাজীর মধ্যে
যখন আমরা প্রত্যাবর্ত্তন করি, মানুষ মাত্রেরই যে নৈসর্গিক বৃত্তি
সেই ভবিষ্য দৃষ্টির যখন আনুগত্য স্বীকার করিতে থাকি কেবল তখনই
বুঝিতে পারি জ্ঞান কি কথাটি বলিতেছে।
৩৩ উপদেশ লাভের জন্য আন্তরিক ইচ্ছাই হইতেছে জ্ঞানের আরম্ভ।
একাগ্রমনে পর্য্যবেক্ষণা কর জ্ঞানের ধর্ম্ম কি, তবেই অন্তরে
৩৪ পূর্ণ শুদ্ধির প্রতিষ্ঠা হইবে। — ঐ দেখ জ্ঞানের উৎস। এই জ্ঞান
আহরণ কর। তোমার সকল আহৃত সামগ্রী দিয়া আবার বিবেক
লাভ কর। জ্ঞানদেবীকে মহনীয় করিয়া তোল, তিনিও তোমাকে
সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবেন। তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধর তিনি তোমাকে
বহু মানে মণ্ডিত করিয়া দিবেন। তোমার শিরে দিব্য অলঙ্কার
তিনি পরাইয়া দিবেন, বিজয়মুকুট খানিই তোমাকে ধরিয়া দিবেন।
৩৫ —দিব্য রাজ পরিচ্ছদবৎ জ্ঞান তোমার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া রহিবে,
৩৬ তুমি তাহাকে আনন্দঘন মুকুটরূপে মস্তকে স্থাপন করিবে।—জ্ঞান-
দেবীকে ডাকিয়া বল তুমি আমার ভগিনী, বিবেককে তোমার
৩৭ পরমাত্মীয় বলিয়া গ্রহণ কর।—জ্ঞান তবে তোমার হৃদয়ে প্রবেশ
পথ পাইবে, জ্ঞানলাভেই হইবে তোমার আত্মার তুষ্টি

* * *

৩৮ এই সকল কথা চিন্তা করিলাম, ইহাদিগকে হৃদয়ে ধারণ করিলাম।
তারপর দেখিলাম জ্ঞানদেবীর সহিত মিলিত হইলেই আমি অমৃতত্ব লাভ
করিব। তাঁহাকে সঙ্গিনী করিয়া লইব এই মানসে তখন চারিদিকে
৩৯ তাঁহার অন্বেষণে ছুটিলাম। — আমি রাজ্য রাজসিংহাসন ছাড়িয়া
জ্ঞানকেই চাহিয়াছি। আমি বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি জ্ঞানের তুল-

৪০ নায় ধনরত্ন কিছুই নয়। জ্ঞানই যে মানুষের অক্ষয় ধন। — যত কর্ম্মে আমি হস্তক্ষেপ করিয়াছি, যত প্রয়াসে আমি প্রয়াসী হইয়াছি সে সকলেরই প্রতি চাহিয়া দেখিলাম। সে যে কেবলি শূন্য কেবলি বাতাসের পশ্চাতে ছুটিয়া চলা, বিশ্বে আমার এতটুকুও লাভ কিছু হয় নাই। তখন আপনাকে ফিরাইলাম, বুঝিতে চাহিলাম সুবুদ্ধি সুমতি কি আর উন্মত্ততা ও নির্ব্বুদ্ধিতাই বা কি……তখন দেখিলাম অন্ধকার হইতে আলোক যতখানি গরীয়ান নির্ব্বুদ্ধিতা হইতে সুবুদ্ধি ততখানিই গরীয়ান।

৪১ নিগূঢ় ছিল যাহা, যাহা কেহ আবিষ্কার করিয়া উঠিতে পারে নাই আমি তাহা শিখিয়াছি। কারণ সকল জিনিষের যে সৃষ্টিকর্ত্তা সেই জ্ঞান স্বয়ং আমাকে দিয়াছে। জ্ঞানের মধ্যে এমন একটি জাগ্রত শক্তি রহিয়াছে যাহা বিশুদ্ধ, এক অদ্বিতীয় অথচ কার্য্যতঃ বহুরূপ, অলক্ষচারী অথচ বিপুল, কমনীয়, রমণীয়, অনবদ্যাঙ্গ, পরম প্রিয়। সজ্জনের সে মিত্র, সকল জিনিষের অন্তর ভেদ করিয়া সে চলিয়াছে, তাহার কর্ম্মে বাধা দিবে এমন কিছুই নাই। কল্যাণময়, মানুষের সহায়, প্রীতিপূর্ণ, ধীর, স্থির, অব্যর্থ, সকল সিদ্ধি তাহার, সর্ব্বতোদৃষ্টি তাহার, বিশ্বের মনকেই নিজের মধ্যে ধারণ করিয়া আছে। তাহা বুদ্ধ, তাহা শুদ্ধ, তাহা সূক্ষ্ম।

৪২ সনাতন জ্ঞানের কাজ গড়িয়া তোলা। সে যখন আমার মধ্যে সুখপ্রতিষ্ঠ, আমি যখন তাহার মধ্যে সুখপ্রতিষ্ঠ, তখনই আমি তাহার রাজপ্রাসাদস্বরূপ হইয়া উঠিব।

---

২৭) জোব। — ২৮) তো-যু-হিং-ৎসান-কিং। — ২৯) জ্ঞান-কথা। — ৩০) সেনেকা। — ৩১) পরফিরি। — ৩২) এমার্সন। — ৩৩) জ্ঞান-কথা। — ৩৪) প্রবচনসংগ্রহ। — ৩৫) এক্লেসিয়াষ্টিক। — ৩৬) প্রবচনসংগ্রহ। — ৩৭) ঐ। — ৩৮) জ্ঞান-কথা। — ৩৯) ঐ। — ৪০) এক্লেসিয়াষ্টিক। — ৪১) জ্ঞান-কথা। — ৪২) আঞ্জেল সিলেসিউ (Angelus Silesius).

ত্যাগের কথা

(২)

অর্জ্জুন যখন যুদ্ধ করতে চাইছিলেন না, ভগবান তখন তাঁকে বলেছিলেন—

মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয়—

আমার যেন মনে হয় আমরা ত্যাগধর্ম্মকে আলিঙ্গন করে ধীরে ধীরে আমাদের জীবন-সংগ্রামে ক্লীবতাকেই আশ্রয় করেছি। প্রথম যে মহাপুরুষ এই ত্যাগধর্ম্মের প্রচার করেন তিনি এই মন্ত্রের মধ্যে যে শক্তি চালিত করেছিলেন সে শক্তি কালবশে হীন হবারই কথা। তাই এখন সে মন্ত্র আর নেই — শুধু আছে তার শব্দ এবং রূপ। তাই এখন এ মন্ত্র দেশবাসীকে প্রকৃতপক্ষে উদ্বোধিত না ক'রে শুধু তাদেকে একটা আলস্যের এবং ঔদাসিন্যের খোলসই পরিয়ে দিয়ে যায়। আর এই আলস্য ও ঔদাসিন্যকে আশ্রয় ক'রে ক্লীবতা আমাদের মধ্যে ধীরে ধীরে মাথা তুলেছে। আমাদের না চাওয়াটা, যেটা আগে সত্য ক'রে না চাওয়া ছিল এখন সেটা "পাইনে বলে চাইনে" হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ স্রোত ত ফিরাতে হবে — এত প্রকৃত মোক্ষ নয়, এযে বিরাট অক্ষমতা — এত মুক্তি নয়, এযে মৃত্যু। যে স্রোতে আমরা ভেসে চলেছি সে স্রোত থেকে বাঁচ্‌তে হলে ত তার বিপরীত দিকেই দাঁড় টান্‌তে হবে। তাই আমরা আজ নিবৃত্তিমার্গকে ত্যাগ করে প্রবৃত্তিমার্গকে বরণ করে নেব।

যদি কেউ আমাদেকে আজ জিজ্ঞেস করেন যে, তোমাদের এ পন্থা পরিবর্ত্তনের ভেতরের কারণটা কি? — তবে আমরা বল্‌ব যে — আমরা আজ মানুষকে নতুন ভাবে দেখ্‌তে শিক্ষা করেছি, মানুষের এক নতুন সার্থকতা খুঁজে পেয়েছি। সে সার্থকতাটা — মানুষের বাহুতে যে বল রয়েছে, প্রাণে প্রাণে যে পুলক রয়েছে, হৃদয়ে হৃদয়ে যে স্পন্দন রয়েছে, মনে মনে যে আশা আকাঙ্খা রয়েছে, মর্ম্মে মর্ম্মে যে স্বপ্ন রয়েছে—তার অর্থে অর্থে পূর্ণ। সে সার্থকতা হচ্ছে — মানুষের মানুষত্বের বিলোপ সাধন করে জীবাত্মাকে ব্রহ্মপদে লীন করে না দিয়ে — এ আনন্দময় জগত জুড়ে শ্রীকৃষ্ণের যে বাঁশী বাজ্‌ছে সেই বাঁশীর তালে তালে নৃত্য করা। এ জগতকে

আমরা দুঃখময় বলেই জানি না। মানুষের সমস্ত জীবনের মধ্যে, তার প্রবৃত্তির খেলার মধ্যে একটা নিগূঢ় সন্ধান আমরা পেয়েছি — সেটা স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, ফাঁকি কথা নয় — কারণ তারও প্রতিষ্ঠা হচ্ছে চিদ্‌ঘন আনন্দেরই ওপরে। আমরা আজ মানুষের অধ্যাত্ম ও অধিভূতের মধ্যে এক নিগূঢ় রহস্যময় সম্বন্ধ খুঁজে পেয়েছি — বুঝেছি এরা মানুষের জীবনে পরস্পর বিরোধী নয়—পক্ষান্তরে এরা পরস্পর পরস্পরকে পূর্ণ করেই চলেছে—এদের একের তৃপ্তিতে অপরের তৃপ্তি, একের সন্তোষে অপরের সন্তোষ, একের আনন্দে অপরের আনন্দ — অধ্যাত্মে এবং অধিভূতে সমান ভাবে ভগবান বিরাজ কচ্ছেন, সমান ভাবে তাঁর লীলা প্রকট হয়ে আছে। আমরা এই মানুষ মানব ফুলটাকে সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত করে তার সমস্ত গুণরাশিকে বিকশিত করে তাকে তার সমস্ত মহিমায় সমস্ত ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত করে ভগবানের শ্রীচরণে উৎসর্গ করে দিতে চাই। এটাই আমাদের ভিতরের কথা। আর সেটা হতে পারে শুধুই প্রবৃত্তিমার্গের ভিতর দিয়ে।

অনেকের একটা মস্ত ভুল ধারণা আছে যে প্রবৃত্তিমার্গটা নিবৃত্তিমার্গ চাইতে অমঙ্গলময় এবং বিপদসঙ্কুল। আসল কথা হচ্ছে এই সৃষ্টিতে এমন কোন জিনিষ নেই যা অমঙ্গলময়। আবার এমন কোন জিনিষ নেই যাকে আশ্রয় করে অমঙ্গল জন্মলাভ কর্‌তে না পারে। সবই মানুষের বুঝ্‌বার দোষে, আপনাকে চালাবার দোষে। স্ত্রীলোকের রূপরজ্জু গলায় বেঁধে যদি পুরুষ আত্মহত্যা করে তবে স্ত্রীলোককে সংসার থেকে উচ্ছেদ কল্লে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। প্রবৃত্তির পথটা যদি বিপদসঙ্কুল হয় তবে নিবৃত্তির পথটাতেও কম বিপদ নেই। তবে যে প্রবৃত্তিটাই আমাদের বদ্‌নাম গায়ে জড়িয়ে সংসারে হেয় হয়ে আছে তার কারণ এই হচ্ছে যে, প্রবৃত্তির খারাপ ফলটাকে আমরা চর্ম্মচোখ দিয়ে যতটা দেখি, ততটা নিবৃত্তির খারাপ ফলটাকে দেখ্‌তে পাইনে। কারণ প্রবৃত্তির খারাপ ফলটা বাইরে ফুটে ওঠে আর নিবৃত্তির ফলটা ভিতরে জন্মাতে থাকে। আর আমাদের মধ্যে ক'জনা ভিতরের খবর রাখ্‌তে পারে? যেমন প্রবৃত্তির বিপদ হচ্ছে মানুষকে ধীরে ধীরে রাজসিকতায় বাড়িয়ে বাড়িয়ে তাকে দানবত্বে, অসুরত্বে স্থাপিত করা, তেমনি নিবৃত্তির বিপদ হচ্ছে মানুষকে ধীরে ধীরে সাত্ত্বিক না করে তুলে, তামসিকতার দিকে নিয়ে গিয়ে তাকে জড়ত্বে পূর্ণ করা। কারণ সাত্ত্বিকতা আর তামসিকতায় এমনি চেহারা

যে বাহির থেকে তাদেকে প্রায় এক বলেই বোধ হয়। আমার মনে হয় আমাদের দেশবাসী এই দ্বিতীয় অবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল।

তবে যদি কেউ আমাকে জড় এবং দানবের মধ্যে তুলনা কর্‌তে বলেন —তবে আমি নিঃসন্দেহে বল্‌ব যে দানবই শ্রেষ্ঠতর। কারণ জড় যে সে কাউকেই আপনার বলে জানে না কিন্তু দানব যে সে সমস্ত বিশ্বকে না হোক্ অন্ততঃ তার দেশটাকে আপনার বলে জানে। আর বিশেষতঃ দানব যে তাকে পরিবর্ত্তন করা চল্‌তে পারে, কিন্তু জড়ের নড়া চড়া পর্য্যন্ত নেই — দানবকে দেবতা করে তোলা সম্ভব হতে পারে কিন্তু জড় যে তাকে জন্ম জন্ম তপস্যা কর্‌তে হবে জীব হবার জন্য — তখনই তার সম্বন্ধে কোন কথা কওয়া চল্‌বে। প্রকৃত কথা হচ্ছে যে প্রবৃত্তিই হোক্ আর নিবৃত্তিই হোক্ অজ্ঞানতার সঙ্গে এ দুটোর যে কোনটার মিলন হলে তা ভয়াবহ হয়ে উঠে। তবে অজ্ঞানতাপূর্ণ নিবৃত্তি চাইতে অজ্ঞানতাময় প্রবৃত্তি অনেক ভাল।

আজ যে মহাকালীর তাণ্ডব নৃত্য ইয়োরোপের আকাশে বজ্র শিখা ছড়াচ্ছে তা'তে আমাদের মধ্যে অনেকের হৃদয়-তলের রক্তরাশি হিম হয়ে গিয়েছে। তাঁরা সভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করে শিউরে শিউরে উঠ্‌ছেন আর ইয়োরোপের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বল্‌ছেন "দেখ দেখ ভোগের কি ভীষণ পরিণাম। কি ভীষণ ওদের মৃত্যুকে আলিঙ্গন" কিন্তু যাঁরা ত্যাগকেই পরম মন্ত্র বলে, বরণ করে নিয়েছেন, — যাঁরা এ জগত নশ্বর নশ্বর বলে দিবা-নিশি জপ কচ্ছেন তাঁরা যে মানুষের মরণটাকেই মানুষের জীবনের চরম দুর্ঘটনা বলে মনে করেন কেন — সেটা একটু আশ্চর্য্যেরই কথা — এবং একটু ভেবে দেখ্‌বারও কথা বটে। কারণ এটা মান্‌তেই হবে যে যারা এ যুদ্ধে যাচ্ছে তারা অন্ততঃ কেউ ব্যক্তিগত লাভের আশায় প্রাণপণ করে নি কারণ তারা সকলেই জানে যে এ যুদ্ধে ফিরে আসার চাইতে মরণের সম্ভাবনা-টাই অথবা তা থেকেও বিশ্রী ব্যাপার দু'এক খানি অঙ্গহানির সম্ভাবনাই বেশী। আর যাঁরা যুদ্ধকে ভোগের স্বাভাবিক পরিণতি বলে নির্দ্দেশ করেন তাঁরা ভুলে যান যে ত্যাগের, প্রেমের, দয়ার অবতার ভগবান্ ঈশার জন্য যত যুদ্ধ হয়েছে, লোক হত্যা হয়েছে, অত্যাচার হয়েছে আর কোন কারণে তত হয়েছে কিনা সন্দেহ। আসল কথা যুদ্ধ জিনিষটা বিশ্বমানবেরই একটা ব্যাধি —যদি ব্যাধি বলেই একে ধরা যায়। অবশ্য এ সম্বন্ধে ভিন্ন মতও থাকতে পারে।

কিন্তু যাঁরা ইয়োরোপের এই হতাহতের সংখ্যা গণনা করে আজ এতটা শিউরে উঠ্ছেন তাঁরা আমাদের দেশে বছর বছর লক্ষ লক্ষ লোক যে দুর্ভিক্ষ ম্যালেরিয়া প্রভৃতিতে অসহায়ভাবে অদৃষ্টকে দোষ দিতে দিতে মরে যাচ্ছে তাতে ততটা শিউরে ওঠেননা, আদবে শিউরে ওঠেন কিনা সন্দেহ। তার কারণ হচ্ছে এই যে কামানের গোলাগুলি, সঙ্গীনের খোঁচা খুঁচি প্রভৃতি যুদ্ধের উপকরণ গুলো আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়ের ওপর একটা অসচ্ছন্দতা-পূর্ণ ভাব সৃষ্টি করে যায় যাতে করে আমাদের মন একটা বেদনাময় ধাক্কা পেয়ে যায়। গভীর নিশীথে শান্তিময় নিদ্রার ক্রোড়ে সুষুপ্ত নরনারীর ওপর জেপেলিন থেকে বোম্ ছোঁড়া, জলন্ত গুলি একটা বুক দিয়ে ঢুকে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া, তক্ তক্ কচ্ছে একটা সঙ্গীন, সেটা একটা জীবন্ত মানুষের পেটের মধ্যে চন্ চন করে ঢুকে যাওয়া এ সমস্ত আমাদের Sense-planeএ এমন একটা বিভীষিকাময় ভীতির সৃষ্টি করে যায় যে তাতে আমরা এসব মানস চোখে দেখেও শিউরে উঠি। কিন্তু ঐ যে দুর্ভিক্ষে কিম্বা ম্যালেরিয়াতে মরে যাওয়া—যাতে যেমনকার দেহ তেমনি থাকে, হাত পা চোখ কাণ সব ঠিক ঠিক—কিন্তু যাতে করে মানুষের মনুষ্যত্বকে পলে পলে তিলে তিলে চুষে চুষে চিবিয়ে চিবিয়ে মানুষের ভিতর থেকে বের করে দিয়ে অবশেষে তাকে মরণের বিস্মৃতীময় ক্রোড় দেখিয়ে দেয় তাতে আমরা ততটা ভয় বোধ করি না। কারণ ভিতরের কথা তলিয়ে বুঝ্তে চায়, দেখ্তে চায়। কারণ একটা মৃত্যু কোলাহলময় শোধিতাক্ত কলেবর—রাজসিক; আর একটা মৃত্যু নীরব, নিস্পন্দ, জড়ের মত — তামসিক। আমাদের অস্ত্রধারণ কর্তে হবে এই তমের বিরুদ্ধে। আর তমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে হলে রজঃকে আশ্রয় কর্তেই হবে। কারণ সত্ত্বের aggressiveness নেই।

পূর্ণ-যোগ

৫

মার্গত্রয়ী — ভক্তিযোগ

জ্ঞানযোগ মানুষকে তাহার মস্তিষ্ক, তাহার বুদ্ধিবৃত্তি, সত্যকে জানিবার প্রেরণার মধ্য দিয়া সমুন্নত অধ্যাত্ম সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছে। ভক্তিযোগ লইয়াছে মানুষের হৃদয়, ভালবাসিবার বৃত্তি, সুন্দরের প্রতি আসক্তি। জ্ঞানযোগীর লক্ষ্য ব্রহ্ম, তুরীয় চৈতন্য। ভক্তের লক্ষ্য ভগবান, তুরীয় আনন্দ। জ্ঞানীর পন্থা আত্মোপলব্ধি, আপন স্বরূপকে, সত্যসত্তাকে জানা, চেনা, নিজের "আমিটিই" হওয়া। ভক্তের পন্থা আত্মসমর্পণ, প্রপত্তি—"আমি"কে "তুমি"র হাতে ধরিয়া দেওয়া, "আমার" মধ্যে "তোমাকে" মিলাইয়া আনন্দে তৃপ্তিতে ভরপুর হইয়া উঠা। ভক্ত বলেন প্রেমতৃষ্ণা অপেক্ষা মানুষের মধ্যে প্রবলতর বৃত্তি নাই। মানুষ চিন্তা করে মানুষ কর্ম্ম করে কিন্তু সে সকল যেন বাহিরের অঙ্গমাত্র। হৃদয়ই তাহার কেন্দ্রস্থল, হৃদয় দ্বারাই মানুষ প্রকৃতপক্ষে পরিচালিত। মানুষকে পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে, বৃহত্তর সত্তার সহিত তাহাকে পরিচিত করাইতে হইলে এই ভালবাসার টানের মধ্য দিয়া করাই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও আশু ফলপ্রদ। মানুষ ভালবাসিতে চায় মানুষকে, মানুষের স্থলে স্থাপন কর ভগবান—ভালবাসার পাত্রটি শুধু পরিবর্ত্তন কর, দেখিবে মানুষ কেমন কত শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে। মানুষ খুঁজিতেছে ভালবাসার পূর্ণ তৃপ্তি—কেবল মানুষে তাহা সম্ভব কোথায়? কিন্তু ভগবান যে পূর্ণ প্রেম, অখণ্ড ভোগমূর্ত্তি, পরম সুন্দর। ভগবানকে এই ভাবে দেখিয়া, নিজেরই অন্তরের সমস্ত ভালবাসার নিগূঢ়ে রহিয়াছে যে রসরাজ তাঁহাতেই একান্তচিত্ত হইয়া ডুবিয়া যাও। ঈশ্বরে পরানুরক্তি ইহাই সব সাধনার মূল কথা। এই অনুরাগ যাহার হইয়াছে তাহার চিত্তশুদ্ধিও হইয়াছে, তাহার মুক্তিলাভও হইয়াছে।

ভক্তিযোগ ভগবানকে মানুষের অতি গোচর অতি আপনার করিয়া

ধরিয়া দিয়াছে। মানুষ চায় নিজেরই অনুরূপ সামগ্রী কিছু; নিজের মতনই যাহা যতখানি তাহার সহিত ঠিক ততখানিই সে মিলিত হইতে পারে। ভক্তিযোগে মানুষ তাহার সেই অতীন্দ্রিয় বা তুরীয়, সেই মহত্তর বৃহত্তর আদর্শটি হইতে আর সুদূরস্থলিত বলিয়া আপনাকে বোধ করে না। কারণ ভক্তিযোগ মানুষকে খুব মানুষভাবেই দেখিয়া তবে তাহার সাধন-প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছে। নানা সম্বন্ধের বন্ধনে আপনাকে জড়াইয়া মানুষ এই জগতে—নানা ভালবাসার পাত্রে আপনার হৃদয়-ধারা ঢালিয়া দিতেছে। পুত্রের প্রতি, বন্ধুর প্রতি, প্রণয়ী বা প্রণয়িনীর প্রতি এইরূপ ভালবাসার নানা সম্বন্ধ সে পাতিয়াছে। ভক্তিযোগ বলিতেছেন ভগবানকেও এইরূপ যে কোন ভাবে তুমি পাইতে পার। তিনি একটা অদ্ভুত বা অনধিগম্য পদার্থ কিছু নহেন। তিনিই "পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াঃ। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর প্রেমরসের এই পঞ্চধা ভাব। এই সকল ভাবই হৃদয়ে রাখ। এবং যে ভাবেই তুমি ভরপুর থাক না কেন মানুষের দিক হইতে ফিরাইয়া কেবল তাহাকে ভগবানের চারিদিকে ফুটাইয়া তোল। ভক্তবীর হনুমান, অর্জ্জুন, যশোদাদেবী, শ্রীরাধা এইরূপ এক এক ভাবের মধ্য দিয়া ভগবানকে পাইয়াছিলেন।

কিন্তু ভক্তিমার্গ আবার এ কথাও বলিযাছেন যে শুধু অনুকূল ভাবে নয় প্রতিকূল ভাবেও, শুধু মিত্রভাবে নয় শত্রুভাবেও ভগবানের সাধনা করা যাইতে পারে, ভগবানকে পাওয়া যাইতে পারে। কোন জিনিষ অধিকার করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন তাহার সহিত একটা ঘনিষ্ঠ অতি তীব্র সম্বন্ধ স্থাপন করা। মিত্রভাবের ন্যায় শত্রুভাবও এইরূপ একটা তীব্র সম্বন্ধ। মিত্র যেমন আমাদের কাছে পরিস্ফুট, গোচর শত্রুও ঠিক তেমনি পরিস্ফুট, গোচর, তাহার অস্তিত্ব আমাদের অন্তরে তেমনি জাজ্বল্যমান। ভগবানকেও এইরূপ শত্রুভাবে দেখিয়া, তাঁহার সহিত পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে। এমন কি মিত্রভাব অপেক্ষা, শত্রুভাব অনেক সময়ে সাধকের পক্ষে আশু ফলপ্রদ। কারণ শত্রুভাবের মধ্যে আমাদের অন্তরের যত অশুদ্ধতা, বিকৃতি চারিদিকে ছড়াইয়া লুকাইয়া রহিয়াছে তাহা সব একত্রিত একমুখী বিপুল হইয়া উঠে। এবং যখন এই বিরাট স্তূপটি ভগবানের বিরুদ্ধে নিক্ষিপ্ত হয়—তখন তিনি একযোগে একটি আঘাতে সে সমস্তখানি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিবার সুবিধা পান। মিত্রভাবে কিন্তু ভগবানকে সাধকের প্রতি অল্প

হইতে অবিরাম খুঁটিয়া খুঁটিয়া তবে দোষগুলি দূর করিতে হয় এবং ইহা সময় সাপেক্ষ। সেই জন্যই বোধ হয় কথিত আছে মিত্রভাবে মুক্তি সাত-জন্মে, শত্রুভাবে মুক্তি তিন জন্মে মাত্র। বিদ্বেষ প্রণয়েরই উল্টা দিক। ঘোর বিদ্বেষকে প্রণয়ে সহজেই পরিণত করা যায়। কিন্তু উদাসীনতা যেখানে সেখানে এই প্রিয় সম্বন্ধ স্থাপন করা দুরূহ।

ভগবান্ শুধু অতীন্দ্রিয় অদেহী সচ্চিদানন্দ নহেন। জগতের স্থূলরূপ মানুষের ইন্দ্রিয়াদির খেলার মধ্যে ভগবানেরই আনন্দ স্বরূপ মূর্ত্ত হইয়া ধরা দিয়াছে। ভক্তিযোগের ইহাই মূলতত্ত্ব। জগতের যাবতীয় ভোগ্য বস্তু, সে সকলকে ভোগ করিবার যন্ত্রস্বরূপ যাবতীয় ইন্দ্রিয় এবং সকলের প্রতিষ্ঠান এই দেহ এই জগৎ—সবই সত্য ও নিত্য। ইহাদের প্রত্যেকের একটি সত্যসত্তা আছে, ইহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা সত্য সম্বন্ধ আছে। তাহার পূর্ণ প্রতিকৃতি যেখানে তাহাই ভগবান। স্থূলের যত প্রকাশ যত বিভব সবই ভগবানের মধ্যে আছে এবং সম্পূর্ণভাবেই আছে। আছে বলিয়াই বাহিরে তাহাদের এই বিকাশ। ভগবান তাই সকল ঐশ্বর্য্য সকল বীর্য্য সকল শ্রীর আধার—তাঁহাতেই সকল "ভগ," তাঁহাতেই সকল ভোগ, সকল রস, সকল আনন্দ। স্থূল বস্তুর স্থূল বিকাশের মধ্যে রহিয়াছে যে ভাগবত বস্তু ভাগবত বিকাশ তাহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা তাহার রসে মজিয়া যাওয়াই ভক্তের লীলা।

ভক্ত জগৎকে অস্বীকার করেন না, জগৎকে তিনি ভগবানেরই নিগূঢ় লীলার বাহ্যমূর্ত্তি, ভগবানেরই রাসলীলার স্থূল আশ্রয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া দেখেন। কিন্তু এই জগতের সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ তাহা সাক্ষী অথবা উদাসীন রসগ্রাহকের সম্বন্ধ মাত্র। ভাগবত আনন্দে তিনি গা ঢালিয়া দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু ভাগবত তপঃশক্তি মানুষকে শুধু (passive) ভোক্তা নয়, (active) কর্ত্তা হইতে নিযুক্ত করিতেছে তাহা তিনি অনুভব করেন না। ভক্ত জগতে যাহা যেমন আছে বা হয় তাহাতেই সমরসাত্মক এক বিপুল আনন্দের ঘোরে মগ্ন। এই আনন্দের খেলারও যে একটা বিশেষ লক্ষ্য, বিশেষ গতি, বিশেষ প্রণালী আছে মানুষ প্রজ্ঞার দ্বারা তাহা অন্তরে উপলব্ধি করিবে, কর্ম্মের দ্বারা ইহাকে বিরাট করিয়া তুলিবে—তাহার প্রতি তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। জগৎ তাঁহার চক্ষে তাই অর্দ্ধস্ফুট, ভাবের কুয়াসায় আবৃত, উহা জাগ্রত বস্তুতন্ত্র হইয়া উঠিতে পারে না।

ভাব প্রবণতায় সহজ মাদকতার নেশায় মজিয়া ভক্তির সাধক সাধারণ জগৎ হইতে ক্রমে দূরে সরিয়া পড়েন। ভক্তিমার্গের ইহাই অভাব।

ভগবানের সহিত জ্ঞানীর সম্বন্ধ একেবারে অতীন্দ্রিয়ে, সৃষ্টির বাহিরে। ভক্ত সেই সম্বন্ধটিকে স্থূলতর মানুষের নিকটতর করিয়া দেখিয়াছেন। সৃষ্টির ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভক্তিমার্গের ইহাই বিশিষ্টতা। জগৎ লইয়া, মনুষ্যজাতি লইয়া যে সিদ্ধ জীবন, যে দিব্য সাম্রাজ্য তাহার একমাত্র প্রতিষ্ঠা হইতে পারে এই প্রেম, ভাগবত প্রেম। মানুষে মানুষে, শুধু মানুষে মানুষে কেন, মানুষে ও সৃষ্টপদার্থ মাত্রেরই মধ্যে যে একটা আনন্দের, সামঞ্জস্যের, মিলনের সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে, সে মিলনের খেলার সম্ভাবনা দেখাইয়াছে ভক্তিমার্গ। ভক্তিমার্গ আরও বলিতেছে, মানুষের যে রূপতৃষ্ণা, ভোগবাসনা, ইন্দ্রিয় পরিচালিত জীবন তাহার মধ্যে ভগবানেরই ভোগেচ্ছা লুক্কায়িত, তাঁহারই আনন্দ স্ফুরিত। তাই এ সকলকে ছাড়িয়া দিয়া নয়, কিন্তু ইহাদিগকে ভগবানের মধ্যে শুদ্ধ ও পরিপূর্ণ করিয়া লইয়াই দিব্যজীবন পাওয়া যাইতে পারে।

পাগলের চিঠি

ভায়া! এবার অনেক দিন আর আমার খোঁজ খবর নাওনি—ব্যাপার কি? আমার এই পত্রখানা তোমাদের প্রবর্ত্তকে ছাপাবে কি? আজ বাংলার চতুর্দ্দিকে একটা হাহাকার উঠেছে, অন্নাভাব, জলকষ্ট. মহামারি, এগুলিত বাংলার গা সওয়া হয়ে গেছে—আবার ঘরে ঘরে এক নূতন আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে, গোয়েন্দা পুলিশ কখন তাদের মাথাধরা ছেলেগুলোকে কোম্পানির অতিথিশালায় আবদ্ধ করে রাখে। জায়গায় জায়গায় এটাও গা সওয়া হয়ে উঠ্‌লো। এই মহামারীর যুগে যমের মুখে জুয়ান ছেলে যেমন ধরে দিতে লোকের আর তেমন কষ্ট হয়না, কেননা তারা বলে বেঁচে আছি এই আশ্চর্য্য! তেমনি এই ধর পাকড়ে লোকের আর তেমন উৎকণ্ঠা দেখি না; এই যে প্রায় হাজার ছেলে আটক পড়েছে তাদের কথা কেউ ভাবে কি? যাক্ "কেউ কারু নয় দেখ্‌না চেয়ে কবে ফুট্‌বে আঁখি"—যে যার সে

যায়—শর্ম্মারামের তাতে বিশেষ কিছু এসে যায়না। এই ঘোর যুদ্ধের সময় কোম্পানি রাজ্যে শান্তি রক্ষা করতে এমন দু দশ হাজার ছুট্‌ছেলে আটক করে রাখুক তাতে দেশের বিশেষ ক্ষতি নেই, — গঙ্গার জল দু দশ ভার তুলে নিলে, যেমন গঙ্গা তেমনিই থাকে। এখন কথা হচ্ছে মানুষের মধ্যে যে ভগবদ্ প্রেরণা দেখা দিয়েছে, সেটা ত দারিদ্র্যে, রোগে, পুলিশের ভয়ে মুসড়ে থাক্‌বেনা—তার অবাধ বিকাশ হবেই হবে। এই সুন্দর সত্য পবিত্র ভগবদ বিকাশ কোথায় হচ্ছে তাই দেখ্‌বার জন্য সারা দেশ হাতড়ে বেড়াচ্ছি,—ভায়া, তোমরা এর সন্ধান রাখ কি? না, প্রবর্ত্তকে নূতন নূতন ভাব গুলি লিখে নাকে সর্‌ষের তেল দিয়ে নিরাপদে নিদ্রা যাও।

ঠাকুর তিন রকম আচার্য্যের কথা বলেছিলেন — ধর্ম্মোপদেশ দিয়ে যে আচার্য্য উপদিষ্ট ব্যক্তির আর সন্ধান রাখেনা সে অধম; উপদেশানুসারে কার্য্য করবার জন্য যে আচার্য্য মানুষকে অনুনয় বিনয় করে, যাতে তার উপদেশগুলি ধারণা করতে পারে এর জন্য ভালবাসা দেখায় তারা মধ্যম; আর জোর করে যে আচার্য্য লোকেদের সৎপথে আনায়ন করে, তাকে বলি উত্তম আচার্য্য। এই উত্তম আচার্য্য হতে হলে স্বধর্ম্মের প্রতি অটল অনুরাগ থাকা চাই এবং যে উপদেশ দিচ্ছি, উহা যে সত্য এবং সনাতন এমন দৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই — এবং এই উপদেশেই মানুষের মঙ্গল হবে, মানুষ ধর্ম্মলাভ করবে এমন রোক থাকা চাই — তা না হলে একটা নূতন কিছু করার মত কতকগুলা রাবিশ ছড়িয়ে দেওয়া হবে। তাই বলি ভায়া যা লিখছ তার মত মানুষ কোথায় গজিয়ে উঠ্‌ছে তার সন্ধান রাখ্‌ছ কি?

এইটাই কাজ। নদীতে যখন প্রবল বন্যা আসে, তখন জলের অগ্রভাগটা দেশের আবর্জ্জনা নিয়ে ভেসে আসে, মলামাটী মাখা এই তরঙ্গগুলো দূরে চলে গেলে নদীর স্রোত বিমলিন হয়, তখন সে জল মানুষ পানীয়স্বরূপ ব্যবহার করে, হঠাৎ বাংলায় একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়ে এইরূপ নানা অশুদ্ধ অহিতকর সঙ্ঘের সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু ধর্ম্মের দেশে, প্রেমের রাজ্যে, এটা চিরস্থায়ী হতে পারে না। এ তরঙ্গকে ধরে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ নয়—যখন বান ডেকেছে তখন পেছনে নির্ম্মল জলতরঙ্গ আস্‌বেই এবং এই পবিত্র বারিধারা স্পর্শে বাংলা দেশকে পবিত্র করে তুলতে হবে।

“কাজ হারালি কালের বশে”। যতই দুর্দ্দিন আসুক না, আজ যদি তমগুণের কালো পোষাকে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে ভণ্ড বিটেলের মত অলসে এক মুহূর্ত্ত কাল নষ্ট কর--তোমার পরিণাম শোচনীয় হবে। সৃষ্টি রক্ষার জন্যই ধর্ম্ম, ধর্ম্মও সৃষ্টির মঙ্গল উদ্দেশ্যেই সাধিত হবে, আজ আত্মমুক্তির জন্য যে সাধক চক্ষু মুদ্রিত করে, অরণ্যে পর্ব্বত-কন্দরে ধর্ম্মান্বেষণে ধাবিত হবে তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নাই, আমাদের ঘুরে বেড়াতে হবে সর্ব্বস্ব মাকে উৎসর্গ করে—দরিদ্রের পর্ণ-কুটিরে, অসহায় ব্যাধি-পীড়িত প্রতিবাসীর দ্বারে দ্বারে। মূর্খ নমঃশূদ্র চাষি বাগ্দী ইতর শ্রমজীবীদের দরজায় দরজায় গিয়ে আমাদের প্রেম বিলাতে হবে—আমরা যে অভেদ, আমরা যে একই দেশের জল হাওয়ায় গড়ে উঠেছি, আমাদের সুখ দুঃখ হাসি কান্নার একই কারণ একথা জানাতে হবে। গুরু মশায়ের মত, কলিকাতার পেশাদারী বক্তৃগণের মত এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ কর্‌লে চল্‌বে না—বছরে বছরে কার্য্যের তালিকা প্রস্তুত করে মুদ্রা যন্ত্রের সাহায্যে ছাপিয়ে হাজার হাজার বিলি করে আত্মপ্রসাদ লাভ কর্‌লে চলবে না—এ কর্‌তে হবে নীরবে, তপস্বীর মত, ভক্তের মত, সাধকের মত। আমরা আজকাল যতকিছু কর্‌তে চাই সবের মধ্যে একটা সমিতি (Institution) জ্ঞান থেকে যায়, সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে ক্ষুদ্রত্বের তুচ্ছ সুখ নগদা নগদি আদায় কর্‌তে চাই, এরূপ কর্‌লে চল্‌বে না। যদি ভারতীয় ভাবে স্বজাতির মঙ্গল সাধন কর্‌তে চাও, তবে কর্ত্তৃত্ব অভিমান গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে সেবকের মত কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও। ভগবানের দাস আমি, ভগবানের যন্ত্র আমি, আমার আবার নাম কি? আমার কার্য্যের বাহবাই বা কি? এমনি ভাবে আমাদের বাংলার গ্রামে গ্রামে দাঁড়াতে হবে আজকাল বাপের শ্রাদ্ধ জাঁকজমকে সম্পন্ন করে সংবাদ পত্রে ছাপিয়ে দেওয়া হয়—বল দেখি আমরা কতটুকু হয়ে গেছি? আমরা দু'দশ জনে গ্রামের সামান্য মঙ্গল কার্য্যে অগ্রসর হয়েই তার সভাপতি কে, সম্পাদক কে—এই নিয়ে বাক্ বিতণ্ডা কর্‌তে থাকি। পাশ্চাত্যের কর্ম্ম শৃঙ্খলা আমাদের দেশে ভূতের মত মানুষকে পেয়ে বসেছে। আজ সাহিত্য পরিষদে সভ্য নির্ব্বাচনের জন্য পরস্পর পরস্পরের সহিত কিরূপ চাতুরী কর্‌ছে দেখ্‌লে হাসি পায়—কেবল ভোট, কেবল ভোট—প্রেম নাই, শ্রদ্ধা নাই, বিশ্বাস নাই—দেশের সকল অনুষ্ঠানগুলোই যেন বিলাতের কল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। হে বাংলার নূতন! তোমরা আজ নূতন ভাবেই কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও।

বাংলার নূতন সঙ্ঘের মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে কর্ম্মের বন্ধন দৃঢ় না করে প্রেমের গ্রন্থি দৃঢ় করে তুল্‌তে হবে। মানুষ যে মানুষকে ভালবাসতে পারে কাল প্রভাবে সেটাও এক বিচিত্র ব্যাপার—মানুষ যে মানুষের সঙ্গে আলাপ করে কোন স্বার্থের জন্য নয়, এটা আজ ভাবাও দুষ্কর হয়ে উঠেছে। যেখানে মানুষের জন্য কোন মানুষ পথের ভিখারী হচ্ছে দেখি, মানুষের জন্য মানুষ জীবন দিচ্ছে দেখ্‌তে পাই—তখন কৌতুহল দৃষ্টিপাত করে ভ্রূভঙ্গী সহকারে বল্‌তে থাকি, "লোকটা কি বোকা কি নিরেট—আপনি বাঁচলে বাবার নাম, ইত্যাদি"। বল দেখি এমন স্বার্থবিষে জর্জ্জরিত হয়ে থাক্‌লে আমরা প্রেম লাভ কেমন করে কর্‌তে পারি।

কিন্তু আজ উদীয়মান তরুণমণ্ডলীকে দেখে বহুদিনের সাধ পূর্ণ হবে বলে মনে হচ্ছে—তাই ভায়া কতকগুলো আবোল তাবোল লিখে যাচ্ছি। আমি এই নূতন—যারা বাংলার শ্যামল ক্ষেত্রে ফুলের মত ফুটে উঠেছে—তাদেরই আহ্বান করে বলি—আপনহারা হয়ে ভালবাস, এই ভালবাসা কোথাও হতে আন্‌তে হবে না, ফল্গুপ্রবাহের মত তোমারই অন্তরে অবস্থান কর্‌ছে, কেবল উদ্বুদ্ধ করে তুল্‌তে হবে,—যেমন গাছের ডাল সবুজ পাতা ছড়াতে ছড়াতে একদিন কুসুম কোরক মুখে ধরে বিশ্বনাথের আরতি করে—তেমনি জীবনক্ষেত্রে আপনাকে বিলোতে বিলোতে প্রেমের বিকাশ আপনা আপনই হবে। যখন তুমি একজনকেও সর্ব্বস্ব দিয়ে বিশ্বাস কর্‌তে পারবে, প্রাণপণে আপনার করে তোলবার অধিকারী হবে—তখন তোমার সহস্র বিপদে এই প্রেমাস্পদের সঙ্গ পরিত্যাগ কর্‌তে প্রবৃত্তি যাবে না—তখন জান্‌বে তোমার প্রেমের উদয় হয়েছে। এই প্রেম দিয়েই বাংলা দেশের সকল অশুদ্ধতা সকল সঙ্কীর্ণতা সকল ভেদজ্ঞান দূর করে দিতে হবে।

এই প্রেমের পরম শত্রু সংশয়। যখন আত্মবলিই প্রেমের প্রধান উপকরণ তখন সংশয় কিসের জন্য—বহু জন্ম ত এসেছি এবং কাল কবলে কবলিত হয়েছি, এবার না হয় ভালবেসেই যাব—এমন রোক্ থাক্‌লে সংশয় টিক্‌তে পারে না। দ্বিতীয় অন্তরায় আত্মাভিমান। যাহাকে ভালবাসি তাহার তৃপ্তির জন্য হৃদয় পেতে আছি কিন্তু তাহাতে আমার কি? আমার ব্যাপ্তি কোথায়? আমার স্বতন্ত্রতা যে মুছিয়া যাইতেছে? এইরূপ কল্পনা অহঙ্কারেরই প্রকট মূর্ত্তি। ফুল যেমন সার্থক হয় যখন সে দেবতার চরণে আপনাকে উৎসর্গ করে—কিন্তু ফুলের গন্ধ তাতে লোপ পায় কি? মানুষ ভালবেসে আপনাকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ কর্‌বে কিন্তু তাতে তার ব্যাপ্তি নষ্ট হবে না। তবে সে ব্যাপ্তি তার নয়, তার প্রেমাস্পদের, তার আরাধ্য দেবতার। সাধকের আত্মাভিমান এ কথা ভুলিয়ে তাকে মূল কেন্দ্র হতে বিচ্যুত করে, স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করে তোলে। বাংলা তাই আজ এত বিচ্ছিন্ন, দলাদলির কুটিল গতিতে এত ছন্ন ছাড়া। কে আছ মহাপ্রেমিক এই ভেদের মধ্যে অভেদের সৃষ্টি কর্‌বে, এই বহুর মধ্যে একের প্রতিষ্ঠা কর্‌বে—পাগোল তোমাকেই সর্ব্বান্তঃকরণে আহ্বান কর্‌ছে।

বীর-বাণী

হে ভারতবাসি! মনে রাখিও—সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী তোমাদের আদর্শ রমণী। মনে রাখিও—মহাযোগী উমানাথশঙ্কর তোমাদের আদর্শ দেবতা। মনে রাখিও—তোমার স্ত্রী, তোমার ধন, তোমার জীবন, তোমার ইন্দ্রিয়সুখভোগের জন্য নয়। মনে রাখিও—তুমি জন্মিয়াছ তোমার নিজের সুখের জন্য নয়, জননী জন্মভূমির জন্য।

তুমি বীর, তুমি নির্ভীক, তুমি ধন্য, কেননা তুমি ভারতের—ভারত তোমার! উচ্চকণ্ঠে হাঁকিয়া বল "আমি ভারতের, ভারতবাসী আমার ভাই", সরলান্তঃকরণে বল "মূর্খ, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, ইতর, সমস্ত ভারতবাসীই আমার ভাই"।

তুমি জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড কটিতটে জড়াইয়া সগর্ব্বে উচ্চৈঃস্বরে বল "ভারতবাসী আমার ভাই, আমার জীবন—ভারতের দেবদেবী আমার দেবতা, ভারতের সমাজ আমার বাল্যের ক্রীড়াভূমি, যৌবনের আনন্দকানন, বার্দ্ধক্যের পবিত্র শান্তিময় তপোবন"।•

বল ভাই "ভারতের মাটি স্বর্গাদপি গরীয়সী, ভারতের মঙ্গলে আমার মঙ্গল"। দিবারাত্র প্রার্থনা কর "অয়ি জননি! অয়ি আমার অধিষ্ঠাত্রি দেবি! মহামহিমাময়ি জগৎ-মাতঃ! অয়ি সর্ব্বশক্তিশালিনি জগদ্ধাত্রি! আমায় সর্ব্বদোষ হইতে মুক্ত করিয়া মনুষ্যত্ব দাও—আমি মানুষ হইয়া দাঁড়াই"।

• স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজি হইতে অনুদিত।

চিন্তা গুচ্ছ

দেবতা ও অসুরেরা মিলিয়া সমুদ্র মন্থন করিতেছেন। মানুষের হৃদয়-সমুদ্রে সহস্রফণা চিন্তা-নাগরূপী মন্থন রজ্জু নিয়ত সংকর্ষিত হইতেছে। মথিয়া উঠিবে অমৃত।

মানুষ দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বে ছিন্ন ভিন্ন, বিপর্য্যস্ত। সুখদুঃখের প্রবল ঝটিকায় অস্থির, চঞ্চল, বিভ্রান্ত তাহার জীবন। সে এই সমস্তই এক চক্ষে হাসিতে হাসিতে, অন্য চক্ষে অশ্রু মোচন করিতে করিতে বহিতেছে। কেন এত সহ্য করিয়া চলিয়াছে, কেহ জানে, কেহ জানে না। ভক্তের বিশ্বাস, এই সকলেরই অভ্যন্তরে গুপ্ত আছে—আনন্দ।

শরীর আলস্যে, জড়ত্বে, গতানুগতিক বন্ধনে মানুষকে ধুলায় টানিয়া রাখিয়াছে; হৃদয় মন আকাঙ্ক্ষায়, আবেগে, মহৎ-কর্ম্ম-অভিযানে নিত্য চঞ্চল বহির্ম্মুখ; জ্ঞান ধীর, স্থির, সৌম্য—শান্তি, স্বস্তি, কল্যাণ চিন্তায় বিভোর, স্থবিরতার প্রয়াসী--তমঃ, রজঃ সত্ব এইরূপ ত্রিগুণের তিন দিকে আকর্ষণে মানুষ সাগর তুল্য বিক্ষুব্ধ। ইহাই অপরা লীলা। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের পরালীলাও আছে। তাহাই মানুষের অভীষ্ট।

দ্বন্দ্ব আছে, তাই নির্দ্বন্দ্বতা সম্ভব। যুদ্ধ আছে বলিয়াই শান্তির শ্বেত পতাকা উড়িবে। কোলাহলময়ী লীলার পশ্চাতেই শাশ্বত, প্রশান্ত নিত্যের অধিষ্ঠান। কালী সদাশিবের বক্ষেই চঞ্চল-ঘোর নৃত্যপরা।

⁂

অহং ও ঈশ্বর, জীব ও শিব পরস্পরাপেক্ষী। শিব এক, অদ্বৈত, শুদ্ধ—জীব বহু, খণ্ডিত, কখনও শুদ্ধ কখনও অশুদ্ধ। কিন্তু শিব জীবের ভিতর দিয়াই আত্মপ্রকাশ করেন—জীবকুল জগতে শিবকেই প্রকটিত করিতে প্রয়াসী। শিব স্বয়ম্ভূ ও স্বপ্রকাশ কিন্তু জীবজগৎ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বকে লইয়াই তাঁহার স্বয়ম্ভূত্ব, সকলকে প্রকাশিত করিয়াই তিনি স্বপ্রকাশ।

দেবতা ও মানুষ তাই উভয়ে উভয়ের সহায়তা করেন। মানুষ দেবতার যন্ত্র, ক্রীড়াপুত্তলী—দেবতা মানুষের ইষ্ট, পূজ্য, আদর্শ। আদর্শ বাস্ত-

বের মধ্য দিয়া আত্মপ্রচার করে; বাস্তব আদর্শের উচ্চ প্রভাবের দ্বারাই আপনাকে বিবর্ত্তিত, উর্দ্ধমুখ করিয়া তুলে।

লীলার জন্ত প্রয়োজন—ভগবান্ এবং ভক্ত। ভগবান্ না আসিলে কে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবে, আবার ভক্তমণ্ডলী না থাকিলে কে ভগবান্কে বরণ করিয়া লইবে?

ভগবান্ যতদিন না প্রস্তুত হইতেছেন, ততদিন কে জীবনের শুদ্ধতা আনয়ন করিয়া, মুক্তির প্রতিষ্ঠা করিবে? আবার ভক্তকুল তারস্বরে, ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহাকে না ডাকিলে, কেন ভগবান্ প্রস্তুত হইতে যাইবেন? ভক্তের আহ্বানেই ভগবানের প্রকাশ, ভগবানের করুণা কটাক্ষপাতেই ভক্তের কাতর আহ্বান।

কাল পূর্ণ না হইলে কোনও ঘটনা ঘটে না। কাল পূর্ণ না হইলে মানুষের মধ্যে শক্তি জাগে না, মানুষের কর্ম্মে প্রবৃত্তি, প্রেরণা আসে না। আবার মানুষের প্রয়োজনবোধ, মানুষের ব্যাকুল পিপাসার প্রেরণাতেই কাল পরিপক্ক ও পূর্ণ হইয়া উঠে। দুইই চাই—তবেই লীলার সাফল্য।

⁂

ভিন্নমুখী শক্তির আকর্ষণে মানুষ শতধা বিভক্ত। তাহার দৃষ্টি ঘন মেঘাচ্ছাদিত—তাহার মন উদগ্র, অস্থির, শুভাশুভ কত বিচিত্র ভাবের যুদ্ধভূমি। আর পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তি যেন তাহার উর্দ্ধমুখী গতি রুদ্ধ করিয়া তাহাকে স্বর্গ-দিগ্বিজয়ে নিরস্ত করিতেছে। কারণ কি? খণ্ডতাকে জয় করিয়াই চির বিদ্যমান অখণ্ড সত্বাকে পুনঃ প্রকাশিত করিতে হইবে, দ্বন্দ্ব অতিক্রম করিয়া, বিচ্ছুরিত রক্তস্রোতের উপরেই প্রেমের বিজয়-বৈজয়ন্তীর প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, আর মানুষকে স্বর্গে আরোহণ করিতে হইবে না, পরন্তু ইহলোকেই স্বর্গকে নামাইয়া আনিতে হইবে। দ্যুলোক আসিয়া ভূলোককে চুম্বন করিবে।

সম্মুখের পথ অবরুদ্ধ, নয়নের আলোক অপহৃত, হৃদয় মন অন্ধকারে ভরিয়া গিয়াছে। উপায় কি? উপায় কিছুই নাই—কারণ উপায় কিছুই করিতে হইবে না। নিশান্তে সূর্য্যোদয় হইবেই, আলোকপুঞ্জ দিগন্তকোল উদ্ভাসিত করিয়া অচিরেই ভবিষ্যযুগের আনয়ন পথ নয়ন সমক্ষে উন্মুক্ত করিয়া দিবেই, রুদ্ধ দ্বার খুলিবেই। চাই

কেবল ভক্তকুলের অসহ্য মর্ম্মবেদনা আর ব্যাকুল, শুষ্ককণ্ঠে প্রতীক্ষা। ভগবান্ যদি না মরিয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে মানুষ ভগবানকে পাইবেই। অখণ্ড প্রেম যদি জগৎ হইতে শুকাইয়া না গিয়া থাকে, তাহা হইলে মরুভূমি ভাসাইতে বহিবেই ; শুদ্ধ, মুক্ত, স্বাধীন, পূর্ণ পরাৎপর পুরুষ যদি মানুষের জীবনের মধ্যে সত্য সত্যই বিরাজ করেন, বিশ্ব ও ব্যক্তিগত প্রকৃতির মধ্য দিয়া তিনি বিকশিত হইবেনই ; মানুষ শুদ্ধ, স্বাধীন, পূর্ণ হইয়া নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ করিবেই।

ধর্ম্ম প্রচারে রবীন্দ্রনাথ

কিছুদিন পূর্ব্বে জাপানের একটি মত উদ্ধৃত করিয়া আমরা দেখাই যে পাশ্চাত্যে অথবা পাশ্চাত্যভাবে প্রভাবান্বিত প্রাচ্যে কবি রবীন্দ্রনাথ যে সর্ব্ববাদীসম্মত প্রশংসা পাইয়াছেন প্রচারক রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তেমনটি পাইতেছেন না। কর্ম্মজগতের জন্য তিনি যে তন্ত্র ব্যবস্থা করিতেছেন অনেক মনীষীই তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পাইতেছেন না কেন এই কথাটিই এবার আমরা একটু তলাইয়া দেখিতে চেষ্টা করিব। প্রথমেই আমাদের মনে রাখা উচিত যে রবীন্দ্রনাথ হইতেছেন কবি। আর কবির যাহা সাধারণ দোষ তাহা যে রবীন্দ্রনাথে পাইব ইহা কিছু আশ্চর্য্যের নয়। কবির দোষ কল্পনাপ্রিয়তা। কিন্তু যে কবি শুধু কল্পনাপ্রিয় নহেন, কল্পনাকে সত্যের মধ্যে ভবিষ্য-দৃষ্টির মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছেন সে কবিও দোষমুক্ত নহেন। কবির প্রকৃতিই হইতেছে একটি দিক একটি ভঙ্গিমার সত্যটি উপলব্ধি করা। তাঁহার দৃষ্টি যতই গভীর হউক না প্রধানতঃ তাহা খণ্ড অনুভূতি, তাহা চলিয়াছে ঋজুরেখায়। যে জিনিষটিকে তিনি ধরেন তাহাকে আবেগভরে আলিঙ্গন করেন, তাহার মধ্যে জগতের যতটুকু সেইটুকুকেই স্ফুট, বিরাট, জাজ্বল্যমান করিয়া তুলেন। কিন্তু অবশিষ্ট যাহা কিছু সে সব তাঁহার দৃষ্টির বহির্ভূত, অথবা একেবারে বহির্ভূত না হইলেও গোধূলির অস্পষ্ট আলোকে প্রতিবিম্বিত মাত্র।

রবীন্দ্রনাথেরও ভুল এইখানেই যে তাঁহার কবি-অনুভূতিটিকে কর্ম্ম-জগতে সর্ব্বস্ব করিয়া লইয়াছেন, জগতের সমস্তখানিকে আলিঙ্গন করিবার পক্ষে তাহাকেই পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে করিয়াছেন।

জগৎকে কিন্তু কখনও একটি সংজ্ঞার মধ্যে আবদ্ধ করা যায় না, সৃষ্টিরহস্য একটি মাত্র কোন মন্ত্রের দ্বারাই ব্যাখ্যাত হয় না, মানুষকেও একটি মানদণ্ড অনুসারে কাটিয়া ছাঁটিয়া খাড়া করা চলে না। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইতেছেন মিত্রদেব, তাহার মন্ত্র প্রেম—করুণা মৈত্রী সামঞ্জস্য সম্মেলন সুষমা সৌন্দর্য্য আলো আকাশ মলয়বাতাস। কিন্তু সৃষ্টির জীবনের মানুষের এ একটা দিক মাত্র—যতই আবশ্যকীয় মহনীয় হউক না কেন তবুও একটা দিক মাত্র। রবীন্দ্রনাথ যে দিকটি নির্নিমেষ দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই তাহা হইতেছে শক্তি—বীর্য্য তেজ যুদ্ধ সংঘর্ষ ধূলি ঘনঘটা ঝঞ্ঝা, রুদ্রের বিভূতি। সৃষ্টির, মানুষের ধর্ম্মের ব্যাখ্যা কেবল প্রেমের মধ্যেই নয়, শক্তির মধ্যেও। আধুনিক যুগে শক্তিকে কেন্দ্র করিয়া তাহারই অভিব্যঞ্জনায় জগতের ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন নীট্শ। নীট্শও একটি অঙ্গেরই উপর, একটি তত্ত্বেরই উপর সমস্ত জোর দিয়াছেন তাই সেই ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ। শুধু অসম্পূর্ণই নয়, দোষযুক্ত। তিনি শক্তিকে ধরিতে গিয়া শক্তির যে সকল আনুসঙ্গিক বিকৃতি তাহাকেও নিত্যবস্তু করিয়া লইয়াছেন। মানুষকে বীর শক্তিমান হইতে উপদেশ দিয়াছেন কিন্তু সেই সঙ্গে মদ মাৎসর্য্য ক্রূরতা অত্যাচারপ্রিয়তা এ সকল বিসর্জ্জন দিতে পারেন নাই। ঠিক সেইরূপই রবীন্দ্রনাথ চাহিয়াছেন প্রেমের সুষমাটি দিয়া মানুষকে গড়িতে। কিন্তু প্রেমের সাথে আসিয়া পড়িয়াছে প্রেমের বিকার—অতিমাত্র নমনীয়তা কমনীয়তা, কেমন একটি সামর্থ্যের অভাব। সামঞ্জস্য প্রীতির উপর লোভের সঙ্গে আসিয়াছে দ্বন্দ্বমাত্রেরই প্রতি অবজ্ঞা, পৃথিবীর কণ্টকাকীর্ণ ধূলি ধূসরিত পথে চলিতে কেমন এক অস্বস্তি। রাজসিক নীট্শ অশুদ্ধতার ফলে যেমন পশু জগতের প্রতি হেলিয়া পড়িয়াছেন, সাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথও তেমনি পরীর দেবতা এঞ্জেলের জগতের প্রতি অতিমাত্র পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন। কেহই—নীট্শও নয়, রবীন্দ্রনাথও নয়—মানুষকে, মানুষের প্রয়োজন প্রেরণাকে অখণ্ড উদার দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই।

নবযুগের মূলমন্ত্র হইতেছে "জীবন"—রবীন্দ্রনাথ এই জীবনেরই উপাসক, তাঁহার নিকট হইতে এই শিক্ষাটিই আমরা লাভ করিয়াছি। পুরা-

তন সন্ন্যাসের বৈরাগ্যের সমাধির মন্ত্র ছাড়িয়া তিনি আমাদিগকে "অসংখ্য বন্ধন মাঝে মুক্তির স্বাদ" পাইতে উদযুক্ত করিয়াছেন। পার্থিব জগতের মধ্যে, সকল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জীবনরস গ্রহণ করা, কর্ম্মজীবনের শত বৈচিত্র্যের মধ্যেই আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করা—রবীন্দ্রনাথের ইহাই লক্ষ্য। নব্যভারত, বিশেষতঃ নব্যবাঙ্গলা এই জন্যই তাঁহাকে একজন নেতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু জীবনের ব্যাখ্যা দিতে যাইয়া তিনি যে সঙ্কীর্ণতাটুকু আনিয়া ফেলিয়াছেন, জীবনের সাধনারই অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গগুলির উপর তিনি যে তাচ্ছিল্য বা বিরক্তি দেখাইয়াছেন সেইটুকু আবার বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করা আমরা আবশ্যক মনে করি।

রবীন্দ্রনাথ চাহিয়াছেন সেই জীবন যাহা আনন্দপূর্ণ, স্বস্তিপূর্ণ, শান্তিপূর্ণ যেখানে দ্বন্দ্ব নাই, বৈপরীত্য নাই। বিশ্বমানব অন্তরে অনুভব করিয়াছে প্রেমময় ভগবান, সকলে সকলের সহিত নিরবচ্ছিন্ন মিলনসূত্রে সংগ্রথিত, ভুলিয়া গিয়াছে ধর্ম্মগত জাতিগত দেশগত বিরোধ বৈষম্য, সকলে চলিয়াছে সৌন্দর্য্যের সৌরভের পূজা করিয়া, এক অপূর্ব্ব ভাবাবেশে মুগ্ধ হইয়া। আদর্শ জীবনে এ সকলেরই স্থান আছে। কিন্তু কেবল ঐটুকু বলিলেই তাঁহার সব কথাখানি বলা হইল না। আমরা যেন অনুভব করি রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ চাহেন বৈচিত্র্য চাহেন কিন্তু যতদূর পারেন সে সকলকে সন্ন্যাসীর শান্ত নিশ্চল দ্বন্দ্বাতীত ব্রহ্মেরই নিকটে লইয়া গিয়াছেন। তপঃ শক্তির বীর্য্যের বিক্রমের রেশ মানুষ যে অনুভব করিতেছে রবীন্দ্রনাথ তাহার একটা যথার্থ স্থান দিতে পারিতেছেন না। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সঙ্ঘে সঙ্ঘে যে সংঘর্ষ যে বৈরীভাব তাহা কি কেবলই হেয়, কেবলই মোহের খেলা, তাহার অন্তরে কি কোন সত্য বস্তুই নাই? ব্যক্তির সঙ্ঘের দেশের জাতির যে স্বাতন্ত্র্য, যে ভাগবত একটা প্রাণ আছে আমরা তাহা বিশ্বাস করি। আদর্শ জীবনের মহা সম্মেলন আর বর্ত্তমানের সংঘর্ষ বিসম্বাদ এই দুয়ে একটা নিগূঢ় যোগ আছে, শুধু যোগ নয় একটা ঐক্যই আছে। আমরা বলি বর্ত্তমানের দ্বন্দ্বকে চাপা দিয়া বা পিষিয়া দূর করা উচিত নয়। তাহাকে ফুটিয়া উঠিতে দিয়া, সকল ব্যষ্টিরই আত্ম-স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণ প্রসারে মহাসামঞ্জস্যটিকে বৈচিত্র্যময় করিয়া তুলিতে হইবে। নতুবা জীবন পাইতে পারি, কিন্তু জীবনকে সমরসের এক শান্ত ক্লীব ভাবুকতা দিয়াই ভরিয়া তুলিব। তারপর বর্ত্তমান জগতের যে অতিমাত্র কর্ম্মবহুল জীবন—তাহার স্থূল দৃষ্টি, তাহার বৈশ্য ধর্ম্ম

তাহার উদ্ব্যস্ততা ত্রস্ততা মত্ততা লইয়া যতই কুৎসিত হউক না কেন কিন্তু তাহারই মধ্যে রহিয়াছে সজীবতা, জীবনকে জগৎকে তীব্রতর ভাবে স্পষ্টতর ভাবে আলিঙ্গন করিবার প্রয়াস, শক্তির খেলাকেই মূর্ত্তিমান করিয়া তুলিবার ইঙ্গিত, জাগতিক প্রতিষ্ঠানকে নিত্য নব নব সৃষ্টি দিয়া ফলপ্রসূ করিবার মহান আয়াস। রবীন্দ্রনাথ যে জীবনের ছবি আঁকিতেছেন তাহা দেখিয়া আমাদের মনে পড়ে শান্তরসাস্পদ বিঘ্নবিরহিত, লোকালয়ের মলিনতাহীন আশ্রম কুটিরখানি।

আমরা জানি রবীন্দ্রনাথকে ঠিক এই ভাবে লইতে অনেকে স্বীকার পাইবেন না। তাঁহারা দেখাইয়া দিবেন রবীন্দ্রনাথ সমাজের, ধর্ম্মের ভণ্ডামীর সহিত কিরূপ যুদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার বিদ্রুপবাণী তাঁহার অট্টহাস কতক্ষেত্রে কতভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, স্বদেশীর যুগে তাঁহার অগ্নিময় বাক্যেই না বাঙ্গালী বালক নাচিয়া উঠিয়াছে? আর আজ যে ইউরোপে তিনি প্রচারকার্য্যে লিপ্ত--তাহা কি সমস্ত ইউরোপীয় শিক্ষাদীক্ষার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা নয়? আমরা বলি এ সকলে এইটুকু প্রমাণ হয় যুদ্ধ করিবার একটা সহজ প্রেরণা—ক্ষাত্রশক্তি, মানুষের মধ্যে কি সত্যকার বস্তু। কথায় অস্বীকার করিতে যাইয়া ভঙ্গিমায় রবীন্দ্রনাথ তাহা প্রকটিত করিয়া ফেলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেন শঙ্করের কথা—ইহবিমুখ সন্ন্যাসী যিনি আহিমালয় কুমারিকা বিধ্বস্ত করিয়া প্রচার করিতেছেন তিনি নৈষ্কর্ম্ম্য কিন্তু প্রকৃত কথা হইতেছে রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বে সংঘর্ষের ব্যাখ্যা নাই, দ্বন্দ্বের যে কি প্রয়োজনীয়তা কি অব্যর্থতা তাহার যথাযথ নির্দ্দেশ নাই। এমন কি আমরা বলিতে পারি কর্ম্মেরও স্থান নাই। কর্ম্ম হইতেছে তপঃশক্তির জাগ্রত প্রয়োগ—রবীন্দ্রনাথ মনে করিবেন তাহার অবার্থ ফল দ্বেষ হিংসা ক্রূরতা পাশবিকতা। তিনি চাহেন রসভোগাত্মক কর্ম্ম। তিনি জীবনের যে কিছু বৈচিত্র্য চাহেন তাহা মিলনেরই নানা ভাবের রসাস্বাদন। আমরা এসকলই স্বীকার করি। কিন্তু ইহা প্রতিষ্ঠা মাত্র, ইহা অন্তরের একটা ভাব বা অবস্থা। কিন্তু ইহাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, এমন কি ইহাকে অটুট স্ফুট স্থিরপ্রতিষ্ঠ রাখিবার জন্যই—আমরা সকল দ্বন্দ্ব, সকল সংঘর্ষ, সকল পার্থিব ধূলিমলীনতায় লিপ্ত হইতে শঙ্কান্বিত হইব না বা দ্বিধা-বোধ করিব না। কারণ, দ্বন্দ্ব তখন শুধু দ্বন্দ্ব নয়, সংঘর্ষ তখন শুধু সংঘর্ষ নয়, পৃথিবী শুধুই পৃথিবী নয়। এ সকলের মধ্যে একটা উচ্চতর ক্ষেত্রেরই

পরিপূর্ণ প্রেরণা খেলিতেছে দেখিব।

এ কথা সত্য স্বদেশীর যুগে রবীন্দ্রনাথে আমরা দেখিয়াছিলাম কিছু অগ্নির খেলা, কিন্তু বাতাসের প্রথম প্রকোপেই তাহা নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। সে এক দিন ছিল মূকও যেদিন বাচাল হইয়া উঠিয়াছিল, পঙ্গুও গিরিলঙ্ঘিতে চেষ্টা করয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও রুদ্রদেবতার আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ অতিমাত্র কবি। সৌন্দর্য্য সুষমা নমনীয়তা কমনীয়তার আস্বাদ তিনি অতিমাত্র পাইয়াছেন। কৃষ্ণের বংশী তাঁহাকে মোহিত করিয়াছে। কিন্তু কালী যে কৃষ্ণেরই আর এক ভঙ্গিমা—সে করাল মূর্ত্তিতে যে কি সৌন্দর্য্য, কি মহিমা, কি নিত্য-সত্য তাহা তিনি সম্যক দেখিতে চাহেন নাই। হইতে পারে ইউরোপে তাঁহার শান্তিপ্লুত বাণীর প্রয়োজন আছে। কেবল ইহপরায়ণ ভোগমত্ত দন্তনখর রক্তাক্ত সে রাক্ষসের দেহে অতি-জগতের সৌরভ প্রলেপ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এ কথাটুকুও মনে রাখা আবশ্যক পশু হউক পিশাচ হইক, রাক্ষস হউক অসুর হউক পূর্ণ জীবনে সিদ্ধের জীবনে এ সকল রকম প্রকৃতিরই স্থান আছে, সকলেরই একটা অব্যর্থ সামঞ্জস্য আছে। জীবনের কোন বিভূতি—অহঙ্কার বশে আমাদের কাছে তাহা যতই অপ্রিয় যতই কদাকার বোধ হউক না কেন—মায়া নহে মতিভ্রম নহে।

প্রকৃত কর্ম্মী যিনি তিনি জীবনের যে নয়নমন বিভ্রান্তকারী চঞ্চলতা তাহাতে পরিশ্রান্ত বোধ করিবেন না, সকল অবাঞ্ছনীয় জিনিষের মধ্যে থাকিতেও অস্বস্তি বোধ করিবেন না। সেখান হইতে ছুটিয়া জনতা হইতে দূরে প্রকৃতির কোলে মুক্ত স্নিগ্ধ আকাশতলে ভগবানের সৌম্যমূর্ত্তিটিরই ধ্যানে তৃপ্ত থাকিবেন না। দ্বন্দ্ব বাঞ্ছনীয় জিনিষ না হইতে পারে কিন্তু দ্বন্দ্ব দেখিয়াই যে শিহরিয়া উঠা তাহাও কিছু বাঞ্ছনীয় নহে। অহংকার ক্রূরতা ব্যসন আদর্শ জিনিষ না হইতে পারে কিন্তু প্রীতি পরার্থপরতা সাত্ত্বিকতার আবরণে একটি জিনিষ আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করে—গীতাকার তাহার নাম দিয়াছেন ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্ব্বল্য, কার্পণ্যদোষ—সে জিনিষটার বিরুদ্ধে আমাদিগের সাবধান থাকা উচিত। অর্জ্জুনের মত মহাকর্ম্মীর মধ্যেও এ ভাব স্থান পাইয়াছিল—সে টুকু দূর করিতে শ্রীভগবানের কতখানি আয়াস করিতে হইয়াছিল! আমরা ত মনে করি আদর্শ মানুষ যিনি, আদর্শ মানুষত্বের সাধক যিনি তিনি জগতের

সমস্ত দ্বন্দ্বে, পা চালিয়া দিয়া, জীবনের শত অসুন্দর ব্যাপারের কাদা মাটিতে লিপ্ত হইয়া তাহারই মধ্য হইতে নিজের অন্তরে বাহিরের জগতে একটা উচ্চতর মহত্তর সুন্দর সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন সৃষ্টি করিয়া চলিবেন।

ভবিষ্যতের ইঙ্গিত

আজ মানবজাতির মধ্যে একটা বিপুল পরিবর্ত্তনের যুগ আসিয়াছে—সে পরিবর্ত্তনে জগতের উন্নতিসাধন হইবে, ইহাই সর্ব্ববাদীসম্মত অভিমত। জগতের ভাবী উন্নতিযুগে বিশ্বমানবজাতির মধ্যে ভেদভাব দূরীভূত হইয়া মহা ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হইবে। কি ধর্ম্মজগতে কি সামাজিক আচার ব্যবহারে সকল বিষয়েই ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন মানবজাতির মধ্যেই একটা একতান বাজিয়া উঠিবে। পরস্পরের মধ্যে যে বিভেদ আছে, ইহা তিরোহিত হইয়া এক জাতি এক মন এক প্রাণ এক ধর্ম্ম হইয়া একই ছত্রতলে জগতের জাতি মহানন্দে দিনপাত করিবে, জগতে হিংসা থাকিবে না, ঘৃণা থাকিবে না, মানুষ মানুষের প্রতি বিদ্বেষ পরবশ হইয়া আর নরশোণিতে ধরণী কলঙ্কিত করিবে না। এইরূপ একটা সুখস্বপ্ন প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই দেখিয়া থাকেন এবং তদনুযায়ী অনেকেই অনেক প্রকার ভাবেরও প্রচার করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন—বর্ত্তমান মহাপ্রলয়ের যুগে ইহা বিচিত্র বটে!

কিন্তু এই আনন্দস্বপ্ন, এই কল্পনার স্বর্গরাজ্য প্রতি মুহূর্ত্তেই ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া ধুলায় লুটাইয়া পড়িতেছে বিধাতার অট্টহাস্তে; তিনি তাঁর কঠোর বিধানে নিষ্পেষিত করিতেছেন মানবজাতির চেষ্টানির্ম্মিত এই নূতন শান্তিসম্বন্ধকে, য়ুরোপের যুদ্ধই তার প্রকৃত নিদর্শন।

কিন্তু ভগবানের এই নিদারুণ আঘাতে মানুষ ক্রমশঃই তার স্বপ্নকে যথার্থ করিয়া তুলিবার জন্য অসাধারণ প্রয়াস প্রদর্শন করিতেছে, এই অবিচ্ছেদ প্রচেষ্টা মানুষকে ক্রমশঃই শুভের পথে আনিতেছে—মানুষ ধীরে

ধীরে বুঝিতেছে যে এই সোণার স্বপ্ন কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে মানুষের প্রতি কেবল সহানুভূতিপরায়ণ হইলেই চলিবে না, স্বজাতি প্রীতি পরিবর্দ্ধন করিলেই হইবে না, পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধনকে সুদৃঢ় করিয়া তুলিলেই কার্য্য সিদ্ধ হইবে না, পরন্তু মানুষকে বুঝিতে হইবে যে সমগ্র মানবজাতির সঙ্গে তাহার বন্ধন অচ্ছেদ্য এবং এক। মানুষের মনে প্রবল ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দিতে হইবে, যে সে বিশ্বমানবজাতির অংশ মাত্র, সমস্ত মানবের সহিত তাহার ভাগ্যসূত্র একই ভাবে গ্রথিত —তার নিজের আনন্দ নিরানন্দ, সুখ দুঃখ, দারিদ্র্য ঐশ্বর্য্য, বন্ধন মুক্তি প্রভৃতির অনুভূতি নিজের জন্য নহে, পরন্তু মনুষ্যজাতির জন্য। য়ুরোপে শান্তিবিধানকল্পে উনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল বিধানের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা সকলই ব্যর্থ হইয়াছে। এরূপ লোকক্ষয়কারী মহাযুদ্ধেরই বিশেষ প্রয়োজন ছিল নতুবা মানুষের ভুল ধরা পড়ে না। এই মহাসমরে আশী লক্ষ লোক নিহত হইয়াছে, ইহাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোক বিকলাঙ্গ হইয়া জন্মের মত অব্যবহার্য্য জীবন ভার বহন করিতেছে,—শুনিতে পাই এক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে যত শ্বেতাঙ্গ নরনারী বাস করে, এই যুদ্ধের আহতের সংখ্যা তাহার সমান—কি লোমহর্ষণ শোচনীয় প্রকৃতির তাণ্ডব লীলা! এই উৎকট অভিনয়ের অন্তরালেই জগতের ভবিষ্যৎ মঙ্গলরাজ্যের আভাষ পরিলক্ষিত হইতেছে, একটা স্থায়ী শান্তির জন্য পাশ্চাত্যের সকল জাতিই উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে—জয় পরাজয়ের গর্ব্বে বা লজ্জায় আর কেহ অভিভূত নহে—কিসে পৃথিবীতে একটা শান্তি রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয় প্রত্যেক মনীষীই এই কথা লইয়া আলোচনা করিতেছেন। সেদিন ‘লিগ্ অব্ নেশন সোসাইটি”র অধিবেশনে জেনারেল স্মাটস্ স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন—

“If one hundredth part of the thought given to this war were given to peace, there would never be a war again. I believe that a passion for peace has been born in this war which will prove greater than any passion for gain or conquest, and as far as is humanly possible, such a war as this should never be tolerated again. However there is a danger in believing too much in treaties until we have a radical change in the hearts of men, but I think that change is coming. There must be no patch-work peace or a peace which is simply a compromise of conflicting interests. Every nation must have the choice of its own destiny and not be cut and curved to please the great powers. অর্থাৎ বর্ত্তমান যুদ্ধ পরিচালনায় যে পরিমাণ চিন্তাশক্তি নিয়োজিত হইতেছে যদি তাহার শতাংশের একাংশও শান্তিকল্পে প্রযুক্ত হয় তাহা হইলে ভবিষ্যতে আর কদাপি যুদ্ধ হইবে বলিয়া বোধ হয় না। আমার বিশ্বাস এই যুদ্ধপরিশান্তির নিমিত্ত সকলেরই অন্তরে একটা বিপুল অভিলাষ আসিয়াছে এবং কোন লাভ বা জয়েচ্ছা অপেক্ষা ইহা যে অধিকতর শক্তিসম্পন্ন ইহা শীঘ্রই প্রমাণিত হইবে এবং আশা করি মানুষের পক্ষে যতদূর সম্ভব ভবিষ্যতে আর কখনও এরূপ যুদ্ধকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না কিন্তু ইহাও আবার দেখিতে হইবে যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষের অন্তরের স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন না আইসে ততদিন পর্য্যন্ত যেন আমরা শান্তির উপর অতিমাত্রায় আস্থা না রাখি—আমার বোধ হয় যে উক্ত পরিবর্ত্তন এখন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কোনরূপে তালি দেওয়া শান্তির প্রার্থী আমরা নহি অথবা এমনও চাহিনা যাহাতে কেবল মাত্র পরস্পরের বিরোধজনক স্বার্থগুলির একটা মোটামুটি নিরাকরণ হয়। প্রত্যেক জাতিকে তাহার ভবিষ্যৎ বাছিয়া লইতে দেওয়া হইবে, পরন্তু বিশাল শক্তিসমূহের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য কাহাকেও খণ্ডিত বা খর্ব্ব করা না হয়।

আজ য়ুরোপ সত্যই যদি স্বার্থলেশশূন্য হইয়া এই মহাভাবে উন্মত্ত হয়, যদি জগতের সমগ্র মানবজাতির সমবেদনায় কাতর হইয়া উঠে, যদি কি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ কোন জাতির উন্নতির পথে ব্যষ্টিভাবে অথবা দলবদ্ধ হইয়া অন্তরায় না হয়, তাহা হইলে প্রচণ্ড সংঘর্ষে বসুন্ধরা এক নুতন পরিচ্ছদ ধারণ করিবে তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই; কে জানে জগতের বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ সেই ভাবী স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার শেষ পরিচ্ছেদ অথবা ইহাই কেবল প্রারম্ভ মাত্র!

আজ আমাদের জানিতে ইচ্ছা করে হিন্দু যে সনাতন সত্যযুগের স্বপ্ন দেখিয়া আসিতেছে, খ্রীষ্ট যে আনন্দময় স্বর্গরাজ্যের কাহিনী বলিয়া গিয়াছেন, তাহা কিরূপ? আদর্শের সন্ধান না পাইলে মানুষ তদনুকরণে কৃতকার্য্য হয় না, আদর্শের আভাষ পাইয়াই মনুষ্য-জগতে নানা জাতি নানা ধর্ম্ম নানা সম্প্রদায়ের

উৎপত্তি। কিন্তু হায়! আজ মানবজাতি যে আদর্শে উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছে তাহার স্বরূপ কোথায়? ব্যবহারিক জীবনে তাহার কোন ইতিহাস নাই, কেবল ভাবরাজ্যেই ইহার প্রচার।

হিন্দুর যে সত্যযুগ, তাহার ভাষা বেদ, ধর্ম্ম উপনিষদ। কিন্তু সে যুগের মানুষ কেমন ছিল, সে যুগের ভৌগলিক তত্ত্ব কিরূপ তাহার ঠিক বিবরণ আয়ত্ত করা মনুষ্যচেষ্টার অতীত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা জগতের যে অস্ফুট ইতিহাস পাই, উহা পৌরাণিক যুগের। তখন সত্যযুগের অবসান হইয়াছে; সর্ব্বসমন্বয়কারী পূর্ণ ধর্ম্মের একপাদ তখন কালের অন্ধকারগর্ভে বিলীন হইতেছে—ইতিহাসের সে আলেখ্য বর্ত্তমান মানবজাতির আদর্শ হইতেই পারে না। কেন এমন হইল? আজ আমরা যাহা হইতে চাহি, তাহার নিদর্শন ভগবান রাখিলেন না কেন? উপরন্তু খণ্ড ধর্ম্মের প্রভাব, খণ্ড ধর্ম্মের আদর্শ জগতের সম্মুখে উজ্জ্বল চিত্রে আঁকিয়া রাখিয়াছেন। কি প্রহেলিকা! কি রহস্যময় লীলা!

মানুষ স্বভাবতঃই ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যাহা তাহাদের মনোমধ্যে নীত হয়, বুদ্ধির সাহায্যে তাহারই অঙ্গুলি সঙ্কেতে কার্য্য করিয়া] থাকে—সেইজন্য মানুষ আপাত-মধুর আদর্শগুলিকেই আঁকড়িয়া ধরে। আমাদের ভয় হয়—বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের পরিণামেও য়ুরোপ ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া একটা সাময়িক চুক্তিবদ্ধ না হয়। মানুষের অসমর্থতাই মানুষকে সে সত্য আনন্দময় সত্বাটীকে দেখিতে দেয় না—মানুষ দুর্ব্বলতাবশতঃই উপস্থিত অসম্পূর্ণ ধর্ম্মেরই আশ্রয় লইয়া থাকে। ভগবান সেই জন্যই বার বার ভীষণ সংঘর্ষের সৃষ্টি করেন--মানুষ অপরিমিত শক্তিশালী না হইলে এই অভাবনীয় দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয়ী হইয়া সে নূতনকে সে সত্যকে সে স্বপ্নকে সফল করিয়া তুলিতে পারে না।

আমরা যুগে যুগে দেখিয়া আসিতেছি এই বিরাট ঐক্যে এক নূতন বিশ্বসাম্রাজ্য গঠন করিবার ভাব বহু আধারে প্রবেশ করিয়া আধারানুযায়ী বহুবিধ কর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছে, আধারের শুদ্ধতার অভাবে এবং কালের প্রতিকূলাচরণে এই সর্ব্বসমন্বয়কারী মহাভাব বহু স্থানে বিচিত্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সত্যযুগের সংস্কার মানুষের চিত্ত হইতে কখনই মুছিয়া যায় নাই—এই অমর ভাব প্রতিভাত হইয়া অনেককে মহাকর্ম্মী করিয়া তুলিয়াছে। ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত আমরা অনেক পাইয়া থাকি। এতদ্

উদ্দেশ্যে মানুষ বহুবার ব্যর্থ হইলেও—ইহার প্রতিকূল শক্তি যে ক্রমশঃই খর্ব্ব হইয়া আসিতেছে, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

এই মহাভাবের দ্যোতনাতেই মহাত্মা মহম্মদ উদ্বুদ্ধ হইয়া জগতে এক ধর্ম্ম প্রচার মানসে প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন—জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মহম্মদীয় শক্তি অপরাজেয় হইয়া উঠিয়াছিল। সর্ব্বধর্ম্মের অসারত্ব প্রতিপাদন করিয়া মহম্মদীয় ধর্ম্মই জাগতিক ধর্ম্ম, সমস্ত জগদ্‌বাসীর ইহাই গ্রহণ করা বিধেয়—এইভাব কেবল প্রচার করিয়াই একনিষ্ঠ মুসলমানগণ বিরত হন নাই, পরন্তু তরবারির সাহায্যে পৃথিবীর তৃতীয়াংশে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন কিন্তু এই বীর জাতির আশা পূর্ণ ভাবে কার্য্যে পরিণত হইবার পথে কণ্টকস্বরূপ রোম রাজ্য উত্থিত হইল, য়ুরোপে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রচারিত হইতে লাগিল।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর আরম্ভ কাল হইতেই এই খ্রীষ্টানজাতিকে আশ্রয় করিয়া প্রকৃতিদেবী সর্ব্বজগতে একতার ভাব প্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিবার পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতেছেন। ষষ্ঠ কন্‌সটানটাইন রোমের শক্তি খর্ব্ব করিয়া স্বনামে কন্‌স্টোনটিনোপলে যখন নূতন রোমের প্রতিষ্ঠা করিলেন তখন রোমের পোপ সারলমাইনকে অবলম্বন করিয়া জগদ্ সাম্রাজ্যের আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার কল্পনা করেন, কিন্তু তাহাও সফল হয় নাই। এইরূপ কত ক্ষুদ্র বৃহৎ আন্দোলনে তিনি জগতকে আলোড়িত করিতেছেন—কে জানে এক দিন নেপোলিয়ানও এই সুখস্বপ্নে উন্মত্ত হইয়া নররক্তে য়ুরোপ প্লাবিত করিয়াছিলেন কি না? খ্রীষ্টানজাতির ঐশ্বর্য্যসূর্য্য যতই মধ্যাহ্নাকাশে উঠিতে লাগিল, ততই তাহাদের মনে হইয়াছে যে এক খ্রীষ্টান ধর্ম্মই জগতের প্রকৃত ধর্ম্ম এবং এইজন্য কত অর্থ কত নররক্ত ব্যয়িত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই—ইহাও প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সেই মহাভাবেরই অভিব্যক্তি মাত্র।

বর্ত্তমানক্ষেত্রেও আমরা দেখিতে পাই—জর্ম্মণ সম্রাট কাইজর আপনাকে Messiah of God এইরূপ ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া জগতের মুক্তি বিধান করিবার জন্য এক তুমুল বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রকৃতির এইরূপ উৎকট তাণ্ডব লীলা জগদিতিহাসে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মানুষকে অবলম্বন করিয়া প্রকৃতির এই যে নিগূঢ় লীলা, ইহার মূল তত্ত্ব ভারতের ঋষিবৃন্দ অবগত আছেন—জগতের বহুবিধ পরিবর্ত্তনে তাই তাঁহারা

নির্ব্বিকার নিরাসক্ত। খৃষ্টান জাতির উচ্চ আকাঙ্খার পথে কেবল ইসলাম এবং পীত জাতিই অন্তরায় হইতে পারে ইহাই মনে হইয়াছিল এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে য়ুরোপের মনীষীগণ য়ুরোপীয় শক্তির সমাহারেই যত্নবান হইয়াছিলেন। সে কাজ সমাপ্ত হইতে না হইতেই য়ুরোপের শক্তিপুঞ্জের মধ্যেই ধ্বংসের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। খৃষ্টান ও মোস্‌লেম সমাজের মধ্যে সমগ্র জগতকে একই ছত্রতলে আনিবার মজ্জাগত আকাঙ্খা কার্য্যে পরিণত হইবে কি না এক্ষণে বলা বড় সহজ নহে, কিন্তু ১৩ কোটি কর্ম্মপটু পীত জাতির অন্তরে প্রকৃতিদেবী এই অবসরে যদি তাঁর অন্তর্নিহিত মহাভাবের বীজ বপন করিয়া দেন তবে তাহারাও যে অগ্নি স্ফুলিঙ্গের মত জ্বলিয়া উঠিবে ইহা অবধারিত—জগতের রাষ্ট্রনায়কগণ এই সকল বিষয় লইয়া চিন্তা করিতেছেন।

জগতের অপরাপর মহাজাতির তুলনায় ভারতের বস্তুগত ঐশ্বর্য্যও বড় অল্প নয়, কিন্তু ভারতবর্ষ স্বভাবতঃই অধ্যাত্মভাবপরায়ণ—বাহিরের ব্যাপ্তির জন্য অসময়ে অনর্থক শক্তিক্ষয়ে তাহারা নিতান্তই উদাসীন। প্রকৃতিদেবী ইচ্ছা করিয়াই যেন এইখানে আপনার শ্মশান-কালীর ভৈরব মূর্ত্তিটী গোপন রাখিয়াছেন। সমগ্র জগতে যখন একীকরণের মহা ভাব উন্নতশীল জাতিগণের মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া যুগে যুগে ভীষণ আহবের সৃষ্টি করিয়াছে, নররক্তে বসুন্ধরা রঞ্জিত হইয়াছে তখন ভারতবর্ষ বাহিরের অসহনীয় আক্রমণে বিধ্বস্ত বা উত্তেজিত হয় নাই; সে নীরবে জগতের ভাবী মঙ্গল কামনায় তপঃমগ্ন ছিল। মধ্যে মধ্যে পুরাতন ক্ষত্রিয় শক্তি প্রকাশিত হইয়া আস্‌মান বাজীর মত ক্ষণিক আলোক বিস্তার করিয়া নির্ব্বাপিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ ব্যবহারিক জগতে নিতান্ত অপদার্থ নহে, ধর্ম্মজগতেও তাহার প্রতিদ্বন্দীতা করে এমন শক্তি কাহারও নাই। পার্থিব জগতে সে অপটু—ঐশ্বর্য্যহীন বলিয়া নহে—ইহাই ছিল প্রকৃতির ইচ্ছা। লোকবলে ঐশ্বর্য্যে জ্ঞানে ভারতবর্ষ অদ্বিতীয়। সমস্ত জগতের ভারকেন্দ্র ইচ্ছা করিলে একা ভারতবর্ষই বহন করিতে পারে। আজ ভারতবর্ষ শ্রীকৃষ্ণের মত, অর্জ্জুন ও দুর্য্যোধনের মধ্যবর্ত্তী। এমন দিন আসিতেছে ভারতবর্ষের শক্তি সামর্থ্যের উপরেই ধর্ম্ম সমন্বয়, জাতি সমন্বয়, সর্ব্ব সমন্বয় নির্ভর করিতেছে। এই ভারতবর্ষ বিষয়ক নিগূঢ় সমস্যার কথা কেবল যে ভারতবর্ষ চিন্তা করিতেছে এরূপ নহে—ভারতের বর্ত্তমান ভাগ্যবিধাতা পদাক্রান্ত

ইংরাজরাজও ভারতের সমস্যাবিধানে চিন্তাশীল।

উপসংহারে, এই যে মহাসমন্বয়ের একটা প্রচেষ্টা ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার উপস্থিত কাহার সামর্থ্য আছে দেখিবার চেষ্টা করা যাউক।

যাঁহারা, বক্তৃতার জোরে এই বিরাট কার্য্য সংসাধিত হইবে, এমন কল্পনা করেন তাঁহাদিগকে রমণীর অঞ্চল আশ্রয় করিতে অনুরোধ করি, প্রচুর বাহুবলের সঙ্গে ব্রহ্মণ্যশক্তি সংযোজিত হইলেই মানুষ এই কার্য্য সম্পাদন করিবে। কেবল ক্ষত্রিয়-শক্তির উপর নির্ভর করিলে বার বার বিফল মনোরথ হইতে হইবে—জ্ঞানদীপ্ত ক্ষাত্রতেজের স্ফুরণেই প্রকৃতির এই মহদুদ্দেশ্য সার্থক হইবে।

সারাজগতে মোটামুটী ৩৮ কোটী সবল লোক আছে। ইহারা প্রত্যেকেই যুদ্ধপটু হইয়া উঠিতে পারে। য়ুরোপে একা রুষিয়ার লোকবল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল—রুষিয়ার সুযোগ চিরদিনের জন্য তিরোহিত হইয়াছে—স্বেচ্ছাতন্ত্র রুষিয়ার জার্ প্রজাবৎসল হইতে পারেন নাই, ফলে রুষ সাম্রাজ্যে ভীষণ অশান্তি ও বিপ্লব চলিয়াছে। এই সকল সামলাইয়া রুষের প্রভাবশালী হইতে অধিক সময় সাপেক্ষ, ইহার মধ্যে জগতে আরও নূতন পরিবর্ত্তন হইবে। তারপর জর্ম্মনী, অষ্ট্রীয়া ও তুর্কীর সহিত সংযুক্ত হইয়া লোকবলে বলীয়ান হইলেও বহির্জগতের সহিত তাহার মিলনের আশা অল্প—তাহার বর্ব্বর ক্ষাত্রশক্তি জগজ্জয়ের পথে প্রবল বাধা উৎপাদন করিবে। একমাত্র ইংরাজই এক্ষণে মিলিত শক্তির সহিত য়ুরোপে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী, সমুদ্রপথে সে জগতের অদ্বিতীয়, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিবে এরূপ শক্তি কাহারও নাই। যদি য়ুরোপে শ্রেষ্ঠাসন অধিকার করিবার উপযুক্ত কোন জাতি থাকে তবে সে ইংরাজ, কিন্তু কেবল য়ুরোপে শক্তি বিস্তার করিলেই জগতের ভাবী সমন্বয় যুগের কর্ণধার যে সে হইতে পারিবে এরূপ কোন কথা নাই। প্রাচ্যে পীত জাতি বলশালী হইয়া উঠিতেছে, জাপান যদি চীনের সহিত সম্মিলিত হয় তবে লোকবলে সে অপরাজেয় হইয়া উঠিবে—১৩ কোটী যোদ্ধা সে রণক্ষেত্রে উপস্থাপিত করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু ইংরাজ রাজ নিঃস্বার্থ এবং সত্যপরায়ণ হইয়া তাহার বর্ত্তমান সাম্রাজ্য-শক্তিকে একত্রিত করিলে, ভবিষ্যতে প্রকৃতি তাহারই ললাটে বিজয় সিন্দুর পড়াইয়া দিবে। আমরা নিম্নে জগতের লোকবলের একটি তালিকা প্রদান করিলাম।

প্রাচ্য		
চীন	১১	কোটী
জাপান	২	,,
ভারতবর্ষ	৭॥	,,
	২০॥০	কোটী
ইজিপ্ট	২	,,

পাশ্চাত্য		
রুষিয়া	৪	কোটী
ফ্রান্স	২।০	,,
জার্ম্মাণী	২	,,
গ্রেট ব্রিটেন	১॥০	,,
অষ্ট্রিয়া	১	,,
ইতালী	৸০	,,
তুর্কী	॥০	,,
স্পেন	।০	,,
অন্যান্য জাতি	॥০	,,
	১২৸০	কোটী

ইংরাজ সম্মিলিত শক্তির সহিত তাহার ভারতসাম্রাজ্য ও ইজিপ্ট যোগ করিলে জগতে ইংরাজের তুল্য শক্তিশালী জাতি আর কেহই নাই। আমরা ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া হাসিতেছি—চতুর বুদ্ধিমান ন্যায়পরায়ণ তীক্ষ্ণদর্শী রাজনীতিবিদ্ ইংরাজ এ সুযোগ পরিত্যাগ করিবে কি?

ধর্ম্ম

ভারতবর্ষ যে ভাবে গড়িয়া উঠিবে উহা ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম বিরহিত হইয়া যে কোন অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হউক না তাহা ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু যত গোল এই ধর্ম্ম লইয়া। গুণাদিভেদে বহুবিধভাবে ধর্ম্মের ব্যাখ্যা হইয়া থাকে, সুতরাং ভূয়োদর্শন ব্যতীত, ভুক্তভোগী না হইলে যথাযথ ভাবে ধর্ম্মের আস্বাদ জীবনে ঘটিয়া উঠে না। তবে ধর্ম্মবিষয়ক উদার আলোচনা সাধক জীবনে পরম সহায়ক।

ধর্ম্মের জন্য উন্মাদ কে নহে? এ বিপুল বিশ্বের মূল উপাদান কি? ধর্ম্ম নহে কি? আজ জীবন মরণ পণ করিয়া তরুণ যুবকমণ্ডলীকে এই ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিতে আহ্বান করি; এই নিগূঢ় ধর্ম্মের পথেই মানব জীবনের সকল সার্থকতা বিদ্যমান আছে। ভারতবর্ষ যদি কখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশ বলিয়া জগতে বিদিত হয়, যদি সে শৌর্য্যে, বীর্য্যে, সাহসে, সততায়, বাণিজ্যে, ঐশ্বর্য্যে, সকল দিকেই প্রভাবশালী হইতে চাহে, যদি মানবজাতির মুক্তির পথ আবিষ্কার করিবার সে স্পর্দ্ধা রাখে তবে তাহাকে ধর্ম্মের পথেই অবিচলিত চিত্তে অগ্রসর হইতে হইবে।

ভারতবর্ষের রাজনীতি, ভারতবর্ষের শিক্ষাদীক্ষা আচার ব্যবহার, ভারতবর্ষের সাধন ভজন, শুদ্ধি মুক্তি ভুক্তি সিদ্ধি, যাহা কিছু—সকলই এই ধর্ম্মের অন্তর্গত। ভারতবর্ষের শরীর প্রাণ মন সকলই ধর্ম্ম—জগদ্‌প্রাণ সমীরণ যেমন সর্ব্বব্যাপী, সেইরূপ ধর্ম্মই আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে ভারতবর্ষকে, অতএব ভারতবর্ষের ধর্ম্ম ভিন্ন গতি নাই। এই উদার বিরাট ধর্ম্মকে বুঝিতে হইবে, জানিতে হইবে এবং ইহাকে লাভ করিতে হইবে। ভারতবর্ষ যে মুহূর্ত্তে ধর্ম্মলাভ করিবে সেই মুহূর্ত্তেই মূর্ত্তিমান মুক্তি তাহার কণ্ঠে বরমাল্য প্রদান করিবে।

আজ গতানুগতিক খণ্ড ধর্ম্মের কুহকজাল ছিঁড়িয়া পূর্ণ-যোগাভিলাষী কে আছ ভারতের বীরপুত্র—বাহির হইয়া আইস, প্রাণশক্তির ঈশ্বর তুমি, নাক টিপিয়া সে তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার অবসর তোমার নাই। সর্ব্বপ্রথমে

বিশ্বাস কর আপনাকে—কেবল বিশ্বাস, সত্যের উপর অনন্ত বিশ্বাস—ধারণা কর তুমি তুচ্ছ নও, তুমি হীন নও, তুমি অবিনাশী—তুমিই তোমার দেহরাজ্যের অধিপতি, তোমার ইচ্ছায় তুমি মুক্ত হবে, সিদ্ধ হবে, নির্দ্বন্দ্ব হবে। নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ করিবার জন্য আত্মদ্রোহী যে সাধক খণ্ডবুদ্ধির অহঙ্কারে অনন্ত কালকে খণ্ডিত করিয়া উপাসনার সময় নির্ণয় করিয়াছে, অনন্ত ভগবানের অফুরন্ত রসাস্বাদন করিবার জন্য মানব বুদ্ধির চতুঃসীমায় যে সাধন ভজনকে বিধিবদ্ধ করিয়াছে—তাহা টান দিয়া দূরে নিক্ষেপ কর; ভারতবর্ষের যে ধর্ম্ম তাহার বিধি নাই, সে মুক্ত, ব্রহ্মাণ্ডের বিধি তার চরণ তলে প্রণত। ভারতবর্ষের ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, সত্য—এই পর্য্যন্ত; মুদ্রাযন্ত্র তার পদরেণুকেও প্রকাশ করিতে অসমর্থ, ভারতবর্ষের ধর্ম্ম প্রকাশ করিবার ভাষা নাই—সে অনির্ব্বচনীয়। এই বিরাটকে অবধারণ করিবার জন্য অবিদ্যাকুহকাচ্ছন্ন ভেদবুদ্ধি মানব জীবনের কয়েক ঘণ্টা ঈশ্বর উপাসনায় মগ্ন থাকিয়া ভগবদ্ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিতে উদ্যত, কি অহঙ্কার! কি তমঃগুণের পরিপূর্ণ বিকাশ! হে সাধক, আর মুহূর্ত্তকাল গতানুগতিকের আশ্রয়ে বিমুগ্ধ থাকিও না; ধারণা কর তোমার সমস্ত জীবনটাই সাধনা, তোমার জীবনটাই ধর্ম্মসাধনার বেদী, তোমার জীবনের মলমূত্র ত্যাগ হইতে ঈশ্বর আরাধনারূপ সকল কর্ম্মই ভগবদ্ পূজার উপচার—আর তোমার নৈনং ছিন্দতি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবক—যে অনাদি অক্ষর আত্মা সেই এই মহাযজ্ঞের পুরোহিত। আজ বলতন্ত্র শিঙ্গামুখে যে শক্তিমন্ত্র প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা শক্তিসাধনারত বঙ্গসন্তানকে সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করিতে হইবে। ভেদবুদ্ধিকে অপসারিত করিয়া অভেদভাবেই ভগবানকে লাভ করা যুগ ধর্ম্ম। আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই, মানুষ স্বতন্ত্র "আমির" ধারণায় যুগযুগান্তর একই পথ অনুবর্ত্তন করিতেছে—কেহ বাসনার দাস, কেহ আদর্শের দাস, কেহ খণ্ড খণ্ড দেবতার অধম ভৃত্যরূপেই লীলারত; আজ পূর্ণ লীলার জন্য আমাদের মধ্যে যে পরাৎপর পুরুষ বিরাজ করিতেছেন তাঁহাকে জাগাইয়া তোলাই আমাদের সর্ব্বপ্রধান সাধনা হউক। এই হইতেছে তাঁহার আদেশ---এই হইতেছে তাঁহার ইচ্ছা।

বাসনার কেন্দ্র হইতেছে প্রাণ, এই প্রাণ আমাদের প্রভু হইতেই পারে না। প্রাণ শক্তি আদর্শের অনুগত হইলেও আমরা নিরঙ্কুশ আনন্দের অধিকারী হইব না, কেননা মনও আমাদের পরিচালক নহে।

আশ্রয় করিয়া উঠিব ভগবানে, আমাদের মন প্রাণ শরীর পরিচালিত হইবে—ভগবানের ইচ্ছায়, আনন্দের প্রেরণায়। আমরা দ্রষ্টারূপে দেখিয়া যাইব—গুণাদিভেদে আমাদের যন্ত্রনিচয়ের সুখ দুঃখ, ক্রোধ ক্ষমা, প্রেম ঘৃণা প্রকৃতির বিকাশ—আমরা দেখিয়া যাইব আমাদের জীবনে প্রকৃতির অবাধ লীলা, তমের সঙ্কীর্ণতা, রাজসিকতার উদ্দাম কর্ম্মপ্রেরণা, সত্বের নির্ম্মল জ্ঞানলিপ্ত আনন্দ; আমরা উদাসীন রহিব—যতক্ষণ প্রকৃতির দৃঢ়বৈরিতা বর্ত্তমান থাকে, তারপর উপর হইতে প্রত্যাদেশের অভাব বুঝিয়া প্রকৃতি যখন প্রকৃতিস্থা হইবেন তখন তাহাকে পরিচালিত করিব আমারই ইচ্ছায় আনন্দের পথে। তাই বলি জীবনের মধ্যে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা যদি করিতে চাও স্থিতধী হইয়া অবিচ্ছেদ ধারণা কর তুমিই ঈশ্বর—তুমিই সাধক—তুমিই তোমার নিয়ন্তা।

বর্ণাশ্রম

নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ভারতবর্ষে নানাবিধ উন্নতির স্রোতঃ দেখা দিয়াছে—ধর্ম্ম, রাজনীতি, সমাজ, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ের উন্নতিকল্পে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিবিধ কর্ম্মস্রোতের মধ্যে ভারতের ভবিষ্যৎ গড়িয়া উঠিতেছে—ভারতবর্ষ জাতি গঠনের দিকে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—দেশে যতগুলি কর্ম্মপ্রবাহ দেখা দিয়াছে, এতদ্দিনে তাহার মধ্যে কোনটীই সুপ্রচলিত হইতে পারে নাই, কোনটীর গতিই অনাবিল নহে, অতি ক্ষীণ ভাবে ধীর ও মন্থর গতিতে জটিল পথেই ছুটিয়া চলিয়াছে। জাতির এই সকল জীবনী-স্রোতকে একটি বিশাল ও বিস্তীর্ণ স্রোতে পরিণত করিতে না পারিলে পথের মাঝে সবগুলিই শুকাইয়া যাইতে পারে।

• • •

আমাদের মনে হয়—দেশের রাজনীতিক আন্দোলন যত বড় করিয়াই আরম্ভ করি না—সমাজ সংস্কারের জন্য যত জোর করিয়াই বক্তৃতা দিই না—ব্যবসা, বাণিজ্য বিস্তার উদ্দেশে যত যৌথ কারবারের সৃষ্টি করি না—সকলই পণ্ড হইবে যদি ভারতের এক সনাতন ভাবের মধ্যে এইগুলিকে না ফেলা হয়। সেই সনাতন ভাব হইতেছে ভারতের বর্ণাশ্রম।

• • •

এই বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্ত সম্প্রতি দেশে এক হুজুগ আসিয়াছে, শত শত শিক্ষিত ব্যক্তিকে একত্র করিয়া যাহার কিছু বলিবার শক্তি আছে —তিনি এই বক্তৃতা করেন আর সংবাদ পত্রে সপ্তাহ ব্যাপী তাহারই আন্দোলন চলিতে থাকে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমরা এত উন্মার্গগামী হইয়াছি, এত লঘুচিত্ত হইয়া পড়িয়াছি যে আমাদের প্রাচীন ভাবগুলি গ্রহণ করিবার সামর্থ্য ত দূরের কথা সেগুলি ভাবিতেই পারি না। আমরা অতীতের শিক্ষা বিস্মৃত হইয়া য়ুরোপের অনুকরণে আমাদের সকল অনুষ্ঠানগুলি আরম্ভ করিয়া দিই—পরে নাস্তানাবুদ হইয়া আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই পড়িয়া থাকি।

• • •

ব্রাহ্মণের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের শক্তি, বৈশ্যের বাণিজ্য, শূদ্রের সেবা—এই চতুবর্ণের পূর্ণ বিকাশই জাতিকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলে, এই চতুবর্ণের গুণাভাব ঘটিলে জাতির পতন হয়। দেশের বাণিজ্যনীতি যদি লোপ পায়, শূদ্রের সেবাভাব যদি অন্তর্হিত হয়, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শক্তি তাহার পুনরুদ্ধার করিতে পারে, কিন্তু ক্ষাত্র শক্তি অথবা ব্রাহ্মণ্য তেজ যদি কোন কারণে নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে জাতির মধ্যে বর্ণসঙ্কর দেখা দেয়—ধীরে ধীরে সে জাতি অবনতির অধম পদবীতে গিয়া উপস্থিত হয়। ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ্য শক্তিই লোপ পাইয়াছে—তাই ভারতের এই শোচনীয় অধঃপতন।

• • •

লেখক এই বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে প্রবর্ত্তকের প্রথমবর্ষে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছে—এতদ্‌সম্বন্ধে এ ক্ষেত্রে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন, তবে বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠার মধ্যেই যে জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতি প্রসুপ্ত আছে একথা অবশ্য স্বীকার্য্য এবং এই বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্যই আজ সমগ্র দেশকে উদ্যোগী হইতে হইবে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মধ্যে যে গভীর জ্ঞান যে বিপুল শক্তি যে অতুল ঐশ্বর্য্য যে অকপট সেবা লুক্কায়িত আছে—তাহার বিকাশ সাধন করিয়া ভারতের সনাতন ধর্ম্মের স্রোতকে প্রবল করিয়া তুলিতে হইবে, এবং দেশের আধুনিক সর্ব্ববিধ আন্দোলনকে এই বিরাট বিপুল প্রবাহের মধ্যে আনিয়া ফেলিতে হইবে। শ্রীভগবান এই পথেই দেশের গতি নির্দ্দেশ করিতেছেন। ভারতবর্ষকে অতীতের শিক্ষা ভুলিলে চলিবে না, বর্ত্তমানের শিক্ষা

নানা দেশগত হইলেও উহা ভারতীয় ভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে এবং ভবিষ্যতে ভারতীয় ভাবের প্রতিষ্ঠার জন্ত তাহার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। আজ পাশ্চাত্য আমাদের সম্মুখে গর্ব্ব করিয়া বলে যে সর্ব্বকর্ম্মে ভগবান্ ভগবান্ করিলে চলিবে না—রাজনীতি ক্ষেত্রে, ব্যবসা বাণিজ্য শিল্পে ভগবানের স্থান নাই, ভগবান আছেন ভজনালয়ে অবসর মত তাঁহার সন্ধান করা যাইবে; হিন্দু যেন এ কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া আবার বিপথে গমন না করে। বুকানিন্ টলষ্টয় প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষীগণের শিক্ষায় য়ুরোপে যে সোসালিজম্, এনার্কিজম্ দেখা দিয়াছে তাহা এই ঘোর নাস্তিকতার চরম ফল। ভারতবর্ষের পুণ্যপূত জীবনে যে আজ বিপ্লববাদের চিহ্ন নিহিত হইল ইহাও পাশ্চাত্যানুকরণে আমাদের জীবনগতি নির্দ্দেশের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

* * *

একণে আমাদের মধ্যে ব্রহ্মণ্য শক্তিকেই বরণ করিয়া লইতে হইবে, কলিযুগে অশুদ্ধ শূদ্র শক্তিই প্রবল হইয়া থাকে—এই ভাবাপন্ন শূদ্র জাতির মধ্যে অবনত ব্রহ্মণ্যতেজও সংহৃত হইয়া আছে, এই বিশাল সমাজের আলোড়নে আবার ব্রহ্মতেজ আবির্ভূত হইবে; তথাকথিত ব্রাহ্মণ সমাজ সঙ্ঘবদ্ধ হইলেই যে দেশের ব্রহ্মতেজ পুনঃ জাগরিত হইবে, এমন কোন কথা নাই। স্বামিজী কায়স্থ সন্তান হইলেও তাঁহার দিব্য ব্রহ্মণ্যশক্তিকে অবহেলা করে এমন কোন লোক দেখি না। জাগাও দেশের ব্রহ্মশক্তি এই ব্রহ্মতেজেই ইন্দ্রজালের মত সৃষ্টি করিয়া তুলিবে দেশের অপরাজেয় মহাশক্তিকে—একটু চক্ষু বুজিয়া দেখ একা স্বামিজীর আবির্ভাবে সহস্র বৎসরের জড়তা অপসারিত করিয়া ধীরে ধীরে জাতির মধ্যে লুপ্ত ঐশ্বর্য্যের পুনঃ বিকাশ সম্ভব হইবার আশা দেখা দিয়াছে; আংশিক ভাবেও যদি দেশ এই বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্ত আজ ব্রাহ্মণ হইবার [illegible] করে অচিরেই আংশিক ফল লাভ করি[illegible] হইতে চায় ইহাই ভগবানের ইচ্ছা, ইহাই তাঁহার [illegible] হে ভারতবর্ষ! আবার তুমি ব্রাহ্মণ হও, তোমারি শক্তি দিয়ে ভারতে বর্ণাশ্রমে প্রতিষ্ঠা হইবে।

বীর-পূজা

(চন্দননগরের ভলেণ্টিয়ারগণের সাম্বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে)

প্রেম নিষ্কাম. আপনাহারা, অহং লেশশূন্য ঈশ্বর প্রেম—ভারতের নবজীবনের ইহাই সর্ব্বোত্তম আদর্শ, কেন্দ্রস্থানীয় মূলমন্ত্র—এ বিষয়ে বস্তুতঃ কোনও সংশয়ই থাকিতে পারে না। বুদ্ধের দেশে, শ্রীচৈতন্যের দেশে, বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলে, কে এমন মূর্খ, অন্ধদৃষ্টি আছে যে এই আদর্শ, এই লক্ষ্য অস্বীকার করিবে ?

তবে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, প্রেম হীন দাস্যবৃত্তি নহে, শূদ্র ও বৈশ্য কখনও বিশুদ্ধ প্রেমকে অবিকৃত ভাবে ধারণা করিতে পারে না। কারণ হীনত্ব, পরমুখাপেক্ষিত্ব, বণিগ্‌বৃত্তি—এ সকলগুলিই প্রেমের চিরশত্রু। ভীরু, দুর্ব্বল, সদাতঙ্ক পীড়িত কাপুরুষের প্রেম—প্রেমই নয়। দুর্ব্বলতা ও প্রেম সুমেরু ও কুমেরুর মত একস্থানে কখনই থাকিতে পারে না। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—ক্ষুদ্রপ্রাণ প্রেমের অধিকারী হইতেই পারে না। ব্রাহ্মণই বিশুদ্ধ ঈশ্বর প্রেমের যোগ্য আধার, প্রকৃত অধিকারী। কিন্তু যে দেশে ক্ষত্রিয় নাই, সে দেশে ব্রাহ্মণের বিশুদ্ধি ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত টিঁকিতে পারে না। আমাদের এই দেশে, এই শূদ্র প্লাবিত, পরমুখাপেক্ষী দেশে, নিদারুণ অর্থকষ্ট প্রপীড়িত দেশে,—সেই নির্ম্মল প্রেম-শতদল প্রস্ফুটিত হইলেও তাহার সৌরভবিস্তার, তাহার যোগ্য-মর্য্যাদা, তাহার সফল আত্মবিকাশ কিছুতেই সম্ভবে না। ভারতের এই যে শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য, এই অধ্যাত্মসম্পদ, এই ভগবৎ প্রেম,—ইহাকে যদি সুমার্জ্জিত, সুকর্ষিত ভূমিতে, অনুকূল জলবায়ু সংযোগে যথার্থ ফলপ্রসূ করিয়া তুলিতে হয় তবে এ দেশে ক্ষাত্রবীর্য্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে।

আশার কথা, ভগবানের করুণায় এ দেশের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি ধীরে ধীরে মানুষকে এই কথাই হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেছেন। সেদিন, এই সাম্যমৈত্রীস্বাধীনতার বিজয়-লীলা-স্থল ফরাসী ভূমি হইতে, ভিক্টর হিউগো, কোম্‌ৎ, নেপোলিয়ানের জাতির আহ্বানে এই চন্দননগরেই বাঙ্গালী প্রথম ক্ষাত্রশক্তির উপাসনায় অধিকার লাভ করিয়াছে। শতাব্দীরও অধিক কাল পূর্ব্বে অসামান্য প্রতিভাশালী ডুপ্লে মহোদয় ভারতীয় সিপাহীকে সর্ব্বপ্রথম রণশিক্ষায় কুশলী অদ্বিতীয় সেনাবাহিনীতে পরিণত করিয়া যে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন—আবার এই নবীন যুগে ২৬ জন ভলাণ্টিয়ারকে সর্ব্বপ্রথম ইউরোপের রণরঙ্গ ভূমে অগ্নিক্রীড়ার অবসর দিয়া উদার হৃদয় ফরাসী গভর্ণমেণ্ট তেমনি হৃদয়ের বিশালতার পরিচয় দিয়াছেন,—সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার চির কলঙ্ক দূরীভূত হইবার পথ প্রথম উন্মুক্ত করিয়া সমগ্র জাতির অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন—বাঙ্গালীর ক্ষাত্রশক্তির নব-উদ্বোধন ঘটাইয়া সমগ্র ভারতের ইতিহাসে একটা নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত করিয়া দিয়াছেন। আজ ভারতের সর্ব্বত্র যে সেনাবাহিনী গঠনের বিরাট উদ্যোগ চলিয়াছে, শিক্ষিত ভারতবাসী মিত্রশক্তির বলবৃদ্ধিকল্পে আজ যে নূতন সৈনিকাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার মূলে এই ক্ষুদ্র ফরাসী উপনিবেশের রণোদ্যম যে কতদূর শক্তি সঞ্চার করিয়াছে, বাঙ্গালীর অন্তর্নিহিত আশালতাকে জলসেকে কতদূর পরিবর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছে, যাঁহারা সেই সময়ের "অমৃতবাজার পত্রিকা"র নিয়মিত পাঠক ছিলেন, তাঁহাদের তাহা অবিদিত নাই।

সেই ২৬ জন বীর, সেই ২৬ জন অগ্রণী যুবক আজ এক বৎসর ধরিয়া কঠোর একনিষ্ঠ তপস্বীর মত রণকৌশল শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছেন, ইস্যাম্‌স্‌, স্ফ্যাক্‌স্‌, বাইজার্ত প্রভৃতি স্থান সমূহে অবস্থান করিয়া পদাতিক, বন্দুক, গোলন্দাজী শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন, আজ বুঝি তাঁহারা রণ-প্রান্তে রক্তলীলায় যোগদান করিতে সত্যই চলিয়াছেন, এ সংবাদও আসিয়াছে। এই এক বৎসর তাঁহারা কি ভাবে কাটাইয়াছেন, সেই বীর নায়ক হারাধন বক্সির স্বলিখিত কাহিনীই একটু উদ্ধৃত করিয়া দেখাই—

অপর দিকের কথাও শুন। অনেক দিন ধরে নিয়ম, রীতি, প্রণালীর পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফলে আমরা পদাতিকের শিক্ষা হর্দ্দমুর্দ্দ করে ছেড়ে দিতে পেরেছি, সঙ্গে সঙ্গে চারিমাস ধরে সমর বিদ্যালয়ে পড়িয়া যত উচ্চ কর্ত্তব্য

সে সকলও আয়ত্ত করেছি, সে বিদ্যালয়ের পরীক্ষা সমূহেও প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হতে পেরেছি। তার পর আমাদের মধ্যে প্রেমের দুর্গ সুদৃঢ় করে তুল্‌তে, পরস্পরকে বুঝ্‌তে, পরস্পরের আত্মোৎকর্ষ সাধন কর্‌তে, আমাদের সমষ্টিকে আরো দুর্ভেদ্য ভিত্তির উপর স্থাপন কর্‌তে সমর্থ হয়েছি। আবার এর মধ্যে আমরা সমগ্র টিউনিস্ প্রদেশটি দেখা শেষ করেছি, মিশরবাসীদের চরিত্র ও সভ্যতার অন্তর্ভেদ কর্‌বার চেষ্টা করেছি উপরন্তু যেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের দুর্গ রক্ষা কর্‌তে হত, সেখানকার সামরিক শৃঙ্খলা, অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ স্থান প্রভৃতিও দেখেছি, জেনেছি; লোকে কেমন করে ছিন্ন-বস্ত্র পরে, না খেয়েও যুদ্ধ কর্‌তে পারে, প্রবাসী সৈনিক মাতৃভূমি হইতে দূর বিদেশে এসে কি ভাবে বিদেশীয়দের মধ্যে কাটিয়ে থাকে, যুদ্ধ বিপর্য্যস্ত কত দেশ বিদেশের প্রত্যক্ষ কাহিনী—এই রকম কত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কর্‌তে কর্‌তে ঘটনাবহুল, কর্ম্মসঙ্কুল জীবনের মধ্য দিয়ে আমার দুঃসাহসী বীর সহচরবৃন্দের সহিত উপকথার Ulysesএর মত ভেসে চলেছি * * * আমরা এখন কামান শিক্ষা করিতে যাচ্ছি, কিন্তু আমাদের বেশী ইচ্ছা যায় বন্দুক স্কন্ধে ইউরোপের রণরঙ্গপ্রান্তে বিচরণ কর্‌তেই, তখন মাইল মাইল দূর থেকে বিজ্ঞান সৃষ্ট এই রহস্যময় নালিকামুখের সাম্‌নে মানুষগুলার মরণ যজ্ঞ দেখে উপেক্ষার হাসি হাসা যেত * *”।

ইহাঁরা ত চলিয়াছেন--বাঙ্গালীর প্রথম রণযজ্ঞের পুরোহিত, বাঙ্গালীর ক্ষাত্র বীর্য্যের সাধনার অগ্রণী সাধক—আত্মাহুতি দানে বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিতে, বিশ্বমানবের একত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া,—ইহাঁরা ত চলিয়াছেন। কিন্তু কর্ত্তব্য ফুরায় নাই, আমরা সাম্বৎসরান্তে তাঁহাদের পুণ্যস্মৃতি স্মরণ করিতে উদ্যোগী হইয়াছি, কর্ত্তব্য কিন্তু এই খানেই সব শেষ করিলে চলিবে না। বীরের যোগ্য আবাহন বাক্‌পটুতায়, সভাতল ধ্বনিত করিয়া করতালিশব্দে হয় না, বীরের যোগ্য মর্য্যাদা যাহাতে যোগ্যতার সহিত আমরা রক্ষা করিতে পারি, সে বিষয়ে আমরা কি চেষ্টা করিলাম? বস্তুতঃ, যাঁহারা নাম যশের আকর্ষণে মহৎ আত্মদানে অগ্রসর হয়েন নাই, তাঁহাদের নামগুণ গানের দ্বারা কখনও উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষা হইতে পারে না। আমরা কই বীর্য্যের উপাসনায় বীরের সম্মান রক্ষা করিলাম? হীন পরমুখাপেক্ষিতা, চিরাভ্যস্ত জীবন যাপন

ছাড়া কই মহৎ উদার ক্ষত্রিয় দীক্ষায় দীক্ষিত হইতে প্রচেষ্ট হইলাম—বীর্য্য, সাহস, রণকৌশলকে বরণ করিয়া লইয়া কই জাতির মধ্যে অলৌকিক প্রেমাধার ব্রহ্মণ্য শক্তির আবির্ভাবের অনুকূল ক্ষেত্র সৃষ্টি করিতে পারিলাম? ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুনের দেশে কেন জাতীয়জীবনের এই অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গটি উপেক্ষণীয় কোণটুকু মাত্র আশ্রয় করিয়া রহিল? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চতুরঙ্গ জাতীয় জীবন, একটীর উপেক্ষাতে জাতীয় জীবন পঙ্গু হইয়া পড়ে—বিশেষতঃ যদি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের অভাব ঘটে, সে জাতির তবে আর আশা ভরসা কিছুই থাকিতে পারে না। কারণ ইহারাই জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় থাকিলে, ইঁহারা অপর বর্ণদ্বয়কে সৃষ্টি করিয়া লইতে পারেন, কিন্তু ইঁহাদের অভাব ঘটিলে জাতির মৃত্যু আসন্ন, অনিবার্য্য। তথাকথিত ব্রাহ্মণ, তথাকথিত ক্ষত্রিয়ের কথা বলিতেছি না—কিন্তু সেই তপস্তেজোদ্ভিন্ন ললাট, সরল, ভগবৎ প্রেমিক, আর সেই প্রচণ্ডবিক্রমশালী স্বজাতি, স্বদেশ, স্বধর্ম্মের রক্ষাব্রতে সর্ব্বত্যাগী বীর—কই আমাদের সমাজ মধ্যে ইঁহাদের সুপ্রতিষ্ঠা, আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে সেই তপস্থা, সেই শৌর্য্যবীর্য্য, সেই সমুচ্চ গুণ ও কর্ম্মের প্রভাব কোথায়? চারিদিকে চাহিয়া দেখ সেই অসাড় সমাজ তেম্নি অসাড়ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে, সেই গতানুগতিক জীবন প্রবাহ, সেই সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভীরুতা কাপুরুষতা, সেই শূদ্র চরিত্র, সেই বণিগ্‌বৃত্তি। মাতার অঞ্চলাশ্রয়ের মধ্যে, রমণীর বাহুলতিকার মধ্যে সকল তেজ, সকল তপস্যা অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে--গড্ডলিকা প্রবাহের মত উচ্চাকাঙ্খাশূন্য দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত জীবনস্রোতঃ—ইহা ছাড়া আর ত কিছুই চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিগোচর হয় না।

তাই, আজ যদি যুদ্ধগত সেই বীরবৃন্দের যথাযোগ্য স্মৃতিপূজা করিতে চাই, যদি সত্য সত্যই আমাদের জাতীয় জীবনকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, মহান্ সুপরিপুষ্ট করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে এই তামসিকতা পূর্ণ জীবনে শক্তির ঝন্‌ঝনা বাজাইয়া তুলিতেই হইবে, যুগধর্ম্মের প্রভাবকে শিরোধার্য্য করিয়া কঠোর প্রযত্নের সহিত ক্ষাত্রশক্তির উদ্বোধন পূর্ব্বক, আমাদের জাতীয় জীবনে ব্রহ্মণ্যশক্তির পূর্ণাবির্ভাব সম্ভব করিতেই হইবে।

তখনি তিনি পূর্ণ প্রকটিত হইবেন—যিনি যুগে যুগে ভূভার হরণ করিতে আসেন, সেই কেশীনিধন, মধুসূদন, মুরারি—তখনই সফল হইবে তাঁহারই

অঙ্গুলী হেলনে ভারতের জীবনব্রত—সেই কৃষ্ণ প্রেমের সিদ্ধি; আর যে দিন ভারতের এই আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্য মিত্রশক্তির বাহ্যৈশ্বর্য্যের সহিত সংযুক্ত হইবে—জগতের পক্ষে সেই দিনই মহা কল্যাণের দিন।

পূর্ণ-যোগ

৬

মার্গত্রয়ী—কর্ম্মযোগ

কর্ম্মযোগী কর্ম্মজীবনের মধ্য দিয়া ভগবানকে আরও বাস্তব, আরও প্রকট করিয়া দেখেন। ভগবান জ্ঞাতামাত্র নহেন, শুধু ভোক্তাও নহেন, তিনিই আবার নিয়ন্তা,ঈশ্বর। তিনিই বিরাট কর্ম্মী—এ কর্ম্মশীল জগৎ তাঁহারই বিরাট অঙ্গ সঙ্কলনা। ভগবানের যে স্পষ্টতম স্থূলতম প্রকাশ, জাগতিক প্রতিষ্ঠানে মানুষ যাহার সহিত ওতঃপ্রোত ভাবে মিশ্রিত, যাহা ব্যতিরেকে কেহ ক্ষণকালও তিষ্ঠিতে পারে না, সেই কর্ম্মরাজীর মধ্য দিয়া কর্ম্মযোগী ভগবানের সহিত সংযুক্ত হইতে চাহেন। কর্ম্মযোগে তিনটি ধাপ লক্ষ্য করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, জীবনের প্রতি কর্ম্ম, যে অবস্থায় যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যেই সাধক থাকুক না কেন তদুচিত প্রত্যেক কর্ত্তব্য করিতে হইবে ভগবানকে উদ্দেশ্য করিয়া, প্রত্যেক কর্ম্মটি পুষ্পাঞ্জলিস্বরূপ তাঁহারই চরণে নিবেদন করিতে হইবে। কারণ মানুষ সাধারণতঃ কর্ম্ম করে অহংকারবিমূঢ় হইয়া, এই অহংকারই তাহার ও ভগবানের মধ্যে একমাত্র অন্তরায়. এই অহংকারের দেউলটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াই তাহাকে অনন্তের বৃহৎ বিসারে চলিয়া যাইতে হইবে। তাই নিজের জন্য নয়, নিজের লাভালাভ, সুখ দুঃখ, জয়পরাজয়ের প্রতি উদাসীন হইয়া, শুধু কর্ম্মের জন্যই কর্ম্ম, ভগবান চাহিতেছেন তাই করিতেছি—এই ভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে। কর্ম্মযোগের ভিত্তি হইতেছে এই ফলাকাঙ্খা শূন্য হইয়া কর্ম্ম করা—আত্মসমর্পণ ও নিষ্কামতা। তারপর এই আত্মসমর্পণ ও নিষ্কামভাব যখন পূর্ণতর দৃঢ়তর হইয়া উঠে তখন ফলাফলের জন্য কোন অপেক্ষা ত থাকেই না, কর্ত্তব্যের জ্ঞান

কর্ম্মের উপর অধিকারও মুছিয়া যায়। আমার করণীয় অকরণীয় কাজ বলিয়া কিছু নাই, আমার উৎসর্গ করিবার কিছু নাই, কারণ আমি নিজে কিছু করিতেছি না। ভগবানই আমার দ্বারা তাঁহার কর্ম্ম করিয়া লইতেছেন। তাঁহারই বিরাট শক্তি তখন সাধকের মধ্যে আবির্ভূত হয়, সাধক তখন স্বতন্ত্রতাবিহীন যন্ত্রটির মত ভগবানের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিয়া চলে, বাত্যামুখে তদ্‌গতপ্রাণ পত্রটির মত ঘুরিয়া চলে। আমি তখন কর্ত্তা নহি। আমি দ্রষ্টা, পুরুষ দেখিতেছে মাত্র, প্রকৃতিই সব করিতেছে। শেষ অবস্থা তখন যখন ভাগবত প্রকৃতির পূর্ণ প্রেরণা সাধকের মধ্যে কর্ম্ম করিয়া চলে। তখন আমি বোধ নাই। আমার দৃষ্টি নহে, ভগবানের দৃষ্টি। আমি মিশিয়া গিয়াছে পরমপুরুষে, এ দেহ মন প্রাণ মিশিয়া গিয়াছে দিব্য প্রকৃতিতে। পরমপুরুষের ঈষণাতেই চলিয়াছে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত গ্রথিত আমার ব্যক্তিগত প্রকৃতি। ভগবান তখন শুধু আমার সংস্কারগত প্রেরণা ধরিয়া, আমার পারিপার্শ্বিক নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যের অনুসারেই কর্ম্ম করেন না, উহাদের মধ্যেই আপনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখেন না। তিনি নিজের অলৌকিক ঐশী শক্তির দ্বারা তাঁহারই অভিপ্রায় অনুসারে নূতন প্রেরণার মধ্যে নূতন কর্ম্ম ফুটাইয়া তুলেন।

কিন্তু সাধারণতঃ কর্ম্মযোগী কর্ম্ম করেন কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইবার জন্য। জীব বদ্ধ, কারণ তাহার কর্ম্ম আছে। কর্ম্মের নাশেই তবে নিঃশ্রেয়স কৈবল্য। তবে কর্ম্মের নাশ সম্ভব কর্ম্ম হইতে বিমুখ হইয়া নয়। কর্ম্ম করিয়াই কর্ম্ম ক্ষয় করিতে হইবে। কিন্তু অহংকারের দ্বারা কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্তি নাই। তাই যে কর্ম্ম কর সবই ভগবানের যজ্ঞমূর্ত্তিতে আহুতি প্রদান কর। এইরূপেই সকল কর্ম্ম ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। ভিতরে কর্ম্মের বীজ নষ্ট হইলেও যতদিন দেহ থাকে ততদিন পূর্ব্ব সংস্কারের প্রেরণা বশতঃ দেহ কিছুদিন কর্ম্ম করিয়াই চলে। কিন্তু এ দেহও শেষে ভাঙ্গিয়া পড়ে, পঞ্চভূতের বন্ধনটুকুও তখন টুটিয়া যায় তখন তুমি চলিয়া যাও তোমার স্বরূপে, আর তোমাকে সংসারচক্রে ঘুরিতে হয় না। তখনই তোমার পূর্ণ সিদ্ধি। সাধারণ কর্ম্মযোগীর ইহাই আদর্শ।

কিন্তু কর্ম্মযোগকে এইরূপ সঙ্কীর্ণ করিয়া না লইলেও লইতে পারি। কর্ম্ম কিছু বন্ধনের কারণ নয়। বন্ধনের কারণ অহংকার ও অজ্ঞানতা। কর্ম্ম ভগবানেরই স্বরূপ হইতে উৎসারিত হইয়াছে। চিৎশক্তির স্ফূর্তিই যে

কর্ম্মে বিলসিত, ভাগবত আনন্দই কর্ম্মে লীলায়িত। অহংকার বিনাশ কর, অজ্ঞানতা দূর কর কিন্তু সেই সঙ্গে কর্ম্মও যে বিনষ্ট দূরীভূত হইবেই তাহা নয়। কারণ কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা আরও সত্য ও গভীরতর প্রদেশে। প্রকৃত কর্ম্মযোগ আমাদিগকে বরং ইহাই শিক্ষা দেয় অহংকার অজ্ঞানতা ভিতরের ময়লা দূর হইলে কর্ম্মের স্রোত শুদ্ধতর বিপুলতর হইয়াই ছুটিয়া বাহির হয়। মুক্তির পরেই বস্তুতঃ যথার্থ কর্ম্ম সম্ভব, ভিতরে ব্রাহ্মী স্থিতিকেই অব্যাহত রাখিয়া বাহিরে কর্ম্মজীবনের বিরাট খেলাটি সৃষ্টি করিয়া চলিতে পারি। তখন যে কর্ম্ম করি তাহা আমার অন্তরাত্মার, তুরীয়ের, ভাগবত প্রতিষ্ঠার কর্ম্ম—স্থানু মুক্ত অনন্ত সত্তাকে পশ্চাতে জাগ্রত রাখিয়া যে সচল শক্তি প্রকট হইয়াছে।

এখন আমরা বুঝিতে পারিব দুইটি কারণে মার্গত্রয়ী আমাদের পূর্ণ সন্তোষ দেয় না। প্রথমতঃ ইহাদের লক্ষ্য শুধু আধ্যাত্মিকতার, স্বরূপের নগ্নতা। অধিভূত যাহা, রূপ যাহা তাহার পরিপূর্ণতাও যে আধ্যাত্মিকতা এ কথা ইহারা ধরিতে পারে নাই। দ্বিতীয়তঃ জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্ম মানুষের এই তিনটি বৃত্তি ওতঃপ্রোতভাবে সংযুক্ত। জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ বলিয়া পৃথক পৃথক পন্থা নির্দ্দেশ করা কৃত্রিমতার সৃষ্টি মাত্র। প্রকৃত জ্ঞানী যে ঈশ্বরে পরানুরক্তি তার আপনা হইতেই হয়। এবং ভগবানকে যে ভালবাসিয়াছে জ্ঞান তাহারই মধ্যে ফুটিয়া উঠে। জ্ঞানের, প্রেমের, সার্থকতা কর্ম্মের মধ্যে—কর্ম্মী যিনি তাঁহার কর্ম্ম বিধৃত জ্ঞানের মধ্যে, প্রেমের মধ্যে। পূর্ণভাবের সাধক জ্ঞান প্রেম কর্ম্ম যুগপৎ চাহেন, আপনাকে কাটিয়া ইহার কোনটিকে একেবারে উপেক্ষা করিতে বা ইতর স্থান দিতে তিনি প্রস্তুত নহেন।

বিভিন্ন যোগপন্থার বিশেষ গুণ কি তাহা আমরা দেখিলাম, অভাবই বা কোথা তাহাও দেখিয়াছি। আমরা এখন কোন্ পন্থা অনুসরণ করিব? আমাদের অন্তর বাহিরের সকল স্তর, আমাদের সকল সত্তা সকল শক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি চাই। ভগবানকে আমরা সর্ব্বতোভাবে চাই, স্বরূপের নগ্নত্বে তাঁহাকে চাই, রূপের ঐশ্বর্য্যেও তাঁহাকে চাই। এই উদ্দেশ্য কল্পে হঠযোগ রাজযোগ প্রভৃতি প্রত্যেক পন্থারই কিছু না কিছু দান করিবার আছে। তবে কি সকলগুলিই আমাদিগকে যুগপৎ অভ্যাস করিতে হইবে? কিন্তু ইহা সম্ভব নয়। পন্থাগুলিকে এত বিভিন্ন প্রকৃতির করিয়া

সৃষ্টি করা হইয়াছে, প্রত্যেকের আপন আপন নিয়ম, প্রক্রিয়া, তাহারা এমন পরস্পর বিরোধী, এত সূক্ষ্ম, এত জটিল, যে সবগুলিকে অভ্যাস করিতে গেলে আমরা এক বৃহৎ অপায়ের সৃষ্টি করিব মাত্র। একটির পর একটি করিয়া ক্রমে ক্রমে সবগুলি যে আয়ত্ত করিব তাহাও সম্ভব নয়। এক জীবনে ত নয়, বহুজীবনেও তাহা সুদুষ্কর।

আমাদিগকে এমন একটি তত্ত্ব বাহির করিতে হইবে যেখানে সকল পন্থার সামঞ্জস্য, এমন একটি সূত্র ধরিতে হইবে যাহাতে সব পন্থাগুলিরই গূঢ়তম রহস্য বিধৃত। এমন বস্তু যদি কিছু পাই তাহাই আমাদের আদর্শের উপযোগী। যোগমার্গাবলীর বাহ্য অঙ্গগুলি আমরা পরিত্যাগ করিব, অবান্তর ঠাট যাহা তাহা দূরে রাখিব। এমন একটি সজীব সত্যকে ধরিব যাহা সকল পন্থার প্রাণ, যাহা সকলকেই পূর্ণতায় ভরিয়া ধরিতে পারে। এই মূল সত্যটীর আলোকেই আমরা বুঝিতে পারিব কোন্ পন্থার কতটুকু গ্রহণ করিতে হইবে, কতটুকু বর্জ্জন করিতে হইবে, ঠিক কি ভাবে আমাদিগকে চলিতে হইবে।

উন্মাদ

আজ বাঙলায় হাজার হাজার লোককে উন্মাদ হতে হবে। উন্মাদ হতে হবে বলি কেন? তা না হলে পৃথিবীর যে অধোগতি—তার যে সেই দিকে প্রবল আকর্ষণ—তা থেকে পরিত্রাণ কেউ পাবে না। কীট পতঙ্গের যে বৃত্তি—দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করেও সেই হীন বৃত্তি থেকে এক পাও অগ্রসর হতে পারি না, সেই আহার নিদ্রা ও মৈথুন। এমন নবীন কে আছ, বল দেখি, যার জীবন-পদ্মের একটি পাপড়িও নির্ম্মল আছে, নিদাগ আছে, বীর্য্যোৎপত্তি না হতে হতেই, কামের দুর্জ্জয় বহ্নি জীবন-কোরক শুষ্ক করে দেয়, পৃথিবীর বুকে আপনার সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাণ ভরে ফুটিয়ে তুলতে পারি না।

আজ তাই উন্মাদ হতে চাই। ভগবদ্ প্রেমে উন্মাদ হতে চাই, ভগবদ্ ভাবে বিভোর হতে চাই—বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভগবদ্ পরিচয় লাভ করতে চাই, প্রাচীনদের উপদেশ দূরে পরিহার করে নবীনদের আজ এই অসাধারণ কার্য্যে অগ্রসর হতে হবে।

যে দেশে প্রহ্লাদ জন্মেছিল, ধ্রুব জন্মেছিল, সে দেশের বালক বালিকাগণ মাতৃস্তন্য পানের সঙ্গে সঙ্গে ভগবদ্ রস পান করিবে। যদি দেশকে জাতিকে সুমহান্ কর্‌তে চাও অচিরে প্রত্যেক কর্ম্মীকে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ কর্‌তে হবে।

আর গতি নাই—ভগবদ্ রস যতশীঘ্র পার আস্বাদ কর, অমর হবে, অভাবনীয় শক্তি লাভ করবে। ভগবদ প্রেমে উন্মাদ হও, পৃথিবীর জঞ্জাল ভবে ঝাঁটিয়ে ফেল্‌তে পারবে। উন্মাদ হতে হবে বলে ভয় পেয়ো না—তুমি একেবারে উন্মাদ—দু'হাতে মল মূত্র ঘাঁটছ, সমস্ত দেশটার মাথা বিগ্‌ড়ে গেছে তাই নিজ নিজ দুরবস্থা বুঝতে পার্‌ছ না, চিটে গুড়ে মাছির মত সংসারে হাবুডুবু খাচ্ছ। অমৃতের সন্ধান কর—তাতে পড়লে হাত পা জুড়ে যাবে না, নূতন জীবন লাভ কর্‌বে—অমর হবে--নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ পাবে,

শক্তি পাবে—তখন কাটি করে আর আর মানুষগুলোকে সংসার চিটেগুড় থেকে কাণায় তুল্তে পারবে।

ভারতের সাধনাই হচ্ছে ভগবদ্ সঙ্গ লাভ করা, ভারতের সকল ঐশ্বর্য্য উৎসর্গ করতে হবে এই ভগবদ্ চরণে, তা না হলে সমস্ত উপকার শূকরের বিষ্ঠার মত জগতের কোন কার্য্যেই আসবে না। ভারতের বিপর্য্যয় অবস্থাই হয়ে উঠেছে স্বাভাবিক, তাই সনাতন চরিত্র লোকচক্ষে অসাধারণ বলেই মনে হচ্ছে। আজ এই অসাধারণ চরিত্রই লাভ করতে হবে, দেশের কাণ্ডজ্ঞানশূন্য পাগলের দল তোমায় উন্মাদ বলবে, তা বলুক, আজ উন্মাদই হতে হবে।

আমরা উন্মাদ হব এই সংসারকে আনন্দ দিয়ে গড়ে তোলবার জন্য; মানুষের গতানুগতিকের তীব্র আকর্ষণ ভেঙ্গে চুরে ধুলায় পরিণত করবার জন্য। ভারতের যে আনন্দময় ভবিষ্য যুগ তাকে আন্‌তে হলে আমাদেরই ভগবানের হাতের যন্ত্র হতে হবে, তারই প্রেরণা বলে আমরা উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবো।

অমৃতের আস্বাদ না পেলে আমাদের চিটে গুড় খেয়েই থাক্‌তে হবে। ভগবদ্ প্রেম লাভ না কর্‌লে বিভ্রান্তকারী কামের আশ্রয় নিতেই হবে। নিগ্রহে, শাস্ত্রপাঠে, সদুপদেশলাভে কিছুই হবে না; যুগ প্রভাবে যে জগতের বুকে উপবেশন করে রক্ত পান কচ্ছে, সে অন্ধতা সে দুর্জ্জয় শত্রুকে জয় কর্‌তে হলে মানুষকে দেবশক্তি অর্জ্জন কর্‌তে হবে। চেষ্টা ব্যর্থতা এনে দেবে, অবসাদ এনে দেবে। তপস্যা জ্ঞান প্রেম শক্তি দান করবে। যে শক্তিধর সেই অহঙ্কার ও বাসনারাশির মাথায় পা রেখে হেঁকে বল্‌তে পার্‌বে হে জগদ্ধাত্রি! আমার সর্ব্বস্ব তোমার, আমার বিদ্যা বুদ্ধি মান অপমান জীবন মরণ স্বর্গ নরক সব তুমি নাও—আমায় তোমার করে নাও, তোমার অঙ্গুলি হেলনে আমায় পরিচালিত কর—তোমার আনন্দে, তোমার প্রেমে আমায় পূর্ণ করে রাখ; আমি তোমার যন্ত্র হয়ে থাকি, দাস হয়ে থাকি, সেবক হয়ে থাকি।

এই তপস্যা সংসারে বসেই করতে হবে। আমাদের জীবন আমাদের জন্য নয়, মনুষ্যজাতির জন্য। আমরা আত্মমুক্তির কাঙ্গাল নই। মুক্তি আবার কি? তিনি খেলান, তাইত খেলি। এই জ্ঞানই মুক্তি।

"ভাবিলেই ভাবের উদয় হয়,
ওসে যেমনই ভাব তেমনই লাভ মূল সে প্রত্যয়।"

যত ভাবিবে ততই ভাব পাইবে ত যেমন ভাব পাইবে তেমনই লাভ হইবে—

তবে বিশ্বাস চাই, আমি কালীশক্তিকে বলছি আমার বাসনা অহঙ্কার দূর করে দাও, নিশ্চয় আমার বাসনা অহঙ্কার দূর হবে—এমনই বিশ্বাস, এমনি ঝোক্ চাই নতুবা কিছুই হবে না।

পরন্তু প্রত্যেক যুবককে এই মুহূর্ত্তে এই ভাব গ্রহণ কর্‌তে বলি, জীবনের চেষ্টা দ্বারা যাহা আমরা উপার্জ্জন করি, উহা কেবল অহঙ্কারেরই সৃষ্টি করে। মায়ের দেওয়া জিনিষে অহঙ্কার নাই, ইহা যে তাঁর দান। তাঁর ঐশ্বর্য্যেই আমাদের ঐশ্বর্য্যবান হতে হবে, তাঁর ভোগেই ভোগী, তাঁর শক্তিতেই আমরা শক্তিশালী।

আমরা ভোগের কথা বলি বলিয়া একদল মার্কামারা ত্যাগী ত্যাগের স্পর্দ্ধা দেখাতে কুণ্ঠিত হন না। চেষ্টাদ্বারা কোন অবস্থায় আসিলে এইরূপ পরিণামই অবশ্যম্ভাবী। আমাদের ভোগ কি? সে যে ভাগবত ভোগ, সে যে প্রেম—প্রেমে কি লিপ্তালিপ্ত জ্ঞান থাকে? এই প্রেম লাভ হবে মায়ের ইচ্ছায়; আমরা তাঁরই জন্য উন্মাদ। এই উন্মাদনার বিভোরতায় আমাদের শিশ্নোদর বৃত্তি সজাগ হয়ে উঠে না, সংসারের চিটে গুড়ে প্রবৃত্তি যায় না। এই অনন্ত ভাগবৎ ভোগের প্রতিষ্ঠাকল্পেই আজ নবীনদের আত্মোৎসর্গ ক'রে এই সংসারেই উন্মাদ হয়ে থাকতে বলি—এই উন্মাদগণের পদধূলি স্পর্শে সংসার স্বর্গে পরিণত হবে।

দেবজাতি

কালচক্র ঘর্ঘর শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে। কি কর্কশ বিকট তার শব্দ, কি জটীল এবং বীভৎস তার গতি! জগতের বুকে এমন তীব্র বেদনার রেখা আর কখন সে অঙ্কন করে নাই, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন নিদারুণ ঘটনাবলী কোন কালে চিত্রিত হয় নাই, এমন শ্মশানকালীর তাণ্ডবলীলা আর কেহ কখন প্রত্যক্ষ করে নাই। যুগ পরিবর্ত্তন কালেও পৃথিবী ব্যাপী এমন ভীষণ অন্দোলনের কখন অবতারণা হয় নাই। একাত্তর দিব্য যুগের অবসানে মন্বন্তর উপস্থিত হয়, মাত্র সপ্তবিংশতি মহাযুগ অন্তে বৈবস্বত মনুর অষ্টাবিংশ মহাযুগের কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে, আজ অকালে সপ্তম মনু কি অধিকারচ্যুত হইবে? পাপভারে ধরাতল কি এতই প্রপীড়িত! কে জানে, দেবলীলা মানুষের অনধিগম্য।

মন্বন্তর কালে শতসূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণে ধরাতল বিদগ্ধ হয়, প্রলয়-পয়োধিজলে ভূমণ্ডল রসাতলে প্রবেশ করে, এবার নররক্তে পৃথিবীর মলিনতা বিধৌত হইয়া আবার নূতন যুগের আবির্ভাব হইবে, তাই বুঝি ভগবান্ এই দুর্জ্জয় আহবের সৃষ্টি করিয়াছেন। পাশ্চাত্যের দুর্দ্দমনীয় রক্তপিপাসা অ্যাটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়া যুক্ত-মহাদেশে প্রবেশ করিয়াছে—প্রাচ্যের চীন জাপানও বাদ পড়িবে না। শিবের প্রলয় বিষাণ গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া আকাশ পাতাল প্রকম্পিত করিতেছে—মদগর্ব্বিত মনুষ্যজাতি পতঙ্গের মত প্রলয়ানলে আত্মাহুতি দিবে—জগতের সর্ব্বাঙ্গই ক্ষতপূর্ণ হইল, ঔষধ দিবার স্থান নাই।

স্বাধীনতার লীলাভূমি—য়ুরোপের দীক্ষাগুরু ফরাসীজাতি আত্মসম্মান সংরক্ষণে সর্ব্বস্ব নরমেধ যজ্ঞে উৎসর্গ করিয়া আমেরিকার সিংহাসনতলে দাঁড়াইয়া কাতরভাবে কি বলিতেছে শোন—শোন, কোটী কোটী নরনারী হৃদপিণ্ড উপাড়িয়া দেশের উজ্জ্বল মণিরত্নসদৃশ বীর-হীরার সবটুকু শোণিত ঢালিয়াও হিংসা দ্বেষের ভীষণ অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে পারে নাই—জগতে

চিরশান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে জেনারল জোফ্রে আমেরিকার সাহায্যপ্রার্থী হইয়া বলিতেছেন "The French Government implores haste on America's part making no secret of the fact that it is appealing on behalf of a nation almost spent." কি হৃদয় বিদারক কারুণ্যপূর্ণ সবিনয় প্রার্থনা !

মানুষের পক্ষে ইহাপেক্ষা অধিক দুর্দ্দিনের পরিচয় আর কি হইতে পারে ? কেবল ফ্রান্স নয়, যুরোপের সকল সভ্যজাতির অবস্থাই এইরূপ —আমাদের দেশে প্লেগে, বসন্তে, বিসূচিকায় দুর্ভিক্ষে যেরূপ এক একটা দেশ শ্মশানে পরিণত হইতেছে—যুরোপের কুরুক্ষেত্রে সেইরূপ গ্রাম নগর একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। আমরা মরিতে বসিয়াছি তামসিকতার তুষার শীতল আলিঙ্গনের নিষ্পীড়নে, আর যুরোপ মরিতেছে রাজসিকতার লেলিহান অগ্নিজিহ্বার আকর্ষণে—আজ উভয়েই মরিবে, মৃত্যুই দেখিতেছি এ যুগের বিধিনির্দ্দিষ্ট পন্থা।

মরণের দ্বার দিয়াই নূতনের আবির্ভাব হয়। মৃত্যুই অমর আত্মার পুরাতন পরিচ্ছদ সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তন করিয়া দেয়। জগতে যে ভবিষ্যযুগ আসিতেছে, সে যুগে পুরাতনের আর আবশ্যক নাই—মানুষ নূতন প্রাণ, নূতন মন, নূতন বুদ্ধি, নূতন শরীর লইয়া নূতন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে, পুরাতনের আংশিক পরিবর্ত্তনে দেবলীলা পূর্ণভাবে চরিতার্থ হইবে না বলিয়াই আজ মানুষকে মরিয়া নূতন হইতে হইবে —মানুষের পুরাতনের প্রতি অদম্য অনুরাগ তাই শ্রীভগবান সংগ্রামছলে মানুষকে পুরাতনের কুহকজাল হইতে ছিন্ন করিয়া নূতনের দেশে লইয়া যাইতেছেন—সেখানে নূতন বেশভূষায়, নূতন ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ হইয়া মানুষ আবার ইহজগতে আনন্দরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পুনরাগমন করিবে। আজ ভারতবর্ষে তাই নূতন সাধনার প্রবর্ত্তন দেখা দিয়াছে—যোগের দ্বারা ভগবদকার্য্য সুগমে সম্পন্ন হয়, ভারতবর্ষ যোগের দ্বারাই কায়া পরিবর্ত্তন না করিয়াও নূতন ঐশ্বর্য্য লাভ করিবে—আত্মবিসর্জ্জনের পরিবর্ত্তে সে অগ্ন্যোৎসর্গের অমরমন্ত্রে দীক্ষিত হইবে—তপস্যার দ্বারা অহং নাশ করিয়া দেবজীবন লাভ করিবে। যাঁহারা আজ ভগবত নির্দ্দেশে জীবন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক নূতনের উপযোগী হইতে ছুটিয়াছেন তাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিবেন, ভারতবর্ষই তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তুলিয়াছে—অদূর ভবিষ্যতে যিনি আসমুদ্র

হিমাচল সমস্ত ভূমণ্ডলের একচ্ছত্র সম্রাটরূপে জগৎ শাসন করিবেন, যিনি জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সমুদয় মনুষ্যজাতির ভাগ্যবিধাতা হইবেন, যিনি রাজর্ষি জনকের মত ভোগ ও ত্যাগের সমন্বয় সাধন করিয়া বিশ্বহিতের জন্য বিশ্বের সিংহাসনে অধিরোহণ করিবেন, তিনি ভারতবর্ষের পুণ্য ভূমিতেই তাঁর সর্ব্ব সমন্বয়কারী বিজয়পতাকা সর্ব্বপ্রথমে প্রথিত করিবেন। ভবিষ্যৎ স্বর্গরাজ্যের কেন্দ্রস্থান হইবে ভারতবর্ষ, জগতের নরনারী এই মহাতীর্থে আসিয়া স্ব স্ব জীবন ধন্য করিবে—ইহাই দেবলীলা, মানুষ তখন বিভিন্ন জাতির গণ্ডী অতিক্রম করিয়া এক নূতন জাতির অন্তর্গত হইবে, সে জাতির নাম হইবে দেবজাতি।

বৈদিক চিন্তা-প্রসূন

বহু জগতের বিন্যাসে এই ব্রহ্মাণ্ড রচিত। এই জগৎ সমুদায় আমাদের ভিতরে ও বাহিরে উভয়ত্রই। এক দিকে তাহারা যেমন চিন্ময় ভাবগ্রাহ্য, অন্যদিকে তেমনি বস্তুময় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কত পৃথিবী কত স্বর্গ মাথায় মাথায় উঠিয়া চলিয়াছে। এ যেন বহুধারা সমন্বিতা নদী অথবা বহু অধিত্যকাবিন্যস্ত পর্ব্বত। এ যেন এক বিরাট জ্যোতিঃ, কখন তার সাতটি, কখন আট, কখন নয়, কখন বা দশটি রশ্মি।

* * *

ঋষিগণ ব্রহ্মাণ্ডকে কখন বা দেখেন ত্রয়ীর মূর্ত্তিতে। পৃথিবী তিনটি, স্বর্গ তিনটি। তিনটি জগৎ অধঃস্তরে—স্বর্গ পৃথিবী আর উভয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী অন্তরীক্ষ। তিনটি জগৎ মধ্যভাগে—সূর্য্যের জ্যোতির্ম্ময় স্বর্গত্রয়। তিনটি জগৎ উর্দ্ধস্তরে--দেবসত্তার পরাস্থিতি, আনন্দবিধৃত প্রতিষ্ঠান।

* * *

বাহিরের এই যে স্তরবিভক্ত ভুবনসমূহ তাহাদের অনুরূপ প্রতিকৃতি রহিয়াছে আবার আমাদের অন্তরেই। অন্তরে যে ভাবস্তর, চেতনার ক্রমবিকাশের যে পর্দ্দা তারই বিগ্রহ, তারই লীলায়িত মূর্ত্তিস্বরূপ রচিত হইয়াছে বাহিরের এক একটি ভুবনস্তর। জগৎ বিশেষের যে ধর্ম্ম যে শৃঙ্খলবিধান তাহা নিগূঢ়ে ধরিয়া রহিয়াছে অন্তরের চেতনা বিশেষের অনুরূপ ধর্ম্ম অনুরূপ শৃঙ্খল বিধান।

* * *

মূলতত্ত্ব হিসাবে সাতটি ভুবন। কার্য্যতঃ পাঁচটি ধরা হয়। আবার সাধারণভাবে তাহাদিগকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—

তত্ত্ব	জগৎ
১। সমুচ্চ সৎ-চিৎ-আনন্দ	দিব্যভুবনত্রয়
২। যোজক বা বন্ধনী—তুরীয় জ্ঞান	জ্যোতির্ম্ময় স্বর্গত্রয় সমন্বিত স্বর্লোক —সত্যং ঋতং বৃহৎ
৩। অবরলোকত্রয়	
বিশুদ্ধ মন	স্বর্গ (দ্যোঃ, স্বর্গত্রয়)
প্রাণশক্তি	অন্তরীক্ষ
জড় বা দেহ	পৃথিবী

* * *

পুরাণেও সপ্ত লোকের কথা পাই। সে সাতটি লোকও সৃষ্টির মূল সপ্ততত্ত্বেরই প্রতিরূপ—

বিশুদ্ধ সত্ত্বা—সৎ	সত্ত্বা যেথায় সমুচ্চের সত্যে প্রতিষ্ঠিত	—সত্যলোক
বিশুদ্ধ চেতনা—চিৎ	জ্ঞানদীপ্ত তপঃশক্তি, অখণ্ড ইচ্ছাশক্তি	—তপোলোক
বিশুদ্ধ আনন্দ—আনন্দ	যে আনন্দ হইতে সৃষ্টির উৎপত্তি	—জনলোক
বিশুদ্ধ জ্ঞান, সত্য—বিজ্ঞান	বিরাট বৃহৎ প্রতিষ্ঠান	—মহর্লোক
মন	জ্যোতির্ম্ময় লোক	—স্বঃ
প্রাণ	নানারূপের, বৈচিত্র্যের, পরিণামের প্রসূতি	—ভুবঃ
জড়	ভূতলোক	—ভূঃ

* * *

মানুষ জাগ্রতভাবে আছে মন প্রাণ ভূতদেহ, পুরাণের ভাষায় ভূর্ভুবস্বঃ, বেদের ভাষায় পৃথিবী অন্তরীক্ষ আর দ্যোঃ এই তিনটি লোকে। পৃথিবীর দেহের মধ্যেই তার প্রতিষ্ঠা। সে জানে কেবল এই নশ্বর মরজীবনটুকু। দেহের উপকরণ সে আহরণ করে পৃথিবী হইতে, জীবনীশক্তির আহার্য্য সে পায় প্রাণজগৎ হইতে, মানসিক সত্ত্বা পায় মনোময় জগৎ হইতে। কিন্তু এ সকলের উপরেই তবু রহিয়াছে তুরীয় অতীন্দ্রিয় প্রতিষ্ঠান, যেখানে দিব্যভুবনরাজী নিগূঢ় জ্যোতিঃর মাঝে লুক্কায়িত।

* * *

সে অতীন্দ্রিয়ের সহিতও ফল্গুধারার ন্যায় মানুষের সংযোগ আছে। ইচ্ছা

করিলেই তাহার মধ্যে সজ্ঞানে জাগ্রত অবস্থায় প্রবেশ করিতে পারে; তাহাতেই জন্মগ্রহণ করিতে পারে। আবার তাহারও উপরে উঠিয়া একেবারে সমুচ্চের পরাৎপরের তোরণে পৌঁছিতে পারে। ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু মানবাত্মার সম্মুখে দৈবী-দুয়ার সকল ঝন্ ঝন্ শব্দে উদ্‌ঘাটিত হইতে থাকিবে।

* * *

মানুষের এই ক্রম-অধিরোহণ সম্ভব, কারণ প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক জীবই যে জিনিষটিকে বাহিরের বস্তু বলিয়া মনে করে তাহা সে নিজের ভিতরেই ধারণ করিয়া আছে। বাহিরে ব্রহ্মাণ্ডে জগতের যত স্তর যত ধাপ আছে তাহার প্রত্যেকটির সাথে সাথে অন্তরে আছে এক এক বৃত্তি। অন্তঃকরণের এই বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়াই মানুষ বৃত্তির প্রতিরূপ যে জগৎ তাহাতে উঠিতে পারে, তাহাকেই জীবনের লীলার প্রতিষ্ঠা করিয়া তুলিতে পারে।

* * *

মানুষ যতখানিই পৃথিবীর সন্তান হউক না কেন, এই যে ভৌতিক জীবন এই যে জড় জগতের সঙ্কীর্ণ চেতনাটুকু তাহারই মধ্যে কেবল মানুষের অভিজ্ঞাকে আবদ্ধ থাকিতে হইবে এমন নিয়তি কিছু নাই। মাতা পৃথিবী তাহাকে গর্ভে বহন করিয়াছে, বাহুপাশে ধরিয়া রহিয়াছে। তবু স্বর্গই যে তাহার জনক, তাহার উপর স্বর্গেরও দাবী যাইবে কোথায়? নিজের অন্তরে যে গভীরতর অতল-সমুদ্র যে উচ্চতর শিখররাজী তাহাদের অভিজ্ঞার জাগিয়া উঠিতেও সে পূর্ণ স্বাধীন। এই জাগরণেই যে তাহার বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট ক্রমবিবর্ত্তনের উন্নতির ক্রম।

* * *

মানুষ যতই নিজের ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর স্তরে উঠিতে থাকে, তাহার জীবনের তাহার দৃষ্টির সম্মুখে নূতন নূতন জগৎ ততই খুলিতে থাকে। সে জগৎ তাহার অভিজ্ঞার ক্ষেত্র, অন্তরাত্মার বাসভবন হইয়া উঠে। সে জগতের যে দেবসত্বা, যে শক্তিসমূহ তাহাদের সহিত পরিচিত সংমিলিত হয়, তাহাদেরই প্রতিমূর্ত্তিতে আপনাকে পুনর্গঠন করিয়া লয়। প্রত্যেক নূতন আরোহণ জীবাত্মার এক নূতন জন্ম। সেই জন্যই বেদ ভুবন বা লোক সকলের নাম দিয়াছেন "জন্ম", আবার বলিয়াছেন "আসন", "ভবন"।

ত্যাগের কথা

(৩)

মানুষের দুটো দিক। একটা ধ'রে রাখার দিক, একটা ছেড়ে দেওয়ার দিক। মানুষের জীবনে যা কিছু সত্যি তা এদের দুটোকে নিয়ে। মানুষ যেখানে কেবল আপনাকে ধরেই রেখেছে সেখানে সে পরিণামে পরিণত হয়েছে জড়ে—তার চারপাশে গড়ে উঠেছে অচলায়তনের আলোঢাকা বাতাস বন্ধ করা বিরাট প্রাচীর। আর যেখানে সে আপনাকে শুধু ছেড়েই দিয়ে আছে সেখানে তার পরিণামে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে' যাওয়ারই সম্ভাবনা—হয় প্রকৃতির শক্তির সংঘর্ষে নয় পারিপার্শ্বিকের শক্তির সংঘর্ষে এসে—যদুবংশের মত, হয়ত বর্ত্তমান ইউরোপের মত। এই দুটোকেই যোগের ভাষায় আমরা বলি নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি মার্গ।

এই যে ধ'রে রাখা আর ছেড়ে দেওয়া তা রবীন্দ্রনাথ বেশ ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর "অচলায়তন" নাটকের মহাপঞ্চকে আর পঞ্চকে। সেই যে অচলানয়তন, যেখানে বাইরের আলো বাইরের বাতাস প্রবেশ করে না, যেখানে উত্তর দিকের জানালা খুলে চাইলে মুহূর্ত্তে চোখ দুটো পাথর হ'য়ে যাওয়ার সম্ভাবনা—আর চোখ দুটো কপাল ক্রমে পাথর হ'য়ে না গেলে—মহাতামস নামক ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত করবার দুর্ভাবনা—সেই অচলায়তনে যে পঞ্চকের বুক চিরে গলা কেটে ক্রন্দনের সুরে গান বেরিয়ে আসে—

বেজে ওঠে পঞ্চমে স্বর,
কেঁপে ওঠে বদ্ধ এ ঘর,
বাহির হতে দুয়ারে কর
কেউ ত হানে না।

সে গান পঞ্চকের একার নয়। সে গান বিশ্বমানবের সকলের। এ গান বসন্তাগমে রুদ্ধকণ্ঠ কোকিলের আকুলতার মত। এ গান ছায়ায় বর্দ্ধিত কুসুমলতার আলোর দিকে ধাওয়ার মত। অন্ধকারময় ক্ষুদ্র কুটুরীতে সমস্ত থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে শুধু আপনাকে নিয়ে শান্তিতে সমস্ত জীবনটা কাটিয়ে দেওয়ায় যতই বাহাদুরীর কাজ হ'ক না কেন—মানুষের

জীবন-দেবতার সত্যিকার কথা সেটা নয়। সে যে চায় আলো, সে যে চায় বাতাস—সে যে চায় নৃত্য গীত, হাসি কান্না, জয় পরাজয়—সে চায় তার ভিতরের সঙ্গে বাহিরের মিলন—তার অন্তরের রঙে বিশ্বটা রঙিয়ে তুল্‌তে, বিশ্বের রঙে অন্তরটা পূর্ণ কর্‌তে। এক কথায় সে চায় ছাড়া পাওয়া, বিশ্বের মাঝে আপনার সত্যিকার স্থান খুঁজে নিতে—আপনাকে চিনিয়ে দিতে, ছড়িয়ে দিতে, লুটিয়ে দিতে। আর তাই মহা পঞ্চকের সঙ্গে তার চিরকালের অমিল। "অচলায়তন" তার চিরদিনের মরণ-সমাধি। কিন্তু বিরাট হিন্দু জাতি ক্রমে ক্রমে একটা বিরাট মহাপঞ্চককে গড়ে উঠ্‌ছিল। আর তাই হিন্দু বিশ্বের দিকে তাকায় নি, বিশ্বও হিন্দুকে বুঝ্‌তে পারে নি, চিন্‌তে পারে নি, এমন কি তাকে অবজ্ঞাই ক'রে এসেছে।

হিন্দু সমাজ একটা বিরাট মহাপঞ্চককে গ'ড়ে উঠুক তাই ব'লে যে এই হিন্দুসমাজের মধ্যে যারা বাস কচ্ছেন তাঁরা সব নির্ব্বাণ মুক্তি প্রাপ্ত হয়েছেন অথবা সবাই কর্ম্মহীন ভোগহীন হয়েছেন তা নয়। কারণ এর বিরুদ্ধে প্রমাণ অত্যন্ত স্পষ্ট যাঁরা সত্য দেখ্‌তে কুণ্ঠিত বা ভীত নন্ তাঁদের কাছে। অন্যান্য জাতির মতই অন্যান্য দেশবাসীর মতই হিন্দুদের মধ্যেও সেই জন্ম, মৃত্যু, সেই বিবাহ, পুত্রোৎপাদন, সুখে হর্ষ দুঃখে বিষাদ, সেই স্নেহ প্রীতি প্রেম বিদ্বেষ সেই সবই চলে আস্‌ছে তার কোন ব্যতিক্রম হয় নি। তবে এই একটু প্রভেদ যে এরা—হিন্দুরা—কথায় কথায় ভগবানের নাম করে আর সেই সঙ্গে সঙ্গে এদের ললাট চোখ মুখ সমস্ত নিয়ে তার ওপরে একটা নিষ্ঠুর কথা বড় বড় অক্ষরে লেখা হ'য়ে গেছে যে তা আর কারও ভুল কর্‌বার যো নেই—সে কথাটা হচ্ছে—অক্ষমতা। যখন জার্ম্মানী শ্যেন পক্ষীর মত বেগে তার বিশাল চমূ নিয়ে প্যারিসের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তখন যদি সমস্ত ফরাসী জাতি হাত গুটীয়ে ভগবানের নাম কর্‌তে কর্‌তে আপনাদের ভক্তির (?) চরমোৎকর্ষ দেখাতে বসে যেত তবে কি দৈহিক, কি মানসিক, কি ব্যবহারিক, কি নৈতিক, কি আধ্যাত্মিক—কোন দিক থেকে যে সেটা প্রশংসনীয় হ'ত তা পৃথিবীর কেউ কোন দিন আবিষ্কার কর্‌তে সক্ষম হ'বে না বোধ হয় এক অক্ষমতা পূর্ণ, শক্তিহীন, জীবনশূন্য হিন্দু ছাড়া। কিন্তু হিন্দু ঐরূপ সময়ে ফরাসী বাসীর ঐরূপ ব্যবহার যে প্রশংসনীয় তা আবিষ্কার কল্লেও তার মানে

এ হ'বে না যে আজকার হিন্দু অন্যান্য দেশ জাতি চাইতে একটা কিছু মহৎ, বৃহৎ—বা একটা চিদ্‌ঘন আনন্দরূপ লাভ করেছে—তার মানে এই যে আজকার হিন্দু এমন একটা "জড়ভরত" অবস্থায় এসে পৌঁছেচে যেখান থেকে সে আত্মমর্য্যাদা, আত্মসম্মান প্রভৃতি মনুষ্যোচিত গুণাবলী প্রাণে প্রাণে অনুভব কর্‌তে অক্ষম—যেখান থেকে সে দেশের মঙ্গল, জাতির মঙ্গল প্রভৃতিতে আপনার ব্যক্তিগত অস্তিত্বকে যোগ করতে ব্যথা বোধ করে। তাই এখন "আপনি বাঁচলে বাপের নাম" "চাচা আপন বাঁচা" "আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি" ইত্যাদি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে এদেরি মন্ত্র। আমরা এখন ম'রে বাঁচতে চাইনে, বেঁচে ম'রে থাকৃতে ভালবাসি।

কিন্তু এইখানে একটা কথা উঠ্‌তে পারে যে বাঁচাই বা কাকে বল আর মরাই বা কাকে বল? পূর্ব্বগত ধর্ম্মোপদেষ্টারা ত আমাদেকে শতাব্দী ধরে শুনিয়ে এসেছেন যে—এই যে মাটী—এ ত সবার পায়ের নীচেকার মাটী—ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, ঐহিক, সেত নরক তুল্য—তার মধ্যে থাকা সে ত মৃত্যুরই সামিল—ছাড় ছাড় সে সব—সে সব ছেড়ে ছুড়ে তু'লে ধর আপনাকে সেইখানে যেখানে চিদ্‌ঘণ আনন্দ নিয়ে ব'সে আছে স্থাণুর মত নিশ্চল অক্ষর ব্রহ্ম—সেখানে গিয়ে বস—সেই ত বাঁচা, সেই ত জীবন—আর যা কিছু সব ক্ষুদ্র তুচ্ছ মানুষের জীবনের কলঙ্ক—পশুর উপযুক্ত তোমার নয়। শতাব্দী শতাব্দী ধ'রে এই যে মন্ত্র আমাদের কাণে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়েছে তা সত্ত্বেও পৃথিবীটা যেমন চ'লে আস্‌ছিল তেমনি চ'লে আসছে আর আমরাও সবাই বুদ্ধত্ব লাভ ক'রে শূন্যে মিলিয়ে যাইনি, এই মায়া এবং নির্ব্বাণমন্ত্রের ঝড়ের ভিতর দিয়েও আমরা বেঁচে এসেছি—ক্ষতির মধ্যে শুধু এই হয়েছে যে আমরা মনমরা আর শক্তিহীন হয়েছি—যা'হক এসব সত্ত্বেও যে আমরা টিকে আছি—তার মানেই হচ্ছে—এই পৃথিবী, এই মানুষ এই লীলা এদের এমন একটা সত্যতা আছে যেটা মানুষের নির্ব্বাণ মুক্তির চাইতে বড়। আর সেই সাহসেই আজ আমরা জোর ক'রে বল্‌তে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত বা ভীত হচ্ছি না যে--বাঁচা—সে মানুষের মাথার চুল থেকে আরম্ভ ক'রে পায়ের নখাগ্র পর্য্যন্ত, তার অন্নময় কোষ থেকে বিজ্ঞানময় কোষ পর্য্যন্ত সবার সার্থকতা সম্পাদন। মানুষের এই জমিদারীতে কেউ যেন অনাহারে না মরে। সে যেন দেহ থেকে আরম্ভ ক'রে তার মন বুদ্ধি চিত্ত

বিজ্ঞান সবার আহার যুগিয়ে চলে। তার জীবনে যেন কর্ম্মের অভাব না হয়, রসের অভাব না হয়, জ্ঞানের অভাব না হয়। এই হচ্ছে বাঁচা। ভগবান্ মানুষকে ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত ক'রে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ যদি সে ঐশ্বর্য্যের অমর্য্যাদা করে তবে ভগবানও মানুষের মর্য্যাদা রাখ্‌বেন না নিশ্চয়। মানুষ সে ঐশ্বর্য্য নিয়ে বিশ্বমানবের মহামেলায় হাজির হবে, নিজে দেখ্‌বে—অপরকে দেখাবে—পরস্পর পরস্পরকে বুঝ্‌বে চিন্‌বে। এই হচ্ছে বাঁচা। ব্রহ্মে লীন—সেটা আত্মার লীলা-বিরতির অবস্থা--এ সৃষ্টি লীলায় বাঁচার চিহ্ন কিছুতেই নয়। আর আমরা বাঁচতে চাইই—সে সম্বন্ধে একটুকুও কোনখানে ভুল নেই।

এই যে শতাব্দী শতাব্দী ধ'রে ত্যাগের মন্ত্র, নির্ব্বাণের তন্ত্র, বৈরাগ্যের যন্ত্র আমাদের বাঁধবার চেষ্টা করেছে তাতে আমরা কি আজ কর্ম্ম করি না? করি। কিন্তু সে কর্ম্মে এমন কিছু বৃহৎ নেই, মহৎ নেই যা আমাদেকে, আমাদের জীবনকে মহত্ত্ব অনুভব করিয়ে দিতে পারে। কর্ম্মের ভিতর দিয়ে যে কোন দিন মহত্ত্ব অনুভব করে নি কর্ম্মের আনন্দরূপ সে ত কোন দিন দেখ্‌তেই পাবে না—আর সে ত জীবন থেকে কর্ম্মকে সরিয়ে ফেলবারই চেষ্টা কর্‌বে। যে আপনার মধ্যে কোন দিন মহত্ত্ব অনুভব করে নি সে জীবনের আনন্দ বুঝ্‌বে কি, ভগবানের মহত্ত্ব বুঝ্‌বে কি? তাই আমাদের মধ্যে ধীরে ধীরে মায়াবাদটাই সত্য হয়ে উঠেছে। আজকার হিন্দু কি ভোগ করে না? করে। কিন্তু সে ভোগে কোন বিরাটত্ব নেই, কোন গৌরববোধ নেই। আর তাও আবার ভয়ে ভয়ে, যেন তারা একটা কি রকম ভয়ঙ্কর দুষ্কর্ম্মই কর্‌ছে। আর তাই তাদের ভোগ তাদের আনন্দের কারণ না হ'য়ে, তাদের চারিপাশে বন্ধন হ'য়ে ঘিরে আছে। হিন্দু কি চিন্তা করে না? করে, কিন্তু সে চিন্তা আপনার চারিপাশেই ঘুরে ফিরে আবার আপনাতে এসেই লয় হয়। আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাঁরা তাদের চিন্তা যায় বড় জোর "দরিদ্র নারায়ণের সেবা" পর্য্যন্ত। কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্ব চায় সেই চিন্তা যা এমন পন্থা বের কর্‌বে যাতে ক'রে দেশে আর "দরিদ্র নারায়ণ" জন্ম নেবারই সুযোগ

ভোগের এমন একটা সৎরূপ আছে যে মানুষ তা কতকটা গুপ্ত ক'রে রাখ্‌তে পারে কিন্তু সে তা লুপ্ত কর্‌তে পারে না। যখন কর্ম্ম ও ভোগ থাক্‌লই তখন জীবকে এই কর্ম্ম ও ভোগকে প্রতিষ্ঠা কর্‌তে হবে সত্যের ওপরে, মঙ্গলের ওপরে। কারণ এই কর্ম্মের ভিতর দিয়েই সমাজের দেশের বিশ্বের কল্যাণ আস্‌বে—এই ভোগের ভিতর দিয়েই মানুষের জীবন-দেবতার তৃপ্তি আস্‌বে, মুক্তি আস্‌বে। আর যেখানে এই কর্ম্ম ও ভোগ আপনার সত্য ও মঙ্গলময়রূপ নিয়ে আপনাকে প্রকাশ কর্‌তে সক্ষম হবে সেখানেই আবির্ভাব হবে সুন্দরের। আর এই হচ্ছে এ সৃষ্টির চরম অভিলাষ, চরম উদ্দেশ্য—সুন্দরকে প্রকাশ করা।

লীলা

(২)

ভগবানের ইচ্ছা না হইলে জগতে কোন ঘটনার সৃষ্টি হয় না। ভাল মন্দ, মঙ্গল অমঙ্গল সকল কার্য্যেই তাঁর ইচ্ছা নিহিত আছে। তাঁর ইচ্ছাতেই দারুণ দুর্ভিক্ষে জঠরানলোন্মত্ত নরনারী মানুষের মাংস চর্ব্বণ করিতে উদ্যত হয়—ভীষণ ঝটিকাবর্ত্তে প্রবল জলপ্লাবনে ভয়ঙ্কর মহামারিতে দেশ উৎসন্ন যায়—দ্বন্দ্বে বিপ্লবে মহাসমরে মনুষ্যসমাজ পরিত্রাহি চীৎকার করে আবার তাঁর ইচ্ছাতেই দেশে শান্তি বিরাজ করে, বসুন্ধরা প্রচুর শস্য দানে মনুষ্যজাতিকে ধনে ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ করিয়া তুলে। স্নেহ প্রীতি দয়া-দাক্ষিণ্য গুণে বিভূষিত হইয়া ধরাবাসী পরস্পর পরস্পরকে সহানুভূতির চক্ষে দেখে, এ সকলই তাঁর লীলা—তিনি লীলাময়।

অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড লীলাচ্ছলেই সৃষ্টি হইয়াছে—লীলাচ্ছলেই সমুদয় জগত উদ্ভাবিত ও বিকশিত হইয়া অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যের মেলা বসাইয়াছে এবং একদিন লীলার জন্যই সংখ্যাতীত গ্রহ উপগ্রহ জ্যোতিকমণ্ডলী স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল কোন্ অতলে ডুবিয়া যাইবে—সগুণ ব্রহ্ম নির্গুণ হইবে, প্রকাশ ব্রহ্ম কোন্ অপ্রকাশে অরূপে আত্মগোপন করিবে; ব্রহ্মাণ্ডের সে অভাবনীয় পরিণাম অব্যক্ত, প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। তবে মানুষের মধ্যেই যে

তাঁর লীলা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ইহা অবিসংবাদিত সত্য। এই লীলা অসীম—ইহার আদি নাই—অনাদি কাল ধরিয়া চক্রবৎ ইহা চলিয়া আসিতেছে। লীলার গুণে ও বিকাশের তারতম্যে মানুষ তাহাকে চারিটী ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। যথাক্রমে ইহা সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি। অনন্তকাল ধরিয়া এইরূপ একটী ক্রম অনুসারে ভগবানের অপার লীলা মানুষের মধ্যে প্রবাহের মত বহিয়া চলিয়াছে। সত্যের পর ত্রেতা দ্বাপর এবং কলি, আবার কলির পরই সত্য ত্রেতা প্রভৃতি। সেইজন্য কলিযুগই প্রকৃষ্ট সাধনার যুগ কেননা ভবিষ্যৎ স্বর্গরাজ্যের জন্য ভগবান এই যুগেই মানুষকে প্রস্তুত করিয়া তুলেন। সত্যযুগই চতুর্যুগের প্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান যুগ। এইযুগে দেবতাকুল জাগ্রত থাকেন—পৃথিবীতে চতুষ্পাদ ধর্ম্ম বিরাজ করে—বসুমতী প্রচুর শস্যশালিনী হইয়া ধরাবাসীকে সবল, সুস্থ ও হৃষ্টপুষ্ট শরীর দান করেন। ব্রাহ্মণগণ বেদবিদ্, ক্ষত্রিয়গণ যাগোদ্যত, বৈশ্য শ্রীবিষ্ণুপূজাপরায়ণ হইয়া ধর্ম্মতঃ বস্তু বিনিময় পূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, শূদ্র দ্বিজসেবারত, সুতরাং বর্ণাশ্রমের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা এই যুগেই পরিসাধিত হয়। শাঠ্য চৌর্য্য প্রভৃতি হীনবৃত্তি পরিহার করিয়া আধিব্যাধি বিবর্জ্জিত নরনারীগণ পূর্ণ পুণ্যে মহান ঐক্যে দৈবীজীবন ভোগ করিতে থাকে। ভগবানের পূর্ণানন্দ মানুষের জীবনে এই যুগেই বিকশিত হয়, মানুষকে চেষ্টা করিয়া কিছু করিতে হয় না—স্বভাবশক্তিই মানুষকে সত্যভাবাপন্ন করিয়া তুলে, কিন্তু ইহাও কাল এবং অবস্থা বিশেষের বশবর্ত্তী হওয়ায় কাল পূর্ণ হইলে এই আনন্দের খেলা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। মানুষের চেষ্টা যতই প্রবল হয় প্রকৃতি ততই সবেগে নিম্নদিকে অবতরণ করিতে থাকেন, ফলে চতুষ্পাদ ধর্ম্মের একপাদ লোপ পায়—ইহাই ত্রেতা যুগ। স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিলেও মানুষ সহজে প্রাপ্ত অধিকার পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। অহংমত্ত মানব ভগবদ্ ইচ্ছার গতি অবধারণ করিতে অসমর্থ হয়, যাহা ভাঙ্গিতেছে তাহার সংরক্ষণে অধিকতর প্রয়াস করিতে থাকে। দ্বাপর যুগে মনুষ্যগণ বুদ্ধিবৃত্তির সহায়তায় নানাবিধ নৈতিক ও সামাজিক বিধানের শাসনে মানব সমাজের মধ্যে দৈবীযুগকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করে কিন্তু স্বভাবশক্তি সত্যযুগের অনেক প্রভাব বিনষ্ট করিয়া দেয়, ধরাতলে পুণ্যার্দ্ধ লইয়া মনুষ্যগণ সুখে দুঃখে পাপে পুণ্যে দিনাতিপাত করে। কলিযুগে সকলই লুপ্ত হয়, পুণ্যের যেটুকু অবশিষ্ট থাকে তাহা

পাপের প্রবলতায় অতি অস্পষ্টভাবেই পরিদৃষ্ট হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই কলিযুগ একেবারেই মন্দ নহে, কেননা ভবিষ্যৎ যুগকে আরও মহান আরও বিরাট আরও পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য এই যুগেই আয়োজন অনুষ্ঠান চলিতে থাকে। কলির যে ৫০০০ হাজার বৎসর গত হইয়াছে এই দীর্ঘ দিনে ভারতের পুরাতন ঐশ্বর্য্যের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, প্রাচীন জ্ঞান প্রাচীন সভ্যতা সকলই অবাধে ধ্বংস হইয়াছে। বেদে উপনিষদে ভারতের প্রাচীন ধর্ম্ম গ্রন্থে প্রচলিত কিম্বদন্তিতে অতি সামান্য অংশই বিদ্যমান আছে। কিন্তু এইবার পুনর্গঠণের যুগ আসিয়াছে। ভারতের উর্দ্ধগতি আরম্ভ হইয়াছে—বিপদসঙ্কুল মহানিশা অবসান প্রায়—পূর্ব্ব গগনে উষার উজ্জ্বলরাগ দেখা দিয়াছে; প্রকৃতির গুপ্তমন্দিরে প্রভাতারতির পঞ্চপ্রদীপ সজ্জিত হইতেছে, শীঘ্রই বিশ্বপতির সম্মুখে দীপাবর্ত্তন আরম্ভ হইবে। নূতন যুগের উদ্বোধনসঙ্গীতস্বরূপ ধর্ম্ম, নীতি, বিদ্যা, জ্ঞান প্রভৃতি বহু ভাবের আন্দোলন মানব সমাজে দেখা দিয়াছে। কিন্তু যথার্থ সত্যের সন্ধান এখনও কেহই পায় নাই। সর্ব্বাগ্রে ভারতবর্ষই এই সত্যের সন্ধানে কৃতকার্য্য হইবে। জগতে আজ যে নূতন যুগের আবির্ভাব হইবে; যে ধর্ম্ম, যে সত্য, যে ঐক্য ভগবান পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন উহা বর্ত্তমান মানব চরিত্রের আংশিক পরিবর্ত্তনে সম্ভব হইবে না। আধুনিক মানবজাতির মধ্যে আবশ্যকানুযায়ী শৃঙ্খলা বিধান করিলে চলিবে না। মানুষকে একবারে নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে হইবে, পুরাতনের সংস্কারে এই কার্য্য সংসাধিত হইবে না—বহির্জীবনের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনে অথবা মানুষের কার্য্য পরম্পরার ধারা বদলাইয়া দিলেও ইহা পূর্ণ হইবে না—ভিতর হইতে এই নূতন গঠন আরম্ভ হওয়া চাই। মানুষের অন্তঃকরণ সম্পূর্ণ নূতন আকার ধারণ করিবে; মন প্রাণ চিত্ত সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইবে কেননা মানুষের এবং জাগতিক বস্তু নিচয়ের স্বভাবই হইয়াছে অনৈক্যপূর্ণ। প্রত্যেকের মধ্যে যে সমতার সুর ছিল তাহা বেসুরা হইয়া গিয়াছে। এই স্বভাবের পরিবর্ত্তন করিতে হইলে যোগের আশ্রয় লইতেই হইবে; রাজনীতিক অথবা সামাজিক সমিতি সংস্থাপনের দ্বারা অথবা কোন আদর্শ বা দর্শন সাহিত্য প্রভৃতির দ্বারা এই আমূল পরিবর্ত্তন সম্ভব হইবে না, যোগের দ্বারা ভগবানকেই আমাদের মধ্যে উপলব্ধি করিতে হইবে, আমাদের জীবনকে ভগবদ্ভাবেই পুনর্গঠন করিতে হইবে। আমরা আমাদের মধ্যে এবং সমস্ত বিশ্বের অভ্যন্তরে এই জাগ্রত পরাৎপর

পুরুষের সাক্ষাৎ না পাইলে ইহা ঘটিয়া উঠিবে না, পূর্ণ যোগের দ্বারাই ইহা সফল হইবে'। ভারতবর্ষ সকল ঐশ্বর্য্যে বঞ্চিত হইলেও এই যোগ পদ্ধতি সংগোপনে এতাবৎকাল আপনাদের মধ্যে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, এই পূর্ণযোগ সাধনে সিদ্ধ হইয়া ভারতবর্ষ নূতন যুগের প্রতিষ্ঠা করিবে। এই যোগ কোন বিশিষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য গ্রহণ করিলে চলিবে না; মুক্তি এবং আনন্দ লাভই যদি যোগের উদ্দেশ্য হয় তত্রাচ মানুষের মধ্যে ভগবানের প্রতিষ্ঠা করাই সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য। পার্থিব জীবনেই দেবতার লীলা পরিপূর্ণ হইবে--এই মহৎ সঙ্কল্পেই আমরা সাধনার পথে অগ্রসর হইব।

উৎসব

১৩২৩ সালের ৩রা বৈশাখ বাংলার ইতিহাসে এক নূতন পর্য্যায় কেননা এই দিনেই বাঙ্গালী বিধাতার আশীর্ব্বাদে সর্ব্বপ্রথমে সাধারণভাবে ক্ষত্রিয়শক্তি লাভ কর্‌বার অধিকার পেয়েছে—এই দিনেই সমগ্র ভারতের প্রতিনিধিগণ বিংশতিজন বাঙ্গালী সৈনিকের বিদায় উৎসবে চন্দননগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রজাবৎসল ফরাসি-রাজের ভিতর দিয়াই ভগবানের এই শুভাশীর্ব্বাদ পৌঁছিয়াছে—আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই উদার জাতির কল্যাণ কামনা করি। এই দিনটী মনে রাখিবার জন্য চন্দননগরে ১৩২৪ সালের ২রা বৈশাখে এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। বাঙ্গালী সৈনিকগণও সুদূর প্রবাসে এই দিনটী উৎসবে অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহাদের পত্রখানিই এই মহোৎসবের নিদর্শনস্বরূপ পত্রস্থ হইল। (প্রঃ সঃ)

Fort Roumi, Bizerte, 16. 4. 17.

প্রিয়—

আজ এক বৎসর হল তোমাদের ছেড়ে এসেছি। তোমাদের ছেড়ে এসেছি বলে যে ভেতরের টানাটানি সেটা একটা ভোগের সামগ্রী হয়ে উঠেছে। কারু কারু পক্ষে এটা অসহ্য হত কিন্তু তারাও কর্ত্তব্যের দোহাই দিয়ে কঠিন কর্ম্মটাকে মিষ্টি সুখ করে নিয়েছে। অর্থাৎ মোটের মাথায় আমরা সুখে আছি। কষ্ট হলে কি থাকতে পারতুম? কষ্ট কি মানুষ সইতে পারে? সে যে আনন্দের ঠাকুর। ভালবেসে মরা সেটা যে একটা মস্ত আনন্দ। মানুষের জীবনটা

একটা ভালবাসার ইতিহাস যার আরম্ভ গতি ও সমাপ্তি লীলার আনন্দে। ছেলে বেলায় সেটা মা বাপ ভাইবোনে ছিল। মধ্যে সখা সখীতে। তার পর দেশ, তার উপর দেশের ঠাকুর প্রেম গ্রহণ করেছে। আজ আমরা আমাদের Chef de Squadron Comdt. Rousseauxর নিকট হইতে ছুটি নিয়েছি। আমরা আজ একটা উৎসবের মতলব করেছিলুম। সমস্ত সকাল আয়োজনেই কেটে গেল। বৈকালে সকলে একটু কথাবার্ত্তা কইব মনে ছিল। অনেকে মনে করেছিল কথাটা দু'রকম হবে। ১—দেশ ছেড়ে এসেছি তার পুনঃস্মরণ। যাদের ভালবাসি তাদের কথা কওয়া। ২—কেন এসেছি তার কথা। কিন্তু সব হয়ে গেল উল্টো। এমন একটা Programme তৈয়ারি হল যেটা প্রথম একটু অবান্তর কেউ কেউ মনে কর্‌লেও শেষে সেটাই লেগে গেল। হঠাৎ কতকগুলি সৈনিক বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারী ও Military ডাক্তার মোটর ও Ambulance গাড়ী করে উপস্থিত হলেন। তাঁদের চেয়ার দেওয়া হল। তারা কার মুখে আমাদের উৎসব বার্ত্তা শুনে ছুটে এসেছিল জানিনা। বোধ হয় কত কি অদ্ভুত দেখতে এসেছিল। কিন্তু দেখে শুনে (যদিও তারা কেউ ইংরাজী বা বাঙ্গালা জান্‌ত না) নতুন ভারত সম্বন্ধে তাদের মধ্যে সব চাইতে যে বোকা সেও একটু কিছু নতুন Impression নিয়ে গেছে। Indiaতে যে একটা Nation building হচ্ছে সেটা তাদের ফরাসী করে বলা হয়েছিল। আর সে যে একটা অমৃত আনবার জন্য জাগছে সেটাও তারা শুনে গেল।

আমাদের "ধন ধান্য পুষ্পেভরা" গান গাওয়া গেছ্‌ল। দশ অবতারের স্তোত্র পড়া হয়েছিল। অরবিন্দ বাবুর Nation building in India (Karmayogin), Yogic Sadhan হইতে Yoga এবং Hindu Culture (যে Culture হচ্ছে Life governed by ideas) সম্বন্ধে কিছু পড়া ও বলা হয়েছিল। বাঙ্গালায় রবিবাবুর 'অরবিন্দ বন্দনা' কুমুদরঞ্জন বাবুর "বোধন" পাঠ হয়েছিল। তার পর খাওয়ার মধ্যে মোহন ভোগ, সিমাইয়ের পায়েস, কমলা লেবু এবং পানীয়ের মধ্যে সিদ্ধি দুএক চামচে ও চা। সাহেবরাও খেয়ে খুব আনন্দিত হয়েছিল। এদের সঙ্গে একজন সার্ব্বিয়ান ডাক্তার এসেছিলো। এরা আস্‌বে জানলে আমাদের সার্ব্বিয়ান বন্ধুদেরও নিমন্ত্রণ কর্ত্তুম। আমাদের পণ্ডিচারীর ভ্রাতারাও এতে

সহৃদয়ে "আমি হিন্দু" বলে যোগ দিয়েছিল।

আমরা তোমাদের মনে রাখবার জন্য এত করেছি। আবার তোমরা আমাদের মনে রাখবার জন্যে বা আমাদের মানুষ করবার জন্যে কি কর্‌ছ জান্‌তে পারলে বড় সুখী হব।

বাঙ্গালী সৈনিক

কেমনে রহিব গৃহকোণে—ওরা যে শুনেছে সব
শঙ্খের আরাব তব; এ বিশ্বের বিপুল উৎসব
তাই অতি সত্যরূপে ফেলিয়াছে আনন্দের ছায়া
ওদের হৃদয় 'পরে; ছিন্ন হ'য়ে গেছে সব মায়া
কত শত শতাব্দীর—স্পষ্ট আজি নব সত্য পথ
সম্মুখে বিস্তৃত ওই—কোটী নরনারী-মনোরথ
ওই পথে ছিল গুপ্ত, কত বর্ষ পল পল গণি'
কোন্ শুভ মুহূর্ত্তেতে তব শঙ্খধ্বনিখানি শুনি'
কে আসিবে জয়মাল্য বাঁধি' শিরে তা'রি অপেক্ষায়
আঁধার নিশীথে কত শতাব্দীর আশা নিরাশায়।

আজি এই ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তে কে যে দিল দেখা
মুছে গেল নিমেষেতে শতাব্দীর গৈরিকের রেখা,
জীবনের ছবি সেথা ফুটি' গেল দীপ্ত হিরণ্ময়
সৃষ্টির গৌরব ল'য়ে—ল'য়ে তার জয় পরাজয়—
ল'য়ে হাসি, ল'য়ে অশ্রু ল'য়ে যশ গৌরব সম্মান
ল'য়ে দুঃখ ল'য়ে শোক মানুষের লক্ষ কোটী তান:—
শতাব্দীর শৃঙ্খলেরে ছিঁড়ি আজি বিশ্বের মেলায়
বিশ্বের সবার সনে ওরা আজি মিলিবারে যায়।

ওই যে সমর-ক্ষেত্র—পলে পলে মরণের খেলা—
ওই আজি মিলনের স্থান; নাহি যেথা অবহেলা
নাহি ছল নাহি ঘৃণা; কৃষ্ণ শ্বেত উচ্চ নীচ সব

মৃত্যুর পতাকা তলে হবে এক; মরণ-উৎসব
দেখাবে সবারে ভাঙ্গি' মদমত্ত মোহময় কারা
কৃষ্ণ শ্বেত সবাকার বক্ষতলে একই রক্ত ধারা।
মৃত্যুর শাসন নিবে দূর ক'রি যত অপরাধ
শতাব্দীর; যত মিথ্যা জীবনের যত বিসম্বাদ
সঙ্কোচে হইবে নত; শুধু রবে মানুষের প্রাণ
উন্মুক্ত মিলন লাগি বিধাতার শ্রেষ্ঠ অবদান;
ওই যে মরণ-ক্ষেত্র ওই আজি মিলন মন্দির
সেথা ওরা ছুটিয়াছে দগ্ধ প্রাণ শত শতাব্দীর।

ওরা আজি মুক্তি পেল—মুক্তি পেল মানুষের প্রাণ,
অসংখ্য শৃঙ্খল হ'তে আজি মুক্ত জীবনের গান,
বাঁচিতে মরিতে ওরা পাবে নিজ স্বত্ব অধিকার,
আজি লুপ্ত হবে যত আজন্মের লক্ষ অবিচার।
কারা বেরে শাস্ত্রে ঘিরি' মানুষেরে করেছিল নত
তারি আজ প্রায়শ্চিত্ত; আর কভু নাহি হবে রত
দৈন্যের পশরা বহি' অসহায় মানুষের প্রাণ,
কারা সবে ভুলেছিল মানুষেরে বিধাতার দান,
ভুলেছিল অন্তরেতে প্রভু তুমি সদা আছ ভাসি'
শাস্ত্রেরে করিয়া বড় হায় তারা মুক্তি অভিলাষী!

ওরা আজি মুক্তি পেল—আজি শক্তি ছাড়-পত্র তার
দিবে আঁকি বক্ষ-'পরে যেথা নাচে শোণিতের ধার
জীবনের আলোড়নে; আজি সত্য হবে হাসি গান,
পুষ্প হ'য়ে যাবে ফুটি' জীবনের বেদনার দান,
আজি সত্য হবে এই জগতের সংগ্রামের খেলা
শক্তি আজি প্রাণ দিবে দূর করি' যত অবহেলা।

অধ্যাত্ম যুদ্ধ

যুগে যুগে সকল দেশে এমন একদল লোকের আবির্ভাব হয়, সমসাময়িক অধিকাংশ লোকে তাদের পাগল বলে। শুধু পাগল আখ্যা লাভ করেই ইহারা অব্যাহতি পান না, সময় সময় ইহাদের উপর অমানুষিক অত্যাচারও হইয়া থাকে। ইহার কারণ আছে। মানুষের জ্ঞান স্বভাবতঃই দেশ কাল এবং কারণ অবলম্বনে সীমাবদ্ধ। সুতরাং ভগবান্‌কে মুখে স্বীকার করিলেও সাধারণ জীব নিতান্ত জড়বাদী। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ব্যতীত তাহারা অন্য কোন বিষয়েই আস্থা স্থাপন করে না। জড়ের পশ্চাতে এক চৈতন্যময় শক্তি আছে একথা সকলেই হয়ত স্বীকার করিতে পারে—কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা এই অনন্ত চিদ্‌শক্তি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে অসমর্থ হওয়ায়, যাঁহারা দৈবশক্তি বলে ইহাকে উপলব্ধি করিয়াছেন—তাঁহাদের ভাব ও ভাষার সহিত ইহাদের কিছুতেই মিল হয় না। পরন্তু এই ইন্দ্রিয়ের অগোচর পদার্থের সন্ধান পাইয়া—উহাকে সঠিক ভাবে প্রকাশ করিবার জন্য সাধকের উত্তম প্রচেষ্টাগুলিই জনসাধারণের নিকট উন্মাদের কাজ বলিয়াই পরিগৃহীত হয়। এইরূপ জ্ঞানোন্মাদ উত্তম সাধকগণের সহিত আহারনিদ্রামৈথুনরত সাধারণের আকাশ পাতাল প্রভেদ। প্রথমোক্ত মহাপুরুষগণ অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা যাহা প্রত্যক্ষ করেন তাহার উপর অকাট্য বিশ্বাস করিয়া থাকেন—শেষোক্ত ব্যক্তিগণ বিশ্বাস কাহাকে বলে তাহা জানেই না, তাহাদের নিকট 'বিশ্বাস' আভিধানিক একটা কথা মাত্র। যোগদৃষ্টিশালী জনগণ স্থান কাল এবং কারণ ছাড়াইয়া আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ করিয়া যে সকল সত্য আবিষ্কার করেন, তাহার প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন মরণ পণ করিয়া বসেন। সাধারণ মানুষ সত্য মিথ্যার ধার ধারে না, ক্ষণবিধ্বংসী জীবনের ভোগ্যবস্তু সংগ্রহে সদা ব্যাপৃত থাকে, এতদ্বিপরীত কার্য্যে কাহারও যত্ন দেখিলে তাহাকে দূরে পরিহার করে এবং তাহাদের কল্পিত সুখরাজ্যে অশান্তির ছায়া পড়িবে ভাবিয়া সমাজ হইতে

এইরূপ অসাধারণ তপঃশক্তি সম্পন্ন সাধকগণের উচ্ছেদ সাধনেও কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠে।

মনুষ্য সমাজের মধ্যে এইরূপ দ্বন্দ্ব সকল দেশেই দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু অগ্নিকণা যেমন বৃহদাকার ধারণ করিয়া গ্রাম নগর ভস্মীভূত করিবার সামর্থ্য রাখে, সত্যও সেইরূপ বিশাল মানব সমাজের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া দেশের সমস্ত অশুদ্ধতা ও অসত্য দূরীভূত পূর্ব্বক আপনার বিজয়কেতন সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। দৃষ্ট অদৃষ্ট সমস্ত বিপক্ষ শক্তিকে গ্রাস করিয়া চিরদিনই সত্য জগতে আত্মকাহিনী প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং যুগে যুগে বিজয়ী বীরের মত আপামর সকলেরই পুষ্প অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া আপনার অমর বীর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছে।

স্থান কাল এবং কারণের বশবর্ত্তী হইয়া এই সত্য আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করে, ভগবৎ ইচ্ছায় ইহাই যখন মুক্ত এবং স্বচ্ছন্দ ভাবে অগ্নিমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া উঠিয়া দাঁড়ায় তখনই মানব সমাজের মধ্যে এক প্রবল তরঙ্গ উঠিতে থাকে। যে সকল যন্ত্র এই সত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া পৃথিবীর সমস্ত বন্ধন বিদলিত করিতে প্রয়াসী হয়, সাধারণতঃ তাহারাই সাময়িক বহু বিরুদ্ধ শক্তির আঘাত সহ্য করিয়া পরিশেষে উত্তম যুগের প্রতিষ্ঠা করে।

য়ুরোপ আজ জগতে স্থায়ী শান্তির সংস্থাপনে প্রয়াসী হইয়া এক মহা সংগ্রাম বাধাইয়া বসিয়াছে। মানুষের সকল দুরাশাগুলি এই আঘাতে অপসারিত না হইলে ইহা যে কার্য্যে পরিণত হইবে না প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই ইহা বুঝিতে পারেন কেননা বাহিরের যুদ্ধ ভিতরেরই অভিব্যক্তি মাত্র, ভিতরের পরিবর্ত্তন না ঘটিলে বাহিরের রক্তপাত কিছুতেই চিরদিনের জন্য নিবারিত হইবে না।

মানুষের বর্ত্তমান অশুদ্ধ স্বভাবের বিরুদ্ধে জগৎ আজ জাগতিক উপকরণ সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। কি চূড়ান্ত মোহ এবং অহঙ্কারের খেলা! এই মহাযুদ্ধের উপকরণ—মানুষ, অর্থ এবং অস্ত্রশস্ত্র ; এই সকল উপাদানই পৃথিবীর সুতরাং ইহাদের একটা সীমা আছে। যে জাতির এই উপকরণাদির অভাব হইবে, সেই জাতিই চিরশান্তির যে সুখ স্বপ্ন উহা বিস্মরণ হইয়া উপস্থিত স্ব স্ব অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আপোষ করিবেই কিন্তু সুদূর ভবিষ্যতে পার্থিব উপকরণাদির প্রাচুর্য্য ঘটিলে উহারাই

আবার এই যুদ্ধের অসমাপ্ত অংশটুকুর অভিনয় আরম্ভ করিয়া দিবে—সৃষ্টির দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত এইরূপই হইতেছে।

সমস্ত জগৎ যখন আপনাপন ধর্ম্ম সংরক্ষণে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে, ভারতবর্ষও তখন বিধাতার ইঙ্গিত উপেক্ষা করিবে না—সেও জগতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে; অন্যান্য জাতির যুদ্ধোপকরণ পার্থিব ঐশ্বর্য্য, ভারতের কিন্তু উহা হইবে অধ্যাত্মশক্তি। পৃথিবীর সামগ্রী কোন কালে স্থান কাল এবং কারণের অতীত হইতে পারিবে না সুতরাং ঐ সকল অনিত্য বস্তুর অবলম্বনে আজ যাহারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির অর্দ্ধ পথ হইতেই আবার ফিরিয়া আসিতে হইবে; কিন্তু ভারতবর্ষ মনুষ্যজাতির মধ্যে একটা অখণ্ড সত্য ও একতার প্রতিষ্ঠা না করিয়া এই অনন্ত সংগ্রাম হইতে কখনই বিরত হইবে না। ভারতবর্ষ তাই আজ শুদ্ধ অধ্যাত্মশক্তি সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। জরা মৃত্যু উৎপীড়ন জগতের কোন উপদ্রবেই এই মহামন্ত্রের পরিশেষ হইবে না। এই মহাশক্তির সাহায্যেই ভারতবর্ষ নূতন সত্যযুগের প্রতিষ্ঠা করিবে। আজ আত্মজয়ের জন্য ভারতবর্ষ যে সাধনা আরম্ভ করিয়াছে, বিশ্বজয় না হওয়া পর্য্যন্ত এ সাধনা সে পরিত্যাগ করিবে না—ইহা অবধারিত জানিও।

তিনটি কথা

যার বিশ্বাস আছে সাহস আছে এবং ধৈর্য্য আছে—সেই এই নূতন যোগ গ্রহণের অধিকারী। বিশ্বাস না থাক্‌লে কে আপনাকে ভুলে প্রাপ্ত-পদার্থ পরিত্যাগ করে' অনির্দ্দিষ্ট দুর্গম পথে, অপার্থিব বস্তুর অন্বেষণে প্রধাবিত হয়? সে পথে কত বিভীষিকা কত বাধা কত দুর্গতি! সাহস থাক্‌লেই ত বীরের মত সকল বিঘ্ন অতিক্রম কর্‌বার স্পর্দ্ধা হয়। কোন্ কাপুরুষ কোন্ কালে সংগ্রাম হতে ফিরে এসেছে তার সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তিকে পরাজিত করে' বিজয় মাল্যটি গলায় দিয়ে? কোন্ ধৈর্য্যহীন অজর অমরের মত দিবস সর্ব্বরী এক করে' সংগ্রাম কর্‌তে পেরেছে, যতদিন না অভীষ্ট সিদ্ধ হয়? তাই বল্‌ছি অধুনা যে প্রবল বাধা মনুষ্য-জীবনের সম্মুখে অটল হিমালয়ের মত খাড়া হয়ে রয়েছে, যে বাধা ক্রমোন্নতিশীল মানব-

জাতির স্বভাব গতিকে প্রতিহত কর্‌ছে, তাকে চিরদিনের জন্ত দূর করে দিতে হলে মানুষকে ত ধর্ম্মপ্রাণ কর্‌তে হবে—তার জন্ত চাই অটুট বিশ্বাস, দুর্জ্জয় সাহস, আর অফুরন্ত ধৈর্য্য।

* * *

বিশ্বাস! অটুট বিশ্বাস—আপনার অমর অস্তিত্বে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস—আপনার বৃহতে আপনার ধর্ম্মে আপনার কর্ম্মে দৃঢ় প্রত্যয়, তারপর ভগবান্। ভগবানের ইচ্ছা না হলে যে একটি অঙ্গও আমি সঞ্চালন কর্‌তে পারি না, ভগবানের বিনা ইচ্ছায় জগতের কোন কার্য্য সম্পাদিত হয় না এইরূপ অকাট্য অবিচ্ছিন্ন বিশ্বাসকে হৃদয়ে বদ্ধমূল কর্‌তে হবে। মানুষের অহং জ্ঞানকে এই বিশ্বাসের পবিত্র অনলে পুড়িয়ে ছাই করে ফেল্‌তে হবে। কলের ইঞ্জিন যেমন বাষ্পের সহায়তায় পরিচালিত হয় আমার দেহযন্ত্রও সেইরূপ ভগবদ্ শক্তির প্রেরণায় বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে নৃত্যশীল, এইরূপ ধারণা কর্‌তে হবে—আমি যে ভগবানের হাতের যন্ত্র, ধর্ম্ম অধর্ম্ম পাপ পুণ্য কিছুই জানি না, তাঁর ইচ্ছাতেই পরিচালিত হই, তাঁর বিরুদ্ধে এক পদও অগ্রসর হতে পারি না—এইরূপ বিশ্বাসের সাহায্যেই একদিন আমরা দেখ্‌তে পাব—ডাব যখন ঝুনো হয় তখন যেমন তার শাঁস আর খোল্ আলাদা বলে বাহির হতেই বুঝা যায়—সেইরূপ আমাদের যন্ত্র এবং যন্ত্রী স্বতন্ত্র বলে প্রতীয়মান হবে—তখনই আমরা জীবন্মুক্ত হব, তখনই সমরসের মধ্যে অবগাহন করে সচ্চিদানন্দে বিভোর হয়ে থাক্‌বার অবস্থা লাভ কর্‌বো।

* * *

সাহস না থাক্‌লে এই বিশ্বাসকে দৃঢ় রাখা কঠিন হবে। বিভীষিকা দেখে প্রতিপদেই যদি কাপুরুষের মত শিহরিয়া উঠি তা হলে কর্পূরের মত বিশ্বাস অন্তর্হিত হবে। ভগবান যখন ইচ্ছা করেন তখনই যখন সকল কার্য্যের সৃষ্টি হয় তখন ভয় কিসের, আমি অভী। আমার জীবনের উপর দিয়ে কত কঠোর বিধানই আবর্ত্তিত হোক না, আমি নিঃশঙ্ক চিত্তে তা সহ্য কর্‌বো কেননা এ দুঃখ যে ভগবানেরই দান। আমার জীবন-ক্ষেত্রকে দেবজীবনের উপযোগী করে' তোলবার জন্তই ত তার এই সকল ঘটনার সৃষ্টি। কোন্ পথ দিয়ে গেলে আমি শীঘ্র তাঁর অভয় চরণে আশ্রয় পাব, সে কথা তিনিই জানেন। আমি তাঁর হাতেই যখন আমাকে সম্পূর্ণরূপে

উৎসর্গ করেছি, উচ্চকণ্ঠে যখন বলেছি,

> "জানামি ধর্ম্মং নচমে প্রবৃত্তিঃ জানাম্যধর্ম্মং নচমে নিবৃত্তিঃ,
> ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" ॥

তখন আমার আবার ভয় কি? মৃত্যুর করাল বদন দৃষ্টি পথে আবির্ভূত হলে সাহস করে তাকে সাদরে বরণ করে নেব। কে জানে এই পথেই আমার সিদ্ধি আছে কিনা? দরিদ্রতার কঠোর নিষ্পেষণে বিমর্দ্দিত হলেও ভীত হব না কেননা শ্রীভগবান যখন এই পথে এনেছেন নিশ্চয় ইহারই মধ্যে অমৃত লুকান আছে। পৃথিবীর অমানুষিক অত্যাচার মাথা পেতে নিতে কুণ্ঠিত হব না, হয়ত বা এই পথেই আমার শুদ্ধি, মুক্তি, সিদ্ধি, ভুক্তি বিদ্যমান আছে। শ্রীভগবানের হাতের যন্ত্র হবার সাধনা কর্‌তে হলে এই সাহসকে সর্ব্বাগ্রে বরণ করে নিতে হবে।

* * *

তারপর চাই ধৈর্য্য। মৃত্তিকার মত সহ্য করে স্থির থাক্‌তে হবে। অভিমান বা দ্বেষ এসে যেন আপনাকে বিচলিত না করে। সাধনার পরম শত্রু অভিমান। মানবজীবনের স্বভাবগতি প্রতিহত প্রতিহিংসার কণ্টকাকীর্ণ আবেষ্টনে। উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে বিঘ্ন দেখেই আমরা বুদ্ধিভ্রংশ হই, ধৈর্য্যহীন হয়ে বাধার সঙ্গে মাথা ঠোকাঠুকি করে অযথা শক্তি ক্ষয় করি। বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা হলেই স্বভাবতঃই ধৈর্য্য দেখা দেবে। ধৈর্য্যের সৌম্য শান্ত বোধক মূর্ত্তি সাধকের পথ প্রদর্শক হবে। সাধক তখন অনন্ত জীবন পথের পথিক হয়ে শ্রীভগবানের ইচ্ছায় কোন ফলের প্রত্যাশা না করে, অকুণ্ঠিত চিত্তে কেবলই বাধার সঙ্গে লড়াই কর্‌তে কর্‌তে ছুটে চল্‌বে, সিদ্ধির আশায় এক মুহূর্ত্তও বিচলিত হবে না। সাধক শ্রীভগবানের যন্ত্র, সিদ্ধি আসা না আসা ভগবানেরই ইচ্ছাধীন সুতরাং এত দিন কি কর্‌লুম, বা কি কর্‌ছি প্রভৃতি দ্বন্দ্ব এসে সাধকের হৃদয় কদাচ সংশয়াপন্ন কর্‌বে না, এইরূপ জীবনেরই মধ্যে আগামী সত্যযুগের কর্ম্মপ্রেরণা প্রতিদিন নব নব বেশে প্রস্ফুটিত হতে থাক্‌বে—এইরূপ জীবন অবলম্বন করেই স্বর্গের দেবতা মরজগতে আবির্ভূত হবে, মায়াবাদীর ঘৃণার্হ কলুষিত অনৃতময় এই বিশ্বভূমেই বৈকুণ্ঠের অমর লীলা অভিনীত হবে। হে বাংলার নরনারী, তাহারই জন্য কেবল প্রস্তুত হইতে বলি।

রাজসিক উত্তেজনা

সাধারণ মানব জীবনে দুইটী প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়, একটী রাজসিক উত্তেজনায় অপরটী তামসিক উদাসীনতায়। এই দুই স্বভাবশক্তি বর্ত্তমান জগতে অধিকার বিস্তার করিয়া সমগ্র মানবজাতির সর্ব্ববিধ কর্ম্মপ্রেরণাগুলিকে নিয়মিত করিতেছে। বঙ্গীয় যুবকগণকে এই অশুদ্ধ শক্তির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সাধনা করিতে অনুরোধ করি, বিনা সাধনায় জগতে কোন্ কার্য্য সফল হইয়াছে? যে জীবন দিয়া আমরা ভগবদ্ কার্য্য সম্পাদন করিব বলিয়া স্পর্দ্ধা করি, সেই জীবন-স্রোতকে সর্ব্বাগ্রে অনাবিল করিতে হইবে—রাগ দ্বেষ বিবর্জ্জিত না হইলে কোন মহান কার্য্য করিবার অধিকারী আমরা কোন কালেই হইব না—ক্রমাগত মদগর্ব্বে উন্মত্ত হইয়া অশুদ্ধ কর্ম্ম রাশির সৃষ্টি করিলে তাহার কঠোর চাপে আমরা ধ্বংস হইব।

স্বদেশী যুগের পর হইতে আমাদের বাংলা দেশে যে সকল সমুচ্চ কর্ম্মপ্রেরণার উদ্ভব হইয়াছিল—তাহা সফল হওয়া দূরের কথা, উহার গুরুভারে আমরা এমনই সঙ্কুচিত ও পিষ্ট হইয়া পড়িতেছি যে অনতিকাল মধ্যে সমাজজীবন আবার নিস্পন্দ এবং জড়ভাবাপন্ন হইয়া পড়িবে। সকল দেশেই জাতিকে মরণের পথ হইতে নবীনগণই অমৃতের পথে পুনরানয়ন করে। হে বাংলার অসংখ্য কর্ম্মী যুবকগণ, সাধনার দ্বারা মনটাকে উর্দ্ধে উত্তোলিত রাখিয়া শরীর ও প্রাণ দিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও, অহংবিবর্জ্জিত হইয়া আপনার মধ্যে ভগবানের ইঙ্গিত পরিলক্ষিত কর—সদুদ্দেশ্যে কে কবে বিফল মনোরথ হইয়াছে তবে অহংদোষদুষ্ট বুদ্ধি দ্বারা স্বকর্ম্ম মাত্রকেই ভগবদ্ কার্য্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিও না, মনে রাখিও—

নেহাভিক্রম নাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥

মনকে ভগবানে সংলগ্ন রাখিয়া পরিশুদ্ধ চিত্তে নিষ্কাম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে কখনই বাধা বিঘ্ন সে কর্ম্ম প্রবাহকে প্রতিহত করিতে পারে না—এইরূপ বিশ্বাস ও ধৈর্য্য সহকারে বিদ্বেষ বিবর্জ্জিত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে

আগুয়ান হও। তুমি যতটুকু শুদ্ধ হইবে ততটুকু ভগবদ্ কার্য্য করিবার অধিকার পাইবে, এবং ততটুকু নির্ভয় হইবে "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।"

অশুদ্ধ জীবননদীতে যখন পূত মন্দাকিনীপ্রবাহ প্রথম প্রবাহিত হয় তখন স্বভাবতঃই অশুদ্ধ ও আবিল তরঙ্গ মাথা তুলিয়া নৃত্য করে, কিন্তু অবিচ্ছেদ পুণ্য-স্রোত প্রভাবে সে দোষ বিদূরিত হয়, তখন জীবনে পবিত্র নির্দ্দোষ আনন্দলহরী উথলিয়া উঠে তখনই কর্ম্মীর জীবন সার্থক হয়; কর্ম্মক্ষেত্রের মহা কোলাহলের মধ্যে অবস্থান করিয়াও সে শান্তি ও সমতার আস্বাদ লাভ করে।

সম্ভব অসম্ভব ইত্যাকার বুদ্ধি দ্বারা উদ্ভ্রান্ত হইয়া মানুষ যখন জড়ের মত কর্ম্মশালার এক পাশে হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকে তখনই বুঝিবে তামসিক উদাসীনতায় সে আচ্ছন্ন হইয়াছে। প্রতি কার্য্যেই সে অশক্ত এই রূপ অনুভূতিই তমের লক্ষণ, শরীর রক্ষার জন্য স্নানাহারেও সে অনাস্থা প্রদর্শন করে, তাহার ভিতর যে অনন্ত শক্তিধর পুরুষ বিরাজ করিতেছেন সে যে কিছুই নয়—তাঁর ইচ্ছা হইলে পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করে, এইরূপ ভগবদ্ বিশ্বাস তাহার আদৌ আসে না—স্বীয় বুদ্ধির দ্বারা কেবল নিতান্ত যাহা না দেখিলে নয়, যাহা না শুনিলে হয় না, বসিয়া বসিয়া এইরূপ বিষয় বিশেষের উপর টিপ্পনি করাই ইহাদের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। কোন কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বেই ফলাফল বলিয়া দিতে ইহারা খুব পটু তা ঠিকই হউক আর নাই হউক। জগতের চক্ষে ইহারা চক্ষুশূল! এই আবর্জ্জনা স্তূপকে না দূর করিয়া দিতে পারিলে, কোন দেশ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেই পারে না—আমাদের বাংলা দেশে এইরূপ বৃহৎ বৃহৎ পাহাড়ের মত পাপের বোঝা ক্রমাগত কর্ম্মোৎসাহীগণের গতিপথ অবরুদ্ধ করিয়া অবস্থিত আছে। যাহাদের মধ্যে কর্ম্মপ্রেরণা দেখা দিয়াছে, তাহারা এই পূতিগন্ধময় গলিত আবর্জ্জনা স্তূপ ঠেলিতে আরম্ভ করে—ইহাই সংঘর্ষ; কর্ম্মী চাহে তাহার গতিকে অবাধ করিয়া তুলিতে কিন্তু গতির পথে যে বিপুল বাধা তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে কেহ কেহ অবসন্ন হইয়া পড়ে, কেহ বা অক্লান্ত চেষ্টা দ্বারা নিজের স্বভাবকে দৃঢ় করিয়া তুলে। দেশের তমসাবৃত মানব সমষ্টিই যে কর্ম্মতৎপর জনগণের একমাত্র বাধা, এরূপ নহে, কেননা যে স্বভাবশক্তি দেশকে এইরূপ জড়ত্বে পরিণত করি-

য়াছে—উহা বাস্তব জগৎ ব্যতীত আধ্যাত্মিক জগতেও অবস্থান করিতেছে, সুতরাং কর্ম্মপ্রেরণা লাভ করিলেও মানুষকে অন্তর ও বাহির উভয়ের সঙ্গেই সংগ্রাম করিতে হয়।

এই অন্তরকে জয় করিতে না পারিলে—বাহিরের যুদ্ধে জয়ী হওয়া সম্ভবপর নহে, কেবলমাত্র কর্ম্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া যাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাঁহারা স্বভাবতঃই বাধা ও বিঘ্নগুলির অন্তরদেশ দেখিতে পান না, সুতরাং বাধার কঠোর বিগ্রহের উপরেই অস্ত্রক্ষেপ করিয়া থাকেন—ইহাতে শীঘ্রই শক্তি ক্ষয় হয় এবং কর্ম্মীকে অবসাদগ্রস্ত হইতে হয়। রাজসিক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইলে মানুষ কিছুতেই স্থিতধী হইয়া প্রত্যেক বাধাটির কতটুকু শক্তি এবং তাহার উৎপত্তি স্থান কোথায় এবং ইহাকে জয় করিতে হইলে ইহার কোন্‌খানে আঘাত করিতে হইবে ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিতে পারে না; উত্তেজনার বশে মূর্খের মত প্রতিহিংসার শাণিত অস্ত্র ক্ষেপণ করাই ইহাদের কার্য্য—তা সে আঘাত প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিকে আদৌ স্পর্শ করুক আর নাই করুক।

আমাদের দেশের সকল কার্য্যগুলিই এইরূপ। সমাজ সংস্কার, শিক্ষা বিস্তার, শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি সকল কর্ম্মক্ষেত্রেই আনাড়ির অভিনয় দেখিতে পাওয়া যায়। সমস্ত জীবন স্বদেশের সেবায় উৎসর্গ করিয়া দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথ আজ ১৮০০ শত যুবক সংগ্রহ করিতে বাংলার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ধাবিত হইতেছেন ইহা দেখিলে কি মনে হয়? তিনি সমস্ত জীবনে যে কার্য্য করিয়াছেন তাহার সিকি অংশও বিচক্ষণতার সহিত সম্পাদিত হয় নাই—নতুবা তাঁর একটি আহ্বানে সপ্ত কোটী বঙ্গ সন্তানের মধ্যে এক লক্ষও কি সাড়া দিত না! হায় বাংলা দেশের কর্ম্মীগণ! কবে তোমরা যোগপথ অবলম্বন করিয়া বিক্ষিপ্ত কর্ম্মপ্রেরণাগুলিকে সংহত করিয়া বিশ্বের কল্যাণ সাধনে সমর্থ হইবে?

আজ য়ুরোপে যে ঘোরতর সংগ্রাম চলিয়াছে ইহার ফলে য়ুরোপীয় জাতিগণের মধ্যে যে সংযম ও সংরক্ষণনীতি প্রকাশ পাইতেছে, তাহা শিক্ষা করিবার বিষয়। কত দীর্ঘ দিন এই যুদ্ধ চলিবে তাহার স্থিরতা নাই, সেইজন্য প্রত্যেক দেশের মনীষিগণ খাদ্য অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতির অপচয় নিবারণের জন্য কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিতেছেন তাহা অবলোকন কর। পাশ্চাত্য, আপনাপন বিশেষত্ব ও মর্য্যাদা রক্ষা কল্পে এই মহাসমরে

অবতীর্ণ—আর আমরাও কি সেইরূপ আমাদের ধর্ম্ম ও অস্তিত্ব রক্ষা করিবার জন্য আমাদের নিম্নমুখী স্বভাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি নাই? য়ুরোপের সংগ্রাম পৃথিবীর—মানুষের বাহ্য ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যই ইহার সর্ব্বপ্রধান উপকরণ কিন্তু আমাদের যুদ্ধ আধ্যাত্মিক—অধ্যাত্মশক্তির উন্মেষ সাধনই ইহার মূল উপাদান, সেই অধ্যাত্মশক্তির বিকাশসাধন এবং তাহার যথাযোগ্য প্রয়োগ-কৌশল শিক্ষা না করিলে আমরা কোন কালেই জয়ী হইতে পারিব না। এবং এই মহাশক্তির যথেচ্ছাচার ব্যয় নিবারণ করিয়া ইহাকে সংযত ও সংরক্ষণ করা এই দণ্ডেই কর্ত্তব্য।

এতদিন আমরা কেবল উত্তেজনায় বশবর্ত্তী হইয়া অনর্থক শক্তির অপব্যয় করিয়া আসিয়াছি। যথাযোগ্য শক্তিপ্রয়োগে অসমর্থ হইয়া শিব গড়িতে বাঁদর গড়িয়া বসিয়াছি, গতির পথে বাধা দেখিয়া আত্মহারা হইয়া রাগ দ্বেষের সৃষ্টি করিয়াছি। আজ সমাহিতচিত্তে সর্ব্বাগ্রে আত্মশক্তিকে চিনিয়া লইতে হইবে—আপনার ভিতর যে বিরাট ভগবদ্‌শক্তি বিরাজ করিতেছে, যে শুদ্ধ সৎ স্বভাব আমায় নিয়ন্ত্রিত করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছে তাহারই গতি অবাধ করিয়া দিতে হইবে, বুদ্ধি মন প্রাণ শরীর কিছুর অহঙ্কারে সে যেন বাধা প্রাপ্ত না হয়। আমরা কেবল স্ব স্ব বুদ্ধির অনুগত করিয়া তুলিবার জন্য মন প্রাণ শরীরের সহিত বৃথা সংগ্রাম করিয়াছি—আপনার স্বভাবানুযায়ী আপনার আদর্শকে, কল্পনানুসারে পৃথিবীকে গড়িয়া তুলিবার অহেতুক চেষ্টা করিয়াছি—অহংকারের গগনস্পর্শী তাজমহল নির্ম্মাণের বৃথা আশা আজ ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে। এই মাহেন্দ্রক্ষণেও যদি আমরা আমাদের জীবনকে দৈবশক্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে না পারি, আগামী সহস্র বৎসরের মধ্যেও আর পারিব না। আমরা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিতে চাহি না, দেশের মধ্যে নিরর্থক বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি আনয়নের পক্ষপাতী নহি তবে ধর্ম্ম ও প্রেমের নিখুঁত বিগ্রহ ভারতের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিতে চাই। এই দেবকার্য্য সম্পাদন করিতে যদি সহস্রবার মরিতে হয়, সহস্রবারই আবার আমায় এই পুণ্যপীঠ ভারতে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইবে কেমনা জগতে প্রেম ও সত্যের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতে না পারিলে সৃষ্টির সার্থকতা থাকে না, ভগবানের যে ইহাই আদেশ।

অতএব প্রত্যেক ভগবদ্‌ভক্তকে আজ এক সুরে প্রণব উচ্চারণ করিতে হইবে, একটুকু উনসুরো হইলে চলিবে না। অপ্রত্যক্ষ অনুভূতির উদ্দেশ্যেই শরীর

ও মনকে পরিচালিত করিতে হইবে; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় বিশেষের উপর উপস্থিত মন নিয়োগ করিলে আমাদের উর্দ্ধগতি মন্থর হইয়া যাইবে। আমরা সর্ব্বাগ্রে দেবতার সমীপগত হইব—দেবতার অক্ষয় আশীর্ব্বাদে পূর্ণ হইয়া ফিরিয়া আসিব এই মরজগতেই, শরীর ও প্রাণ উৎসর্গ করিব এই পৃথিবীর উপরেই আমাদের দেবরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য; চাই ভগবান, চাই দেবশক্তি—অন্তর ও বাহিরের সহিত সংগ্রাম করিবার ইহাই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাদান।

লীলা

(৩)

ভগবান্ আর পৃথিবী এই দুয়ের পৃথক জ্ঞান এতই প্রবল, যে ভগবানকে চাহিলে অপরটীর সহিত আমাদের সকল সম্বন্ধ নষ্ট করিতে হয়। আমাদের ধারণা, ভগবানই সত্য নিত্য বস্তু, জগৎ অলীক মায়া মাত্র। সেই জন্য ধর্ম্মসাধনা অর্থে আমাদের ত্যাগমন্ত্রে দিক্ষীত হইয়া ইহজগতের সহিত সম্পর্কশূন্য হওয়া, জাগতিক সকল ঐশ্বর্য্য মূত্রপুরীষের মত পরিত্যাগ করিয়া জগতাতীত অবস্থা লাভ করা। কিন্তু আমরা যে তত্ত্ব প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি ইহা ভগবানের সহিত জগতের যে কোন বিরুদ্ধ ভাব আছে তাহা অস্বীকার করে, উপরন্তু ব্রহ্ম ও জগৎ, এই দুইই যে এক, অভেদ—এই কথাই খুব জোর করিয়া বলে।

আমরা জগৎ ও তাহার সমুদয় বিকাশকেই সত্যের চক্ষে দেখিতে চাই, শরীর হইতে সূক্ষ্ম আত্মা পর্য্যন্ত সকলই জগদীশ্বরের ঐশ্বর্য্য এই জ্ঞানকে অনাহত রাখিয়া সচ্চিদানন্দে বিভোর থাকিতে চাই কেননা জাগ্রতের মধ্যেই সমাধির জ্ঞানকে কর্ম্মপর করিয়া তোলাই আমাদের লক্ষ্য।

এই উদ্দেশ্যেই জীবনকে তিল তিল করিয়া নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে—পুরাতনের বনিয়াদ্ পর্য্যন্ত উপাড়িয়া আত্মবিধৃত সত্তার দ্বারা মূল হইতে আরম্ভ করিয়া নূতন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। তাহাই হইবে আমাদের দেবজীবন এবং এই দেব চরিত্র দিয়াই গড়িয়া তুলিব আমাদের ভবিষ্যৎ স্বর্গ যুগকে।

ইহার জন্যই সাধনা; এই দেবলীলা চরিতার্থ করিবার জন্যই আমরা

উদ্যোগ পর্ব্ব আরম্ভ করিয়াছি; এই মহাপর্ব্বের উপাদানস্বরূপ আমাদের বর্ত্তমান জীবনগুলিকে যে ভাবে গঠিত করিলে সত্বর ভগবৎ-লীলা সিদ্ধ হয় তাহার কথাই বলিব।

জীবনকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতনভাবে গঠিত করিতে হঠযোগ অনেক ক্ষেত্রে প্রশস্ত হইলেও বর্ত্তমান অবস্থায় হঠযোগ ততটা কার্য্যকরী হইবে না, ত্রিমার্গযোগও সম্পূর্ণরূপে আমাদের উদ্দেশ্যের উপযোগী নহে, এই সকল অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত সরল অথচ উচ্চ যোগপদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে। উহা হইতেছে অধ্যাত্মযোগ। এই যোগের পথে অগ্রসর হইতে হইলে মানুষকে সর্ব্বাগ্রে অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতে হইবে—কেবল বিশ্বাস নহে, বুদ্ধির দ্বারা দৃঢ় ধারণা করিতে হইবে, যে জগতে যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই, অথবা যাহা আমরা প্রত্যক্ষ করি নাই কেবল শুনিয়াছি, যে কোন বস্তু, যে কোন ঘটনা, মানুষ পশু পক্ষী যক্ষ রক্ষ ভূত প্রেত পিশাচ, এ সমস্তই ভগবান, ব্রহ্মের বিচিত্র বিকাশ ভিন্ন অপর কিছুই নহে। আমাদের কার্য্য, আমাদের আচার ব্যবহার, আমাদের স্বভাব, সমস্তই এই জ্ঞানের অনুগত করিয়া তুলিতে হইবে। আমরা যেন কখনই ভুলিয়া না যাই যে জগতে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু আছে, থাকিতে পারে। আমরা সম্পূর্ণভাবে সেই পরাৎপর পুরুষের নিকট আত্মনিবেদন করিব, যিনি কখন পুরুষ কখন প্রকৃতি, কখন সান্ত কখন অনন্ত, কখন এক কখন বহু, যিনি আপনার সনাতন সত্ত্বা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল, যিনি আপনাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন দেবতার মধ্যে, মানুষের মধ্যে, পশুপক্ষী কীটপতঙ্গের মধ্যে, যিনি সমান ভাবে পূর্ণ রয়েছেন ত্রিজগতে।

এই আত্মোৎসর্গ হইবে ছেদহীন সমাহৃত। একবারও এই জ্ঞানের সূত্র ছিন্ন হইলে চলিবে না, জীবনের সকল অবস্থায় সকল ঘটনায় সকল কার্য্যেই ভগবানের অস্তিত্ব আছে এই ধারণা দৃঢ় করিয়া তুলিবার ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। আপনাকে এই ভগবদ্‌জ্ঞানের অন্তর্গত রাখিয়াই অবস্থান করিতে হইবে। আমার স্বাতন্ত্র্য মুহূর্ত্তের জন্যও মনে জানিব না, আমার বলিতে কিছুই নাই, সব ভগবানের। তাঁর জন্যই জীবন—আমার বাসনা, আমার কামনা, আমার মতামত, আমার আদর্শ, আমার উচিত অনুচিত, আমার সম্ভব অসম্ভব প্রভৃতি সকল জ্ঞান ঐ ভগবদ্ জ্ঞানের অনুগত করিয়া তোল। হৃদয় হইতে সমস্ত আশা আকাঙ্খাগুলিকে বিসর্জ্জন দাও, বুদ্ধির অসম্পূর্ণ

অশুদ্ধ বিকারগুলির নিরসন কর, ধারণা কর—জগৎ এবং তুমি অভিন্ন। এই অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে সৎ-চিৎ-আনন্দ অবস্থিত আছে—এই সকলই সেই পরমব্রহ্মের বিকাশ—তিনিই বিশ্বপটে জ্ঞান শক্তি প্রেমের অনন্ত লীলা প্রকট করিয়া তুলিতেছেন। খণ্ড এবং ভেদজ্ঞান দূর করিয়া বিশ্বশিল্পীর হস্তে আপনাকে ক্রীড়নকের মত সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হও, পরমানন্দ লাভ কর। অহঙ্কারই এই উত্তম যোগপথের পরিপন্থী। অহঙ্কারের বিনাশ হইলে ভগবানের পূর্ণ লীলা আমাদের জীবন-কুঞ্জে অভিনীত হইবে। পূর্ণ জ্ঞানে প্রেমে আনন্দে শান্তিতে আমাদের এই জীবন বিকশিত হইয়া উঠিবে, আমরা তখনই লাভ করিব দেবজীবন কেননা আমাদের জীবনই তখন ভগবদ্‌লীলার যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহৃত হইবে।

আংশিক ভাবেও যদি সাধক এই আত্মোৎসর্গ করিতে পারে তাহা হইলেও মানুষের জীবনে অন্ধচেষ্টার যে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল কর্ম্মপ্রেরণা "তাহা রুদ্ধ হইয়া যাইবে। ইঞ্জিন যেমন পরিচালকের হস্তে পরিচালিত হয়, সেইরূপ আমাদের জীবনের প্রভু হইবেন স্বয়ং ভগবান। তখন আমার পরিবর্ত্তে ভগবানই হইবেন সাধক এবং আমার জীবনের সকল অশুদ্ধতা দূর করিয়া তিনিই হইবেন সিদ্ধ। তাঁর দৈবশক্তিই তখন শুদ্ধি বিধান করিবে। আমরা যে সকল কৃত্রিম যোগক্রিয়া অবলম্বন করি সেগুলি সর্ব্বসময়ে ফলপ্রসূ নাও হইতে পারে কিন্তু ভগবানের আদেশে সর্ব্বান্তর্যামী কালীশক্তি যখন আমাদের জীবনকে ভগবানের লীলাভূমির উপযোগী করিবার জন্য নিয়োজিতা হন তখন আমাদের শুদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। জীবনের চির তমসাবৃত অসংখ্য অন্ধ কোঠরে কোথায় কোন্ শত্রু লুক্কায়িত আছে, আমাদের কাল্পনিক সাধনা তাহার অনুসন্ধানে অকৃতকার্য্য হইতে পারে কিন্তু প্রকৃতির অন্তর্ভেদী দৃষ্টির হস্ত হইতে তাহাদের পরিত্রাণের উপায় নাই, কাজেই রাজযোগ প্রাণায়াম ধ্যান ধারণা ভক্তি ত্যাগ প্রভৃতির ফল, তুলনায় অধ্যাত্মযোগের অপেক্ষা অসম্পূর্ণ বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। উপরোক্ত যোগক্রিয়াগুলি মানুষের সাধ্যানুসারেই সম্পাদিত হয় সুতরাং এই যোগের ফল কিয়ৎ পরিমাণে সীমাবদ্ধ কিন্তু অধ্যাত্ম যোগের পরিণাম কিছুরই অধীন নহে, কেননা অনন্ত ভগবানের ইচ্ছানুসারেই ইহা সাধিত হয়। জগতের কল্যাণের জন্য ভগবানই মানুষকে আবশ্যকানুযায়ী উন্নত করিয়া তুলেন। এই উন্নতির পরিমাপ তাঁর ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে।

চণ্ডীদাস

শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া যখন প্রেমমাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছিলেন তাহারও প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুর গ্রামে চণ্ডীদাস বসিয়া একমনে এই প্রেমের বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন। চণ্ডীদাস যে বীজ রোপন করিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্য তাহারই অঙ্কুর মাত্র। কে জানে কবে সে প্রেমবৃক্ষ পত্র পুষ্পে সুশোভিত হইয়া সমস্ত ভারতের শোভা বৃদ্ধি করিবে?

চণ্ডীদাস বাঙ্গালীর কবি, চণ্ডীদাসের মধুর পদাবলী পাঠে বাঙ্গালী মুগ্ধ, বাঙ্গালীর প্রাণের কথা চণ্ডীদাস যেমন গুছাইয়া বিনাইয়া বলিয়াছেন, আজ পর্য্যন্ত কোন কবিই সেরূপ সুস্পষ্ট জলন্ত ভাষায় বাঙ্গালীর মরমকথা বলিতে সমর্থ হন নাই। বাছিয়া বাছিয়া মধুর শব্দবিন্যাসে অনেকেই সিদ্ধহস্ত, কিন্তু মানুষের অন্তরের যে কথা—যাহা ইন্দ্রিয়াতীত, অধ্যাত্ম দৃষ্টি ব্যতীত যাহার সন্ধান পাওয়া যায় না—তাহাকে টানিয়া সহজ ও সরল ভাষায় ব্যক্ত করিবার স্পর্দ্ধা অতি অল্প লোকেরই হইয়া থাকে। চণ্ডীদাস শুধু কবি নহেন, তিনি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

অকারণে এত বড় উচ্চাসন নির্দ্দেশ করি নাই। যাঁহাদের সূক্ষ্মদৃষ্টি আছে, তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন, এ জগতে কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে হইলে ভগবান স্তরের পর স্তর সাজাইয়া উহা সম্পন্ন করেন, এইরূপ বিভিন্ন স্তরের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। অতি ক্ষুদ্র ঘটনাতেও শ্রীভগবান যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন, জগদ্ব্যাপী সুবৃহৎ ব্যাপারেও তাহার অন্তবিধ হয় না।

একটী বীজ অপরটী অঙ্কুর, অধ্যাত্মভাষায় একটী প্রাজ্ঞ ভাব অপরটী বিরাট ভাব, শ্রীব্যাসদেব ছিলেন বীজ বা প্রাজ্ঞ অবতার, শ্রীকৃষ্ণ তারই অঙ্কুর অথবা বিরাট অবতার। বীজানুসারে সৃষ্টি ক্ষুদ্র ও বিরাট হইয়া থাকে। সর্ষপ বীজ কখনও বিশাল মহীরুহ সৃষ্টি করে না, জগতে যত ঘটনার সৃষ্টি হইয়াছে তলাইয়া দেখিলে এই প্রাজ্ঞ ও বিরাট ভাবের ওতঃপ্রোতঃ বিকাশ দেখিয়া উৎফুল্ল হইতে হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণ যে মহামহীরুহের বীজ

বপন করিয়াছেন তাহার বিরাট প্রকাশ কবে সার্থক হইবে কে বলিতে পারে ? অঙ্কুর দেখিয়াও ইহার বিরাটত্ব অনুধাবন করা যায় না ; যে বীজের সন্ধান জানে, যে বীজের পরিচয় পায় সেই বলিতে পারে এই অঙ্কুরের পরিণাম কি এবং কতখানি।

চণ্ডীদাস এমনি একটী বীজ বা প্রাজ্ঞভাব। আজ পাঁচ শত বৎসরের অধিককাল সে বীজ বাংলার উর্ব্বরক্ষেত্রে রোপিত হইয়াছে কিন্তু তাহার বিরাট প্রকাশের এখনও পূর্ণ পরিণতি আসে নাই, মধ্যে শ্রীচৈতন্য কেবল তাহারই একটী মনোরম অঙ্কুর মাত্র। এই চারি শত বৎসর সে বাংলার অসংখ্য বৃক্ষরাজির মধ্যে আপনাকে বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। ক্ষুদ্র যে সে অনতিকাল মধ্যেই কালের কক্ষে আত্মবিলয় করে। প্রকৃতি এইরূপ অসংখ্য ক্ষুদ্র বিকাশের সার লইয়াই সৃষ্টিশক্তি পরিবর্দ্ধন করেন, বৃহৎই টিকিয়া যায়। যাহা বৃহৎ তাহাই সত্য তাহাই সনাতন। চণ্ডীদাস অমর—চণ্ডীদাসের যে ভাব তাহা কোন স্থান কালের আবছায়ায় ধ্বংস হইবার নহে, সে অনন্ত শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তাই বলি শ্রীভগবান ভবিষ্যৎ ভারতের প্রমোদউদ্যানে যে সকল কল্প-বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করিবেন, চণ্ডীদাস তাহাদের মধ্যে অন্যতম।

চণ্ডীদাসের কথা মনে হইলে প্রেমের কথাই মনে পড়ে। প্রেমই ছিল চণ্ডীদাসের প্রতিপাদ্য বিষয়। এই প্রেমের অনন্ত প্রকাশ চণ্ডীদাসের মধ্যেই নিহিত আছে। আজ বাংলার যশস্বী কবিগণ—যাঁহারা প্রেমের কবিতা লিখিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত—তাঁহারা চণ্ডীদাসের শাখা প্রশাখা মাত্র।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বীজের পরিচয় জানা না থাকিলে তাহার আদর কেহই করে না, চণ্ডীদাস যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে যুগের লোক চণ্ডীদাসকে তেমন ভাবে বুঝে নাই, শ্রীগৌরাঙ্গের বিকাশেই বাংলার ভক্তমণ্ডলী চণ্ডীদাসের আদর করিতে শিখিলেন—কিন্তু দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি এখনও আমরা এই মহাপুরুষের সম্যক্ পরিচয় পাই নাই, পাইতে পারি না, তবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাঁহার প্রেমচিত্রগুলি ধ্যান করিলে যে অপার আনন্দ উপভোগ করি, কবে সে প্রেম ধারা সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া আমাদের ধন্য করিবে, এক্ষণে তাহাই হইয়াছে চিন্তনীয়।

বীজ কখন পৃথিবীর সংশয়মোচনের জন্য একেবারেই আপনার হৃদয়

দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া সবখানি দেখাইয়া ধন্য হইতে চাহে না, সে উপেক্ষিত ভাবেই লোকচক্ষুর অগোচরে বৃদ্ধি পাইতে থাকে কেননা লোকের হাততালির তোয়াক্কা সে রাখে না, নীরবে ভক্তের মত পাতার পর পাতা ছড়াইয়া সে ছুটিয়াছে বিশ্বপতির আহ্বানে। তার দৃষ্টি ঊর্দ্ধে; নিচু দিকে তাহার চাহিতে নাই, তাই কবির ভাব কুহেলিকাময়ী, প্রাণের গোপন রহস্য না জানিলে যথার্থ কবির ভাষা হৃদয়গত করিবার উপায় নাই।

চণ্ডীদাসের কবিতাবলীর মধ্যে ভবিষ্যতের যে সঙ্কেত আছে তাহা বঙ্গীয় যুবকগণকে আয়ত্ত করিতে বলি, অনুভব করিতে বলি। আমরা সমালোচকের মত কবির ভাবগুলি বিশ্লেষণে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া পাঠকবর্গের সম্মুখে ধরিতে প্রয়াসী নহি—সে অবসর আমাদের নাই, ভবিষ্যত ভারতের হিরন্ময় প্রাসাদ নির্ম্মাণের অমূল্য উপাদানগুলি সযত্নে আমাদের আহরণ করিতে হইবে। আজ আমরা যে ভগবৎ-মণ্ডলী সৃষ্টির জন্য উন্মত্ত হইয়াছি, চণ্ডীদাসই যে সে ভাবের মন্ত্রদ্রষ্টা, তাঁরই মন্ত্র-শক্তি প্রভাবে আমরা কৃতকার্য্য হইব—ইহাই আমাদের আশা।

চণ্ডীদাস ছিলেন দুঃখের কবি। তিনি প্রেমকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানিয়া সুখী হইতে পারেন নাই, প্রেম দিয়া জগৎ সৃষ্টি করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন —সে ভাব কার্য্যে পরিণত না হওয়া অবধি চণ্ডীদাসের শেষ হইবে না, তাই চণ্ডীদাসের দুঃখের প্রতিও তীব্র অনুরাগ ছিল। তিনি সুখের মধ্যেও দুঃখের ছায়া দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতেন না কেননা সুখকে সুখ বলিয়া গ্রহণ করিতে তিনি নিতান্তই নারাজ হইতেন। একটা পূর্ণতর প্রেম রাজ্য যে এত সহজে সৃষ্ট হইতে পারে ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। চণ্ডীদাসের হৃদয় এত গভীর এত উদার যে তাহার অবধি নাই, মিলনের মধ্যেও তিনি তৃপ্তি পাইতেন না। চণ্ডীদাস যে মনুষ্যজাতির কবি, সমগ্র মানুষের মধ্যে প্রেমের বীজ রোপন করাই যে তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা ছিল, সে কার্য্য না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি সুখ পাইতে পারেন না।

তাই তিনি বলিতেন—

"কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনি
সুখ দুঃখ দুটী ভাই,
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি
দুঃখ যায় তার ঠাঁই।

আরও অধিক জোর দিয়া বলিয়াছেন—

"যার যত জ্বালা তার ততই পিরীতি"

এই পিরীতিই প্রেম রাজ্যের প্রধান উপাদান। পাছে জ্বালা পাইয়া মানুষ পিরীতির পথে না আইসে এই জন্ম বলিয়াছেন—

সই পিরীতি না জানে যারা,
এ তিন ভুবনে জনমে জনমে
কি সুখ জানয়ে তারা?

এ এক মস্ত প্রলোভন—জ্বালা সইয়া দুঃখ পাইয়া এ পিরীতি সাধনে মানুষকে নিরত রাখাই ছিল চণ্ডীদাসের উদ্দেশ্য।

ক্রমশঃ

গান

যখন তোমার ইচ্ছা হবে, এই ভাবেতে বসে থাকা;
আমার জীবন তোমার তবে, এই কথাটি মনে রাখা।
আমার চোখের জ্যোতিঃ রেখা, সে যে তোমার তুলির লেখ,
আমার শুধু চেয়ে থাকা, কখন তোমার পাব দেখা॥

পন্থা

সমগ্র বাঙ্গালীর প্রাণশক্তিকে এমন এক উদার বিরাট আদর্শের পথে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে যাহাতে জাতিটা তাহাদের সকল সঙ্কীর্ণতা, সকল কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া, অবাধ ও স্বচ্ছন্দ গতিতে এক বৃহৎ সংহতিতে পরিণত হইতে পারে। খণ্ড খণ্ড আদর্শের অনুগামী হইয়া আজ বাঙ্গালী সহস্র সহস্র গুরুর নির্দ্দেশে বিভিন্ন কর্ম্মস্রোতে ধাবমান, জাতির উন্নতি যুগে ইহা স্বাভাবিক হইলেও এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলী ভেদ করিয়া তাহাদিগকে মহাগুরুর অনুগত হইয়া এক বৃহৎ সঙ্ঘের সৃষ্টি করিতে হইবে। স্ব স্ব ক্ষুদ্রত্বের মমতায় ক্ষুদ্র আত্মপ্রতিষ্ঠার কামনায় বৃহতের দিকে আমরা যেন দৃষ্টি-হীন না হই। আমাদের গতি অহংকারের কুটিল গোলকধাঁধায় যেন আবদ্ধ হইয়া না পড়ে, আমরা যেন মুক্ত ও বিস্তৃত হইয়া অনন্ত বারিধির অভিমুখে ছুটিয়া চলি।

আমরা আজ ভিন্ন ভিন্ন সাধনক্ষেত্রে অবস্থান করিলেও আমাদের মনে রাখা চাই যে আমাদের উদ্দেশ্য এক এবং সে উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে—শ্রীভগবানের ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত হওয়া। সুখে দুঃখে অনুদ্বিগ্ন হইয়া জগদীশ্বরের নির্দ্দেশ মত চলিবার জন্যই আমাদের সাধনা, আমাদের জীবন। মনে রাখা চাই প্রকৃতিই আমাদের নিয়ন্ত্রী। পৌরাণিকযুগের কোন নির্দ্দিষ্ট সাধন পদ্ধতির মধ্যে আমাদিগকে হারাইয়া ফেলিব না—পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানসম্মত করিয়া আমাদের জীবনকে অষ্টপাশে আবদ্ধ করিব না—আমরা ছুটিব অন্তরের দিকে, আমাদের সমস্তখানিকে বিকশিত করিয়া; আমরা সকল ইন্দ্রিয়কে সজাগ ও সতেজ করিয়া রাখিব, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ উপভোগ করিবার জন্য। জীবন ত অঙ্কশাস্ত্র নহে, যে সে পরিমিত রেখার মধ্যে কতকটা সঙ্কুচিত হইয়া থাকিবে—কতকটা নিরূপিত ব্যবহারিক রীতিনীতির গণ্ডীর মধ্যে পঙ্গু হইয়া রহিবে; সে অনন্ত বিশ্বে অনন্তের আধার হইয়া অনন্তরূপেই বিরাজ করিবে—তাই তাহার গতি হইবে বাধাহীন মুক্ত।

কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করিতেই আমাদের জীবন অতিবাহিত হইতেছে, জীবনের অগ্রগতি প্রবল বাধায় নিয়ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে। কি রাজনীতিক ক্ষেত্রে, কি ধর্ম্মসাধনে, কি সমাজসংস্কারের পথে—কোথাও আমাদের গতি অবাধ নহে। বাঙ্গালী যুবকগণ যে উৎসাহে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহা যদি সুনিয়ন্ত্রিত হইত, তাহা হইলে বাংলায়ও আজ সোণা ফলিত—বাঙ্গালীর গৌরবে সমগ্র ভারতবর্ষ গৌরবান্বিত হইত।

দেশের নামে, জন্মভূমির উন্নতি কামনায় বাংলার যুবকমণ্ডলী যে ক্ষতিস্বীকার করিয়াছে, তথাকথিত বাংলার নেতৃমণ্ডলী তাহার শতাংশের একাংশও গ্রহণ করেন নাই, বরং রাজসম্মানে তাহারা সম্মানিতই হইয়াছেন—দুঃখের কঠোর তপস্যা যুবকগণই করিয়া চলিয়াছেন— ইহাতে ক্ষোভের কারণ নাই—তাঁহাদের আত্মোৎসর্গের উপরই ভবিষ্যৎ ভারত প্রতিষ্ঠালাভ করিবে।

কিন্তু বাংলার যুবকগণকে আজ ভগবদ্ নির্দ্দেশে পরিচালিত হইবার জন্য আহ্বান করিতেছি—মানুষের অঙ্গুলিসঙ্কেতে ভক্তের মত সেবকের মত এতদিন পরিচালিত হইয়া তাহারা যে শক্তি যে জ্ঞান যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছে আজ তাহার অনুশীলনের দিন আসিয়াছে—যৌবনের উচ্ছৃঙ্খল রুদ্রশক্তি নিয়ত কঠোর কর্ম্মের আবর্ত্তনে স্থির ও শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। শুক্লকেশ স্থবিরের প্রজ্ঞা যুবকমস্তিকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাংলার কর্ম্মরথে যুবকসঙ্ঘই সারথ্যের কর্ম্ম গ্রহণ করিবে।

কুরুক্ষেত্র মহাসমরে নানা ঘটনার সমাবেশে কুরুপিতামহ চিরকুমার ভীষ্মও বিচলিত চিত্ত হইয়াছিলেন—ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাই বহু বিজ্ঞ ব্যক্তির বর্ত্তমানেও বয়ঃকনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণই সে মহাসমরের প্রধান নায়ক হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। জ্ঞান বৈরাগ্যের পূর্ণাবতার শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য নিতান্ত অল্প বয়স্ক হইলেও ভারতের সঞ্চিত অন্ধসংস্কারগুলিকে এক আঘাতে অপসারিত করিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্য অতি কিশোর জীবন হইতেই বাংলা দেশে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, আর সেদিন মধ্য বয়সে স্বামী বিবেকানন্দ যে তুমুল ধর্ম্মান্দোলনে সমস্ত পৃথিবী নাচাইয়া তুলিয়াছিলেন তাহার কথা কাহারও অবিদিত নাই। আজ আবার নবীনদেরই এই দুঃসময়ে বাংলার কর্ম্মপ্রবাহে বাঙ্গালীর জীবন-তরণীর কর্ণধার হইতে হইবে। আজ কাণ

পাতিয়া শুনিতে হইবে ভগবানের আদেশ কি। বাংলায় একদিন যে বিরাট আন্দোলনের যুগ আসিয়াছিল আবার কি আর একভাবে তাহারই পুনরাবর্ত্তন করিতে হইবে? আবার কি মোহঘোরে অন্তর্দৃষ্টি দূরে পরিহার করিয়া বাহিরের কোলাহলে উন্মত্তের মত যোগদান করিতে হইবে? না না ভগবান বলিতেছেন—আত্মস্থ হও, জগৎপ্রাণ সমীরণের সহিত প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতি শ্বাসে যে অনন্ত শক্তি আহরণ করিতেছ তাহার অপব্যয় করিও না। অধিকার অধিকার করিয়া চীৎকার করিলে কি হইবে, জগতের কোন্ জিনিষের তুমি অধিকারী? নিজের দেহেরও ঈশ্বর তুমি নও, এরূপ অবস্থায় তুমি কিসের জন্য উন্মাদ হইয়াছ! সাবধান বাংলার যুবকসঙ্ঘ! যে যোগ যে তপস্যা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে শত প্রলোভনেও যেন তাহা ভঙ্গ না হয়।

চিন্তা-চুম্বক

মানুষ কর্ম্মশীল। অবশ্য আমাদের সংজ্ঞা অনুসারে। অর্থাৎ কায়েন মনসা বাচা। মানুষ মরণশীল কথাটা যতখানি সত্যি এ কথাটাও ততখানি সত্যি।

কর্ম্মের মধ্যে ভোগের অধিকার লিপ্ত হয়ে রয়েছে।

যারা কর্ম্ম করে না তাদের ভোগ করাটা হবে পাপ। কিন্তু যারা কর্ম্ম করে' ভোগের অধিকার অর্জ্জন করেছে তাদের ভোগ না করাটাই হবে ঘোর অধর্ম্ম।

জীবনে স্বার্থটা যত সংকীর্ণ হতে থাকে মানুষের দুঃখের সম্ভাবনাটাও তত বেড়ে যেতে থাকে। আর স্বার্থটা যত বৃহৎ, যত ব্যাপক হতে থাকে দুঃখের সম্ভাবনাটাও সংকীর্ণ হয়ে আসতে থাকে।

* * *

মানুষ বর্ত্তমানের কেউ নয় তার জীবনটা গড়া ভূত আর ভবিষ্যৎ দিয়ে। তার কর্ম্মসমূহ দেখে বুঝবে সে কি ছিল আর তার চিন্তাপ্রণালী দেখে জানবে সে কি হতে যাচ্ছে।

মানুষের জীবনকে গড়ে তুলতে হবে সিন্ধুর আদর্শে। সিন্ধুর উপমি-

ভাগ চঞ্চল, অস্থির—তরঙ্গে তরঙ্গে নৃত্যশীল, কল কল ছল ছল-মুখর আর তার অতল তল স্থির, মৌন, অচঞ্চল, বিরাট, ধ্যানী। মানুষেরও তেমনি বাহির হবে কর্ম্মে, ভোগে, সংগ্রামে, কোলাহলে অস্থির, চঞ্চল, পুলকিত, মুখরিত—আর অন্তর হবে স্থির, শান্ত, মৌন—ঋষির মত আপন সত্ত্বায় আপনি পূর্ণ। এই হচ্ছে প্রকৃতি ও পুরুষের খেলা।

পৃথিবীর দুইটী গতি আছে—একটী আহ্নিক আর একটী বার্ষিক। তেমনি মানুষেরও দুইটী গতি আছে। একটী সান্তের দিকে আর একটী অনন্তের দিকে। এক হাত দিয়ে সে পৃথিবীকে আলিঙ্গন করে' আছে, অন্য হাত সে আকাশের দিকে বাড়িয়ে আছে।

* * *

উত্তুঙ্গ পর্ব্বতের শিখরে ভগবান্ যেমন ভাবে আছেন তার পাদদেশে তিনি তার চেয়ে কম জীবন্ত হয়ে নাই। নবীন যুগের সাধককে তেমনি বুঝ্তে হবে যে আমাদের রক্তমাংসেও ভগবান কম মহীয়ান্ হয়ে বিরাজ কচ্ছেন না। এই সত্য যখন সাধক জীবনের মর্ম্মে মর্ম্মে ফুটিয়ে তুল্তে পার্বেন তখন প্রকৃত মুক্তির দ্বার তার সাম্নে ধীরে ধীরে খুলে যাবে।

ভগবানের সঙ্গে আর মায়াবাদীদের সঙ্গে ভীষণ লড়াই। ভগবান বল্‌ছেন—আমার এ জগতের লীলা খেলা চল্‌বেই। আমার ইচ্ছাই তাই। মায়াবাদীরা বল্‌ছেন—ওহে জগতবাসী, এ সব স্বপ্ন, ফাঁকি, মায়া। এ সব ত্যাগ করে' অক্ষর ব্রহ্মে লয় হয়ে যাও। কিন্তু জয় হচ্ছে কার? জয় হবে কার? সেটাও কি আবার বলে দিতে হবে?

জীবনের তিনটী প্রবাহ। ভাবপ্রবাহ, কর্ম্মপ্রবাহ ও ভোগপ্রবাহ। এই তিন প্রবাহ বয়ে চলেছে আনন্দলোকের ভিতর দিয়ে।

অজ্ঞানীদের কাছেই শুধু আছে—ইহলোক, পরলোক। জ্ঞানীরা দেখেন শুধু এক আনন্দলোক।

* * *

মানুষের মনস্তত্ত্বের দিক থেকে দেখ্‌লে দেখা যাবে যে ত্যাগ বলে' কোন জিনিষ নেই। কারণ যেখানেই স্ব ইচ্ছায় কেউ কিছু ত্যাগ করেছে সেখানেই তার পিছনে একটা বৃহত্তর কিছু লাভের স্বপ্ন রয়েছে। অবশ্য এই লাভ যে সব সব সময় বস্তুগত বা বিষয়গত হবে তার কোন মানে নেই॥

আমরা যতই আধ্যাত্মিক আধ্যাত্মিক করি না কেন অধিভূত নামক জিনিষটা মানুষের মজ্জায় মজ্জায়। তাই মানুষের চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মেই আর তৃপ্তি নেই, সে ভগবানকে আকার রূপ দিয়েছে। সে যে চায় দেহের সঙ্গে দেহের মিলন, প্রাণের সঙ্গে প্রাণের মিলন, হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের মিলন। সে যে চায় দেহ প্রাণ মন হৃদয় সব দিয়া ভগবান্‌কে ধর্‌তে। আর এটা মানুষের বন্ধন নয় এটা তার গৌরব, এটা তার পরাজয় নয় এটা তার ভগবানের দান।

সুখের দরকার অপর দশজনের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে, আর দুঃখের দরকার আপনার নিজের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে।

যে ভালবেসে দুঃখ পায়নি তার ভালবাসা অনেকখানিই ব্যর্থ।

* * *

মানুষ সুন্দর দেখ্‌লেই ভালবাসে না কিন্তু ভালবাস্‌লে সুন্দর দেখেই।

মধুর প্রেমেই শুধু মিলন আছে। অন্যান্য প্রেমে যা আছে তা মিলন নয়, তা হচ্ছে সংযোগ।

হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে অন্যান্য ধর্ম্মের মস্ত একটা প্রভেদ এই যে হিন্দু ধর্ম্মে ভগবানের সঙ্গে প্রেম করা যায়, ভগবানের উদ্দেশ্যে অভিসার করা যায়, কিন্তু অন্যান্য ধর্ম্ম অনুসারে মানুষের অধিকার শুধু ভগবানের নিকট হতে করুণালাভ, আশীর্ব্বাদলাভ। এইখানেই হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব।

* * *

পুরুষ এবং নারীর মধ্যে যে প্রভেদ সেটা সত্যবস্তু—ভগবান্‌সিদ্ধ। মানুষ সেই প্রভেদকে যে পরিমাণে ভাঙ্‌তে সমর্থ হবে সংসারে সুখও সেই পরিমাণে হ্রাস হবে।

মরণ ও জীবন দুটো বিরুদ্ধ নয়। মরণই জীবনের জন্মদান কর্‌ছে। মরণের সমষ্টিই হচ্ছে জীবন। কারণ প্রতি মুহূর্ত্তেই ত আমরা মর্‌ছি। এই প্রতি মুহূর্ত্তের মরণ যদি না থাকৃত তবে আমাদের কোন গতিই হতে পার্‌ত না। আর গতি আছে বলেই ত জীবন।

Poverty is no sin—কখন? যখন সে জীবনে দীনতাকে না আনে। দীনতা থেকেই ত অক্ষমতা—অক্ষমতাই ত পাপ।

সোঽহং জ্ঞান জন্মাবার পূর্ব্বে মনুষ্যোঽহং এটাই উপলব্ধি করা আগে দরকার। আর মনুষ্যোঽহং জ্ঞান উপলব্ধি কর্‌তে হলে মানুষের কাজ

করতে হবে।

"অর্থই অনর্থের মূল" মোটা দৃষ্টির কথা। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখ্‌লে বোঝা যায়—অর্থের অভাবই অনর্থের মূল।

* * *

অনেকে বলেন মানুষের খাওয়াটা হওয়া উচিত শুধু তার বেঁচে থাকার জন্তে। এঁরা মানুষের যে রসবোধ বলে' একটা মস্ত জিনিষ আছে সেটা অস্বীকার কচ্ছেন।

সাধকের পত্র

স্নেহের ভাইটি—

তুমি লিখিয়াছ যে তুমি সাধারণ মানুষ মাত্র। আমার মত অসাধারণ মানুষ নও। সাধারণ হইতে একটা বড় কিছু হইবে এ দুরাশা তোমার নাই। কারণ তুমি জান যে সে রকম শক্তি বা যোগ্যতার তোমার নিতান্ত অভাব। তাই দশজনেরই মত জীবন তোমার কাটাইতে হইবে। আচ্ছা, তোমাকে একটি প্রশ্ন করি তুমি যে নেহাৎ সাধারণ তাহা তোমাকে কে বলিয়া দিল ? কর্ম্মক্ষেত্রে না নামিয়া কোন পরীক্ষা কিছু পার না হইয়া নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে এমন নিঃসন্দেহ কেমন করিয়া হইলে ? তুমি নিজেকে সব জানিয়া ফেলিয়াছ কি ? উত্তরে বলিবে "না, কিন্তু নিজের দোষগুলিকে অভাবগুলিকে ত স্পষ্টই দেখিতেছি। এ সব যার আছে সে আবার বড় হইবে কি ? বড় হইতে হইলে আগে চাই বড় হইবার আকাঙ্খা কিন্তু আমার যে সেটুকুও নাই।" কিন্তু আমি দেখিতেছি এই গোড়াতেই নিজের সম্বন্ধে তুমি ভুল বুঝিয়াছ, তোমার নৈরাশ্যের মধ্যে আকাঙ্খাই কি লুকাইয়া আছে না ? আকাঙ্খা আছে কিন্তু সে আকাঙ্খাকে কার্য্যে পরিণত করিবার কোন সম্ভাবনা দেখিতেছ না, তাই তাহাকে চাপিয়া রাখিয়াছ মাত্র। এ ত তুমি নিজের উপর অভিমান করিয়া বসিয়া আছ! কিন্তু এ অভিমান এ নৈরাশ্যটুকু তলাইয়া দেখিয়াছ কি ? নিজের দোষগুলি দেখিতেছ, গুণগুলি কখন দেখিতে চেষ্টা

করিয়াছ কি? নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার পূর্ব্বে নিজের দোষের দিকটাই দেখিও না, গুণের দিকটাও দেখিও। বাস্তবিক পক্ষে তোমার ত অনেক গুণই আমি দেখিতেছি। দোষ আছে, কিন্তু গুণ কি নাই? তুমি জিজ্ঞাসা করিবে, কতখানি? বেশ, দেখ কতখানি, আগেই কেন সরাসরি বিচার করিয়া ফেল?

দোষে গুণে মানুষ। দোষের যেমন একটা ভাণ্ডার আছে, গুণের ও তেমনি একটা ভাণ্ডার আছে। আমাকে অসাধারণ বল কিন্তু তোমার মত বয়সে আমাকে যদি তুমি দেখিতে তবে নিশ্চয়ই বলিতে "এ এক হতভাগা। এর কিছু হবে না।" আর সকল বড় মানুষ, সকল অসাধারণ পুরুষের জীবন ইতিহাস যদি খুঁজিয়া দেখ তবে দেখিবে কেহ অসাধারণত্ব লইয়া জন্মে নাই। সকলেই তোমার আমার মত দোষে গুণে, আশায় নিরাশায়, আকাঙ্খা অবসাদে মিশিয়া জন্মিয়াছে। বড় বড় লোকের বাল্যকালের ইতিহাসে যে সব অসাধারণ কাহিনী বিবৃত দেখিতে পাও, তাহা সবই খোসগল্প বলিয়া আমার বিশ্বাস, বড় হইবার পর তবে লোকের দৃষ্টিপথে পড়িয়াছে। আগে তাহা কেহ দেখে নাই। তুমি যদি বড় হও তোমার বাল্যকালের কথা সম্বন্ধে ঐ রকম অনেক গল্প বাহির হইবে, নিঃসন্দেহ হইও। বলিতে পার, তবুও সকলেই কিছু বড় হয় না, কয়েকজনের মাত্র একটা সুপ্ত শক্তি বা পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি অথবা ভগবৎপ্রসাদ কিছু থাকে, তাহারই জোরে তাহারা বড় হইয়া উঠিয়াছে। বালি মাটিতে শিব গড়া যায় না। কিন্তু কে বলিল তোমার একটা সুপ্ত শক্তি নাই, পূর্ব্বজন্ম সুকৃতি বা ভগবৎপ্রসাদ কিছু নাই? কে বলিল তুমি শুধু বালি মাটি? আমি তাই বলি আগে নিজেকে জান। আর নিজেকে জানিবার আগে মনে রাখ সেণ্ট পলের কথাটি "I know not what I am"। এই বলিয়া আরম্ভ কর। আমার নিজের সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না, আমি সাধারণ না অসাধারণ তাহা জানি না, সে কথা জানা যাইবে সকলের শেষে। তুমি কিরূপ আবার তাহা জানিবার জন্য experiment করিতে আরম্ভ কর। বৈজ্ঞানিকের মত নির্ব্বিকার চিত্তে আপনাকে পরীক্ষা কর, কাটিয়া কাটিয়া দেখ, দোষ দেখ, গুণ দেখ, দোষের নীচে কত দোষ, আবার গুণের নীচে কত গুণ থরে থরে পড়িয়া রহিয়াছে। আর বাস্তবিকপক্ষে যত দোষ তুমি টানিয়া বাহির করিবে, দেখিবে গুণের মাত্রাও তেমনি বাড়িয়া যাইতেছে।

কারণ মানুষ হইতেছে একটা অতলগর্ভ রত্নের আকর। উপরে কেবল বালুকা, প্রস্তর, কর্দ্দম, কয়লা এইরূপ কত স্তর, কত মিশ্রিত স্তর রহিয়াছে। যত নীচে যাও এই সব ভেজালের সাথে একটু একটু আসল রত্ন পাইতে থাকিবে। আরও নীচে যাও ভেজাল খুব কম, রত্নই সব। তুমি শুধু উপরের ঘাস বালু পাথর দেখিয়া হতাশ হইয়াছিলে। সকল মানুষই এই রকম একটা খনি। বলি না, সকল খনিতেই হীরক পাওয়া যায়। কিন্তু একটা কিছু মূল্যবান প্রয়োজনীয় জিনিষ পাওয়া যায়। মানুষের পক্ষে তা হইতেছে তাহার নিজস্বতা, তাহার বিশিষ্টতা। বড় লোক হইবে বলিয়া তুমি যে নেপোলিয়ন বা বুদ্ধ হইয়া উঠিবে তাহা নয়। আর পারিলেও আমার মতে তোমার তাহা হওয়া উচিত নয়। কারণ নেপোলিয়ন বা বুদ্ধ হওয়াটাই বিশ্বজগতের আদর্শ নয়। প্রত্যেকের প্রত্যেকটি হওয়া, তোমার তুমিটি হওয়াই সব বড়লোকত্ব।

এ কথা স্বীকার করিবে তুমি একটা শক্তিপিণ্ড, ঠিক এখন যেমন আছ বা যাহা করিতেছ সুবিধা পাইলে তাহা অপেক্ষা একটা কিছু বেশী হইতে বা করিতে পার, তা যতটুকুই হউক না। তোমার শক্তির সবখানি খেলিয়া উঠিতে পারিতেছে না, potentiality কিছু না কিছু আছেই। এই শক্তিটুকু জানা, তাহাকে খেলাইয়া তুলা, এই potentialityকে জাগ্রত করাই তোমার বিশিষ্টতা, তোমার অসাধারণত্বকে ফুটাইয়া তুলা। শুধু এই শক্তির এই potentialityর মাত্রা কিছু দিয়া রাখিও না। তুমি কি জান তোমার মধ্যে যে শক্তি তার পরিধি কোথায়? আর এই যে নিগূঢ় শক্তি, এই যে তোমার অসাধারণত্ব, অন্য ভাষায় বলিতে গেলে তাহাই হইতেছে তোমার মধ্যে দিব্যঐশ্বর্য্য, ভাগবত প্রতিভা, ভগবান্ স্বয়ং। আর নিজের মধ্যে কোন রকম একটা গণ্ডী না টানিয়া দিয়া, আপনাকে উদার করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া, নির্ব্বিকার চিত্তে অন্তঃস্থিত শক্তিকে ফুটিয়া উঠিতে দেওয়ারই অন্য নাম হইতেছে ভগবানে আত্মসমর্পণ।

আর একটি কথা বলিয়া আমি এবারকার মত শেষ করিব। দেখ, বিনয় জিনিষটির উপর সমাজে আমরা অতিমাত্র জোর দিয়া থাকি। কিন্তু বিনয় অর্থে যদি হয় নিজেকে কেবল ছোট করিয়া দেখা তবে সে বিনয় না থাকাই ভাল। বিনয় জিনিষটির প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? না, গর্ব্ব বা অহঙ্কার দূর করা। কিন্তু গর্ব্ব অর্থাৎ দম্ভ, আস্ফালন, বাহ্বাস্ফোট,

আমরা সচরাচর যাহাকে অহঙ্কার বলিয়া থাকি তাহাই অহঙ্কারের একমাত্র মূর্ত্তি নয়। এ সব হইতেছে অহঙ্কারের রাজসিক রূপ। কিন্তু নিজেকে দীনহীন পাপীতাপী কৃমিকীট সকলের অধম বলিয়া বোধ করাও অহঙ্কার। শুধু ইহা তামসিক অহঙ্কার। অহঙ্কার হইতেছে অহং-কার অর্থাৎ আমি, সকল হইতে ছাড়া—এই এই বিশেষ গুণ (বা দোষ) সমন্বিত মাত্র জীবটি—এই চেতনার মধ্যে আবদ্ধ থাকা। এই স্থূল অহং-কার-টি—রাজসিক হউক আর তামসিক হউক উভয়কেই দূর করিতে হইবে। কারণ উভয়েরই সত্যটি দেখিতে দেয় না, ফুটাইয়া তুলিতে দেয় না। ইহা ছাড়া সাত্ত্বিক অহঙ্কার বলিয়াও একটি জিনিষ আছে। তিনেরই অতীত হইতে হইবে। কোনরূপ অহঙ্কারই চাই না—চাই আত্মসমর্পণ। তোমার বিনয়ের নম্রতার পশ্চাতে রহিয়াছে তমোঘন অহঙ্কার। ইহা অপেক্ষা রাজসিক দাম্ভিকতা বরং ভাল। কারণ তমঃ তোমাকে জড়বৎ করিয়া ফেলে কিন্তু রজঃ' এর প্রভাবে তুমি সজীব সচল আকাঙ্খায় শ্রদ্ধায় ভরপুর হইয়া উঠ। কেবল এই আকাঙ্খা ও শ্রদ্ধাকে শুদ্ধ করিয়া লইলেই হইল। আশা করি, সকল রকম অহঙ্কারের খেলাকে চিনিয়া ক্রমে ক্রমে নিরসন করিতে পারিবে, ও নিজের অতলে যে সত্য 'নিজস্ব' বস্তু তাহারই প্রতিভায় তোমার সকল সত্ত্বা ভরিয়া উঠিবে। ইতি

তোমার—

পূর্ণ-যোগ

(৭)

বৈদান্তিক যোগ ও তান্ত্রিক যোগ

সাধারণ প্রচলিত যে যোগপন্থাসকলের বিবরণ আমরা দিয়াছি, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিব সে সকলেরই অন্তরালে একটি মূলভাব রহিয়াছে—আপাততঃ তাহাদিগকে যতই বিসদৃশ বলিয়া বোধ হউক না কেন। যে মূলবস্তুটি আশ্রয় করিয়া এই সকল সাধনপন্থায় চলি তাহা

হইতেছে জ্ঞান। এবং এই জন্য উঁহাদিগকে বলা যাইতে পারে বৈদান্তিক-মার্গী। জ্ঞানযোগী হউন, ভক্তিযোগী হউন আর কর্ম্মযোগীই হউন সকল সাধকের নির্ভর হইতেছে জ্ঞান, মূলতঃ জ্ঞানকেই লক্ষ্য ও উপায়-রূপে ধরিয়া তাঁহারা চলেন। জ্ঞানীর বিচার বিতর্ক জ্ঞানের একটি রূপ মাত্র—এ জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা বুদ্ধিতে। কিন্তু ভক্ত বা কর্ম্মীর জ্ঞান তর্কবুদ্ধিপ্রসূত না হইলেও তাহা জ্ঞানই। ভক্তের জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হইতেছে হৃদয়ে—সে জ্ঞান ফুটিয়া উঠিয়াছে প্রেম, শ্রদ্ধা, বিশ্বাসের ভিতর দিয়া। আর কর্ম্মীর জ্ঞান তাঁহার ইচ্ছাশক্তির পশ্চাতে, এই জ্ঞানই ইচ্ছাশক্তির ভিতর দিয়া কর্ম্মে মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিতেছে। রাজযোগ, হঠযোগেরও অন্তস্থলে রহিয়াছে এই জ্ঞানেরই প্রাধান্য। এ সকল যোগে পুরুষই সাধক, আত্মাই দ্রষ্টা, জ্ঞাতা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা ও ভোক্তা রূপে সাধনা করিয়া চলিয়াছে, সেই স্থির করিয়া দিতেছে কি রাখিতে হইবে, কি বর্জ্জন করিতে হইবে, আধারকে কেমন সাজাইতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে এই পুরুষই হইতেছে লক্ষ্য—এই চৈতন্যময় আত্মসত্তার সহিত মিলিত হওয়াই যোগ সিদ্ধি।

কিন্তু ভারতবর্ষে আর এক প্রকার যোগ প্রচলিত আছে, তাহার প্রতিষ্ঠা জ্ঞানের উপর নহে, পুরুষ তার নিয়ন্তা নহে। তান্ত্রিকযোগে সাধক হইতেছে প্রকৃতি, উপায় হইতেছে শক্তি। যে সাধনায় পুরুষ হইতেছে সাধক আর জ্ঞানই উপায় তাহার মূলকথা উদাসীনতা, সকল খেলা হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করা, সরাইয়া ফেলা। তান্ত্রিক কিন্তু সকল খেলা-কেই জড়াইয়া ধরিয়াছেন, প্রকৃতির নিগূঢ়ে রহিয়াছে যে আদ্যাশক্তি, যে তপঃশক্তি তাহারই অদম্যবলে, তাহারই স্ব-ঈপ্সিত পন্থায় তিনি চলিয়া-ছেন। বৈদান্তিক প্রকৃতিকে জানেন মায়াময়ী বলিয়া। প্রকৃতি অন্ধ উচ্ছৃঙ্খল, ইহার মধ্যে যতটুকু চেতনার ছায়া তাহা পুরুষের সংস্পর্শে। তাই বৈদান্তিক সাধক প্রকৃতির হাতে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে চাহেন না, প্রকৃতিকে তাহার সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে ধাবিত বিকশিত হইতে দেওয়াও তাঁহার লক্ষ্য নয়। তান্ত্রিক কিন্তু প্রকৃতিকে জানেন চিন্ময়ী বলিয়া। তাই তাঁহারই প্রেরণায় সম্পূর্ণ ভর করিয়া চলিতে তান্ত্রিকের এতটুকুও ইতস্ততঃ নাই। বৈদান্তিকের উদ্দেশ্য প্রকৃতির ছায়াপাত হইতে পুরুষকে ক্রমে ক্রমে মুক্ত করিয়া লওয়া। তান্ত্রিক প্রকৃতিকে জগৎশক্তির সমস্ত খেলাকেই সত্য বলিয়া আনন্দপূর্ণ বলিয়া আলিঙ্গন করেন। তাই প্রকৃতিকে তিনি পুরুষের উপর

প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, শক্তিকেই অধ্যাত্মজীবনের সাম্রাজ্ঞীরূপে বরণ করিয়াছেন।

সাধারণ জীবনের যে খণ্ডতা অসম্পূর্ণতা, আধারের যে অসামর্থ্য মলিনতা তাহাকে দূরে রাখিয়া নিগ্রহ করিয়া, তাহার দিক হইতে সকল মনোযোগ ফিরাইয়া জীবনের, আধারের অন্তরালে অতীতে যে শান্ত নিত্যশুদ্ধ পূর্ণ অদ্বৈত জিনিষটি আছে ধ্যানে, মনের একাগ্রতায় তাহাকেই জাজ্বল্য করিতে চাহিয়াছেন বৈদান্তিক যোগী। তান্ত্রিক বলিতেছেন জীবনের পূর্ণতার উৎস জীবনের মধ্যেই, আধারের শুদ্ধির কারণ আধারের মধ্যেই আর কোথাও নয়। তান্ত্রিক প্রকৃতির মধ্যেই এমন একটি মৌলিক তত্ত্ব পাইয়াছেন যাহার প্রাণ অদম্য বল, অনন্ত শক্তি, অব্যাহত কর্ম্মপ্রেরণা—ইহাই আবার শুদ্ধ পূর্ণ চেতনাদীপ্ত। জীবনকে, আধারকে জীবনের আধারের এই অধিষ্ঠাত্রী দেবীর তর্জ্জনীসঙ্কেতে জীবনের কর্ম্মবহুল ভোগবহুল বিক্ষুব্ধতায়, আধারের সকল প্রাকৃতপ্রেরণার মধ্য দিয়াই চালাইয়া তিনি গড়িয়া লইতেছেন।

বৈদান্তিক সাধনার বিষয় সৎ, উপায় বৈরাগ্য। তান্ত্রিক সাধনার বিষয়, তপঃ শক্তি, উপায় ভোগ। বৈদান্তিক পুরুষকে অতিমাত্র করিয়া ধরিয়াছেন, তান্ত্রিক প্রকৃতিকে অতিমাত্র করিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু বৈদান্তিক ও তান্ত্রিক এই যে সৎ'এর বিরুদ্ধে শক্তিকে, শক্তির বিরুদ্ধে সৎকে দাঁড় করাইয়াছেন ইহাতে তাঁহারা উভয়েই সত্যের অর্দ্ধেকটুকু পাইয়াছেন মাত্র। বৈদান্তিক শক্তিকে হারাইয়া সৃষ্টির ভোগের আনন্দবিরহিত সাধুসন্ন্যাসীর সৃষ্টি করিয়াছেন। তান্ত্রিকও তেমনি সৎকে হারাইয়া প্রকৃতির উন্মার্গগামী স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়া দুরাচারকলুষিত ভৈরব ভৈরবীর জন্ম দিয়াছেন। বৈদান্তিক যেমন ত্যাগকে ত্যাগ বলিয়াই মহনীয় করিয়া দেখিয়াছেন, তান্ত্রিকও ভোগকে ভোগ বলিয়াই মহনীয় করিয়া দেখিয়াছেন। যাহা উপায় বা সহায়মাত্র উভয়ে তাহাকেই লক্ষ্যের অধিক করিয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সৎ ও শক্তি, পুরুষ ও প্রকৃতি, এমন কি ত্যাগ ও ভোগের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। ইহাদের একটি যে উপরে আর একটি যে নীচে তাহা নয়, উভয়েই সমানপর্য্যায়ে। পূর্ণযোগের যে সামঞ্জস্য তাহার মূল এইখানে। পূর্ণযোগীর চক্ষে আত্মা বা পুরুষ হইতেছে ঈশ্বর, প্রকৃতি হইতেছে তাঁহারই আপন কর্ম্মনিষ্পাদনী শক্তি। পুরুষ অথবা সৎ হইতেছে শুদ্ধ অখণ্ড অসীম আত্মসত্তা। শক্তি হইতেছে চিৎশক্তি—ঐ শুদ্ধসত্তারই

চেতনার প্রেরণা, খেলা। স্থিতি ও গতি, বিরাম ও কর্ম্মের মধ্যে যে সম্বন্ধ, উহাদের মধ্যেও সেই একই সম্বন্ধ। শক্তি বা কর্ম্মপ্রেরণা যখন শুধু থাকা শুধু অস্তির চেতনার যে আনন্দ তাহার মধ্যেই বিলীন তখন হইতেছে স্থিতি বা বিশ্রাম। ইহারই অপর নাম ত্যাগ। আবার যখন পুরুষ আপন শক্তির বহুবিধ কর্ম্মে আপনাকে ছড়াইয়া দিতেছেন, তখনই কর্ম্ম, তখনই সৃষ্টি; তখনই 'থাকা' নয় 'হওয়া'র আনন্দ। আর ইহাই ভোগ। এই যে হওয়ার আনন্দ ইহাই সৃষ্টির, জাগতিক প্রকাশের প্রসূতি, মূল কারণ। আর যাহার সহায়ে যে উপায়টিকে ভর করিয়া আনন্দ বস্তুরাজী সৃষ্টি করিতেছে, এক বহু হইতেছে তাহাই তপঃ।

এই তপঃশক্তি পুরুষেরই চিৎশক্তি অর্থাৎ চিন্ময় পুরুষ যখন আপন শুদ্ধ সত্ত্বার মধ্যে নিগূঢ় অব্যক্ত অনন্ত রূপসম্ভাবনীয়তার উপর আপনার চেতনাকে খেলাইয়া তুলে তখনই উদ্ভূত হয় বস্তুর ভাবময় স্বরূপ, ব্যষ্টির বিশিষ্টের স্বত সত্যময় অন্তরাত্মা—যাহার নাম দেওয়া হইয়াছে বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান অথবা সত্যভাব সকল জ্ঞান সকল শক্তির আধার যে আত্মসত্ত্বা তাহা হইতে নিসৃত হইতেছে বলিয়া আপনাকে অব্যর্থরূপে পরিপূর্ণ করিতে চলিয়াছে। আমাদের দেহ প্রাণ ও মনের অন্তরালে রহিয়াছে এই বিজ্ঞানের ধর্ম্ম। এই বিজ্ঞানই আবার এক নৈসর্গিক প্রেরণাবলে দেহ প্রাণ ও মনের মধ্যে রূপ গ্রহণ করিয়া আপনাকে জাগরূক করিয়া ধরিতে চাহিতেছে। প্রকৃতপক্ষে সকল যোগ সাধনারই প্রতিষ্ঠা এই চিৎভাব এই বিজ্ঞান এই সত্যং ঋতং এর অপ্রত্যাহত কার্য্যকারিতার উপর। সকল যোগপন্থা ইহাকেই মানিয়া চলিয়াছে। গীতায় শ্রীভগবান্ এই সত্যটিকেই লক্ষ্য করিয়া কতবার বলিতেছেন, 'শ্রদ্ধান্বিত' 'ভাবসমন্বিত' হইয়া যে যাহা চায় সে তাহা পাইবেই, যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা, যেরূপ ভাব সে তাহাই হয়। যো যৎ শ্রদ্ধঃ স এব সঃ।

চণ্ডীদাস

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চণ্ডীদাস যে পিরীতের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন অধুনা কলুষিতমনা নর নারী তাহা অতি কদাকার অর্থেই গ্রহণ করিয়াছেন। পিরীতের নাম শুনিলেই নবীনগনের অধরে কুটীল হাসি ফুটিয়া উঠে, মনে কামনার আগুণ জলিয়া থাকে। মনে রাখিতে হইবে—শক্তিসাধনরত চণ্ডীদাসকে বাশুলিদেবী প্রেমসাধনের

জন্যই রজকিনী রামীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং এই নিকষিত হেমস্বরূপ প্রেমলাভ করিয়া চণ্ডীদাস যে দিন গাহিলেন—

শুন রজকিনী রামি,
ও দুটী চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইনু আমি।
তুমি বেদ-বাদিনী, হরের ঘরণী,
তুমি সে নয়নের তারা,
তোমার ভজনে ত্রিসন্ধ্যা যাজনে
তুমি সে গলার হারা।
রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ
কাম গন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম
বড়ু চণ্ডীদাসে গায়।

আশ্চর্য্য তখনও এই অপার্থিব প্রেমের আদর্শ জনসাধারণ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইল। সাধনার কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চণ্ডীদাসকে এই অপার্থিব প্রেম লাভ করিতে হইয়াছিল। সুচরিত্র ব্রাহ্মণযুবক সরলান্তঃকরণে গতানুগতিক সাধনপন্থাই অবলম্বন করিয়াছিলেন, তিনি ঐকান্তিকচিত্তে দেবীর প্রস্তরমূর্ত্তির নিকট আত্মোৎসর্গ করিয়া অভীষ্টসিদ্ধির আশায় প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, নিত্য-নৈমিত্তিক ভোগরাগের সকল অনুষ্ঠান নিষ্ঠাপূর্ব্বক সম্পাদন করিয়া দেবীর তুষ্টিবিধানে যত্নপর ছিলেন। চণ্ডীদাসের অকৃত্রিম ভক্তি ও তপঃপ্রভাবে অচেতন প্রস্তর মূর্ত্তি বাশুলী দেবী চৈতন্যময়ী হইয়া সাধককে সাধনমার্গ দেখাইয়া দিলেন।

দেবীর আদেশলাভ করিয়া চণ্ডীদাস পৃথিবীর কথা ভুলিয়া গেলেন। স্বয়ং ব্রাহ্মণসন্তান হইয়াও রজকিনী রামীকে অকুণ্ঠিতচিত্তে হৃদয়রাজ্যের অধীশ্বরী করিয়া লইলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ কাহাকেও কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিলে জিজ্ঞাসা করিতেন—যে চাপরাশ পাইয়াছ কি? ইহার অর্থ—ভগবৎ-আদেশ না পাইলে ষোল আনা এক করিয়া কেহ কোন কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারে না এবং এইরূপ সর্ব্বান্তঃকরণে কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইলে কোন উদ্দেশ্যই সফল হয় না। কেননা কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবামাত্র স্বভাবতঃ সাধককে যে সকল ভীষণ বাধার সহিত সংগ্রাম করিতে হয়, উহা অতিক্রম করিয়া অভীষ্ট লাভ করিতে হইলে দৈবশক্তি লাভ করা চাই। চণ্ডীদাস এইরূপ আদেশ লাভ করিয়া একদিন প্রভাতে অস্পৃশ্যা রজকিনীর সম্মুখে নতজানু

হইয়া বলিলেন— "ও দুটী চরণ শীতল জানিয়া,
শরণ লইনু আমি।"

এই ঘটনায় পৃথিবীর সহস্র অত্যাচার যে চণ্ডীদাসকে আক্রমণ করিয়াছিল, ইহা বলাই বাহুল্য। সদাচারী ব্রাহ্মণসন্তান রজকিনী রামীর প্রেমাকাঙ্খী, ইহা দেখিয়া সকলেই তাহাকে বাতুল বলিয়া উপহাস করিয়াছিল, দেবী-আরাধনায় অযোগ্য জ্ঞানে তাহাকে সমাজ হইতে দূর করিয়া দিয়াছিল। চণ্ডীদাস তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। প্রবৃত্তির ইঙ্গিতে তিনি যদি রামীর প্রণয় অভিলাষ করিতেন তাহা হইলে লজ্জা ঘৃণা ভয়ের প্রবল তাড়নায় হয়ত এই গর্হিত কার্য্য হইতে তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইতেন। রামীর সহিত একত্র প্রেমের সাধনা করিতে হইবে এই আদেশ প্রত্যক্ষভাবে বাশুলী দেবীর নিকট হইতে তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মানুষের নিকট নিন্দিত হইবেন বলিয়া তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

আত্মসমর্পণের ইহা এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। চণ্ডীদাসের অন্তরে অহঙ্কারের একটী ক্ষুদ্র রেখা থাকিলে তিনি নীতিবিরুদ্ধ এইরূপ কার্য্যে অগ্রসর হইতে নিশ্চয় ইতস্ততঃ করিতেন। চণ্ডীদাস বিচার বুদ্ধি সমস্তই বাশুলীর চরণে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের মনে কোন কামনাই ছিল না, বাশুলীর আদেশই ছিল তাঁহার জীবনের সর্ব্বস্ব। তাই আদ্যাশক্তি এই উত্তম আধার অবলম্বন করিয়া স্বর্গের প্রেম মরজগতে প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছা করিলেন। সে যুগে বর্ত্তমান কালের মত সমাজবন্ধন এরূপ শিথিল হইয়া যায় নাই, হিন্দুসমাজে কেহ উচ্ছৃঙ্খল বা স্বেচ্ছাচারী হইলে সমাজপতি তাহার গুরুতর দণ্ডবিধান করিতেন। বাশুলী দেবী এই কঠোর পরীক্ষার ভিতর দিয়াই চণ্ডীদাসকে সিদ্ধির পথ দেখাইয়া দিলেন, সমাজের চক্ষে যাহা হীন, যাহা নীতিবিরুদ্ধ ভগবদ্-বিধানে তাহা যে অন্যরূপ হইতে পারে, তাহাই তিনি প্রমাণিত করিলেন।

রামীর নিকট হইতে চণ্ডীদাস যে প্রেম লাভ করিয়াছিলেন, সমাজের কঠোর দণ্ড মাথায় বহিয়া তিনি যে প্রেমের সৌরভ জগন্ময় ছড়াইয়া দিয়াছিলেন, দুঃখের তপস্যায় যে স্বর্গীয় ভাবের দ্যোতনা ঝলসিয়া তুলিয়াছিলেন তাহা কি মধুর কি সুন্দর কি প্রীতিপ্রদ! তিনি পিরীতের ব্যাখ্যা কি মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় সরল ও সহজ করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

"পিরীতি পিরীতি সব জন কহে,
পিরীতি সহজ কথা?

বিরিখের ফল নহেত পিরীতি,
নাহি মিলে যথা তথা।
পিরীতি অন্তরে পিরীতি মন্তরে
পিরীতি সাধিল যে,
পিরীতি রতন লভিল সে জন,
বড় ভাগ্যবান সে।
পিরীতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে,
পরকে আপন করিতে পারিলে,
পিরীতি মিলয়ে তারে।
পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস,
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও,
থাকিলে পিরীতি আশ।

চণ্ডীদাস যে উপায় অবলম্বনে এই অপরূপ প্রেমতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান সাধকগণকে সে পথ অনুসরণ করিতে হইবে না, কিন্তু ভবিষ্য সন্তানগণের জন্য তিনি যে অমূল্য সম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন আমাদিগকে তাহারই যথার্থ অধিকারী হইতে হইবে। যে প্রেমের অমর স্পর্শে আপনা ভুলিয়া পরকে আপনার করিতে পারা যায়, যে কঠোর ব্রত সাধনা করিলে দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গে পরিণত হওয়া যায়, তাহাই যে আজ বিক্ষিপ্ত মৃতপ্রায় দুর্ব্বল বাঙ্গালীর মৃতসঞ্জীবনী—তাহাই যে জাতির সিদ্ধমন্ত্র। এই প্রেমের অমৃত নিগড়েই আমরা বিরাট্ ভগবৎ-মণ্ডলীর সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইব।

চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—"পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন," কিন্তু যে কঠোর দুঃখের বোঝা মাথায় বহিয়া আমরা আজ পথ চলিতেছি, যে দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা সহিয়া দিনাতিপাত করিতেছি, যে দুঃখের পাষাণে আমাদের অস্থি-মজ্জা দিন দিন চূর্ণিত হইতেছে, প্রেমের সাধনা তদপেক্ষা কি অধিক কঠোর হইবে? স্বার্থের কালকূট হলাহলে জর্জ্জরিত হইয়া দিবারাত্র উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে আমাদের হৃদয় যে পুড়িয়া ছাই হইল, প্রেমের পূত মন্দাকিনীপ্রবাহে তা কি শীতল হইবে না? অহঙ্কারের পাষাণ মন্দির প্রকৃতির ভীম বজ্রাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া আমাকেই যে পিষিয়া মারিবার উপক্রম করিয়াছে—আজ কে আমার আপনার জন আছে, একবার দেখিব না কি? আমরা সাতকোটি ভাই সাতকোটী বোন—ভেদের দ্বন্দ্বের প্রাচীর অন্তরালে অবস্থান করিয়া হাহাকার করিতেছি—সবলে সে দৃঢ় ভিত্তি অপসারিত করিয়া প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে এক হইবার জন্য প্রেমের সাধনা করিব না কি?

চণ্ডীদাস আমাদের পৃথকত্ব ঘুচাইয়া অভেদ হইতে ইঙ্গিত করিতেছেন, সে মহাপুরুষের বাণী অন্তরে গ্রহণ কর। পিরীতিসাধন যতই কঠিন হউক

উহাতে আমরা সিদ্ধিলাভ করিবই। আমাদের সকল স্বাধীন ইচ্ছা পরের ইচ্ছার আজ্ঞাকারী করিব—যে আমার অধীন নহে আমি তার অধীন হইব, আমার স্বাতন্ত্র্য ঘুচাইয়া চিরজীবন পরতন্ত্র হইয়াই থাকিব—চণ্ডীদাসের ভাষায় জাতির মন্দির দ্বারে গিয়া ঐকান্তিক চিত্তে নতজানু হইয়া চীৎকার করিয়া বলিব— "ও দুটী চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইনু আমি।"

চণ্ডীদাসের প্রেম আজ শাখাপল্লব বিস্তার করিয়া প্রত্যেক বঙ্গীয় যুবকের হৃদয় স্পর্শ করিবে—চণ্ডীদাস রমণীর প্রেমে উন্মাদ হইয়া এই গোপন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার আচরণ সম্বন্ধে কেহ যেন সন্দিহান না হয়েন। চণ্ডীদাস ইন্দ্রিয়জয়ী পুরুষ ছিলেন। আজ আমরা আমাদের যুবতী সহোদরার নিকট একত্রে উপবেশন করিতে সঙ্কোচ বোধ করি—ইহা ভদ্রতা নহে, শীলতার লক্ষণও নহে, আমরা এমনই লঘুচিত্ত ও অপদার্থ হইয়া পড়িয়াছি, আমাদের হৃদয়ে এমনই শক্তির অভাব হইয়াছে। চণ্ডীদাস রমণীর সঙ্গে একত্র অবস্থান করিয়া ছিলেন, এমন কঠোর পরীক্ষার ভিতর দিয়াই এরূপ দুর্গম পথের মধ্য দিয়াই চণ্ডীদাস স্বর্গের প্রেমকে পৃথিবীর উপর প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, দিবানিশি রমণীর সঙ্গে থাকিয়াও তিনি আপনার ভিতর নরকের আগুণ জালিয়া তুলেন নাই—খুব জোর করিয়াই বলিয়াছেন—

"রজনী দিবসে হব পরবশে,
স্বপনে রাখিব লেহা,
একত্র থাকিব নাহি পরশিব
ভাবিনী ভাবের দেহা"

পরবশে থাকিয়া প্রেমকে স্বপ্নের মধ্যেই রাখিব, ইহাই ছিল চণ্ডীদাসের কঠোর সাধনা। একত্র থাকিয়াও প্রেমাস্পদকে জাগতিক স্পর্শে মলিন করিব না, কেননা প্রেম যে দর্শন স্পর্শনের অতীত, জাগ্রত-জগৎ তাহাকে তখন ধরিতে পারে নাই। যখন চণ্ডীদাস উদাত্তস্বরে এই অপার্থিব প্রেমের সঙ্গীত গাহিয়া বাংলার গগন মুখরিত করিয়াছিলেন তখন বাঙালীর সমস্ত জীবনটা দৈব শক্তিতে জাগিয়া উঠে নাই, জ্ঞানের মধ্যেই এই প্রেম খেলিয়া গিয়াছে। আজিও বাংলা তেমনি নিদ্রিত। যে জাগরণ তোমরা প্রত্যক্ষ করিতেছ এ জাগরণ নহে, স্বপ্নঘোরে উঠিয়া বসা মাত্র। যেদিন হিন্দুজাতি এই স্বর্গের পিরীতি তুরীয় জগৎ হইতে বিশুদ্ধ ভাবেই তাহাদের জাগ্রত জীবনে প্রতিফলিত করিতে পারিবে, সেই দিনই জানিবে ভারতবর্ষ ধন্য হইয়াছে, সেই দিনই স্বার্থবিজড়িত ইহ-জগৎ প্রেমপূর্ণ হইবে—জগতের প্রজামণ্ডলী সে দিন প্রেমের প্রজা হইয়া পরমানন্দে বসবাস করিবে।

অহঙ্কার

অহঙ্কারই অবিদ্যাশক্তির প্রধান অনুচর। অহঙ্কারের ভীষণ কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে না পারিলে যোগপথে কাহারও আসিবার অধিকার নাই। বিদ্যার অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, যশঃ গৌরবের অহঙ্কার বরং ভাল কিন্তু যাহার ভিতরে ধর্ম্মের অহঙ্কার প্রবেশ করিয়াছে তাহার মুক্তির আশা সুদূরপরাহত।

পৃথিবীর অহঙ্কার প্রকৃতির সম্মার্জ্জনীসঞ্চালনে প্রতি মুহূর্ত্তে অপসারিত হইতেছে। ধনের গৌরব চিরস্থায়ী হয় না, পুত্রের অহঙ্কার নিমেষে তিরোহিত হইতে পারে, রূপের গরিমা কালস্রোতে ধুইয়া মুছিয়া শেষ হইয়া যায় কিন্তু ধর্ম্মের অহঙ্কার অন্তহীন, জন্মজন্মান্তর জীবের বুকে জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া বসিয়া থাকে—এই ভীষণ ভারবিশিষ্ট পাষাণ-স্তূপকে নিষ্কাসিত করিয়া মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ হইতে সাধককে বহুদিন কঠোর তপস্যা করিতে হয়।

অধমের সহস্র অপরাধ মার্জ্জনীয় কিন্তু উত্তমের বিন্দু কলঙ্কও অসহ্য। রূপ যৌবন বিলাস ঐশ্বর্য্য বিদ্যা যশঃ মানের অহঙ্কার পঞ্চভূতজনিত, অথবা দশ ইন্দ্রিয়ের অন্ধতা নিবন্ধন ঘটিয়া থাকে। ইহা কোথাও তামসিক কোথাও বা রাজসিক, কিন্তু আমি ধার্ম্মিক আমি সত্যবাদী আমি সাধারণ জীব অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীভুক্ত, কেননা শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধ মানিয়া চলি, যথারীতি সন্ধ্যা-উপাসনা ধ্যান ধারণা প্রাণায়াম সাধনে রত থাকি, দিবানিশি হরিনাম করি, নিরামিষ বা হবিষ্যান্ন গ্রহণ করি—এরূপ অহঙ্কার মানসসম্ভূত—ইহা সাত্ত্বিক। পশুবৃত্তিপরায়ণ অধম মানবজীবনাপেক্ষা ব্রতপরায়ণ সাত্ত্বিক অহঙ্কারবিশিষ্ট এই সকল জীব উত্তম হইলেও মুক্তির মন্দিরে ইহারা কদাচ প্রবেশাধিকার পায় না; ইহাদের আগমনে মন্দিরের লৌহ কবাট দৃঢ় আবদ্ধ হইয়া যায়; মহাপাপী অধম নারকীও একদিন ঊর্দ্ধে চাহিয়া একবার ভগবানের পবিত্র নাম গ্রহণ পূর্ব্বক অসংখ্য অপরাধ হইতে মুক্ত হইতে পারে, ইহারা কিন্তু অহংভাবাপন্ন হইয়া দিবানিশি কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিয়া জিহ্বা

কৃষ্ণময় করিয়া ফেলিলেও স্বর্গের দুয়ারে পৌঁছিতে পারে না।

কথাটা অপ্রিয় হইলেও সত্য। আমরা মহা বৈদান্তিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকেও সমতাচ্যুত হইতে দেখিয়াছি। বেদান্ত-পাঠদানকালে দূরে বালকের করুণ ক্রন্দনরোল শুনিয়া স্বীয় পুত্রজ্ঞানে উৎকণ্ঠিতচিত্তে বাহিরে আসিয়া যখন তিনি দেখিলেন সে তাহার আত্মজ নহে, তখন হাসিয়া শিষ্যের নিকট পুনরাগমন করিয়া বলিলেন, "ও একটা কাদের ছেলে পড়ে' চেঁচাচ্চে—" ওহো "সর্ব্বং হেত্যদ্ ব্রহ্ম" জ্ঞান সাধনার কি শোচনীয় পরিণাম!

যোগের যে ত্রিধারা যে তিনটি পথ দিয়া ভগবদ্‌সন্নিধানে পৃথিবীর জীব পৌঁছিতে পারে—উহার কোন একটী পথ গ্রহণ করিলেই যে শান্তি বা সমতার অধিকারী হইবে এরূপ মনে করিও না; কেননা অহঙ্কার থাকিতে কোন পথেই তুমি অগ্রসর হইতে পারিবে না। "আমি" বিসর্জ্জন দিতে না পারিলে পথের ধুলা মাটী মাখিয়া ঘরে ফিরিতে হইবে।

ভগবানের পথ দেখিতে সরল ও সুন্দর বটে কিন্তু এই সুমহান্ বর্ত্মে পদক্ষেপ করিতে কতটা যে তপস্যার প্রয়োজন তাহা বলাই বাহুল্য। উপনিষদের সকল ছন্দগুলি আবৃত্তি করিয়া দশজনের মন মাতাইতে পারি—শ্বাস বন্ধ করিয়া দুই হাত ঊর্দ্ধে অবস্থান করিয়া বহু লোককে চমৎকৃত করিতে পারি, কিন্তু আপনি মাতিয়া বিশ্বজগৎকে মাতাইতে হইলে যে পরেশ পাথর স্পর্শ করিতে হয়, যে অমৃতসাগরে সিনান করিয়া আসিতে হয় তাহার সন্ধান কয়জন জানে এবং কয়জনই বা তাহাতে সমর্থ হয়?

বাংলার যুবকগণ! আজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রবল সংঘর্ষণে যুগযুগান্তরের লুপ্ত পথ বাহির হইয়া পড়িয়াছে—ভবিষ্যযুগের সাধনপন্থা, শ্রীভগবান্ যাহা কুরুক্ষেত্রমহাসমরে অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন তাহা অনুধাবন কর। চিত্তাকর্ষক পুরাতন উপায়গুলির আবর্ত্তনে না পড়িয়া ষোল আনা মন এক করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মধুর অথবা কঠোর বাণী শ্রবণ কর—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি—যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যাসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥"

হে কুন্তিনন্দন! যাহা কিছু কর, যাহা কিছু আহার কর, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর তৎসমস্ত যেরূপ ভাবে করিলে আমাতেই সমর্পিত হইতে পারে, এইরূপ ভাবে (ব্রহ্মার্পণ-বুদ্ধিতে) কর।

কিন্তু আমরা করিতেছি কি ? আমাদের "আমি"কে সাধনার সহায়ে বিরাট অহঙ্কারে পরিণত করিতেছি—শাস্ত্রাদি অধ্যয়নে পণ্ডিত হইয়া উঠিতেছি—নামে রুচি জীবে দয়া করিতে গিয়া মহাভক্ত নামে বিখ্যাত হইতেছি—পরোপকার করিতে গিয়া সুনাম অর্জ্জন করিতেছি—হরি ! হরি ! আমাদের হইবে কি ? ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনপথে বিভ্রান্ত হইয়া উপায়কেই লক্ষ্য করিয়া তুলিতেছি ?

আজ আমরা সর্ব্বাগ্রে "আমি"কে পরিত্যাগ করিতে চাই। তনু মন প্রাণ দিয়া ভগবানের আদর্শকেই মানিয়া চলিব, আমাদের প্রতি কার্য্যের পশ্চাতে যে সেই পরাৎপর পুরুষ বিদ্যমান আছেন এ কথা মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হইব না। আমরা কার্য্য করিব তাঁহার উদ্দেশ্যে, আমরা ভোজন করিব তাঁহার ভোগাদির জন্য, আমরা বিশ্রাম করিব তাঁরই ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া। আমাদের আমিত্বটাকে ভাঙ্গিয়া চূরিয়া মিশাইয়া দিব তাঁহাতে, যিনি সর্ব্বভূতে অবস্থিত থাকিয়া অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন—আমরা তাঁর প্রতি বাণীতে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিব, আনন্দ লাভ করিব, কেননা তিনি সর্ব্বময়—কোমল অথবা কঠিন যে কোন স্পর্শ বোধ করিনা, সকলই মধুময় করিয়া লইব, কেননা তিনি ব্যতীত জগতে আর ত সত্বা নাই—জগতের সকল ভোগই তিনি, সুতরাং অনন্ত ভোগের মধ্যেই অবগাহন করিয়া তাঁহাতেই চির অনুস্যূত রহিব।

আমি জানিব না আমি ভক্ত কি জ্ঞানী, আমি জানিব না আমি কর্ম্মী কি সাধক,—আমার তর্ক নাই, যুক্তি নাই, বিচার নাই, সমাজ নাই, ধর্ম্ম নাই, পাপ নাই, পুণ্য নাই—স্বর্গ নরক ইহকাল পরকাল ভুলিয়া, অতীতের সকল স্মৃতি মুছিয়া, সকল সংস্কার সকল ধারণা বিসর্জ্জন দিয়া এই মুহূর্ত্ত হইতে কেবল একটী কথা জানিব "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি"

তোমরা আমার প্রেমিক বলিতে পার, সাধক বলিতে পার, ভক্ত বলিতে পার, ভণ্ড পাষণ্ড মহাপাপী প্রতারক বলিতে পার—আমার কার্য্য দেখিয়া তোমাদের অভিধানে আমার ধনবান বলিতে পার, দরিদ্র বলিতে পার, বিশ্বনিন্দুক বলিতে পার—জগতের চক্ষে হয়ত ইহার যথার্থতা আছে—কিন্তু আমি জানি আমি এসকলের কিছুই নহি। যদি আমার কোন নাম থাকে সে নাম তাঁর, যদি কিছু উপাধি থাকে সে উপাধি তাঁর, যদি

কিছু গুণ থাকে সে গুণ সেই গুণময়—শ্রীহরির। আমার সাধন ভজন ব্রহ্মচর্য্য যাহা কিছু, এই সমস্ত আমি ইন্দ্রিয়াদির নির্দ্দেশানুসারে করিব না—আমি যে তাঁহার যন্ত্র, তিনি আমায় যাহা করাইবেন আমি তাহাই করিব, তা কে জানে ভাল আর কে জানে মন্দ।

মহাপ্রলয়

চতুর্দ্দিকেই জল থই থই করিতেছে। নিম্নে অসীম বারিরাশি, ঊর্দ্ধে অনন্ত ব্যোম—শব্দহীন, স্পন্দনহীন, এক ঘোর মূর্চ্ছায় অভিভূত। বায়ু নিশ্চল, আদিত্য তিমিরাবৃত, দিন রাত্রি এক। মানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, তৃণ, গুল্ম সব বিলুপ্ত—শুধু নিম্নে নিশ্চল বারিরাশি ঊর্দ্ধে স্পন্দবিহীন ব্যোম। আর সেই ব্যোমে দাঁড়াইয়া একাকী মার্কণ্ডেয়। দক্ষিণে সেই জল ধূ—ধূ—ধূ! তাহাতে তরঙ্গের উল্লাস বিলাস নাই—নৃত্যের সে কল কল ছল ছল হাস্য নাই। বামে সেই জল ধূ—ধূ—ধূ! তাহাতে তটিনীর সে রাগরঙ্গিনী গতিভঙ্গী নাই—তাহার সে হৃদিকোষ-পরকাশা কল কল ভাষা নাই। সম্মুখে পশ্চাতে সেই জল ধূ—ধূ—ধূ! স্তব্ধ, শান্ত, মৌন; অচঞ্চল, নির্ব্বাক, বিরাট!

আজি একি করিলে প্রভু! আজি তোমার একি লীলা! ছায়াবাজির ন্যায় কোথায় বিলুপ্ত হইল সেই মানবজাতি—কোথায় সেই মানবজাতির জ্ঞান-গরিমা-প্রদীপ্ত জীবন—কোথায় তাহার বুদ্ধিবৃত্তির অত্যাশ্চর্য্য নিদর্শন কোথায় সেই বিজয়স্তম্ভ, স্মৃতিসৌধ—কোথায় সে অলকানিন্দিত নগর-নগরী কোথায় আজি তাহার কাম-মদ-মত্ত বিলাস-বাসনা পরিতৃপ্ত করিবার সহস্র সহস্র উপকরণ! কোথায় সে লীলাময়ী নারী অথবা নারীস্বভাবা লীলা! আজি তাহাদের কোন্ রসাতলে নিক্ষেপ করিলে প্রভু! এক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহারা কোথায় বিলুপ্ত হইল! আজি সমস্ত লীলায় বিরাট অবসান,—আজি সমস্তই ক্লান্ত এবং শান্ত, লুপ্ত এবং গুপ্ত, গতিহীন এবং রতিহীন। এই গতিরতিহীন ব্রহ্মাণ্ডে আজ একা মানব আমি। এ বিরাট শূন্যে কোথায় যাইব কি করিব প্রভু? এ বিরামহীন নীরবতা আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত

করিয়াছে। এই বিরাট শান্তি আমার প্রাণে ভীতি সঞ্চরণ করিতেছে—এই দুর্ভেদ্য অন্ধকার আজি আমাকে অন্ধ করিয়াছে। প্রভু আর্ত্তকে ত্রাণ কর, ভয়ার্ত্তের ভয় অপসারিত কর, অন্ধকে পথ দেখাও।

সহসা সেই বিরাট ব্যোম কম্পিত করিয়া যেন সলিলগর্ভ হইতে বজ্র-গম্ভীর স্বরে অভয়বাণী উচ্চারিত হইল—নভেতব্যং নভেতব্যং মারুদিহি মারুদিহি। মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই নীরবতা বিঘ্নিত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের জন্য সেই মহাপ্রলয়ের কালনিশা ভেদ করিয়া দিগচক্রবালে প্রতিধ্বনিত হইল সেই বাণী—নভেতব্যং নভেতব্যং মারুদিহি মারুদিহি! ত্রস্ত মার্কণ্ডেয় অধিকতর ভীত হইয়া সেই আশ্বাসবাণী শ্রবণ করিল। সেই জনপ্রাণী-হীন দেশে মনুষ্যকণ্ঠ শুনিয়া তাহার সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল—কলেবর কম্পিত হইল—সংশয়াকুল চিত্তে ভীতকণ্ঠে মার্কণ্ডেয় উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—কোত্তবান্—কে আপনি আমাকে আশ্বাস দিতেছেন—কে আপনি আমাকে এ ঘোর দুর্দ্দিনে—এ কাল জলধির উপরে আমাকে অভয়বাণী শুনাইতেছেন—আজি এ মহাপ্রলয়ের দিনে, এ দেব-যক্ষ-রক্ষ-নর-কিন্নরহীন-বিশ্বে, এ বৃক্ষ-লতা-তৃণ-গুল্মনিরস্ত জলধিমণ্ডলে মনুষ্যকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন—নভেতব্যং নভেতব্যং মারুদিহি মারুদিহি—কে আপনি? প্রকাশ হউন, আমাকে দেখা দিন—আমি দেখিতে পাইতেছি না; এ কাল অন্ধকার আমাকে অন্ধ করিয়াছে। উত্তর হইল—অবোধ চাহিয়া দেখ। দূর হইয়া যাক্ তোমার অন্ধতা—এক্ষণে নয়ন উন্মিলীত কর, দেখ আমাকে চিনিতে পার কি না? মার্কণ্ডেয় নয়ন উন্মিলীত করিয়া চাহিয়া দেখিল।

মার্কণ্ডেয় দেখিল সেই নির্ব্বাক চেতনাবিহীন জলমণ্ডল—জলের উপরিভাগ কাষ্ঠখণ্ডবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। কোথাও সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম একটু চাঞ্চল্য নাই—কোথাও জলের একটা অণুও স্থানভ্রষ্ট হইতেছে না—স্তব্ধ, স্থির, সমাধিস্থ। আর স্থির বারিরাশির উপর ভাসমান একখানি বটপত্র। মার্কণ্ডেয় দেখিল সেই বটপত্রের উপর শায়িত—মহাবিষ্ণু। সেই নীল জলধির উপর, নবীন নীলবটপত্রোপরি শায়িত নীলপট্টাবৃত শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নীলকান্তি মহাবিষ্ণু—স্থির, প্রশান্ত, সহাস্য। মার্কণ্ডেয় ভক্তিভরে জোড়করে প্রণত হইল।

পরে শক্তি আপনাকে প্রকাশিতা করিলেন। স্থির জলরাশি মুহূর্ত্তমধ্যে চঞ্চল হইয়া উঠিল। নির্ব্বাক ব্যোম জল কল্লোলে পূরিল। জলধির

প্রশান্ত হৃদয় গুলি চাঞ্চল্যে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল—তরঙ্গমালা আপনাদিগকে উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিল। সলিলগর্ভ হইতে বসুমতী আপনার লুক্কায়িত মস্তক উত্তোলন করিলেন। ধরিত্রীর স্তনপানে বৃক্ষ লতা তৃণ গুল্ম আবার বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। উত্তুঙ্গ ভূধর ভূ ধারণ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইল। মলয় পবন বহিল। নদনদী প্রবাহিত হইল। বিহঙ্গকুলের কাকলিতে কাননদেশ কূজিত হইয়া উঠিল। দুর্গম অরণ্য শ্বাপদসমাকুল হইল। প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিলেন। মানবজাতি আপনার অধিকার বিস্তার করিয়া ভগবানের সৃষ্টিকে জয়যুক্ত করিল।

* • * • *

কিন্তু শোন আজি সেই মহাপ্রলয়ের দিনের বজ্রকণ্ঠ নির্ঘোষিত অভয় বাণী—নভেতব্যং নভেতব্যং। ভয় করিও না ঐ মহাপ্রলয়কে, ভয় করিও না খণ্ড প্রলয়কে, ভয় করিও না প্রতিদিনের ক্ষুদ্র প্রলয়কে। ভয় করিও না দেহের ধ্বংসে যৌবনের ধ্বংসে। ভয় করিও না জরা মৃত্যু বার্দ্ধক্যকে। কাপুরুষের ন্যায় ক্রন্দন করিও না।

আপনার চারিদিকে গণ্ডী টানিয়া স্বর্গজয়ের কামনা করিও না। তাহা দুর্ব্বলেরই বাঞ্ছনীয়। অসীম হইয়া সসীম হইবার বাসনা কেন? আপনার চারিদিকে গণ্ডী টানিয়া তাহাতে আপনাকে শৃঙ্খলিত করিও না। তাহা অজ্ঞানীর প্রয়োজন। তুমি জ্ঞানময় শক্তিময় আনন্দময়। ছিন্ন করিয়া দাও যত শৃঙ্খলকে, দূর করিয়া দাও দুর্ব্বলের কাপুরুষের করুণ মর্ম্মোক্তি। তুমি মুক্ত, তুমি পুরুষ, বজ্রগম্ভীর স্বরে ঘোষণা কর—নভেতব্যং নভেতব্যং! নির্ব্বাপিত হউক তোমার তেজে নরকাগ্নির অমূলক ভীতি—বিলুপ্ত হউক তোমার ইঙ্গিতে এ বিশ্ব হইতে পাপপুণ্য—দূর হইয়া যাক্ তোমার মনগত শাস্ত্রের মৃত্যুর বন্ধন। তুমি মুক্ত। আপনাকে চারিদিকে উন্মুক্ত করিয়া দাও। গগনে বজ্রনির্ঘোষরবে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকুক্—নভেতব্যং নভেতব্যং মাঙ্গদিহি মাঙ্গদিহি। এ জগৎকে ক্লীবের লীলাস্থল হইতে দিও না।

বাংলার কথা

সাধকের চক্ষে যিনি জগৎকে দর্শন করিতে শিখিয়াছেন—তিনিই দেখিবেন—পৃথিবীদেবী এখনও মহানিশার ঘনঘোরে শয়ানা। জগতে এখনও ঊষার উজ্জ্বল অরুণচ্ছটা দিগন্তের কোল আলোকিত করিয়া উদিত হয় নাই। মানুষ এখনও স্পষ্টদিবালোকে ভবিষ্যজ্জীবনপথ দর্শন করিতে পারিতেছে না, আঁধারঘোরে সে এখন শুধু হাতড়াইয়া পথনির্ণয় করিতে চেষ্টা করিতেছে মাত্র—প্রকৃত পথের সন্ধান মিলে নাই।

এই পথনির্ণয় অনেকে অনেক প্রকারে করিতেছেন। মনীষিবৃন্দ জাতির জাগরণের জন্য বিবিধ চিন্তা এবং আলোচনায় কর্ম্মপন্থানিরাকরণের জন্য নানা প্রয়াসে নিরত হইতেছেন—প্রভাত যে আসন্ন এ-সকল তাহারই দ্যোতনা করিতেছে। সেদিন বাংলার প্রাদেশিক সভামণ্ডপ হইতে সভাপতি শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় যে মর্ম্মস্পর্শী বাংলার কথা শুনাইয়াছিলেন—আমরা তাহার মধ্যে এমনি একটা পন্থানির্ণয়ের আন্তরিক প্রচেষ্টা দেখিয়া উল্লসিত হইয়াছিলাম।

সভাপতি মহাশয় এই বাংলার কথায় আদ্যোপান্ত একটা যে নূতন সুর ধরিয়াছিলেন সে সুর বাস্তবিকই বাঙ্গালীর মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিয়াছিল—কারণ, সে সুরটা বস্তুতই বাঙ্গালীর প্রাণের কথা; হৃদয়ের কথাই হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে। যে পাশ্চাত্য মোহ, যে অন্ধ অনুকরণ-স্পৃহা আমাদের জাতীয় জীবনের সর্ব্ববিভাগকে আক্রমণ করিয়াছিল স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে তাহার বিরুদ্ধে একটা প্রবল প্রতিক্রিয়াভাব জাতির মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিলেও, রাজনীতিক্ষেত্রে আমরা যেমন বিদেশী ছিলাম—তেমনি, হয়ত অধিকতর পরিমাণেই বিদেশী রহিয়া গিয়াছি। বাংলার কথার আলোচনা প্রসঙ্গে উদ্বোধন পত্রে "ভারতের সাধনা"র লেখক মহাশয় এই কথাই স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—"আমাদের দেশে বিলাতী পলিটিক্সের আমদানী করিয়া যে বিভ্রাট আমরা বাধাইয়া তুলিয়াছি, সে সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয়ের অঙ্গুলীনির্দ্দেশ বড়ই সময়োপযোগী হইয়াছে। প্রথমেই আমা-

দের বিবেচনা করা উচিত ছিল—আমাদের দেশে সনাতন একটা কিছু পলিটিক্স আছে কি না। কিন্তু সে বিবেচনায় অবসর হয় নাই। আমরা ইংরাজি পড়িয়া জীবনের যত বিভাগে "স্বদেশী" ছাড়িয়া "বিদেশীয়" আমদানী করিয়াছি তন্মধ্যে এই রাজনৈতিক বিভাগের কথা এত কাল চাকা পড়িয়া গিয়াছিল, আজ বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় যে বাংলা প্রাদেশিক-সম্মিলনে সভাপতি মহাশয় নিজেই স্বদেশী পলিটিক্সের কথা তুলিয়াছেন।"

চিত্তরঞ্জন বাবুর সম্ভাষণে, এই রাজনীতিক্ষেত্রেও স্বদেশী হইবার প্রচেষ্টাটাই বাঙ্গালীর সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। অনুকরণদূষিত রাজনীতিক্ষেত্রে দীর্ঘ-বিচরণের পর, ব্যর্থমনোরথ এই জাতি যখন সভাপতির মুখে শুনিল—"...... আমরা মনে করি রাজনৈতিক আন্দোলন শুধু তর্ক বিতর্কের বিষয়—বক্তৃতার ব্যাপারমাত্র। আমরা তর্ক করিয়া, বক্তৃতা করিয়া জিতিয়া যাইব। আমাদের সকল উদ্যম ও সকল চেষ্টার উপরে আমাদের ধারকরা কথার ভার চাপাইয়া দিই, যাহা স্বভাবতঃ সহজ, সরল তাহাকে মিছামিছি বিনা কারণে জটিল করিয়া তুলি। শুধু যাহা আবশ্যক তাহা করি না; দেশের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহি না, বাঙ্গালার কথা, বাঙ্গালীর কথা ভাবি না; আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসকে সর্ব্বতোভাবে তুচ্ছ করি। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার দিকে একেবারেই দৃক্‌পাত করি না। কাযেই আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন অসার, বস্তুহীন। তাই এই অবাস্তব আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের দেশের প্রাণের যোগ নাই ......"। তখন সে এই কথায় আপনারই জীবনের অভিজ্ঞতার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিল, তাই অবনতমস্তকে তাহা মানিয়া লইয়াছিল।

বাঙ্গালীই প্রথম স্বদেশী-যজ্ঞের আবাহন করিয়াছিল। পাশ্চাত্যের মোহে ইংরাজীয়ানার পদাঙ্কানুসরণে বাঙ্গালীই প্রথম যেমন পথ প্রদর্শন করিয়াছিল—স্বমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও তাই প্রথম করিতে হইয়াছে তাহাকেই। পরমুখাপেক্ষিতার পরিবর্ত্তে স্বাবলম্বনের মন্ত্র তাহারই মুখে উচ্চারিত হইয়াছে—ইহা সত্য বটে, কিন্তু পূর্ণস্বাবলম্বন, স্বধর্ম্মের সম্পূর্ণ অনুসরণ সে এ পর্য্যন্ত করিয়া উঠিতে পারে নাই। প্রারব্ধের কঠিন নিগড়ে তাহার প্রতি পদক্ষেপ শৃঙ্খলিত হইয়াছে। স্বদেশী স্বাবলম্বনের ভাব হৃদয়ে অবস্থান করিলেও কার্য্যক্ষেত্রে সেই পুরাতন অনু-

করণ নীতি, সেই দারুণ পূর্ব্বসংস্কারই তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে—স্বদেশীভাব এবং বিদেশীয় কার্য্যপ্রণালী, বাঙ্গালীর সকল জাতীয় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরিচালিত করিয়াছে। এই জন্যই বাঙ্গালীর এই বিগত ইতিহাসটা কেবল একটা ব্যর্থতার কাহিনীমাত্র।

স্বদেশী আন্দোলন প্রথমে বস্তুহীন, অসার ছিল না। সভাপতি মহাশয় যেমন বলিয়াছেন—"স্বদেশী আন্দোলন একটা ঝড়ের মত বহিয়া গিয়াছিল, একটা প্রবল বন্যায় আমাদের ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল—প্রাণ যখন জাগে তখন হিসাব করিয়া জাগে না……সেই মহাবন্যায় আমরা ভাসিয়া, ডুবিয়া বাঁচিয়াছি।" দেশের প্রাণের সঙ্গে সে বন্যার যোগ ছিল—আবালবৃদ্ধবনিতাই তাহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল কারণ তাহার মধ্যে দেশ অনুভব করিয়াছিল স্বধর্ম্মেরই প্রেরণা, আত্মপরিচয়েরই আহ্বান। কিন্তু যখন আমরা সে আহ্বানের প্রত্যুত্তরে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিতে গেলাম, সেই পুরাতন কর্ম্মপ্রণালীর খাতের মধ্যে পড়িলাম—অন্তরে আত্মসন্দর্শনের অনুপ্রেরণা পাইলাম বটে, কিন্তু ভাবকে মূর্ত্তিদান করিতে যখনই অগ্রবর্ত্তী হইলাম, তখনই বিদেশীয় ছাঁচ, বিজাতীয় রূপ, বিজাতীয় কর্ম্মসৃষ্টি করিতে লাগিলাম। দেশের লোক সে বিজাতীয় প্রণালী বুঝিল না, তাহাকে হৃদয় দিয়া বরণ করিয়া লইতে পারিল না, বিশাল জন-সংঘ প্রথম মুহূর্ত্তে যে প্রাণের ডাক শুনিয়া জাগিবার উপক্রম করিতেছিল, সে ডাকের ধারাবাহিকতা না পাইয়া, আবার পাশ ফিরিয়া নিদ্রাঘোর জমাইয়া তুলিল। প্রারব্ধ যখন এইরূপে আত্মপরিচয়ের পথে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া বসিল, তখন উপর হইতে বলভদ্রের বজ্রপাত মোহভঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

ভাবিয়াছিলাম রুদ্রের প্রলয়-বিষাণশ্রবণে মোহ বুঝি ভাঙ্গিয়াছে, বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় বুঝি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছে, বাঙ্গালীর জাতীয়সত্তা বিকাশ করিতে হইলে অন্তরেও যেমন আত্মপরিচয় আবশ্যক, কর্ম্মপদ্ধতিতেও তেমনি আত্মধর্ম্মের অনুসরণের প্রয়োজন। বুঝি এইবার বাঙ্গালী শিক্ষায়, দীক্ষায়, শিল্পে বাণিজ্যে, সমাজব্যবস্থায়, রাজনীতিক্ষেত্রে সর্ব্বত্র নূতন ভাবে আত্মার বাণী পালনে যত্নবান্ হইবে।

কিন্তু আজ যাহা দেখিতেছি, তাহাতে এ বিশ্বাস ধূলিসাৎ হইয়া যায়। বাংলার কথার যাঁহারা বক্তা শ্রোতা তাঁহারা আজ আবার সেই রাজ-

নৈতিক আন্দোলন, সেই তর্ক যুক্তি বক্তৃতা, সেই সভা সমিতি রেজোলিউসন্, সেই 'ধারকরা' কর্ম্মপ্রণালীর মোহ পুনরায় বরণ করিয়া লইতে চলিয়াছেন। সমগ্র বাঙ্গালী, সমগ্র ভারতবাসী, অসার বস্তুহীন রাজনৈতিক আন্দোলনেই শক্তিক্ষয় করিতে আবার ছুটিয়াছেন। হায়! এমনি পাশ্চাত্যের মোহ, এমনি প্রারব্ধের আকর্ষণ! বাংলার নেতৃবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করি, এই যে ভারতহিতৈষিণী শ্রীমতী বেসান্তকে আশ্রয় করিয়া নূতন বিক্ষোভ সৃষ্টি করিতে ছুটিয়াছেন—দেশের প্রাণ-সূত্রের সহিত তাহার সংযোগ আছে কি? কতখানি আত্মপরিচয়ের উপর ইহার প্রতিষ্ঠা? 'ধারকরা' বাহ্যপ্রেরণার পরিবর্ত্তে কতটুকু অন্তঃসলিলা শুদ্ধা শক্তি ইহার পশ্চাতে?

অবশ্য এ কথা খুবই সত্য, বিকাশ চাইই—শক্তির প্রকাশ বন্ধ করিয়া তমোঘোরে ডুবিয়া যাইবার জন্য মানুষের জীবন নহে। ভারতের সাধনা অর্থে ইহাও বুঝায় না, যে ভারতকে শুধু নিশ্চিন্ত প্রজাধর্ম্মেরই আদর্শ জগতে দেখাইতে হইবে—রাজনীতির সহিত তাহার সম্পর্ক শুধু আকাশের সহিত মানুষের গৃহধর্ম্মের যতখানি সম্পর্ক তাহার অধিক হইবে না—রাজজাতি আকাশের মত তাহার উপর চন্দ্রাতপ ধারণ করিয়া থাকিবে আর সে নিশ্চিন্ত মনে সনাতন ধর্ম্ম রক্ষণ, সাধন ও প্রচার করিয়া চলিবে মাত্র, যেন ভারতের সাধনা জগতের রাজনৈতিক গগনের প্রলয়লীলা হইতে যতখানি দূরে অবস্থিত, যতখানি বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারিবে ততখানিই তাহার সনাতনত্ব পরিবর্দ্ধিত হইবে।

বাঙ্গালার, শুধু বাঙ্গালার কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম সম্বন্ধে কি যে একটা সঙ্কীর্ণতা ও খণ্ডভাব আমাদিগের বুদ্ধিকে সমাচ্ছন্ন ও অধিকার করিয়া বসিয়াছে তাহা এখনও পূর্ণ নিরাকৃত হইয়া উঠিতেছে না। ধর্ম্ম বুঝিতে গেলেই আমরা এমন একটা খণ্ডধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া ফেলি, যাহা আপনাকে গণ্ডীবদ্ধ করিয়া সমগ্র জগৎ, সম্পূর্ণ জীবনকে আপনার মধ্যে সম্যক্ ভাবে আলিঙ্গন করিতে অসমর্থ করে; আবার কর্ম্ম করিতে ছুটিলেই বিদেশানীত কর্ম্মপ্রণালীকেই বরণ করিয়া লইয়া, অসার আন্দোলনে শক্তির অপব্যয়মাত্র করি। কে বলিবে, কোন্ অভিশাপে ভারতবাসী পূর্ণ দৃষ্টি ও পূর্ণ শক্তির অধিকারী হইয়া উঠিতেছে না? ভারতের ব্রত সম্বন্ধে একটা পূর্ণতর জ্ঞানের প্রয়োজন। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক-ইতিহাস এ জ্ঞান প্রদান করিতে পারে না—সে ইতিহাস ত শুধু বাহ্যঘটনারাশির সঙ্কলন ও তাহা হইতে ভাসমান সাধা-

রূপ সূত্রের আবিষ্কারমাত্র। শাস্ত্রদৃষ্টি, মনীষীর গভীর অন্তর্দর্শন ও সূক্ষ্মগবেষণা—এ সকলও পর্য্যাপ্ত নহে। মনীষার দ্বারা, হৃদয়ের দ্বারা, মনের দ্বারা যত খানি আত্মপরিচয় ঘটা সম্ভব, তাহাত হইয়াছে। একটা কথা মনে রাখিতে হইবে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণরূপে যে মহাশক্তি ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া নবীনযুগের প্রথম ভিত্তি স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন সেই অনন্ত ভাবাধার হইতে দুইটী বিপুল ভাবধারা গ্রহণ করিয়া--স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বঙ্গের জাতীয় জীবনে সঞ্চারিত করিয়াছেন। জ্ঞানমূর্ত্তি-স্বামিজী এই জাতির তমসাচ্ছন্ন মনীষা প্রবুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, ভক্তপ্রবর বিজয়কৃষ্ণ ভক্তিধারা ঢালিয়া বাঙ্গালীর হৃদয়ে সেই বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীচৈতন্যের লুপ্ত সম্বিৎ পুনর্জ্জীবিত করিয়া গিয়াছেন। প্রধানতঃ এই দুই মহাপুরুষের তপঃ-শক্তিতে এবং বঙ্কিমের প্রতিভায় বাঙ্গালী আজ হৃদয়ে মনীষায় আত্মপরিচয় পাইয়াছে—আপনার জাতিত্ব, বিশিষ্টতা বুঝিয়াছে ; বুঝিয়াছে—"এই জগতের মাঝে বাঙ্গালীর একটা স্থান আছে, অধিকার আছে, সাধনা আছে, কর্ত্তব্য আছে, বুঝিয়াছে বাঙ্গালীকে প্রকৃত বাঙ্গালী হইতে হইবে।" কিন্তু বাঙ্গালী আপনার হৃদয় মন চিনিয়াছে বলিয়া ভুলিলে চলিবে না, যে, সে এখনও পূর্ণ আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করে নাই। যে আত্ম-সাক্ষাৎকারে ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাহাকে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা শুধু হৃদয় ও মনের আত্ম-জ্ঞান নহে। তাইত আজ উপনিষদের সেই জলদগম্ভীর শব্দ কর্ণে আসিয়া প্রতিধ্বনিত হইতেছে—নেদং যদিদমুপাসতে—এই যাহাকে উপাসনা করিতেছ ইনি তাহা নহেন। সেই আত্মাকেই জানিতে হইবে—মন যাঁহাকে মনন করিতে পারে না, কিন্তু মনকে যিনি মনন করিয়াছেন—যন্মনসা ন মনুতে, যেনাহু র্মনো মতম্ তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি।

এই পূর্ণ আত্মজ্ঞান লাভ করিলে তবে ত কর্ম্ম জীবনে সেই পূর্ণশক্তির আবির্ভাব হইবে, তবেই ত খণ্ড খণ্ডভাবে রাজধর্ম্ম প্রজাধর্ম্মের মিথ্যাবিভাগ কল্পনা করিতে হইবে না, তবেই ত সত্যের সহিত অনৃতের সহিত আদর্শের সহিত বাস্তবের সহিত আপোষের ব্যবস্থা আর করিতে হইবে না। এই অমানিশার ঘোরে যখন চারিদিকে চাহিয়া দেখি, কোথাও ত পূর্ণ সত্যের, পূর্ণ আদর্শের পরিপূর্ণ তেজ, শক্তি, সাহস, দৃপ্ত হৃদয়বল দেখিতে পাই না—সর্ব্বত্র সঙ্কোচ, সর্ব্বত্র শুধু ভয়ে ভয়ে আদর্শকে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর, তরল হইতে তরলতর করিয়া বাস্তবের সহিত আপোষ করাইবার প্রয়াস। সত্য আদ-

র্যের সে বিশ্ববিজয়িনী মূর্ত্তি আসিবে কোথা হইতে? মানুষের চিন্তাশক্তি, মানুষের কল্পনা, এমন কি মানুষের হৃদয়ও সে শক্তি প্রদান করিতে পারে না। মানুষকে বীর্য্য দেয়, চরিত্রের অপরিমেয় অপরাজেয় বল দেয় বুদ্ধি নহে, মেধা নহে, হৃদয়ও নহে—মানুষ অসম্ভবকে সম্ভব করিতে উত্থিত হয় যখন জীবন্ত কোনও তপোমূর্ত্তি পুরুষসিংহের দুর্জ্জয় তপঃ-শক্তি তাহার মধ্যে সঞ্চারিত হয়। বাঙ্গালীকে আজ সর্ব্বাগ্রে এই তপঃ-শক্তিরই আধার হইতে হইবে। বাঙ্গালী! তপঃ-শক্তিকে বিশ্বাস কর না? দেখিতেছ না, কতটুকু তপঃ-শক্তি লইয়াই বিদেশিনী বেসান্ত ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বুকে একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ সংক্রামিত করিয়া দিলেন? তপস্যার ক্ষীণ কণিকার প্রভাব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াও পূর্ণ-তপঃ-শক্তিতে শ্রদ্ধাবান হইবে না? আজ যে আর এতটুকু শক্তির অপব্যয় করিবার দিন নাই—অসার প্রবচন, মেধা, তর্ক যুক্তির দিন যে চির দিনের জন্য চলিয়া যাইতেছে। ঠাকুর বীর-ভক্ত গিরিশচন্দ্রকে যে বকলমা মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন—আজ যে সমগ্র জাতিটার প্রতিই কোন্ নিভৃত বিশ্বকেন্দ্র হইতে জলদ-গম্ভীর সেই আদেশই আসিয়া পড়িয়াছে। একটা জাতিগত বকলমা—জাতিগত আত্মসমর্পণ ভগবান্ চাহিয়াছেন—সে আদেশ শিরোধার্য্য করিতে পারিলেই সে উৎসর্গ সম্পূর্ণ হইলেই এই দারুণ অমারজনীর ঘোর সূর্য্যোদয়ে অচিরে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে, অনতিবিলম্বে ভবিষ্যতের রুদ্ধ সিংহ-দ্বার ঝনৎকার শব্দে উন্মোচিত হইয়া যাইবে, পার্থসারথী আপনিই এই চিহ্নিত জাতির কর্ম্মপন্থা নির্দ্দেশ করিয়া চলিবেন।

লীলা

(৪)

প্রতিদিন প্রভাতে পূর্ব্বগগন রাঙ্গা করিয়া যে অখণ্ড মণ্ডলাকার মার্ত্তণ্ডদেব সমুত্থিত হন এবং ক্রমে গড়াইয়া গড়াইয়া অনন্ত আকাশের পশ্চিম প্রান্তে ডুবিয়া যান, উহা ভগবানের খেলা—শিশিরসিক্ত ফুলগুলি বাতাসে দুলিয়া দুলিয়া যে সুবাস বিতরণ করে উহাও ভগবানের খেলা—মানুষের হর্ষ

বিষাদ, ক্রোধ ভয়, জগতের যতকিছু ঘটনা—এ সকলই তাঁর লীলামাত্র। জগতের দৃশ্য অদৃশ্য সকল বস্তুই তাঁর ক্রীড়নক। এই লীলাতত্ত্ব সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিবার জন্য সাধককে সর্ব্বপ্রথমেই আত্মসমর্পণের সঙ্কল্প করিতে হয়। আত্মসমর্পণই অধ্যাত্মযোগের প্রথম মন্ত্র।

মানুষের অন্তঃকরণে কোন আশা কোন আকাঙ্খা কোন আদর্শ দৃঢ়-মূল থাকিতে আত্মসমর্পণ সার্থক হইতে পারে না। মানুষের ষোলআনা মন এক করিয়া পরাৎপর পুরুষের হস্তে আপনাকে উৎসর্গ করিতে হইবে। হৃদয়ের সবটুকু শক্তি একত্র করিয়া এই মহাব্রত আরম্ভ করিতে হইবে। ভগবান্ জানেন তিনি আমার আধার লইয়া কোন্ খেলা খেলিবেন, তাঁর বিচিত্র লীলার কোন্ অংশ অভিনয় করিবেন।

জগদ্‌রঙ্গমঞ্চে যে যাহা সাজিবার একাগ্রতা প্রকাশ করে, হয়ত ভগবান্ দয়া করিয়া তাহাকে উহা অভিনয় করিবার অবসর দেন, কিন্তু সে স্বরূপতঃ যে অঙ্গ অভিনয় করিবার উপযোগী তাহা যেমন সম্পূর্ণ প্রীতিপ্রদ হইবে তেমন আর কিছুতেই হয় না। ত্রৈলঙ্গস্বামী যাহা সাজিয়াছিলেন, গুরু নানক যাহা সাজিয়াছিলেন, রামমোহন রায় যাহা সাজিয়াছিলেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, বিবেকানন্দ প্রভৃতি যাহা সাজিয়াছিলেন আর কেহ উঁহাদের অভিনয় চাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ঐরূপ লীলা করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলে তাহাকে যে ব্যর্থ জীবন লাভ করিতে হইবে ইহা বলাই বাহুল্য। মন্দের লালসাও লালসা, ভাল'র লালসাও লালসা, লালসাপরবশ কোন কার্য্যে অগ্রসর হওয়া অকর্ত্তব্য—পূর্ণযোগী সেই জন্য অবহিত চিত্তে আপনার সর্ব্বস্ব ভগবৎ-চরণে উৎসর্গ করিয়া পরম শান্তি লাভ করে, কেননা সে জানে তাহাকে যদি "রমে কেব্‌লা রেমো শেমো" সাজিতে হয় সেও তার প্রভুর ইচ্ছা, আবার তাহাকে যদি বুদ্ধ চৈতন্য শঙ্কর রামানুজ সাজিতে হয় সেও সেই শ্রীভগবানের ইচ্ছা। আত্মসমর্পণযোগীর অন্তরে সর্ব্বদাই সমতা ও শান্তির বিমল জ্যোতি প্রতিভাত থাকে।

আত্মসমর্পণ যোগীর কোনই দাবী থাকিবে না। তাহার আধার লইয়া ভগবান্ যাহা করিবেন তাহাই হইবে। যে সাধক আত্মসমর্পণ মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করে ভগবান্ কল্পতরু হইয়া তাহাকে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করেন—সেই ভগবানের লীলার সাথী হইয়া অনাদি অনন্ত কাল অনন্ত সৃষ্টির মঞ্চে

মহানন্দে জীবন্মুক্ত হইয়া বিচরণ করে।

আমরা যখন আত্মসমর্পণসাধনায় অগ্রসর হই তখন আমাদের অন্তঃকরণে জন্মজন্মান্তরের অশুদ্ধ সংস্কার স্তূপাকার হইয়া থাকে, পুরাতনের প্রতি প্রবল অনুরাগ থাকে, ইন্দ্রিয়াদির স্বভাববশতঃ পার্থিব বস্তুনিচয়ে আসক্তি থাকে—এই সকল নানাবিধ অশুদ্ধতা হইতে জীবনের যাবতীয় যন্ত্রগুলিকে পরিশুদ্ধ করিতে না পারিলে সচ্চিদানন্দের অধিকারী হওয়া যায় না। অন্যান্য যোগপন্থায় নানাবিধ প্রণালী অবলম্বনে এই শুদ্ধি বিধান করিতে হয়, কিন্তু আত্মসমর্পণযোগীর আধারের সকল প্রকার অশুদ্ধতা দূর করেন স্বয়ং ভগবান্। কায়মনোবাক্যে লীলাময় শ্রীহরির হস্তে আত্মোৎসর্গ করার পর ভগবৎ-শক্তি কিরূপে আধারকে পরিশুদ্ধ করিয়া তুলিতেছেন, জীবকে দ্রষ্টারূপে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়।

ইহা সাধনার দ্বিতীয় স্তর। এই অবস্থায় সাধককে নিরতিশয় ধৈর্য্য ও সাহস অবলম্বন করিতে হয়। জীবনের উপর দিয়া কত বিপদ, কত ক্লেশ, কত লোমহর্ষণ ঘটনাবলী একে একে উপস্থিত হইবে—ধীরে ধীরে সেগুলি অপসারিত হইবে—আবার আসিবে—আবার যাইবে, এইরূপ পুনঃ পুনঃ প্রিয় অপ্রিয় বহুবিধ ঘটনার আবর্ত্তনে জীবন যায় যায় হইবে—তত্রাচ সাধক অটল ভূধরের মত নিরুদ্বেগে অবস্থান করিবে, মনে রাখিবে অশুদ্ধতার কণামাত্র বিদ্যমান থাকিতে প্রকৃতিশক্তি আধার যন্ত্রকে অস্থির করিয়া তুলিবেন। নানাবিধ অশুদ্ধতা হইতে মুক্ত করিয়া তোলাই তাঁহার উদ্দেশ্য। জীবন মরণ পণ করিয়া এই সাধনপথে অগ্রসর হইতে হইবে। অবিচল শ্রদ্ধাসম্পন্ন না হইলে জগদীশ্বরের হস্তে আপনাকে উৎসর্গ করিয়া যোগের এই দ্বিতীয় পর্য্যায়ে স্থির থাকা একেবারেই অসম্ভব।

সকল অশুদ্ধতার অপেক্ষা সংশয়ই খুব বড় অশুদ্ধতা। চতুর্দ্দিকে যখন আকাঙ্খা উদ্বেগ অশান্তি আসিয়া জীবনকে বিপন্ন করিয়া তুলে তখন মনে হয়—এই বার বুঝি বিনষ্ট হইব, আর উপায় নাই—এইরূপে ভগবৎ বিশ্বাস হারাইয়া অনেকেই এই অবস্থায় স্বীয় অহঙ্কারপরবশ সমাগত অপ্রিয় ঘটনাবলীর নিরাকরণমানসে সচেষ্ট হইয়া উঠে, অহঙ্কারের পূর্ণলীলা চলিতে থাকে—সাধক যোগচ্যুত হয়।

অহঙ্কারের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন করিবার জন্যই কালী-শক্তি জীবের চতুর্দ্দিকে প্রলয় আগুন জ্বালিয়া দেন, জীব তখন আত্মসমর্পণ মন্ত্রে সিদ্ধ

হইয়া যদি স্মরণ রাখিতে পারে—"মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি" তবেই রক্ষা, নতুবা যোগ ভঙ্গ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। মনে রাখিতে হইবে—আত্মসমর্পণ করিয়াছি আমার জীবনের সকল অশুদ্ধতা দূর করিবার জন্য যত বড় ভীষণ ঘটনাই সৃষ্টি হউক না—মরণের কুলাল-চক্রে নিষ্পেষিত হই না—আমার কি! আমার হৃদয় মন তাঁহারই চরণ-তলে সমর্পণ করিয়াছি; তিনি ইচ্ছা করেন রক্ষা করিবেন, তিনি ইচ্ছা করেন বিনষ্ট হইব—এইরূপ অটুট বিশ্বাসে যোগপথে যিনি অগ্রসর হইবেন তিনি নিশ্চয় এই অধ্যাত্মযোগে সিদ্ধিলাভ করিবেন—একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়।

তবে এই অবস্থায় সাধক অনবরত মনে রাখিবেন যে ভগবানই সাধকরূপে আমার মধ্যে কার্য্য করিতেছেন—তাঁর সুমহান চেষ্টার তুলনায় আমার ক্ষুদ্র চেষ্টা অতি অকিঞ্চিৎকর—এইরূপ নিয়ত ধারণার ফলে নিশ্চয়ই অহঙ্কার দূর হইবে এবং অনতিকাল মধ্যেই ভগবানের করুণা উপলব্ধি করিয়া সাধক পরমানন্দে বিভোর হইবে। যখন ভীষণ ঝটিকাবর্ত্তে জীবন-তরী নিমগ্ন হয় হয় এইরূপ মনে হইবে তখনও সাধক উচ্চকণ্ঠে বলিতে থাকিবে—"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহংত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

আমি সকল ধর্ম্ম, সকল পন্থা, সকল উপায়, সকল সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া হে ভগবান তোমাতেই আশ্রয় লইয়াছি—তুমিই আমায় সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত কর, আমায় অভয় দাও। তুমি ত নিজ মুখেই বলিয়াছ—"মা শুচঃ" দুঃখ করিও না, ভীত হইও না—আমিই তোমায় মুক্ত করিব"। আমায় বিপদ মুক্ত কর।

এইরূপ সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানের নিকট নিয়ত প্রার্থনা করিবে। তোমার বিপদ কি? তোমার আবার চেষ্টা যত্ন কি? তুমি কতটুকু, তুমি ভগবদ্ বিধানের কোন অংশ পরিবর্ত্তন করিতে পার কি? তুমি যখন আত্মসমর্পণ করিয়াছ তোমার যখন মনে কোনরূপ আর সংশয় নাই—তখন আর তোমার দায়িত্ব-জ্ঞান কিসের জন্য? যিনি দেবতা সর্ব্বভূতের অধীশ্বর যিনি অনন্ত জগতের একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা—তিনিই তোমার কর্ত্তা, তিনিই তোমার দেবতা—তোমার ক্ষুদ্র দেহযন্ত্রের তিনিই যন্ত্রী। জীবনের উপর যত বড় বিপদই আসিয়া পড়ুক, যত বড় উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হও, যত বড় পাপই তোমায় ঘিরিয়া রাখুক, ব্যস্ত হইও না, স্মরণ কর—অহংত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়ি

ষ্যামি মা শুচঃ”। ওগো অপদার্থ ক্ষুদ্রবুদ্ধি অবিশ্বাসী! শ্রীমুখের এই আশ্বাস বাণী শুনিয়াও কেন অহঙ্কারের প্ররোচনায় অলীক তপস্যাদি সাধনা-ভজনের ক্রীতদাস হইতে ছুটিয়াছ—একবার কায়মনোবাক্যে পরাৎপর পুরুষের হস্তে আত্মোৎসর্গ করিয়া বীরের মত কেবল দেখিয়া যাও, হিমালয়ের মত বিরাট অশুদ্ধতার বোঝা ভগবানের করুণায় অপসারিত হইয়া তুমি আনন্দ নিলয়ে পরিণত হইতেছ—যতক্ষণ অশুদ্ধতা থাকিবে ততক্ষণ দ্বন্দ্ব, ক্লেশ, যন্ত্রণা,—এই অশুদ্ধতার নিরসনে তুমি যে অমৃতের খনিতে পরিণত হইবে ইহা একবার স্মরণ কর।

যোগের এই দ্বিতীয় স্তরে দাঁড়াইয়া বিরাট বাধার সহিত তুমি যুদ্ধ করিবার প্রয়াস করিও না; তুমি এ ক্ষেত্রে দ্রষ্টা মাত্র। নিতান্ত বিচলিত হইলে ভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে নির্ভর করিবে—এই যোগপন্থায় যাঁহারা কথঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহাদের সঙ্গ লাভ করিবে। মনে রাখিও এই আত্মসমর্পণ যোগ শুনিতে যত সরল ও সহজ, সাধন পথে অগ্রসর হইলে আর সেরূপ বোধ হইবে না; আত্মসমর্পণ করিয়াছি বলিলেই যদি জীবন পবিত্র হইয়া যাইত তাহা হইলে আর ভাবনা থাকিত কি? জীবনটা ইন্দ্রজাল নহে। যেরূপ করিয়া পবিত্র জীবনে তিল তিল করিয়া অহঙ্কারের বিরাট মূর্ত্তিকে সৃষ্টি করিয়া দুঃখ পাইতেছ সেইরূপ ধীরে ধীরে তিল তিল করিয়াই তোমার অহঙ্কার চূর্ণ হইবে—প্রতি আঘাতে মনে হইবে বটে যে এইবার বুঝি বিনষ্ট হইলাম কিন্তু ভগবদ্ বাণী মনে রাখিও—তিনি জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিতেছেন “ভয় নাই, ভয় নাই, আমি তোমাকে অহঙ্কার হইতে মুক্ত করিব। মা শুচঃ”।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, শিলচর।

মান্যবর কামিনী কুমার চন্দ মহাশয়ের অধিনায়কত্বে উক্ত সমিতি পরিচালিত। ইহার কথা আমরা পূর্ব্বে পাঠকগণকে জানাইয়াছি। এক্ষণে সভাপতি মহাশয় এই সমিতির একটী স্থায়ী আশ্রম নির্ম্মাণকল্পে এক আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। ২২ বিঘা জমির উপর শিলচর হইতে তিন মাইল দূরে রামকৃষ্ণপুরের সুদৃশ্য টিলার উপর এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইবে। একটী দাতব্য ঔষধালয় এবং আশ্রমের সন্ন্যাসিগণের বাসোপযোগী করিয়া ইহার নির্ম্মাণার্থে প্রায় ৫০০০৲ টাকা খরচ হইবে। এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে সকলেরই সাহায্য করা কর্ত্তব্য; যাঁহারা অর্থ-সাহায্য করিবেন অতি সামান্য হইলেও উক্ত সমিতির সভাপতি মান্যবর শ্রীকামিনীকুমার চন্দ মহাশয়ের নামে পাঠাইবেন।

প্রবর্ত্তক—২য় বর্ষ, ১৪শ সংখ্যা

"হোমরুল"

ভারতের বিধাতৃপুরুষগণ তাহাদের সত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যখন বর্ত্তমান মরণ-যজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে দিতে প্রতি মুহূর্ত্তে সিদ্ধির প্রতীক্ষা করিতেছেন, তাহাদের এই দারুণ উৎকণ্ঠার সময়ে প্রজার জাতি আমাদের নীরব থাকাই শ্রেয়ঃ; কিন্তু শ্রীভগবানের অসংখ্য প্রেরণারাজি মানুষের হৃদয় মনকে যে অবিরত মথিত ও আন্দোলিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে তাহার তাড়নায় অস্থির না হইয়াই বা সে কি করিবে? তাই বিদেশিনী বাসন্তি বিবি যুদ্ধারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে "হোমরুল" আন্দোলন প্রকট করিয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সে আজ এক যুগের কথা—যে দিন বাঙ্গালীমাত্রেই বঙ্গভঙ্গে ব্যথিত হইয়া এক বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল—একই কেন্দ্র হইতে বিধাতার অমর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া বাংলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা স্বদেশী ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিল। কার্য্যক্ষেত্রে কিন্তু এই স্বদেশ-প্রেমের খরতর প্রবাহ বাঙ্গালীকে বিভিন্নমুখী করিয়া তুলিল। ১৯০৭ সালে দেশনেতৃগণ সুরাট জাতীয় মহাসভায় দুই পক্ষে বিভক্ত হইলেন, পরলোকগত ফিরোজ সা মেঠা ও দিনসা ওয়াচা, মদন মোহন মালব্য, রাসবিহারী ঘোষ, দেশনায়ক সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি, দেশের কতক শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া এলাহাবাদে কনভেনশনের সৃষ্টি করিলেন।

যে উৎসাহে যে ত্যাগের মহামন্ত্রে বাঙ্গালী জাতি কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিল, নেতৃমণ্ডলীর অদূরদর্শিতার জন্য এবং পরস্পর মতবিরোধের গণ্ডগোলে তাহা লোপ পাইতে চলিল, দেশের শক্তি সুনিয়ন্ত্রিত না হইয়া, পাশ্চাত্য শিক্ষার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম বিপ্লববাদ এবং এনার্কিজমে দেশ ভরিয়া উঠিল। আজ বাংলা দেশের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার জন্য আমরা জানতঃ কাহারও অপরাধ না দেখিলেও, বস্তুতঃ দেশের নেতৃমণ্ডলীই যে তজ্জন্য অধিকতর দায়ী একথা নিঃসন্দেহে বলিব।

অধুনা বাসন্তির অন্তরীণে এবং কলিকাতার মহাসভার নিবারণে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে যে তরঙ্গের প্রবাহ বহিতেছে তাহা অভিব্যক্ত

করিবার কি উপায় করা যাইতে পারে এতদ্‌সম্বন্ধে রাজনীতিক ধুরন্ধরগণ মহাভাবনায় পড়িয়াছেন—সে দিন শতাধিক হিন্দুমুসলমান নেতৃমণ্ডলী দুই ঘণ্টা বাক্‌বিতণ্ডার পরও কোনরূপ মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন নাই, শুনা যায় ১৪ ই আগষ্ট পুনরায় এতদ্‌বিষয়ের আলোচনা হইবে।

স্বদেশী যুগের প্রবল আন্দোলনে আমরা বাংলার ব্যক্তিগত চরিত্রের আভাব পাইয়াছি। আজ রাজনীতিক ক্ষেত্রে যে প্রবল ঝটিকার উৎপত্তি হইয়াছে ইহার সুমীমাংসা করিতে হইলে আমাদের নেতৃগণের মধ্যে যে সাহস যে ত্যাগ যে চরিত্র থাকা আবশ্যক তাহা আছে কিনা প্রকাশ না দেখিলে বলিতে পারি না; তবে বাংলার "হোমরুল" সভার মেরুদণ্ড সুপণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ, ব্যবহারজীবী ব্যোমকেশ, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি, দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথেরই মুখ পানে চাহিয়া আছেন। বৃদ্ধ মতিলাল জীর্ণ শরীর লইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সুরেন্দ্রনাথকে এই 'হোমরুল' তরঙ্গে জাতির জীবন-তরণীর কর্ণধাররূপে দেখিতে পাইতেছেন না বলিয়া ব্যথিত, চতুর পাঁচকড়ি "মামার জয়" দিতেছেন। আজ মহা সমস্যা সুরেন্দ্র নাথের—, রাজনীতিক ক্ষেত্র ক্রমাগত জটিলতর হইয়া উঠিতেছে—সুরেন্দ্রনাথ আজন্ম অনেক তরঙ্গ কাটাইয়া পথ চলিয়াছেন, আজ তিনি বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য কি ভাবে নির্দ্ধারণ করিবেন তাহা দেখিবার জন্ত অনেকেই উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া আছে।

বাঙ্গালীর এই কঠোর সমস্যা সমাধানকালে আমরা গোটা কয়েক কথা বলিয়া রাখি। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালায় যে দেশব্যাপী আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল—তাহার কারণ কি? এবং কাহারাই বা এই বিরাট্‌ আন্দোলনের অগ্রণী ছিলেন? জাতিগত আদর্শ বা উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া যাঁহারা সে যুগে আমাদের পুরোভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিশেষভাবে শিক্ষিত এবং পাশ্চাত্য ভাবেরই উপাসক—পাশ্চাত্যের যে সাধারণ তন্ত্র, যার অনুগত হইয়া য়ুরোপ মনুষ্যজাতির মধ্যে সত্যযুগের (millennium) প্রতিষ্ঠা করিতে সচেষ্ট—তাহারই অনুকরণে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্ত য়ুরোপেরই মাল মশলা লইয়া নেতৃগণ কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর সকল চেষ্টার চরম ফল বাংলার স্বদেশী আন্দোলন—জাতীয় চরিত্রের উপযোগী অনুষ্ঠানের অভাবেই আমাদের তত বড় ত্যাগ ও কর্ম্ম একেবারে ব্যর্থ না হইলেও বিশেষ ফলপ্রদ হয় নাই।

এই যে মন্ত্রীসভায় লাট দরবারে আমাদের সমধিক বিস্তৃতি, রাজকার্য্য পরিচালনায় আমাদের কর্ত্তৃত্ব, স্বায়ত্ত-শাসন, যেগুলির জন্য আমরা অমানুষিক পরিশ্রম ও অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করিতেও দিন দিন প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছি; উহা পাশ্চাত্যেরই আকাঙ্খিত সামগ্রী। পরন্তু প্রাচ্য উহাতে কতটা শ্রেয় লাভ করিবে সে বিষয়ে আমাদের নেতৃমণ্ডলীর বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। আমরা য়ুরোপীয় অনুকরণে সাধারণ তন্ত্র লাভ করিবার উপায়-গুলি অথবা পাশ্চাত্যের আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। ভারতবর্ষ যদি ইংলণ্ড হইত, অষ্ট্রেলিয়া ক্যানাডা হইত তাহা হইলে ইহাই আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান বলিয়া স্বীকার করিতাম কিন্তু ভারতবর্ষ প্রাচ্যের কহিনুর; ইহার একটা স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষ বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া চলাই ভারতবাসীর তপস্যা হওয়া উচিত। বর্ত্তমান রাজনীতিক ক্ষেত্রের যে কুটীলতা, যে দুঃখ কষ্ট দ্বন্দ্ব তাহার নিরাকরণ হইতে পারে যদি আমরা স্বায়ত্ত শাসন পাই, যদি আমরা লাট-দরবারে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারি, যদি আমাদের দেশের শাসন ব্যাপারে আমরা কর্ত্তৃত্ব লাভ করি কিন্তু ইহাইত ভারতের সবখানি নয়। য়ুরোপীয় প্রভাবের বাহিরে দাঁড়াইয়া একবার দেখ দেখি ভারতবর্ষ বিধাতার নির্দ্দেশে কোন্ উদ্দেশ্যে জাগিয়া উঠিতেছে! আজ যে সাধারণ তন্ত্রের মোহন বাঁশি পাশ্চাত্যের রণপ্রাঙ্গনে ধ্বনিত হইতেছে তাহার উপায় নির্দ্দেশ করিবে ভারতবর্ষ। সমগ্র জগৎ রাজনীতি সমাজনীতি প্রভৃতির মধ্যে যে নূতন জীবন আরোপ করিবার বাসনা করিতেছে তাহা স্বাধীনভাবে সফল করিবে ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষই জগতের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া যে সিদ্ধমন্ত্র প্রদান করিবে তাহার বিদ্যুৎ প্রভাবে অনন্ত কোটী পৃথিবীর প্রজা এক প্রেমের রাজ্য সৃষ্টি করিয়া তুলিবে। আমরা বলি ভারতবর্ষের যিনি নেতা গুরু পথ-প্রদর্শক, তিনি পটান্তরালে অপেক্ষা করিতেছেন; পুরাতনের শেষাংশ অভিনয়ের অবসানে তিনিই প্রকট হইয়া ভারতকে নূতন পথে পরিচালিত করিবেন।

আমরা তাই এই মহাসন্ধিক্ষণে আপনার মধ্যে যে অমর বীর্য্য আছে, যে অসীম শক্তি আছে তাহা জাগ্রত করিয়া তুলিবার জন্য তপঃপরায়ণ হইতে সকলকে অনুরোধ করি। মায়ামুগ্ধ হইয়া অসার বস্তুর জন্য জীবনের সামান্য ত্যাগও ক্ষতি বলিয়া মনে করি, আপাতমধুর অলীক কুহকে আচ্ছন্ন

হইয়া ভারতের যে অপার্থিব ঐশ্বর্য্য আছে তাহা হইতে বঞ্চিত যেন কেহ না হয়। শ্রীভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আত্মশক্তির উন্মেষ সাধনের জন্য প্রত্যেকেই স্ব স্ব আবাসে বসিয়া তপঃ তপঃ শব্দে বাংলার আকাশ প্রান্তর মুখরিত করিয়া তোল, মেরুদণ্ডে সে বিদ্যুৎশক্তি প্রবাহিত না হইলে তুমি একটা তৃণখণ্ডকেও দু'খণ্ডে বিভক্ত করিতে পার না। সর্ব্বাগ্রে এই শক্তি উপাসনায় আত্মনিয়োগ কর—সময় আসিলে পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনিতে জগতের নেতা শ্রীকৃষ্ণ আপনি আসিয়া তোমায় বলিবেন—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"

উৎসর্গ

ভারতবর্ষ নিতান্তই ইহবাদী হইয়া পড়িয়াছে। অর্থ সামর্থ্য ও নশ্বর শরীরের উপরেই ইহবাদীর ধর্ম্ম ও কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। এই সকলের অভাব ঘটিলে মানুষ জড়ের মত অবস্থান করে। কিন্তু আজ ভারতবর্ষকে দেখাইতে হইবে ঐহিক ঐশ্বর্য্যের উপর তাহার জীবন নির্ভর করে না, আত্মবিধৃত সত্বাই হইতেছে তাহার সবখানি। এই মহা সত্যের উপরই বরং পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য বিধৃত হইয়া আছে।

আমাদিগকে বর্ত্তমান অসত্য ধারণা হইতে মুক্ত হইতে হইলে আত্মোৎসর্গকেই সর্ব্বাগ্রে অবলম্বন করিতে হইবে। বৃন্দাবনে যে লীলার আরম্ভ, কুরুক্ষেত্রে যাহার অঙ্কুর সে ধর্ম্মযুগকে প্রকট করিয়া তুলিতে হইবে এই কলিযুগে। ভগবদ্‌ভক্তগণ দ্বারাই এই ভাগবতলীলা পরিপূর্ণ হইবে।

ভারতের মহাতীর্থ বৃন্দাবনে শ্যামরায়ের মধুর আহ্বানে বিভোর হইয়া ব্রজের গোপীগণ একদিন শ্রীকৃষ্ণের চরণে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। আত্মসমর্পণযোগের সে এক সুন্দর নিদর্শন।

যোগের প্রধান তিনটি পর্য্যায় আছে। তপোনিরত ব্রজাঙ্গনাদিগের জীবনের উপর দিয়াও তরঙ্গাকারে এই তিনটি অবস্থা পর্য্যায়ক্রমে প্রবাহিত হইয়াছিল। সে তরঙ্গের প্রতি আঘাতে তাহারা কখন আনন্দে কখন বিষাদে কখন আশায় কখন নিরাশায় হাবুডুবু খাইয়াছিল, কিন্তু এই "উগ্র নামা প্রেমের তুফানে"

তাহাদিগকে আত্মসমর্পণের সঙ্কল্পচ্যুত করে নাই। কলনাদিনী যমুনার পবিত্র তটে দাঁড়াইয়া শিখিপাখাধারী মুরলীধরের চরণে গোপীগণ সর্ব্বস্ব সমর্পণের সঙ্কল্প মাত্র করিয়াছিল, তাহাদের গৃহ দেবতা পতিপুত্র ধনজন জীবন যৌবন সকলই যে তাঁহারই প্রীতির জন্য এ কথা স্বীকার করিয়াছিল—ইহাই যোগের প্রথম পাদ। কিন্তু অগ্নিপরীক্ষায় এই কথা সত্যে পরিণত হওয়া চাই—এই পরীক্ষার কালই যোগের দ্বিতীয় পর্য্যায়।

শ্রীভগবৎ-চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিবার পর সাধকের অহঙ্কারে যখন প্রতিমুহূর্ত্তে আঘাত পড়ে, তখন জীবন কিরূপ বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠে তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন; গোপবালাগণও শ্রীকৃষ্ণের হস্তে আত্মোৎসর্গের সঙ্কল্প করিয়াই শুদ্ধ ও মুক্ত হইতে পারেন নাই—তাহাদেরও হৃদয়ে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, সাধনপথে অগ্রসর হইয়া প্রতিপদে গতানুগতিক পন্থার বিপরীত আচরণ করিতে গিয়া তাহাদেরও জীবনে প্রবল ঝড় বহিয়াছিল, তাহাদেরও স্থির শুদ্ধ শান্ত জীবনপ্রবাহ উজান পথে ছুটিয়া চতুর্দ্দিকে মহা বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই সকল বিক্ষোভের প্রতি আঘাত অতি অপ্রিয় হইলেও শ্রীভগবানের প্রীতিসম্পাদনার্থে যাহারা উহা হাসি মুখে বরণ করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল তাহারাই যোগের এই দ্বিতীয় পর্য্যায় অতিক্রম করিতে পারিয়াছিল। আত্মসমর্পণযোগের দ্বিতীয় স্তরটাই কঠোর ও দুঃখময়। এই অবস্থাতেই দুঃখের যন্ত্রে নিষ্পেষিত হইয়া সাধককে অবিচল থাকিতে হয়। আপনার জন্মার্জ্জিত স্বভাবের আমূল পরিবর্ত্তনে, স্থায়ী সুখ বিলাসের সহসা তিরোধানে, দৃঢ়মূল ধারণা ও উদ্দেশ্যের বিসর্জ্জনে জীবনের কেন্দ্রস্থ সকল আর সকল আশা সকল সহায়ের বন্ধন হইতে সাধককে মুক্ত হইতে হয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সমাজ ধর্ম্ম রীতি নীতির বিপরীত আচরণও করিতে হয়, দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্রজবালাগণের দ্বিতীয় পর্য্যায়ের কয়েকটা অবস্থার কথা আলোচনা করা যাউক।

স্ফুট জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নীরব নিশীথে যমুনাতীরবর্ত্তী দুর্গম বনভূমে কদম্বমূলে দাঁড়াইয়া রসরাজ শ্রীহরি বংশীবাদনে বৃন্দাবন মুখরিত করিয়া, বংশীর সুধাবিগলিত প্রতি মূর্চ্ছনায় যখন গোপীগণের হৃদয় মন আকর্ষণ করিতেছিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণসর্ব্বস্ব সঙ্কল্পপরায়ণা সরলা গোপীগণের মনে ভীষণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল; একদিকে গৃহ সংসার সমাজ ধর্ম্ম

অপর দিকে যাহাকে জীবনের সর্ব্বস্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাহার করুণ আহ্বান—কি কঠোর সমস্যা! এইরূপ ভীষণ অগ্নিপরীক্ষার অনেকেই অনুত্তীর্ণা হইল। প্রাণারামের সে মুরলীধ্বনী শুনিয়াও দুর্ভেদ্য সমাজ বন্ধনের কঠিন আবেষ্টনে অনেকেই আবদ্ধ রহিল। আর যাহারা বুঝিয়াছিল "শ্যামই হৃদয়রতনমণি আনন্দনিলয়," শ্যামই জীবনের সর্ব্বস্ব, শ্যামই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের আদি কারণ তাহারা সমাজবন্ধন গৃহ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ছুটিল সে বাঁশির সুর অনুসরণ করিয়া! তাহাদের কাণে বাজিতেছিল— "সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকম্ স্মরণং ব্রজ।
অহং ত্বাম্ সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ"॥

শ্রীকৃষ্ণের সমীপবর্ত্তী হইয়াও অনেকে সংশয়াচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। লজ্জা ঘৃণা ভয়ে অনেকের হৃদয় দুরু দুরু করিয়া কম্পিত হইতে লাগিল—তাহারা ভাবিতেছিল—ছিঃ ছিঃ কি করিলাম, কুলত্যাগিনী হইয়া এ কোথায় আসিলাম। এইরূপ অসমর্থা গোপীগণকে আহ্বান করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন "ছিঃ ছিঃ তোমাদের এ কি আচরণ--স্বামী পুত্র পরিত্যাগ করিয়া এই গভীর যামিনীতে কোথায় আসিয়াছ! ফিরিয়া যাও"। তাহারা ফিরিয়া গেল। ফিরিল না তাহারা, যাহাদের পাপ নাই, পুণ্য নাই, গৃহ নাই, ধর্ম্ম নাই, যাহাদের জীবন পৃথিবীর কোন অবস্থার উপর নির্ভর করে না পরন্তু যাহাদের জীবন দিয়া এইরূপ অনন্ত কোটী পৃথিবীর সৃষ্টি হয়। লীলাময় ভগবান্ এই সকল ভক্ত গোপীগণকে কঠোর আত্মসমর্পণ যোগের দ্বিতীয় স্তর এইরূপে অতিক্রম করাইয়াছিলেন। এইরূপ অনেক কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়া ব্রজগোপীদের চলিতে হইয়াছিল। সে এক দিন যে দিন তাহারা নির্জ্জন যমুনাতটে পরিধেয় বস্ত্রগুলি রাখিয়া গাত্রমার্জ্জনের জন্য যমুনাগর্ভে অবতরণ করিয়াছিল--শ্রীহরি অবসর বুঝিয়া সে বস্ত্রগুলি লুকাইয়া রাখিলেন—দেখাইলেন অন্তর বাহির এক করিয়াই আত্মসমর্পণ করিতে হয়। যোগের প্রথমাবস্থায় জীব, ব্রহ্ম এবং প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অনুভূত হইলেও পরিশেষে জীবকে ব্রহ্মস্থ হইতে হইবে। এইরূপ হইতে হইলে কেবল রূপ যৌবন জীবন ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ সামগ্রী উৎসর্গ করিলেই চলিবে না পরন্তু ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষ গুণগুলিকেও সমর্পণ করা চাই। নতুবা জীব কখন ব্রহ্মস্থ হইতে পারে না।

তাই আত্মসমর্পণের পর সাধককে দ্রষ্টা হইয়া দেখিয়া যাইতে হয়

ভগবান যাহা করিতেছেন। বিচিত্র ঘটনার সমাবেশে স্বোপার্জ্জিত সকল সৃষ্টি ঘাতপ্রতিঘাতে বিনষ্ট হইলেও সাধক স্থির থাকিবেন, কোন মতে ভগবৎ-কার্য্যে সংশয় প্রকাশ করিবেন না—সংশয়ই এই দ্বিতীয় স্তরে সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়। ভগবানের সকল কার্য্য নির্ব্বিকার চিত্তে অনুমোদন ও দর্শন করিতে করিতে সাধকের অহং দিন দিন ক্ষীণ হইতে থাকে, ক্রমশঃ স্বীয় স্বাতন্ত্র্য জ্ঞান তিরোহিত হইয়া সমতার বিমল পুলকে সাধক জাগ্রতে সমাধির আনন্দ উপভোগ করেন—ইহাই সাধনার তৃতীয় স্তর। জীব তখন ব্রহ্মস্থ হইয়া কেবল যে স্বীয় আধারের উপর পূর্ণ অধিকার বিস্তার করে তাহা নহে, জগতের বিচিত্র লীলার রহস্যদ্বার তখন সাধকের নিকট উদ্ঘাটিত হয়—সমগ্র জগতের যাবতীয় আনন্দ উপভোগ করিবার তাহার আর কোন অন্তরায় থাকে না।

আজ ভক্ত সাধকগণকে বুঝিতে হইবে ঐহিক ঐশ্বর্য্যের উপর তাহার জীবন নির্ভর না করিলেও এই সকল পার্থিব অন্ধ সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া তাহাকে সিদ্ধির পথে ছুটিতে হইবে, তাহার আত্মসত্বার উপর এই নূতন সৃষ্টিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যে পরিমাণে আমরা আমাদের অমর সত্বার প্রতিষ্ঠাকে লাভ করিব সেই পরিমাণেই নূতন স্বর্গরাজ্যকে তদুপরি প্রতিষ্ঠা করিব। আমাদের নূতন জগৎ আজ অতি ক্ষুদ্র হইলেও ইহাই তাহার পরিণাম নহে, এই সত্বার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের নূতন সৃষ্টি একদিন ত্রিজগৎ অধিকার করিবে—ইহা নিঃসন্দেহ জানিও।

রবীন্দ্রনাথ ও নেশনত্ব

রবীন্দ্রনাথ আজ দাঁড়াইয়াছেন নেশনত্বের বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রনাথ চাহেন বিশ্বমানবের মহাসম্মেলন কিন্তু ইহার মধ্যে নেশনের স্থান কি সার্থকতা কি তাহা খুঁজিয়া পাইতেছেন না, নেশন-ভাবটি বরং সে মহামিলনের পথে কুৎসিত কণ্টকরূপেই তাঁহার চক্ষে জাগিয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিতেছেন জগতে নানাত্ব থাকিবে থাকুক, বিভিন্ন জাতি বা জনসঙ্ঘ তাহাদের বিভিন্ন শিক্ষা দীক্ষা সভ্যতা লইয়া মানব সমাজকে সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যপূর্ণ ঐক্যতানে ভরপুর

করিয়া তুলিবে এ কথাও মানিয়া লইতে প্রস্তুত। ব্যক্তি যেমন সঙ্ঘও তেমনি প্রত্যেকে প্রত্যেকের বিশিষ্টতাটুকু ফুটাইয়া তুলিয়া ঐক্যের সামঞ্জস্যের মধ্যে শোভনাঙ্গ হইয়া উঠিবে—কিন্তু সে জন্য নেশনের প্রয়োজন কি? নেশনই ত এই আদর্শের একমাত্র বাধা। কারণ নেশন আর কিছুই নয়, তাহা হইতেছে জাতির মূর্ত্ত অহঙ্কার, সম্মিলিত প্রাণের পশুসুলভ উদ্দাম ভোগপরায়ণতা অত্যাচারপ্রিয়তা। যখন একটি জাতিকে এমনভাবে গড়িয়া তুলি যে সে চায় কেবল নিজেরই প্রতিষ্ঠা, যখন তাহার সমস্ত জীবনপ্রবাহ সমস্ত শক্তির ধারাগুলিকে এমনভাবে সাজাইয়া গুছাইয়া নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীভূত করিয়া তুলি যাহার উদ্দেশ্য হয় পরকে দমনে রাখা, বিশ্বের ঐশ্বর্য্যকে আত্মসাৎ করা তখনই জাতি ধারণ করে নেশনের বিকট রূপ। তাহার আশ্রয় তখন শুধু পশুবল আর চাতুরী। তখনই কুটিল রাজনীতি, ঘোর সৈন্যসম্ভার, অতিকায় ব্যবসা বানিজ্য তাহাদের সহস্র ফণা তুলিয়া চারিদিকে বিষ উদ্গিরন করিতে থাকে, নিজের জাতির যে প্রাণটি তাহাকেও আপন কুণ্ডলীমধ্যে ধরিয়া পিশিয়া ফেলে। পৃথিবীর যাবতীয় জাতি যদি মৈত্রীর মধ্যে সৌভ্রাত্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে চায় তবে সর্ব্বাগ্রে নেশনত্বটি দূর করিতে হইবে। নেশন যে চায় শুধু নিজেকে, পরকে সে সহ্য করিতে পারে না। আর নিজেকে যে চায় সে চাওয়াও শুধু বাহিরের জিনিষ, স্থূল বৈভব—জাতির, নেশনের অন্তর্ভুক্ত জনসঙ্ঘের যে স্বকীয় প্রতিভা, যে নিগূঢ় দীক্ষা, যে আধ্যাত্মিক বিশিষ্টত্ব তাহাকে যে চাপিয়াই রাখিতে তার চেষ্টা।

আমরা স্বীকার করিলাম নেশনত্বের এ সকল দোষ আছে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে অহঙ্কার জিনিসটি আদৌ কি? ইহার কি কোনই সার্থকতা নাই? আমরা মনে করি খুবই আছে, একটা গভীর সত্যকেই আশ্রয় করিয়া এই অহঙ্কারের খেলা। জগতে কোন জিনিষই একেবারে মিথ্যা বা নিরর্থক নয়, সব জিনিষকেই ভগবান্ সৃষ্টি করিয়াছেন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিবার জন্য, সব জিনিষের মধ্যেই ভরিয়া দিয়াছেন একটা সত্যপ্রাণ, একটা শ্রেয়স্করী প্রেরণা। অহঙ্কার হইতেছে ব্যক্তির বা ব্যষ্টির আত্মসত্বার জাগরণ চেষ্টা, নিজের নিজত্বটুকু, অপর হইতে নিজের স্বাতন্ত্র্যটুকু জাগ্রতভাবে ফুটাইয়া ধরিবার প্রয়াস। জগতে একটা ক্রমবিকাশ চলিয়াছে। প্রথম ধাপে হইতেছে প্রকৃতির অন্ধখেলা। মানুষ যখন তাহার

জীবন খেলা সবে আরম্ভ করিয়াছে তখন তাহার আত্মবোধ, তাহার বিশিষ্টতাটি থাকে যবনিকান্তরালে তমসাবৃত হইয়া—মানুষের কথা ছাড়িয়া দিলে সাধারণভাবে জীব-অভিব্যক্তির সম্বন্ধেও এই একই সত্য প্রযোজ্য। তখন তাহার জীবনে, জাগতিক লীলায় সে আত্মা সে বিশিষ্টতার একটা ছাপ থাকে বটে কিন্তু তাহা অস্পষ্ট, যেন একটা আবরণের মধ্য দিয়া দেখা দিতেছে, নিজেকে সে নিজে সাক্ষাৎভাবে দেখে নাই। সেখানে সবই তরল বাঁধনহীন আপনাহারা—গড্ডালিকাধারা। তাহা হইতেছে instinct এর প্রাকৃতিক প্রেরণার রাজ্য—প্রতিভার যাহা সৃজন, নূতন গড়ন তাহা কিছু সেখানে নাই। বাহুল্যকে অনাবশ্যককে কাটিয়া ছাঁটিয়া, জীবনের সকল সূত্র টানিয়া ধরিয়া একমুখী লক্ষ্যযুক্ত করিবার কোন প্রয়াস নাই। প্রকৃতির, স্বভাবের, সংস্কারের গতানুগতিক অভ্যাসের ফলে যে একটা সামঞ্জস্য গড়িয়া উঠিয়াছে অন্ধভাবে নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে তাহারই রেখায় রেখায় ঘুরিয়া ফিরিয়া চলাই তখনকার ধর্ম্ম কিন্তু জীবাত্মা যখন চায় ফুট হইয়া উঠিতে, নিজের জীবন জাগ্রতভাবে নিয়ন্ত্রিত পরিচালিত পরিবর্দ্ধিত করিতে, আপনার যে ভবিষ্যৎ যে অশেষ সম্ভাবনীয়তা তাহা তলাইয়া দেখিতে, তাহা কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে তখন সে তাহার নিছক প্রকৃতিদত্ত প্রকৃতিটি, তাহার স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্মগণ্ডীটি কাটাইয়া উঠে। তাহার মধ্যে উদ্বোধিত হয় বুদ্ধি বিচার, জাগিয়া উঠে অহংভাব। তাহার চেষ্টা হয় তখন জানিতে বোধ করিতে সে কি, সে কি হইতে পারে। বিশ্বের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া সে চায় তাহার নিজের পরিমাপ, তাহার নিগূঢ় ঈশ্বরত্বের পরিস্ফুরণ। আর তখনই সে হয় অসুর। চারিদিকে আপনাকে বিসারিত করিয়া দিয়া বীর্য বিক্রমে সকলকে মথিত করিয়া সে আপনার স্বাতন্ত্র্য, আপনার আত্মশক্তি, সত্তার পরিধির সহিত পরিচিত হইতে চায়, তাহাকে জাজ্বল্যমান করিয়া কর্ম্মজগতে প্রকট করিতে চায়। ফলে সে একটা আতিশয্য, অসামঞ্জস্য একটা বিরাট বিক্ষোভের সৃষ্টি করে বটে কিন্তু আত্মার মধ্যে সজাগভাবে পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য ইহা তাহার পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়—পার্থক্যকে, দ্বন্দ্বকে যত পরিস্ফুট করিয়া তুলিব নিজের সহিত ততই গভীর ততই জাগ্রত সম্বন্ধ স্থাপন করিব। ক্রমবিবর্ত্তনের এইটিই হইতেছে দ্বিতীয় ধাপ। তার পরের ধাপ হইতেছে মিলনের সামঞ্জস্যের। আত্মার স্বাতন্ত্র্যে প্রবুদ্ধ হইয়া, নিজের বিভূতির সমস্তখানি আলিঙ্গন করিয়া তখন জীব হৃদয়ঙ্গম

করে তাহার শক্তির একটা সীমা আছে, স্বাতন্ত্র্য অর্থ স্বেচ্ছাচার নহে। তাহার আছে শুধু বিশেষ ধর্ম্ম, বিশেষ কর্ম্ম, বিশেষ তন্ত্র; সেইটুকু পরিপূর্ণ করাতেই তাহার সব। সেই রকম অপর সকলেরও আছে একটা বিশেষ ধর্ম্ম, বিশেষ কর্ম্ম, বিশেষ তন্ত্র। প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের পার্থক্য থাকিলেও দ্বন্দ্বের কোন প্রয়োজন নাই। বরং পরস্পর পরস্পরের বৈশিষ্ট্যকে সাহায্য করিয়া উপচিত করিয়া জগতে একটা বিপুলতর মহত্তর সামঞ্জস্যেরই সৃষ্টি করিতে পারিবে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ, আত্মপ্রতিভাকে অটুট অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য একটা মাৎসর্য্যও অবশ্যম্ভাবী, এমন কি অবশ্য প্রয়োজনীয়। অকালসিদ্ধ ঔদার্য্য সৌহার্দ্দ্য হইতে স্বধর্ম্মকে অব্যাহত ভাবে সর্ব্ববিধ উপায়ে রক্ষা করিয়া চলিয়াই প্রকৃত ঔদার্য্য সৌহার্দ্দ্য গরীয়ান সামঞ্জস্যেরই দৃঢ়তর ভিত্তি স্থাপন করিব।

জাতি বা সঙ্ঘ সম্বন্ধেও এই একই কথা। প্রকৃতির বিবর্ত্তনধারার অব্যর্থ প্রেরণাবশেই নেশনবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা আধুনিক যুগের ইউরোপের দান। তাই বলিয়া ইহা অসত্য বা হেয় কিছু নয়। নেশনবাদ চায় জাতির সঙ্ঘের আত্মাকে জাগ্রত জীবন্ত স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ আপন অখণ্ড প্রতিভায় ভরপুর করিয়া ধরা। পূর্ব্বে যে লোকসমাজ ছিল (peoples) তাহা ছিল প্রকৃতির কোলের জিনিষ, আপনাকে ভাল করিয়া চিনিত না, স্বধর্ম্মের মহীয়ত্বে, আপনার সমগ্র অভিন্ন সত্তায় প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে নাই— তাহার প্রয়োজনও সে বোধ করিত না। সে চলিত অন্ধ প্রাকৃতিক প্রেরণার বশে, আত্মচৈতন্য তাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠে নাই। কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে যেদিন সাড়া পড়িল জাতির আত্মা স্বাতন্ত্রে জাগিয়া উঠুক, নয়ন মেলিয়া সে দেখুক তাহার মধ্যে কোন্ ভগবান্ রহিয়াছেন এবং সেই উপলব্ধি অনুসারে জীবনকে নূতনভাবে গড়িয়া সৃজিয়া চলুক, সেই দিনই নেশনের আবির্ভাব। নেশন জাতির অহঙ্কারের প্রতিমূর্ত্তি হইতে পারে, কিন্তু তাহাই যে নিজত্বকে স্ফুটভাবে তীব্রভাবে বোধ করিবার, আপন ভাগবত সত্তা ও ঐশ্বর্য্য পাইবার তাহার বিধিনির্দ্দিষ্ট পন্থা।

লক্ষ্য—জগতে সকল জাতির এক মহাসম্মেলনস্থাপন কিন্তু কোন জাতির স্বাধীনতা স্বাতন্ত্র্যকে ক্ষুণ্ণ করিয়া নয়। সকলেরই থাকিবে সমান মর্য্যাদা, সমান অধিকার। ইউরোপের সৌভাগ্য তাহার প্রত্যেক জাতিই নেশনত্বে উদ্বুদ্ধ হইয়া আপনার মর্য্যাদা, স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম

করিয়াছে—আপন ব্যক্তিত্বকে কেহ আক্রমণ করিতে আসিলে সে এই নেশনস্বরূপ বর্ম্মেই আপনাকে রক্ষা করিয়াছে। আর সেই জন্যই জগতে আজ যে Federation of Nations এর আদর্শ শুনিতেছি তাহাতে ইউরোপীয় অথবা ইউরোপীয় ধারায় চলিয়াছে যাহারা তাহাদেরই কেবল স্থান হইতেছে। এশিয়ার স্থান সেখানে নাই। কারণ এশিয়ার জাতিসকল সময়ের সাথে পা ফেলিয়া চলিতে পারে নাই। সে রহিয়াছে, অন্ততঃ সে দিনও ছিল আদিম যুগে। জাতির নিজত্বের মর্য্যাদা যথাযথ বুঝে নাই, তাহার যে একটা আত্মাই আছে তাহাও পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করে নাই, তাহাকে শরীরী করিয়া ধরিবার প্রয়োজনও বোধ করে নাই। জাতিকে নেশনে গড়িয়া তুলে নাই। এক জাপান পারিয়াছিল তাই বিশ্বসভায় জাপানের স্থান হইয়াছে। আমরা ভারতবাসী আধ্যাত্মিকতা আমাদের গরব—আমরা শ্লাঘা করি জগতের সকল আলোড়ন বিপ্লব সকল জড়বাদ সংশয়বাদের বিভীষিকার মধ্যে আমরাই অধ্যাত্মধনকে জিয়াইয়া রাখিয়াছি। সত্য কথা। কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা যে নেশন হইয়া উঠিতে পারি নাই ইহাও যে কিছু মাহাত্ম্যের বিষয় তাহা নয়। ভারতের আধ্যাত্মিকতা কেবল আপনাকে কোনরূপে বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে মাত্র, গহ্বরে অরণ্যে লুকাইয়া তাহার ক্ষীণ প্রাণটি ধুক্ ধুক্ করিতেছে মাত্র। সে আধ্যাত্মিকতা বিপুল বিশ্বগ্রাসী হইয়া উঠিল না কেন, আপন দুর্ব্বার শক্তিতে জগতকে ভাসাইয়া দিল না কেন? সে আধ্যাত্মিকতার আধার যে ভারতের অধিবাসী সকল তাহারা এমন অল্পপ্রাণ, সর্ব্বদা ভয়চকিত কঙ্কালসার হইয়া উঠিয়াছে কেন? আমরা মনে করি ইহার কারণ প্রথমতঃ আমরা চিনিয়াছি কেবল ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিকতা কিন্তু জাতির অধ্যাত্মসত্বা বুঝি নাই আর দ্বিতীয়তঃ বুঝিলেও তাহার জন্য একটা বিগ্রহ সৃষ্টি করি নাই, তাহাকে স্থূলে পর্য্যন্ত সজাগ পরিপূর্ণ করিয়া ধরিবার কোন পন্থা বাহির করি নাই। নেশনই যে জাতির অধ্যাত্মসত্বার এই জাগ্রত বিগ্রহ, এ মহাসত্য উপলব্ধি করি নাই।

নেশনত্ব এই মহাশিক্ষা দিতেছে যে ব্যক্তির যেমন আছে দেহ প্রাণ মন, জাতিরও ঠিক সেই রকম আছে দেহ প্রাণ মন। জাতির দেহ হইতেছে দেশ, প্রাণ হইতেছে তাহার ক্ষাত্রশক্তি ও বৈশ্যশক্তি, মন হইতেছে ব্রাহ্মণ্যশক্তি। আধুনিক ভাষায়, ভৌগলিক সীমা, সৈন্যসম্ভার, ব্যবসা

বাণিজ্য এবং শিক্ষা-দীক্ষা এই কয়টি জিনিষ লইয়া জাতির পূর্ণ সত্তা। নেশন চায় জ্ঞানতঃ এ সকলকে কেন্দ্রীভূত, পরিচালিত পরিবর্দ্ধিত করিতে, একটা নিগূঢ় আত্মপ্রতিভার ঐশ্বর্য্য ইহাদের সকলের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে। কোন অংশকে বর্জ্জন করিতে সে প্রস্তুত নহে। আদর্শ হইতেছে সকলকে সামঞ্জস্যের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত উপচিত করিয়া ধরা, ব্রাহ্মণ্যের মধ্যে ভাগবত প্রেরণার মধ্যে সকলকে যথাসন্নিবেশ করা এবং অন্যান্য জাতির বিগ্রহের সহিত সৌভ্রাত্রে মিলিয়া মিশিয়া চলা। কিন্তু প্রয়োজনানুসারে, যুগধর্ম্মের বিধানে যদি ক্ষাত্র ও বৈশ্য শক্তির উপর বিশেষ জোর দিতে হয়, দেশমাতৃকার দেহটি লইয়াই ব্যাপৃত থাকিতে হয় তবে তাহাই করিতে হইবে। মহাসম্মেলনের আদর্শ যদি কিছু কালের জন্য ভুলিয়াই যাইতে হয় তবে তাহারও সার্থকতা আছে। ক্ষণিকের পশ্চাৎগমন সে যে একটা উদারতর ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত ভাবেই অগ্রসর হইবার জন্য শক্তি সংগ্রহ। নেশনত্বের মধ্য দিয়াই জাতি বিশ্বজাতির সহিত পূর্ণতর জাগ্রততর সম্বন্ধ স্থাপন করিবে—সংঘর্ষের মধ্যে আপনাকে চিনিয়া পরকে চিনিয়া একটা মহীয়ান্ সামঞ্জস্যেরই সৃষ্টি করিবে। নেশনত্ব যিনি ধ্বংস করিতে উপদেশ দিবেন তিনি চাহিবেন জাতি যেন আবার ফিরিয়া যায় তার প্রাকৃত তামসিক অবস্থায়। নিগ্রহের মন্ত্র দিয়া তিনি লয়েরই পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। নেশনবাদ দুষনীয় হইতে পারে কিন্তু নেশনত্ব দুষনীয় নহে। অহংকারের, পার্থিব বস্তুর প্রতি অতিভক্তি আদর্শ নহে—তাহাকে সংযম করিতে হইবে। সংযম চাই কিন্তু নিগ্রহ নয়। ইহাই ত গীতার শ্রীভগবানের উপদেশ। সংযম অর্থাৎ পরিশুদ্ধ করিয়া তুলা, অন্তর্নিহিত সত্য সত্বাটির মধ্যে উঠাইয়া ধরা। অহঙ্কারেরই মধ্যে যে রহিয়াছে তোমার ভাগবত স্বাতন্ত্র্যের সজাগ অনুভূতি, পার্থিব সম্পদের প্রতি লিপ্সারই মধ্যে যে রহিয়াছে তোমার ভাগবত ভোগপ্রেরণা। দোষের বলিয়া সে সকলকে নিগ্রহ করিলে, ধ্বংস করিলে এ সকল কিছুই তুমি পাইবে না। বরং সে তোমার হইবে মৃত্যুর পথ।’

প্রকৃতির খেলায় জগৎ ব্যাপারে এইটুকু ভুলিলে চলিবে না ভাল ও মন্দ, সুন্দর ও কুৎসিত এই দ্বৈত লইয়াই সৃষ্টি। মন্দ যাহা, কুৎসিত যাহা তাহার মধ্য দিয়া ভগবান আরও ভাল, আরও সুন্দরকে গড়িয়া তুলিতেছেন। এই দ্বৈতের জোরেই জগতে বিবর্ত্তন মানুষে ক্রমোন্নতি চলিয়াছে।

মনুষ্য সব নিশ্চল হইয়া থাকিত। মন্দ হইতে কুৎসিত হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে যে, সত্যকেই সে হারাইবে, ভগবানের কর্ম্মশৃঙ্খলা হইতেই সে খসিয়া পড়িবে। প্রকৃতপক্ষে মন্দ কুৎসিত বলিয়া কিছু নাই, আপাততঃ যাহা মন্দ যাহা কুৎসিত হইয়া দাঁড়ায় তাহার অর্থ সে একটা গভীরতর শ্রেয় একটা উদারতর প্রেয়কেই প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে। মন্দকে কুৎসিতকে আলিঙ্গন করিয়াই ভদ্রকে সৌম্যকে পাইতে হইবে। গরল দেখিয়া যাহার ভয় সে কবে অমৃতের অধিকারী হইয়াছে ?

পূর্ণ-যোগ

(৮)

পূর্ণযোগের স্বরূপ

তবে যোগের প্রথম কথা, যেখান হইতে আরম্ভ করিব তাহা হইতেছে কি রকম ভাবে ও শ্রদ্ধায় আমরা প্রকৃতিকে দেখিতেছি। মূলতঃ আমরা দেখিয়াছি প্রকৃতি হইতেছে আপনারই শক্তির মধ্য দিয়া পুরুষের আত্মবিকাশ, আত্মচরিতার্থতা। কিন্তু কার্য্যতঃ প্রকৃতির দুইটি গতি, দুই রকম খেলা। একটি সাধারণ নিত্য নৈমিত্তিক আর একটি নিগূঢ় দিব্যমূর্ত্তি; একটি উপরের স্তরের আর একটি নীচের স্তরের। সাধারণতঃ যেমন ভাবে আমরা জীবন কাটাই, অহংকারের বশবর্ত্তী হইয়া, অজ্ঞানের অশক্তির দুঃখের ক্রীড়াপুত্তলি হইয়া তাহাই প্রকৃতির নীচের স্তরের খেলা বা প্রাকৃত জীবন। কিন্তু অহংকার ছাড়াইয়া, ক্ষুদ্রতা, ভেদবুদ্ধি অতিক্রম করিয়া জ্ঞানের শক্তির আনন্দের মাঝে যখন উঠিয়া যাই তখনই পাই প্রকৃতির পরামূর্ত্তি, তাহা লইয়াই দিব্য জীবন। এই নীচের ধাপ হইতে উপরে উঠার নামই যোগ। ইহা দুই ভাবে হইতে পারে। এক, নীচ হইতে যখন একেবারেই উঠিয়া যাই, প্রকৃতির অপরা খেলাটিকে নিঃশেষ বর্জ্জন করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাই অথবা যখন নীচকে ইহাকে শুধু পরিবর্ত্তিত পরিশুদ্ধ করিয়া উচ্চতরটির অমুত্রের মধ্যে তুলিয়া ধরি।

কিন্তু যেটিই লক্ষ্য হউক না কেন, আমাদের প্রতিষ্ঠা এই নীচের স্তরে, কাজেই ইহাকেই আশ্রয় করিয়া তবে অপরটি পাইতে হইবে। সাধারণ যোগ সকলের লক্ষ্য ইহকে পরিত্যাগ করা তাই তাহার পন্থা প্রাকৃত প্রেরণার দুই একটি বিশেষ ভঙ্গিমাকে আশ্রয় করিয়া, আর সব ভুলিয়া

তাহারই সহায়ে শেষে সমুচ্চের ভগবানে মিশিয়া যাওয়া। পূর্ণ যোগী কিন্তু চাহিতেছেন অপর জিনিষটা, তিনি চাহিতেছেন প্রাকৃতের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লইয়া তাহারই মধ্যে অতিপ্রাকৃতের দিব্যের খেলা ফুটাইয়া তুলিতে। কারণ প্রকৃতির প্রাকৃত খেলার মধ্যে পুরুষের ভগবানেরই নিগূঢ় প্রেরণা পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। অন্তর্য্যামীর পূর্ণ বিকাশে পূর্ণ চরিতার্থতাই হইতেছে পূর্ণ সত্য—তাহাতেই প্রকৃতির পূর্ণ সার্থকতা। তাই পূর্ণ যোগী জীবনের কোন খণ্ডিত বা বিশেষ প্রকরণের মধ্যে আপনাকে বাঁধিয়া রাখিবেন না। তাঁহার সমস্ত জীবনটিই হইতেছে যোগ। জীবনের সকল বৈচিত্র্য সকল জটিলতার, যত ক্ষুদ্র যত বৃহৎ ব্যাপার সমস্তই অন্তর্ভূক্ত করিয়া দিতে হইবে যোগের মধ্যে। সাধারণ জীবনে প্রকৃতি অখণ্ডভাবে তাহার পূর্ণ ভঙ্গিমাটি লইয়াই আমাদের মধ্যে খেলিতেছে। পূর্ণযোগের সাধক তাই সিদ্ধ জীবনে প্রকৃতির পূর্ণ অখণ্ড খেলাটিই চাহেন। প্রভেদ শুধু থাকিবে এইখানে যে সাধারণ জীবনে আমরা প্রকৃতির স্থূল গতির আধার, যোগযুক্ত জীবনে আমরা হইব দিব্য প্রকৃতির আধার। আমাদের সমগ্র সত্বাটিকেই পরিবর্ত্তিত করিয়া ধরিতে হইবে ভাগবত সত্বার দ্যোতনায়।

সুতরাং উপায় হইতেছে আমাদের সমস্ত সত্বাখানিকে জাগ্রতভাবে ভাগবত সত্বার সহিত সংযুক্ত সম্মিলিত করিয়া ধরা। ভগবানকে ডাকিয়া আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এইখানে, তাঁহারই প্রভাবে আমাদের প্রকৃতি তাঁহারই প্রকৃতির অনুরূপ হইয়া গড়িয়া উঠিবে। এক হিসাবে ভগবান্ নিজেই হইবেন আমাদের সাধনার সাধক, আমাদের অন্তরের পুরুষ, আমাদের যোগের নিয়ন্তা। তিনিই আমাদের ব্যক্তিগত সত্বাটিকে আশ্রয় করিয়া, যন্ত্রবৎ পরিচালিত করিয়া দিব্যমূর্ত্তিতে প্রকটিত হইবেন। কারণ আমরা বলিয়াছি আমরা, আমাদের জীবন, আমাদের পরিপূর্ণ সত্বা হইতেছে একটা ভাব বা তপঃশক্তির অভিব্যঞ্জনা। আমাদের অন্তরস্থিত যে দিব্য প্রকৃতি, আমরা অখণ্ডভাবে যে বস্তুটী তাহা নিহিত রহিয়াছে ঐ ভাব ঐ তপঃশক্তির মধ্যে। এই তপঃশক্তিকে যদি খেলাইয়া তুলিতে পারি তবে তাহা আপনার ভাবের চেতনার অব্যর্থ অটুট প্রসরণে আমাদের প্রাকৃত প্রকৃতিটি পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহার নিজের যে দিব্য অখণ্ড প্রকৃতি তাহাকেই সেখানে প্রতিষ্ঠিত করিবে। যাহা খণ্ডিত, যাহা তমসাবৃত তাহার মধ্যে অবতীর্ণ হইবে যাহা দিব্য যাহা সর্ব্বজ্ঞ যাহা সর্ব্বকৃৎ।

এবং এই বস্তুটিই ক্রমে আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক সমস্ত প্রকৃতিখানিকে শুদ্ধ জ্ঞানোদ্ভাসিত বীর্য্যপরিপ্লুত করিয়া গড়িবে, সকল মানসীয় জ্ঞান, সকল নশ্বর কর্ম্মচেষ্টার পরিবর্ত্তে তাহার নিজের লীলাটিই ফুটাইয়া তুলিবে।

পূর্ণযোগের এই যে মূলকথা ভাগবত ভাব, পূর্ণ বিজ্ঞানশক্তিকে প্রকটিত করা আমাদের সাধনার দিক হইতে তাহারই অর্থ হইতেছে অহংকার বিসর্জ্জন, অহং এবং তার সমস্ত ক্ষেত্রখানি ক্রমে ক্রমে উৎসর্গ করিতে হইবে অহং এর অতীতে যে বস্তুটি তাহার নিকটে, তাহারই বিরাট দুর্লক্ষ্য অথচ অব্যর্থ কর্ম্মপ্রেরণার নিকটে। এ সাধনমার্গ সহজও নয় সরলও নয়। এ পথে প্রয়োজন বিপুল শ্রদ্ধা, অকুন্ঠিত সাহস আর অটুট ধৈর্য্য। কারণ ইহার তিনটী ধাপ আমরা দেখিতে পাই। যখন শেষটিতে পৌঁছিয়াছি তখনই কেবল সাধনা আমাদের কণ্টকহীন ও দ্রুতগামী। প্রথম হইতেছে অহং এর চেষ্টা দিব্যভাগবত সেই বৃহৎ সেই পূর্ণের সংস্পর্শে আসিতে। ফলে তারপর আমাদের সমস্ত নীচের প্রকৃতিটিকে দিব্যপ্রেরণার সহায়ে তিল তিল করিয়া গড়িয়া তুলা এবং তাহাকে সমুচ্চ ভাগবত প্রকৃতিতেই পরিবর্ত্তিত করা। আর শেষ যখন এই পরিবর্ত্তন পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু পথ যতই দুর্গম হউক না কেন, এ পথে আমরা নিজের শক্তিতে চলি না। আমরা অহংকারকে দূর করিতে করিতে চলিয়াছি, তাই ভাগবতশক্তিই অলক্ষ্যে যবনিকার ভিতর হইতে প্রতিনিয়ত আমাদের দুর্ব্বলতার স্থান গ্রহণ করিতেছে, শ্রদ্ধা, সাহস বা ধৈর্য্যের অভাব যখন তখন ইহাই আমাদিগকে ধরিয়া রাখিয়াছে। এই শক্তি যে অন্ধকেও চক্ষুষ্মান করে, পঙ্গুকে দিয়াও গিরি উল্লঙ্ঘন করায়। বুদ্ধি সন্ধান পায় একটি বিধান বা বস্তুর অন্তর্নিহিত এক ধর্ম্ম যাহার অব্যর্থ গতিই হইতেছে ভদ্রকে কল্যাণকে ঘিরিয়া। হৃদয় খুঁজিয়া পায় একজন প্রভু, একজন সখা, অথবা এক বিশ্বমাতা যিনি প্রতি পদস্খলনে আমাদিগকে ধরিয়া উঠাইতেছেন। এ পথে যত বাধা যত বিপত্তি অন্য কোন পন্থায় তাহার কিছুই নাই বটে কিন্তু যখন স্মরণ করি ইহার লক্ষ্যটি, ইহার প্রয়াসের বিপুলত্ব—মানুষের প্রকৃতিকে পরিবর্ত্তন করিয়া তাহার সকল অঙ্গ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আর এক ধর্ম্মে তাহাকে জগতের জীবনের কর্ম্মেই প্রতিষ্ঠিত রাখা—তাহার তুলনায় তখন মনে হয় এ পথের মত সহজ পথ আর নাই, এমন অব্যর্থ সুনিশ্চিত পন্থাও আর নাই।

সমালোচনা

ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের অভ্যুদয়কালের পর হইতে বাংলার গ্রামে গ্রামে মহাপুরুষের আবির্ভাব কথা শুনা যাইতেছে। বর্ষায় ব্যাঙের ছাতা যেমন গজাইয়া উঠে তদ্রূপ অগণ্য দৈবীমানুষ নবযুগে অবতীর্ণ হইতেছেন। আসল নকলের বিচার সামর্থ্য আমাদের নাই—আমরা সকল ঘটনাকেই ভগবদ্ লীলা বলিয়া জানি; কোথায় তিনি পরিপূর্ণ-ভাবে আত্মবিকাশ করিবেন তাহা পরিণাম দেখিয়া নির্ণীত হইবে—বর্ত্তমানকালে সকলকেই শ্রীভগবানের ইচ্ছাসম্ভূত বলিয়া ভক্তিপূত চিত্তে নমস্কার করি।

সম্প্রতি বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী হইতে শ্রীরসিকলাল দে দাস প্রণীত পাগল রাধামাধব নামক একখানি পুস্তক আমরা সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই পুস্তকখানিতেও একজন অতিমানুষের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে—লেখক সামর্থ্যানুসারে, ইনি যে বর্ত্তমান যুগের একজন পথপ্রদর্শক ইহা প্রমাণ করিবার জন্ত যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন।

বর্দ্ধমান জেলায় মানকর গ্রামের রাইপুর পল্লীতে শ্রীল রাধামাধব দাস বাস করিতেন। লেখক দীর্ঘদিনের পরিচয়ে বুঝিয়াছেন ইনি সামান্ত লোক নহেন "সর্ব্ববর্ণনির্ব্বিশেষে জগতের মঙ্গল সাধন উদ্দেশে ইঁহার আবির্ভাব"। এক্ষণে ইহাকে লোকে 'পাগল-মানুষ' বলিয়াই সম্বোধন করিয়া থাকে।

পুস্তকখানি আগাগোড়া পাঠ করিলে স্পষ্টই মনে হয়—পাগল রাধামাধব রাগমার্গের উপাসক। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর অতুলনীয় প্রেম মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ও প্রচার করাই ইঁহার জীবনের উদ্দেশ্ত। তাঁহার নিজের কথাই উদ্ধৃত করি—পুস্তকের একস্থানে লেখা আছে—"আমি খাস তালুকের চৌকীদার জীবের মোহ নিদ্রাভঙ্গ করিয়া জাগরিত করা ও অনুগত পিপাসু ভক্তদিগকে প্রেমামৃত এবং অভয় দানই আমার কার্য্য; তজ্জন্ত সাধ্যমত পত্র দ্বারা বংশীধ্বনি সহ আহ্বান করিয়াছি, ইহা মনুষ্য সাধ্য নহে; কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত; আমার ভগবানের নাম সংকীর্ত্তন ভিন্ন কোন কার্য্য নাই; লাভ, পূজা—প্রতিষ্ঠায় আমার প্রয়োজন নাই; প্রতিষ্ঠার ভয়ে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী, ক্ষীরচোরা গোপীনাথ হইতে পলাইয়াছিলেন; কেবল আপনাদের উপকারের জন্ত কর্ম্ম। ...... প্রচার করুন আর না করুন আমার কোন ক্ষতি নাই; ...... আমাকে আর ভবে আসিতে হইবে না; মা অভয় দিয়াছেন"। পুস্তকখানি পাগল রাধামাধবের মাহাত্ম্য প্রচার কল্পেই মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পাগল রাধামাধব তাঁহার জীবন যাত্রার উপযোগী ১ সের চাউল ও চারিটী পয়সা সংগ্রহের জন্য দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন,—এরূপ মহাপুরুষের সেবার জন্য এই সামান্য ভিক্ষা গ্রাম হইতে সংগ্রহ হয় না ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়! এই পুস্তকখানির সমগ্র আয়ই লেখক দরিদ্র ভাণ্ডারে অর্পণ করিয়াছেন। আমরা এই সদুদ্দেশ্ত সাধনের সাহায্যার্থে সকলকেই একখানি করিয়া পুস্তক ক্রয় করিতে অনুরোধ করি।

চির নবীন!

নবীন সাধক, দেবতার মত চিরযুবা থাকিও। হারাইও না তোমার কল্পনার বিভা, ক্ষুণ্ণ করিও না তোমার প্রাণের তেজ। আশার পরিধি দূর চক্রবালকেও ছাড়াইয়া সুদূরে প্রসারিত করিয়া দাও। তোমার প্রতি পদবিক্ষেপে অনুভব কর কোন দেবতাই বুঝি পৃথিবীর ধূলিকে স্পর্শ করিতে চাহিতেছে, তোমার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিমায় কোন অচেতন আত্মহারা জড় বস্তুটি যেন স্বর্গেরই জ্যোতিতে প্রবুদ্ধ হইতে উদ্গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে। চিন্তা করিতে, কর্ম্ম করিতে—স্বপ্ন দেখিতেও অক্লান্ত হও। অবসাদ অশ্রদ্ধা তোমার হউক অপরিচিত পদার্থ। বৃদ্ধের কাছে, যাহার সকল খেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে তাহারই কাছে প্রশ্ন উঠে—ততঃ কিম্? তারপর কি? তারপর যে সবই। এই মুহূর্ত্তের পরে আকাশ যে চিরিয়া যাইবে না, দেবতার দল যে নামিয়া আসিবে না, ধরিত্রীর কোল হইতে, পাহাড় নদী বনের ভিতর হইতে অশরীরী সত্ত্বা সকল আবির্ভূত হইবে না, তুমি আমি যে আলোকের রূপে আগুণের তেজে গড়িয়া উঠিব না তাহাই বা কে জানে? ইন্দ্রের সহিত একরথে একাসনে বসিব, উর্ব্বশী রম্ভা আসিয়া আলিঙ্গন চাহিবে—তাহাই বা অসম্ভব কেন? ততঃ কিম্? জরা মৃত্যু অন্ধকার শূন্য! আমি ত কিছুই অনুভব করিতেছি না। অমৃতের পুত্র, তোমার সম্মুখে পশ্চাতে দূরে অন্তিকে অন্তরে বাহিরে সবই জাগ্রত সবই জীবন্ত সবই জ্যোতিষ্মান সবই ভরাট। ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব অবধি কে কবে আনন্দের কণা হইতে বঞ্চিত? কোথায় মন্দাকিনীর স্রোত শুকাইয়া গিয়াছে? অমরাবতীতে তাহার উপকূলে ফুটিয়া উঠিয়াছে মন্দার পারিজাত, অন্তরীক্ষে তাহারই লীলাভঙ্গিমা ঝলসিত ছায়াপথে। ভূতলে তিনিই ভাগীরথী হইয়া পৃথিবীকে রসের আধার করিয়া গড়িয়াছেন। পাতালে আবার তাঁহারই প্রবাহ না মৃতকে নবজীবন দিতেছে? মন্দাকিনী ধারার মতনই অটুট অব্যাহত হউক তোমার রসানুভূতি। নিখিল জিনিষেরই মধ্যে খুঁজিয়া

লইও কি অনন্ত অফুরন্ত ভোগের তৃপ্তির উৎস। প্রেমিকের চক্ষে বিশ্বকে চিরদিন রঙ্গিল করিয়া দেখিও। নিত্য নবলালিমায় অননুভূত সুষমায় ফাটিয়া পড়িতেছে কে ওই সৌম্যা সৌম্যতরা অশেষ সৌম্যা হইতেও অতি সুন্দরী! জ্ঞানের জ্বলোজ্জ্বল কিরণলেখা দিয়া তাহাকে চিনিয়া লও, উন্মুক্ত প্রাণের আবেগে ভরপুর হইয়া তাহার অমৃতনিস্যন্দিনী অধরসুধা পান কর—তাহার দেবদুর্লভ তনুখানি তোমার সহস্র বিদ্যুৎ-লেখালসিত আলিঙ্গন পাশে গাঢ়বদ্ধ করিয়া ধরিতে ইতস্ততঃ করিও না। রাখিও না দ্বিধা, রাখিও না শঙ্কা, রাখিও না লজ্জা।

উষার অরুণতিলক কপালে পরিয়া কে তুমি সাধক চলিয়াছ? স্বাগত! স্বাগত! দিক সকল প্রশান্ত হউক, সুশীতল সমীরণ বহিতে থাকুক, পথখানি তোমার ধূলিশূন্য হউক—তুমি ইহা চাহ কি? কিন্তু আমি যে দেখিতেছি থরে থরে কৃষ্ণমেঘরাশী আকাশ ঘিরিয়া ফেলিতেছে, দূরে প্রলয়ঝঞ্ঝার বিকট বিষাণ গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে, পথখানি তোমার আর যে দেখা যায় না। দেখিতেছি তোমারও বীরহৃদয় অলক্ষিতে দুলিয়া উঠিয়াছে রুদ্রের তাণ্ডবতালে। আর্য্যযোদ্ধা, সূর্য্যদেবকে সারথী করিয়া চল সম্মুখে —তীক্ষ্ণ শরজালে ছিন্ন ভিন্ন করিয়াচল ওই তমোঘন কৃষ্ণকায় আততায়ী চমূ। তুমি চাহিবে কেন নিরর্থক শান্তি, বিপ্লববিরহিত কর্ম্মে তোমার উল্লাস হইবে কেন? নবীনহৃদয়ে নবীন আগুণ জ্বলিতেছে, সে যে বিশ্বের খাণ্ডবকে ভস্মীভূত করিবার জন্য, পৃথিবীর অতল হইতে উর্দ্ধে দেবলোকেরও পরপার পর্য্যন্ত যে পথখানি বিস্তৃত তাহাতে চির দিন যুদ্ধ করিয়াই চলিতে, দেউলের পর দেউল ভাঙ্গিয়া ফেলিতে, নগরীর পর নগরী অধিকার করিতে। শান্তি তোমার অন্তরে, সমাধির নিস্পন্দতা তোমার নিগূঢ়ে নিত্যই জাগিয়া রহিয়াছে--তাহারই প্রতিচ্ছবি যে ফুটিয়া উঠিয়াছে তোমার বাহুর লাঞ্ছনায়, তোমার কণ্ঠের আরাবে, তোমার প্রতিপদের বিক্ষেপে। অথবা সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কোলে অবশ অঙ্গে, আবেশজড় প্রাণে তুমি এলাইয়া পড়িতে চাহিবে কেন?

যে বিজ্ঞতা যৌবনের-স্বপন যৌবনের চাঞ্চল্যকে উপহাসই করিয়া চলে সে বিজ্ঞতা তুমি চাহিও না। পদে পদে সম্ভব অসম্ভব গণিয়া যে অগ্রসর হয়, প্রাণের আবেগের রাশ যে চিরদিন পিছনেই টানিয়া ধরিতে চায়, সে প্রবীণ সে চতুর হইলেও হইতে পারে, আপাততঃ জগতে তারই

জয় হইলে হইতে পারে। কিন্তু, হে নবীন যাত্রী, জয় পরাজয়ে তোমার কি আসে যায়? তুমি যে চাও নিজেকে উধাও করিয়া অনন্তের পানে ছুটাইয়া দিতে। বসিয়া বসিয়া তুমি শুধু অগ্রপশ্চাত ভাবিবে কেন? চলিতেই যে আনন্দ, আত্মাকে মত্ত করিয়া তুলিতেই যে তোমার উল্লাস। আর কে জানে প্রকৃত পক্ষে কে জয়ী, কে বিজ্ঞ? আমি যেন দেখিতেছি অসম্ভবের মধ্যে একটা পূর্ণতর সম্ভবই লুকাইয়া আছে, স্বপনের মধ্যে দিব্য ভবিষ্যদৃষ্টিই প্রতিভাত হইতেছে, চঞ্চলতার মধ্যে ভগবানের ত্বরান্বিত গতিই নাচিয়া উঠিতেছে।

চিন্তা বীথী

মানুষের বুদ্ধিটে এক রোখা জন্তু। দুটী বিপরীত এমন কি বিভিন্ন জিনিষ দেখ্‌লেই তার খট্‌কা লাগে, মনে করে একটা ভুল হবেই আর একটা কেবল সত্যি। কিন্তু বিপরীত ভাবের সমন্বয়ই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান। কারণ স্পষ্টই ত দেখ্‌তে পাচ্ছি বিরোধী ভাব, সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির জিনিষের সমাবেশেই এই জগৎ দিব্যি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিচারবুদ্ধির কাছে যা অসম্ভব তা যদি সম্ভব না হ'ত তবে সৃষ্টি বলে কোন বস্তুর সম্ভবও হ'ত না।

* * *

দৈব, না পুরুষকার? কেউ বলেন মানুষ যাই করুক না কেন তা সব নিরর্থক, বিধাতার লিখন জোর করে কে খণ্ডাতে পারে? সব যে সৃষ্টির পূর্ব্বে থেকেই স্থির হয়ে গেছে, মানুষের সাধ্য তা উল্টাবে? বরং মানুষ যে সে অদৃশ্য শক্তির হাতে অন্ধ অসহায় ক্রীড়াপুত্তলিকামাত্র। প্রতিপক্ষ উত্তর করেন, না, মানুষের ক্ষমতাই ত এইখানে, পুরুষকারই নিয়তিকে সৃষ্টি করেছে ও করছে। মানুষের স্বাধীনতা জন্মগত, তার ইচ্ছাশক্তিই তার ভাগ্যকে গড়েছে, তাকে ভাঙতে পারে, আবার নতুন করে গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে দৈব ও পুরুষকার একই জিনিষ। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ যেমন সত্যিকার জিনিষ, বিধাতার অকাট্য বিধান

পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পরিণামের টানও তেমনি সত্যি। ভগবানের মনে যে ভবিতব্যের ছবি ফুটে উঠেছিল, মানুষ স্বেচ্ছাপ্রেরণাতেই নানা সম্ভাবনীয়তাকে পরখ করে তাকে বাস্তবে মূর্ত্তিমান্ করে তুলছে। এতে নিয়তির ভবিতব্যের অকাট্যতা অপ্রমাণ হচ্ছে না, মানুষের পুরুষকারও কিছু খর্ব্ব হচ্ছে না। পুরুষকারের জোর যত দৈব ততই জাগ্রত, আর দৈব যতই অব্যাহত পুরুষকারের ততই সাফল্য।

* * *

ব্যষ্টি, না সমষ্টি? মানুষ না সমাজ? যে সমষ্টি যে সমাজ ব্যষ্টিকে মানুষকে স্বাধীনতা দেয় না, তাদের স্বাতন্ত্র্যের প্রেরণাকে সঙ্কুচিত করে রাখ্‌তেই সচেষ্ট, নিজের অঙ্গসকলকে দেখে কেবল অংশরূপে, তাদের কাছে চায় কেবল আত্মবিসর্জ্জন সে সমষ্টি সে সমাজ প্রাণহীন যন্ত্র তার নাম অত্যাচার। আবার যে ব্যষ্টি যে মানুষ চায় কেবল আত্মপুষ্টি, আপন খেয়ালকে শুধু চরিতার্থ করিয়া চলিতে সে হচ্ছে উন্মত্ততা স্বেচ্ছাচার। ব্যষ্টির স্বাতন্ত্র্যচরিতার্থতায় আত্মপরিপূর্ণতাতেই যেখানে সমষ্টির চরিতার্থতা ও পরিপূর্ণতা, সমষ্টিরই জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ হচ্ছে যেখানে ব্যষ্টি সেখানে দ্বন্দ্ব নাই, সেখানেই সামঞ্জস্য ও পূর্ণতা।

* * *

কর্ম্ম না অকর্ম্ম? কর্ম্ম তোমার থাকবে না। সেই সঙ্গে নৈষ্কর্ম্ম্যও আবার তোমার থাক্‌বে না। তুমি নিজে যে কর্ম্ম কর্‌ছ, তুমি জোর করে না কর্‌লে যে কর্ম্ম হচ্ছে না বা হবে না—এমন বোধ তোমার কিছু থাক্‌বে না। অথচ তোমার মধ্যে কর্ম্ম বিপুল বেগেই চল্‌তে থাক্‌বে। কর্ম্মেন্দ্রিয় সব নিজ নিজ কর্ম্ম করে যাবে, তুমি শান্ত উদাসীর মত তা দেখ্‌তে থাক্‌বে, তার রস গ্রহণ কর্‌তে থাক্‌বে। ইঞ্জিন চল্‌তে থাকে আর ইঞ্জিন চালক বসে বসে দেখ্‌তে থাকে যেমন।

* * *

"ধর্ম্ম যে কি তা জানি তবুও সে জন্য আমার প্রবৃত্তি নেই, অধর্ম্ম যে কি তাও জানি, তবুও যে আমি নিবৃত্ত এমনও নয়।" এই হচ্ছে আদর্শ কর্ম্মীর কথা। অর্থাৎ আমার সংস্কার বা বিচারবুদ্ধি অথবা সমাজের বা মানুষের দেওয়া কোন মানদণ্ড যে ধর্ম্ম অধর্ম্ম নির্দ্দেশ কর্‌ছে সেই অনুসারে, কোন রকম উচিত বা অনুচিত বোধ থেকে আমার প্রবৃত্তি

বা নিবৃত্তি গড়ে উঠ্‌বে না, আমার জীবন নিয়ন্ত্রিত হবে না। আমার প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি তা হচ্ছে ভগবানের রতি বা বিরতি। হৃদিস্থিত হৃষিকেশ তিনি যদি কোন ধর্মে আমাকে প্রবৃত্ত না করান তবে সে দিকে যাবার আমার কোন টান নেই আবার কোন অধর্মের দিকেই যদি তিনি টেনে লয়ে চলেন তবে আমি যে তা থেকে নিবৃত্ত হব তা নয়। তিনি আমাকে যেমন ভাবে নিযুক্ত কর্‌বেন ঠিক তেমনি ভাবেই চল্‌বো।

* * *

আমার ভোগও নেই, আমার ত্যাগও নেই। আমি যখন নেই তখন আমার বলে কিছু থাক্‌তেই পারে না। কিন্তু আমি নেই বলে যে কিছুই নেই তা নয়। ভগবান্ যে সেখানে আসন নিয়েছেন, তাই সেখানে ত্যাগও আছে ভোগও আছে। ভগবান আসক্তি নিয়ে কিছু উপভোগ করেন না, তিনি নিজের সত্বায় নিজে পূর্ণ তৃপ্ত, কোন কিছুর অপেক্ষায় তিনি বসে নেই। এইখানেই তাঁর ত্যাগ। এই অন্তরের ত্যাগ বা বৈরাগ্যের জন্যে তিনি যে আবার বাইরের বিষয় সব ত্যাগ করেছেন তা নয়—তা হলে জগৎ বলে কিছু থাকৃত না। এইখানেই তাঁর ভোগ।

* * *

সিদ্ধ যিনি তিনি সিদ্ধ কারণ তিনি সিদ্ধিকে চান না। কিন্তু চান না বলে যে তাকে অশ্রদ্ধা করে ঠেলে ফেলে দেন তাও নয়। ফুলের রূপটি খুলে দেওয়াতেই ফুলত্ব, বর্ণে সুষমায় তাকে ভরে উঠ্‌তেই হবে। ফুটিয়ে তোলবার বা চেপে রাখবার কোন রকম তার চেষ্টা কিছু নেই। সিদ্ধের সিদ্ধিও সেই রকম সহজ স্বপ্রকাশ। ঐশ্বর্য্য যতক্ষণ বাইরের জিনিস, আহরণ কর্‌বার জিনিষ ততক্ষণ তা খাঁটি নয়। কিন্তু ঐশ্বর্য্য যখন সত্তারই পরিস্ফুরণ, তখন সে ঐশ্বর্য্য ব্যতিরেকে সত্তার কোন অর্থ নেই।

* * *

দ্বন্দ্বের অতীত হও, এ কথার অর্থ কি? এর অর্থ নয় যে জিনিষ দুটিকে দূর করে দাও বা নষ্ট করে ফেল, দুটোই ভুল বলে মুখ ফিরিয়ে চলে যাও। তা নয়, এর অর্থ হচ্ছে দুটোর মধ্যে আছে এমন একটা জিনিষ যা দুটোরই প্রাণ। সেই সত্যগর্ভ প্রাণস্বরূপ বস্তুটির মধ্যেই উভয়কে তুলে ধর, সেখানেই দেখ্‌বে উভয়ের কেমন মিল, কেমন অব্যর্থ সামঞ্জস্য। নিজের নিজের সত্যটিকে অক্ষুণ্ণ রেখেই পরস্পর পরস্পরের সত্যটাকে

কেমন ফলিয়ে দেখাচ্ছে।

* * *

দ্বৈত একটা দিক, অদ্বৈত আর একটা দিক। দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিত যা তাও আবার অন্যদিক। কিন্তু চৌকোশ পূর্ণ অখণ্ডিত জিনিষটি হচ্ছে তাই যা দ্বৈতকে অদ্বৈতকে বর্জ্জন করেছে, উভয়ের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছে অথচ উভয়কেই আলিঙ্গন কর্‌তে পেরেছে। এক, দুই, বহু, সমস্ত অনন্ত, শূন্য—এ সব নিয়েই ভগবান্। এ ছাড়া তিনি যে আরও কত কি, তা কে জানে? একটাকে শুধু সত্যি বলে ধর্‌লেই আমরা ভগবান্‌কে কেটে ফেলি। সবগুলোকে প্রত্যেক্‌কে সমান সত্য বলে যখন উপলব্ধি কর্‌বো তখনই আমরা পূর্ণ সত্যটি পাব।

* * *

বিচারবুদ্ধি সমস্ত সত্যটাকে দেখ্‌তে পায় না, অতএব সত্যকে সে মোটেও দেখেনা—এটাও আবার বুদ্ধিরই সেই এক রোখা গোঁ'র কথা। বুদ্ধি যা দেখে তা নিতান্তই যে ভুল—এও একটা মস্ত ভুল। বুদ্ধি যে কখন সত্যকে পায় না—এও একটা বিশেষ অসত্য। দিব্যদৃষ্টি দিয়েই পূর্ণ সত্যটি যথাযথ পাই—ঠিক কথা। কিন্তু বুদ্ধিকে যদি পরিশুদ্ধ করে নিতে পারি, সে যদি প্রভু সর্ব্বেসর্ব্বা না হয়ে এই দিব্যদৃষ্টিরই অনুগত হয়ে থাকে তবে সে বুদ্ধি সত্যানুভূতির কোন বাধা হয় না, বরং তার স্বচ্ছ প্রণালীস্বরূপই হয়ে উঠে। এই শুদ্ধবুদ্ধির ভিতর দিয়েই তুরীয় দৃষ্টি স্থূলের মধ্যে, প্রকাশের মধ্যে কর্ম্মপর, শৃঙ্খলতার সহায়ক হয়ে উঠ্‌ছে।

সন্ন্যাসীর কথা

সন্ন্যাসী সংসারের একটা মস্ত দায়িত্ব। কারণ সন্ন্যাসীর নিজের কোন উপার্জ্জন নেই অথচ তাকে খেতে হবে। সুতরাং তাদেকে খেতে দেওয়ার ভার পড়ে সংসারের লোকের ওপর। সমাজ অবশ্য ভিখারীকেও প্রতিপালন করে' আস্‌ছে কিন্তু এই সন্ন্যাসীকে দেওয়া আর ভিখারীকে দেওয়ার মধ্যে একটা মস্ত প্রভেদ আছে। সমাজ ভিখারীকে যা দেয় তা দয়া করে' করুণা করে' তাকে ছোট জেনে কিন্তু সন্ন্যাসীকে যা দিতে

হবে তা সন্ন্যাসীর ন্যায্য পাওনাস্বরূপে—কেবল তাই নয় সঙ্গে সঙ্গে এটাও মান্‌তে হবে যে সন্ন্যাসী বড়—তাঁকে শ্রদ্ধা কর্‌তে হবে, ভক্তি কর্‌তে হবে, সম্ভ্রম দেখাতে হবে। কাজে কাজেই এতে সমাজের অর্থের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক দিকটারও একটা টান্ পড়্‌ছে। সুতরাং এটা খুবই স্বাভাবিক যে সমাজ একদিন্ বুঝ্‌তে চাইবে যে এই যে সন্ন্যাসীকে আমরা প্রতিপালন কর্‌ছি সে সন্ন্যাসীদের দ্বারায় সমাজের কি উপকার হচ্ছে।

কারণ যে কেউ হোক্ না কেন সে যদি সমাজের কাছে কিছু দাবী করে তবে আগে প্রমাণ কর্‌তে হবে তার শূদ্রত্ব—সে সমাজের কি ভাবে সেবা কর্‌ছে—সমাজের সে কি কাজে লাগ্‌ছে—সমাজের কি উপকার সে সাধন কর্‌ছে—তার দাবীও নির্ভর কর্‌বে এর ওপর। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য—এদের সবার মূল কথাটা হচ্ছে শূদ্রত্ব। এই হিসেবে শূদ্র বড়। যেখানে এই শূদ্রত্বকে আশ্রয় করে' ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য গড়ে' উঠে নি সেখানে তাদের ধ্বংস অনিবার্য্য। এমন কি বাহুবলে বলীয়ান যে রাজশক্তি তারও পতন নিশ্চয়। ফ্রান্সের রাজা চতুর্দ্দশ লুই যে বলেছিল L'état c'est moi—I am the state, এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ বাণীর প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হল ষোড়শ লুই ও মারি আন্‌তোয়ানেত্‌কে তাদের নিজ নিজ মাথা দিয়ে—আর তার গৌণ ফল হল যে ফ্রান্স থেকে ধীরে ধীরে রাজ-সিংহাসন পর্য্যন্ত উঠে গেল। এটা সৃষ্টিতন্ত্রের অনিবার্য্য নিয়ম। যেটা অকেজো যেটা অমঙ্গলকেই টেনে আন্‌ছে সেটা একদিন না একদিন খসে' যাবেই। সুতরাং সমাজের বুকের ওপর এই যে সন্ন্যাসীর সিংহাসন তা বজায় থাক্‌বে কি না তা নির্ভর কর্‌বে এর ওপরে যে সন্ন্যাসী যাঁরা তাঁরা সমাজের কোন উপকার কচ্ছেন অথবা তাঁদের দ্বারা সমাজের কোন অমঙ্গলই হচ্ছে। এ সম্বন্ধে সন্ন্যাসীর দায়ীত্ব খুব বেশী। কারণ সন্ন্যাসীর দ্বারা যে মঙ্গল বা অমঙ্গল হয় তা একেবারে সমাজের মূল থেকে আরম্ভ হয়। সন্ন্যাসী আপনার যে প্রভাব বিস্তার করেন তা সমাজের মনে মনে। এই জন্যই সন্ন্যাসীর ইষ্ট অনিষ্ট কর্‌বার ক্ষমতা বেশী। সমাজ কোন সমাজের লোকের দ্বারা অনিষ্টের ধার না ধার্‌তে পারে কিন্তু সন্ন্যাসীর দ্বারা যে অনিষ্ট তার বিরুদ্ধে সে খড়্গহস্ত হয়ে উঠ্‌বেই। কারণ সমাজের লোকের দ্বারা যে অনিষ্ট সেটা কাঁচা অনিষ্ট কিন্তু সন্ন্যাসীর দ্বারা যে অনিষ্ট সেটা একেবারে পাকা অনিষ্ট। সে অনিষ্টের মোটা মোটা শিকড়

এম্‌নি করে' সমাজের মন প্রাণকে জড়িয়ে ধরে যে তাতে তাদের আর নড়বার চড়বার শক্তি থাকে না। কারণ চিন্তার রাজ্যে প্রকৃত সন্ন্যাসী যাঁরা তাঁরা সাধারণ লোকের চাইতে শক্তিমান। আর জগৎটা যে Thought current এর দ্বারাই চালিত হচ্ছে এ সত্যটা পাশ্চাত্যও মেনে থাকেন।

সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে আমাদের এত কথা বল্‌বার উদ্দেশ্য এই যে আমাদের মনে হয় এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের দ্বারা আমাদের সমাজের একটা অমঙ্গল হয়ে এসেছে। কেমন করে'—সেইটেই আমরা এই প্রবন্ধে দেখ্‌তে চেষ্টা কর্‌ব। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন কথা বল্‌বার আগে মানুষ সম্বন্ধে আমাদের কি ধারণা সেইটে আমরা স্পষ্ট করে' বল্‌তে চেষ্টা কর্‌ব।

ভগবানের প্রতি আমাদের ভক্তি প্রেম না থাক্‌তে পারে কিন্তু তাঁর প্রতি আমাদের বিশ্বাস আছে অগাধ। তিনি যখন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তখন আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে তিনি তাহা ঠিকই সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ ইংরাজীতে যাকে বলে He meant it—সে সম্বন্ধে তিনি কোন জাল জুয়োচুরি করেন নি অথবা ঘি-বিক্রেতার মত তাতে কোন ভেজাল মেশান নি। তার সমস্ত সৃষ্টি সম্বন্ধে আমাদের এই একই বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের দ্বারা চালিত হয়ে মানুষকে আমরা কেমন্ বুঝেছি সেইটে আগে বল্‌ব।

মানুষের দেখ্‌তে পাচ্ছি আমরা দু'দিকে টান। একটা সান্তের দিকে একটা অনন্তের দিকে। তার জ্ঞাতিত্ব পৃথিবীর সঙ্গেও যেমন, আকাশের সঙ্গেও তেমনি। পৃথিবীর দিকে তার সত্যিকার টান আছে বলে'—কর্ম্মে কর্ম্মে সে পৃথিবীর বুকে আপনার অস্তিত্ব ফুটিয়ে তুলেছে, আপনার চিহ্ন যেখানে যেখানে পেরেছে সে পৃথিবীর পায়ে পায়ে এঁকে রাখ্‌তে চেষ্টা কর্‌ছে। পৃথিবীর পানে মানুষের এই যে টান সেটা ভালবাসার টান—আর ভালবাসা যেখানে আছে সেখানে আনন্দ আছেই—আর যেখানে আনন্দ আছে সেখানে অমঙ্গল নেই কিছুতেই। আবার অন্যদিকে আকাশের সঙ্গেও মানুষের সত্যিকার টান আছে। গাছ যেমন মাটীতে শিকড় গেড়ে আপনাকে আকাশে ছড়িয়ে দেয় মানুষও তেমনি। মানুষ যে গান করে, কবি যে ছন্দে ছন্দে আপনার হৃদয়ের রাগিনী ব্যক্ত করে, শিল্পী যে ছবি আঁকে, ভাস্কর যে পাষাণ কেটে কেটে তার রেখায় রেখায় কোন অজ্ঞাত লোকের সুষমা ফুটিয়ে তোলে এ সবই শুধু আকাশে আকাশে

দূর দিগন্তের কোলে কোলে যেখান থেকে কত রাত-জাগা অপ্সরীর পায়ের নূপুরের রিণি ঝিনি গুঞ্জন তাদের মর্ম্মে এসে পৌঁছাচ্ছে সেখানে সেখানে তাদের আপনাকে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াস মাত্র। শরতের পূর্ণিমা রাতে যখন জোছনায় জোছনায় জগৎটা ছেয়ে যায় আকাশটা ভেসে যায় তখন যে মানুষের মনে মনে প্রাণে প্রাণে একটা কেমন-যেন-কি ভাব জেগে ওঠে সেটা সেই অনন্তের টান—বর্ষায় যখন কাল কাল মেঘেদের মাথায় মাথায় ঝিলিক্ লাগে আকাশের কোলে কোলে গুর্ গুর্ দুর্ দুর্ ডাক ওঠে তখন যে মানুষের অন্তরে অন্তরে কোন্ অচিনপুরীর স্বপ্ন জেগে ওঠে সেও সেই অনন্তের টান। এই সান্ত আর অনন্ত নিয়েই মানুষ মানুষ।

কিন্তু সন্ন্যাসী সম্প্রদায়েরা মানুষের এই সান্তের দিকটা মানুষকে অবজ্ঞা কর্‌বার জন্য বরাবর উপদেশ করে' এসেছেন এবং সমাজের মনে মনে এম্‌নি করে' এই ভাবটা বিছিয়ে দিয়েছেন যে আমরা সবাই কম বেশী সংসার সম্বন্ধে উদাসীনতার খোলস্ পরে' কাল কাটিয়ে এসেছি। এই সান্তের দিকটা তাচ্ছীল্য কর্‌লে মানুষের ধর্ম্মের একপদ ভগ্ন করা হবে—আর একপদ ভগ্ন হলে অপর পদও বড় বিশেষ কার্য্যকরী হবে না। বাস্তবিকপক্ষে আমাদের দেশে বেদ উপনিষৎ লেখা হয়েছিল কোন্ যুগে? সেই যুগে যখন সন্ন্যাসীর গৈরিক পতাকার যাদুকরী মায়া সমাজের মনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে নি। ব্যাস বশিষ্ঠ ঋষি ছিলেন—সন্ন্যাসী ছিলেন না। একদিকে ইন্দ্রপ্রস্থ হস্তিনাপুর ছিল বলে, অপর দিকে নৈমিষারণ্যে ঋষিদের কণ্ঠে বেদমন্ত্র স্বচ্ছন্দ সহজ ও সত্য হয়ে উঠেছিল। আর তাঁদের তুলনায় কি চিন্তায় কি দার্শনিকতায় কি আধ্যাত্মিকতায় আজকার আমরা কি? হিমাদ্রির পাশে বল্মিক—অকূল সিন্ধুর তুলনায় নগণ্য বারিবিন্দু। আমরা যে আজ আধ্যাত্মিকতা আধ্যাত্মিকতা করে' বড়াই করি সে আধ্যাত্মিকতা প্রকৃতপক্ষে সমাজের মনে নেই আছে সেই প্রাচীন কালের লেখা গ্রন্থে। তাই আজ আমাদের সমাজ শাস্ত্রধর হয়েই আছে—আপনার দেবতায় সাক্ষাৎ সে পায় নি। সুতরাং আমাদের অনেকের এই যে ধারণা যে আমরা ইহলোকের ঐশ্বর্য্য গৌরব যশঃ মান ইত্যাদি বিসর্জ্জন দিয়ে আধ্যাত্মিকতার দিকটায় একটা মস্ত রকম লাভ লুটে নিয়েছি সেটা আমাদের হীনবল জাতীয় জীবনের মনের কাছে যেমনি আরামদায়ক তেমনি মিথ্যা। এ সম্বন্ধে যদি কেউ তর্ক তুল্‌তে চান তবে তাঁকে আজকার হিন্দুজাতির

সঙ্গে রামায়ণ মহাভারতের যুগের আর্য্যগণের তুলনা করে' দেখ্‌তে বলি—কারা বেশী সুন্দর সত্যময় আনন্দপূর্ণ—তাঁরা না আমরা। সেই যুগের মানুষের কৃত জিনিষ পত্তর নিয়েই আজ আমরা বড়াই কচ্ছি—এ জগতে কিঞ্চিৎ জান মান বাঁচিয়ে আজও বেঁচে আছি। অথচ তাঁরা সবাই ছিলেন পূর্ণ কর্ম্মী পূর্ণ ভোগী। মানুষের কোন ধর্ম্মকেই তাঁরা ছেঁটে ফেলেন নি। তাঁরাই ছিলেন প্রকৃত মানুষ ঈশ্বরের বিভূতি—যাকে ভগবান্ made in his own image. এ জগতে অমৃতের সন্ধান পেয়েছিলেন তাঁরাই। তাঁরা শক্তিমান ছিলেন তাই শ্রীমান্ ছিলেন। আমরা এ জগতে সন্ধান পেয়েছি শুধু পাপের। তাই আমরা ভীষণ রকম শুচিবাতিকগ্রস্ত হয়ে এ সৃষ্টির যেখানে যেখানে সম্ভব হয়েছে সেখানে সেখানে বড় বড় লাল অক্ষরে Censor নামাঙ্কিত টিকিট মেরে দিয়ে দিব্বি নিশ্চিন্ত মনে ব্যাকরণের সূত্র মুখস্ত কর্‌তে কর্‌তে জিহ্বা ক্ষয় কচ্ছি। নহুষ কার্ত্তবীর্য্যের শক্তি আমাদের নেই, ব্যাস বাল্মীক বশিষ্ঠ গৌতমের জ্ঞান আমাদের নেই, ইন্দ্রপ্রস্থ হস্তিনাপুরী অযোধ্যার সম্পদ আমাদের নেই। অথচ যখন বীর্য্য ঐশ্বর্য্য জ্ঞান ছিল তখন এরা সব এক সঙ্গেই ছিল। আর আজকার আমরা আমাদেকে দেখে কে বল্‌বে যে আমরা সেই উন্নতশির, প্রশস্তললাট, গৌরবর্ণ, বিশালবক্ষ, দীর্ঘবাহু, নির্ভীক-হৃদয় আর্য্যের বংশধর—আজকার আমরা হচ্ছি বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের বটতলার এডিসন। স্পষ্ট কথা আমরা শিবত্ব লাভ করি নি—আমরা লাভ করেছি ক্লীবত্ব।

প্রত্যক্ষের চাইতে বড় প্রমাণ আর কিছু নেই। আজকার বাঙ্গালার নরনারীর অন্তরের দরজায় ঘা দিয়ে দেখ্‌লে স্পষ্ট বোঝা যাবে যে সেখান থেকে আনন্দের কলধ্বনি ফুট্‌ছে না হাহাকার উঠ্‌ছে। আসলকথা আমরা আজ এ জগতে ঐশ্বর্য্য গৌরব যশঃ মান হারিয়ে বসে আছি কিন্তু তার ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে বড় রকম লাভ কিছুই হয় নি—কিছু মাত্র লাভ হয়েছে কি না সেটাও তর্কের বিষয়। আর আমাদের এই যে অবস্থা তার জন্য দায়ী অনেকখানি সেই গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় যাঁরা সমাজের নরনারীর কাণে কাণে বলে বেড়িয়েছেন "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা" "সংসার মায়া" ইত্যাদি ইত্যাদি। এই শিক্ষাকে আশ্রয় করে, আমাদের দেশবাসী হারিয়েছে পুরুষকার—সে অমঙ্গলকে আশ্রয় করে

সমাজে মাথা তুলেছে দারিদ্র্য—দারিদ্র্যের সহবাসে আমাদের মন প্রাণ সব হয়ে গেছে সংকীর্ণ ও নীচ—দীন হীন প্রাণ নিয়ে আজ আমরা শক্তিহীন আনন্দহীন। জগতে আমরা কোন কাজ দেখি না—সৃষ্টিতে কোন সুখ পাই না—এ বিশ্বমানবের মহামেলায় আমাদের কোন সহানুভূতি নেই—সেখানে আমাদের কিছু বল্‌বার নেই, কর্‌বার নেই, কিছু শিখ্‌বার নেই, শিখাবার নেই। এর চাইতে বড় অধর্ম্ম মানুষের আর নেই।

এই যে শিক্ষা—এই যে অমঙ্গল—যা আমাদের সমাজকে কোন আনন্দ লোকে নিয়ে যাই নি—অথচ সমস্ত জগতের অবজ্ঞা পাবার অধিকারী করে,' তুলেছে—তার বিরুদ্ধে সমাজ-দেহ থেকে একটা সংগ্রাম উঠ্‌তে বাধ্য। কারণ জীবদেহে কোন অমঙ্গল চিরদিন বাসা বেঁধে থাক্‌তে পারে না। সে অমঙ্গল একদিন না একদিন ধরা পড়্‌বেই। আর একবার ধরা পড়্‌লে সে অমঙ্গলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষিত হবেই। সে সংগ্রাম ঘোষিত হবে সেইদিন যে দিন সমাজ গতানুগতিকের দাসত্ব ছেড়ে আপনার জন্য আপনি চিন্তা কর্‌তে শিখ্‌বে—যেদিন সমাজ প্রাণবন্ত হবে—সজাগ হয়ে উঠে বস্‌বে। সুতরাং সন্ন্যাসী যদি এখন সময় থাক্‌তে থাক্‌তে আপনার সংস্কার না করেন তিনি নিজ প্রকৃতির দ্বারা চালিত হয়ে নিজে যে পথই অবলম্বনই করুন না কেন—তিনি যদি সৃষ্টি সম্বন্ধে তাঁর doctrineএর পরিবর্ত্তন না করেন—সমাজের atmosphere এ বিভিন্ন প্রকারের, বর্ত্তমান সময়ের সঙ্গে খাপ-খাওয়ান চিন্তারাশী ঢেলে না দেন—মানুষের মধ্যে যাতে করে, পুরুষকার উৎসাহ উদ্যম প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশী উদ্বুদ্ধ হয় তার সাহায্য না করেন তবে এমন একদিন খুব দূর বলে' মনে হয় না যখন সন্ন্যাসীর সিংহাসনখানি সমাজের বুক থেকে ধীরে ধীরে চ্যুত হয়ে পড়্‌বে। কারণ আমাদের মনে হয় এই সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম সমাজের অন্তরে অন্তরে কিছুদিন থেকে আরম্ভ হয়ে গেছে। আর আমাদের ধারণা যে সে সংগ্রামের ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন আপনার অজ্ঞাতসারে বিবেকানন্দ। কারণ মানুষের মুখের কথার চাইতে মনের কথা বড়—মানুষের পরণের কাপড়ের রঙের চাইতে অন্তরের রঙ্‌ বেশী গাঢ়।

জীবনের খেলা

জীবনের খেলা গড়ে তুল্‌তে হবে সত্যের ওপর। সকল বৃত্তি—মনের হোক্, প্রাণের হোক্, শরীরের হোক্, এ সকলের মধ্যে যে ভুলটুকু আছে তা দূর করে তাদের সত্যধর্ম্মটি খেলিয়ে তুল্‌তে হবে। আমাদের এই আদর্শটি শুনে কেউ কেউ জিজ্ঞেস করেছেন, (১) জীবনটা যদি শুধু খেলা বলেই স্বীকার করা হল তবে খেলার সত্যটি ফুটিয়ে তোল এ কথা বলার তাৎপর্য্য কি? খেলার আবার সত্যি খেলা ভুল খেলা কি? খেলামাত্রই ত ভুল। (২) সিদ্ধের লক্ষণ হচ্ছে সমতা, তিনি নির্দ্বন্দ্ব নিত্যসত্ত্বস্থ। সর্ব্বতঃ তিনি সমদৃষ্টি, সব জিনিষেরই মূল্য তাঁর কাছে সমান। তিনি আবার কেমন করে বলেন যে জীবনের এ ভঙ্গিমাটি চাইনে, আর একটি চাই? তিনি ত সমস্ত জীবনটি—তার সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, জয়-পরাজয়, শুভ অশুভ, জ্ঞান অজ্ঞান—সব দেখ্‌ছেন সমান উদাসীন ভাবে। তবে তাঁর মধ্যে কোন একটা বিশেষ কিছু কর্‌বার চেষ্টা কি ক'রে আস্‌তে পারে, তাঁর কাছে সত্যখেলা মিথ্যাখেলার অর্থ কি ? মিথ্যাবুদ্ধি যতক্ষণ ততক্ষণই ত মানুষ এটা চায় না ওটা চায়, ভেদ জ্ঞানের ফলেই ত সে সর্ব্বদা চঞ্চল।

জীবনটা খেলা সত্যি কথা। কিন্তু খেলা হলেই যে সে একটা মিথ্যা কিছু হবে এ মনে করার চেয়ে বড় মিথ্যা নেই। খেলার উপমাটি একটু ভাল করেই দেখা যাক। খেলা বল্‌তে আমরা সাধারণতঃ বুঝি যা অকেজো, যার কোন সার্থকতা নেই। কাজের জিনিষ যেটা তা হচ্ছে খেলার বিপরীত। যেমন বৃদ্ধেরা আমাদেকে বলে থাকেন বিয়ে থা কর, চাকরী কর—এ হচ্ছে কাজের কাজ। আর স্বদেশী করা বা তাসখেলা হচ্ছে অকেজো বাজে। স্বীকার কল্লেম। কিন্তু তাই বলে কি এ কথা বলা চলে বিয়ে করাটা হচ্ছে সত্য আর তাসপেটা মিথ্যা, মায়া ? অকেজো বা তা মিছে হতে পারে কিন্তু মিথ্যা নয়। বিয়ে করাটা যে হিসেবে সত্য বস্তুতন্ত্র, তাসখেলাটাও ঠিক সেই হিসেবেই সত্য বস্তুতন্ত্র। সমস্ত জীবনটাকেই যদি খেলা বলে ধরি

তার অর্থ এ নয় যে সে একটা ভুয়ো জিনিষ মায়া নু মতিভ্রমো নু। সে বস্তুটি খুবই জাগ্রত। শুধু বল্‌তে পার সেখানে এক রকম খেলা আছে যাতে তাসখেলারই মতো কোন ফয়দা নেই, আর এক রকম খেলা আছে যা বিবাহের মতনই বহু ফলপ্রসূ।

কিন্তু খেলাটা মিথ্যা না হলেও, খেলার ভঙ্গীর মধ্যে ভুল থাকৃতে পারে আর তাকেই আমরা বলি ভুল খেলা। বিশেষ খেলার বিশেষ নিয়ম পদ্ধতি আছে। খেল্‌তে হলে সেই নিয়ম অনুসারে চল্‌তে হবেই। সেই সাধারণ নিয়মের অনুগত হয়েই তুমি তোমার প্রতিভা দেখাতে পার। এমন ফন্দী করে এমন কৌশল দেখিয়ে তুমি খেল্‌তে পার যখন আর কেউ তোমাকে ঠকাতে পারে না, তুমি যখন সর্ব্বদা জয়ী তখনি তুমি ওস্তাদ। ঠিক সেই রকমই জগতের খেলায় যে ওস্তাদ, যে পাকাখেলোয়াড়, যার কর্ম্মসুকৌশলম্ তারই নাম প্রকৃতপক্ষে যোগী। যারা ভাল খেলা জানে না, তারা খেলার নিগূঢ় নিয়মও ভাল করে জানে না, তারা খেলে মন্দভাবে এলোমেলো ভাবে। সেই জন্যই আমরা বলি লোকটা ভুল খেলছে। এই ভুল করে খেলাই ভুল খেলা। কেবল এই অর্থেই আমরা বল্‌তে পারি মিথ্যে খেলা। আমরা সাধারণতঃ জীবনটা চালিয়ে দিই আনাড়ীর মতো—ইন্দ্রিয়ের ক্ষণিক উত্তেজনায়, প্রাণের আবেগে, মনের খেয়াল অনুসারে। খেলার যে কি নিয়ম তাও ভাল ক'রে দেখবার আমাদের ধৈর্য্য নেই। কিন্তু এ সকল উচ্ছৃঙ্খলতাকে বশীভূত করে, সকল বৃত্তিকে শক্তিকে শুদ্ধ করে সাজিয়ে গুছিয়ে, স্থিতধী হয়ে জীবনের খেলার গূঢ় রহস্যটি জেনে যে খেলে সেই হচ্ছে দিগ্‌বিজয়ী খেলোয়াড়, অথবা যোগের ভাষায় সিদ্ধপুরুষ।

জীবনের খেলা বুঝ্‌তে হলে সকলের আগে বুঝ্‌তে হবে জীবনের বা প্রকৃতির দুটি গতি; একটি ভিতরের, আর একটি বাইরের, একটি উপরের আর একটি নীচের, একটি সূক্ষ্ম আর একটি স্থূল। দার্শনিক ভাষায় এদের নাম নিত্য ও বিকার। দুটিই সত্য, অর্থাৎ কোনটিই মায়া মরীচিকা কিছু নয়। তবে একটি হচ্ছে সত্যের বস্তুর সরল ঋজুবলম্বিত খেলা আর একটা তারই কুটিল বঙ্কিম ভঙ্গিমা। একটা ভগবানের সজ্ঞান প্রতিষ্ঠার খেলা আর একটা তাঁরই আপনাহারা খেলা। নিত্য ও বিকার, সাধারণ জীবন ও ভাগবতজীবন একই জিনিষের দুই পিঠ মাত্র। যখন নিত্য অহংকারের ভিতর দিয়ে প্রতিফলিত হয় তখনই সে ধরে বিকারের রূপ। অহংকারের

উৎপত্তি কেন, কেন এই দুই রকম উল্টো খেলা, ভগবান আবার আপনাকে কেন হারিয়ে বসেন কেনই পুনরায় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন—এ সকল প্রশ্ন নিরর্থক। সৃষ্টি আদৌ কেন, ভগবানই বা কেন এ সকলের কোন মানে নেই। এই রকমই যে দেখ্‌ছি, এতেই ভগবানের আনন্দ, খেলার এই রকমই ভঙ্গিমা। তার আর উপায় কি?

নিত্যের যে একটা খেলা থাক্‌তে পারে এ কথা হয়ত অনেকেই বুঝ্‌বেন না। তাঁরা বল্‌বেন নিত্য যা তা স্থাণু, অচল, অতীন্দ্রিয়—অক্ষর ব্রহ্ম। সৃষ্টি, জগৎ সবটাই হচ্ছে বিকার। কারণ অহংকার থেকেই ত জগতের উৎপত্তি, 'আমি অভিমান থেকেই খেলার আরম্ভ। 'আমি' গেলে, অহং গেলে নিত্যেরখেলা বলে কিছু থাকে না, জগতই থাকে না, থাকে সেই অচঞ্চল, সকল বিকৃতি সকল পরিণামহীন সত্তা। এই কথাটাই আমরা মানি নে। জগৎ অহংকার থেকে সৃষ্টি হয় নি। জগৎ সৃষ্টি হয়েছে ঈশ্বর-ভাব থেকে। সকল অহংকারের অবসান যেখানে সেখানেই এই ঈশ্বর-ভাব সম্ভব। অহংকারের উল্টো পিঠ হচ্ছে এই ঈশ্বর-ভাব। অহংকার যাবে বল্‌ছি কিন্তু তাই বলে ব্যক্তিত্বও যে যাবে তা নয়। ব্যক্তিত্ব ব্যষ্টিত্ব, থাক্‌বে কিন্তু একের, সমষ্টিরই প্রকাশের আশ্রয়রূপে—অনন্তেরই বিস্ফুরণের জন্যে আতস কাঁচখানির মতো। ব্যক্তির অথবা ব্যষ্টির এই যে নিগূঢ় ঈশ্বর-ভাব তার মধ্যে অহংকার দাগ কেটে দেয় মাত্র, খণ্ড খণ্ড করে, ভেঙ্গে ছোট সঙ্কীর্ণ করে সব জিনিষ দেখায়। কিন্তু জগতের উৎপত্তি অহংকারের উপরের স্তরে, মহর্লোকে, বিজ্ঞানে। সত্তার চেতনা থেকে যখন তপঃশক্তি বিচ্ছুরিত হয় তখন সে এই বিজ্ঞানলোকে এক একটা নিগূঢ় ভাবকে কেন্দ্র করে তবে প্রকাশ পেতে চায়। এই ভাবটিই ক্রমে ক্রমে স্থূল হতে স্থূলতর হতে থাকে, শুদ্ধবুদ্ধি, মন, চিত্ত, প্রাণ ও দেহে মূর্ত্ত হয়ে ওঠে। অহংকার বা ভগবানের মোহকরী বিদ্যার প্রভাবে এই বিজ্ঞানের ভাব, আমাদের সকল প্রকৃতির সকল স্তরের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালক যা তা যবনিকার অন্তরালে ঢাকা থাকে, ও অলক্ষ্যে সুতরাং বিকৃতভাবে কাজ কর্‌তে থাকে। অহংকার, মোহ দূর করে যখন দেখ্‌তে পাই দেহ প্রাণ চিত্ত মন বুদ্ধি বস্তুতঃ কার ছায়া, না জেনে কারই প্ররোচনায় চল্‌ছে, সকল সৃষ্টি ও বৈচিত্র্যের জনক তাদেরই স্বরূপ সেই বিজ্ঞানের, সেই ভাবলোকের মুক্ত প্রেরণায় বেগে যখন তাদেকে গড়ে উঠ্‌তে দিই তখনি হচ্ছে নিত্যের প্রতিষ্ঠা সত্যধর্ম্মের খেলা—দিব্য জীবন। তাদের গায়ে যখন অহংকারের কালিমা

মেখে রাখি সেটা হচ্ছে বিকারের খেলা, প্রাকৃতজীবন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এখন সিদ্ধপুরুষ যিনি অর্থাৎ যাঁর সর্ব্বত্র সমতা হয়েছে তিনি এ কথা কেমন করে বলেন যে এ রকম জীবনটা চাই নে, আর এক রকম চাই। এটা ত ভেদবুদ্ধির কথা, অসমতারই কথা। এ জীবনে ও জীবনে, শক্তি অশক্তি, পাপপুণ্য এমন কি জ্ঞানে অজ্ঞানে তাঁর কি এসে যায়? তিনি যে সব বিষয়েই উদাসীন। এ আপত্তি যাঁরা করেন তাঁরা শুধু কথার মারপ্যাঁচে আবদ্ধ। বাস্তবিকপক্ষে যেটাকে বল্‌ছি 'প্রাকৃতজীবনের অহঙ্কারের খেলা সেটাই হচ্ছে অসমতার খেলা। অন্তর যতই সমতায় ভরে আস্‌তে থাকে তখন অব্যর্থভাবে সেই সমতার খেলাই ফুটে উঠ্‌তে থাকে। চাই বা চাইনে এ কথা বল্‌তে যে একটা বাসনার আবেগ দেখা যায় সিদ্ধের মধ্যে সে রকম কিছু নেই। এই যেমন আমাদের পৃথিবীটে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুর্‌ছে, এতে তার চাওয়া না চাওয়া কিছু নেই অথচ একটা নিগূঢ় প্রেরণার বলে নিয়মমত ঠিক ঘুরে চল্‌ছে। ঠিক সে রকম সিদ্ধেরও আসক্তি বিরক্তি কিছু নেই, কারণ তাঁর অহঙ্কার অভিমান নেই আর নেই বলেই তাঁর মধ্যে তাঁর ভাগবত প্রকৃতি, স্বয়ং ঈশ্বরের তপোবল লীলায়িত হয়ে উঠ্‌ছে। এই তপোবলের ধাক্কাতে কতকগুলি জিনিষ খসে পড়্‌তে থাকে, কতকগুলি আবার জম্‌তে, ভেসে উঠ্‌তে থাকে। খসে পড়্‌তে থাকে তারা যারা সে ঈশ্বর ভাবের সাথে খাপ খেয়ে চল্‌তে পারে না, যারা অন্যরকম ভাবের অন্যরকম বিন্যাসের উপকরণ। আর জন্মাতে থাকে তারা যারা সেই ভাবেরই খাত, প্রণালী, শরীর।

সিদ্ধের কাছে জ্ঞান অজ্ঞান সমান এ কথার অর্থ কি? জ্ঞানী বলেই না তাঁর কাছে জ্ঞান অজ্ঞান সমান অর্থাৎ জ্ঞানেই তিনি জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যে একটা একত্ব উপলব্ধি করেছেন। জ্ঞান অজ্ঞান, শক্তি অশক্তি সব সমান, কারণ, এই যে দ্বৈত তা সেই পরম সত্যের একের অভিব্যক্তি। কিন্তু তাদের মধ্যে ঐক্য থাকলেও তারা যে একই জিনিষ তা বলা চলে না। এক যেমন সত্য, একের বহুত্বও তেমনি সত্য। কাজেই বহুর মধ্যে পার্থক্যটাও তেমনি সত্য। ঐক্য জিনিষটা সত্বাগত, কিন্তু ভেদ ও আছে। ভেদ জিনিষটা কর্ম্মগত। বহু আছে বলে এক যে নেই তা নয়। কর্ম্ম আছে বলে সত্বা যে নেই তাও নয়। তেমনি এক আছে বলে যে বহু থাকৃতে পারে না, সত্বা আছে বলে যে কর্ম্ম থাকৃতে পারে না

তাও নয়। সত্বার মধ্যে ঐক্য সমত্ব বোধ করে কর্ম্মের মধ্যে বাছাই যাচাই করে বৈচিত্র্যকেই ফুটিয়ে তুলতে পারা যায়। তবে এ বাছাই যাচাই তুমি আমি অহংকার অভিমান দিয়ে হয় না--তা করেন ভগবান স্বয়ং, তোমার আমার মধ্যে অন্তর্যামী সে জাগ্রত দেবতা। আর তাঁর পছন্দ অনেক সময়েই আমাদের অভিরুচি আমাদের চিরপরিচিত সংস্কারের সাথে সাথে খাপ খায় না। তাঁর যে তৃতীয় পন্থা। আমরা যে যোগের কথা বলছি তার লক্ষ্যই হচ্ছে মুরারীর এই তৃতীয় পন্থাটি আবিষ্কার করা, সেই পথেই চলতে থাকা। তাঁরই সমাহিত প্রেরণার বশে যাচাই বাছাই করে নিপুণভাবে জীবনের খেলাটি সুসম্পন্ন করতে থাকা।

প্রবর্ত্তক—২য় বর্ষ, ১৬শ সংখ্যা.

তপস্যা

জগৎ এবং ব্রহ্ম অভিন্ন। জগৎ ছাড়া ব্রহ্ম নয়, ব্রহ্ম ছাড়া জগৎ নয়। সুতরাং জগতের যাহা কিছু পরিত্যাগ করিয়া জগতাতীত বস্তুর অন্বেষণে বাহির হইতে হইবে ইহা অযুক্তিকর। জগতে থাকিয়াই জগতের মূলতত্ত্বের সন্ধান করিতে হইবে। যাহা অনন্ত তাহার আবার অংশ কি? একই পুষ্করিণীর জল যষ্টির ব্যবধানে দুইভাগে খণ্ডিত ও বিভক্ত পরন্তু জল সেই একই। জগৎ ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নহে তবে মায়াভেদে যে বহুর সৃষ্টি হইয়াছে—এই মায়াতত্ত্ব বোধ হইলে আমার অজ্ঞান-জনিত যে দ্বন্দ্ব তাহা তিরোহিত হইবে।

অহঙ্কার আমাদের ভেদকে বহুত্বকে প্রকট করিয়া তুলিয়াছে। এক একটী অহঙ্কারের ব্যবধানে একটী একটী ব্যষ্টির সৃষ্টি, অহং-এর গুণাদিভেদে এই ব্যষ্টি বহু প্রকারের বহু ভাবের; ইহার সমীকরণ ও সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে এই ব্যষ্টিত্বকে ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। শুদ্ধ সমষ্টিশক্তি এই বহু ব্যষ্টির সংমিশ্রণেই সুসিদ্ধ হইবে। ব্যষ্টিগুলিকে লয় করিয়াই যে সমষ্টিশক্তিকে জাগ্রত করিতে হইবে এরূপ নহে—পরন্তু তপস্যার দ্বারা ভেদের মধ্যে বহুর মধ্যে যে অভেদ ও একের সত্বা বিরাজ করিতেছে তাহা বুঝিতে হইবে এবং সেই মূলবস্তুকে লাভ করিয়া তপঃশুদ্ধ ব্যষ্টিগুলি এক বিরাট সমষ্টিতে পরিণত হইবে।

বাহিরের কোন ভাব বা কার্য্যের অনুগত হইয়া কোটী কোটী ব্যষ্টি যদি সমষ্টিশক্তিতে পরিণত হয় তাহা স্থায়ী হইবে না। কেননা বাহিরের যে অভিব্যঞ্জনা তাহার সবখানি সত্য নয়—ভিতরের সত্বার ইচ্ছাদিভেদে তাহার প্রকাশ ও পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। আজ যেখানে যে স্বার্থ যে কর্ম্ম সমগ্র জাতির আদর্শ ও উদ্দেশ্য বলিয়া অনুমিত হইতেছে, কালের কঠোর চক্রে আবর্ত্তিত হইয়া তাহা খণ্ড খণ্ড হইয়া ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে পারে।

যেখানে একই স্বার্থে প্রণোদিত হইয়া একটা জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল সেখানে বহু আদর্শের উদ্ভব হওয়ায় বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন সমষ্টির সৃষ্টি হইতে পারে এবং পরস্পরের ভাবের বৈপরীত্য ঘটিলে দ্বন্দ্ব সংগ্রাম প্রভৃতি সৃষ্টি হইয়া জগতে চির অশান্তির সৃষ্টি হইবে।

জগতে যুগে যুগে এইরূপ লীলাই প্রকটিত হইয়া আসিতেছে। মানব-জাতি সমস্বার্থের বশীভূত হইয়াই সমষ্টিবদ্ধ হয়, সে স্বার্থের পরিবর্ত্তনে জাতির মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি হইয়া থাকে—ফলে কুলধর্ম্ম ও জাতিধর্ম্মনাশে মানব-জাতি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষে যে কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা এই স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া—আজ য়ুরোপও যে শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে তাহাও স্বার্থসিদ্ধির আশায়। আর যাহারা মিত্র-জাতি তাহারা একই প্রকার স্বার্থের ছত্রতলে দাঁড়াইয়াছে। যদি কখন স্বার্থ-ভেদ উপস্থিত হয় তখন মিত্রতা ভুলিয়া পরস্পরের বিপক্ষে যে পরস্পর অস্ত্রধারণ করিবে না তাহা কে বলিতে পারে? যে রুশিয়া একদিন ব্রিটনের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি বলিয়াই প্রতীত হইত সমস্বার্থের জন্য আজ সে ব্রিটীশরাজের পরম মিত্র। ফরাসি-জাতিও ব্রিটনের সহিত চিরবিরোধের কথা বিস্মৃত হইয়া তাহার সহিত প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ। এ মিলনের ভিত্তি কিন্তু চিরস্থায়ী নহে। ভারতবর্ষ অন্তর্দ্দর্শী তপস্বী, সে এ তত্ত্ব বুঝে—বুঝে বলিয়াই এই মহাবিপ্লবের দিনে সর্ব্বপ্রথমে স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে। স্বপ্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর হইলে, যে ঐক্য ও মিলনের স্বপ্নে আজ সমগ্র জগৎ বিভোর হইয়াছে, তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সে কঠোর তপস্যা করিবে।

ইহাই ভারতের নবীন দলের আশা ও আদর্শ। ভারতের নবীন সাধক ভারতবর্ষকে একটা জাপান, একটা ফ্রান্স বা ইংলণ্ডে পরিণত করিতে চাহে না। প্রাচ্যের হৃদয়ক্ষেত্রস্বরূপ ভারতবর্ষ ভোগভূমি নহে, ভোগেরও বাহিরে যে শুদ্ধ আনন্দ বিরাজ করিতেছে সেই আনন্দেই ভারতের প্রতিষ্ঠা এবং সেইখানে দাঁড়াইয়া কলুষিত জাগ্রত জগতের সকল মানব-জাতির মধ্যে তুরীয় জগতের যে অনাবিল আনন্দ-ধারা তাহাই বর্ষণ করিবে। সে, স্বর্গের দুন্দুভি-নিনাদে জগতে এক সুমহান্ শান্তির প্রতিষ্ঠা করিবে।

এত বড় কার্য্যকে সুসিদ্ধ করিতে হইলে ভারতের সাধককে জানিতে হইবে যে কতখানি কঠোর তপস্যা তাহাকে করিতে হইবে—কত দীর্ঘ-যুগ

তাহাকে প্রতীক্ষা করিতে হইবে—সিদ্ধির জন্য কতখানি সাহস কতখানি ধৈর্য্য কতখানি বিশ্বাসের তাহার আবশ্যক। আমরা তাই বাহিরের ফাঁকা আওয়াজে আত্মহারা হইয়া সাধক যাহাতে যোগভ্রষ্ট না হয় তাহার আয়োজন করিতে চাহি। ভারতবর্ষ যে দিন দিন শুধু আপেক্ষিক উন্নতি লাভ করিবে তাহা নহে, সে জগতের সমুচ্চ শিখরে দাঁড়াইয়া মঙ্গলশঙ্খ-ধ্বনিতে জগৎ মুখরিত করিয়া তুলিবে; হিংসা বিদ্বেষ নরহত্যা চৌর্য্য-বৃত্তি এগুলি মানুষের অশুদ্ধ সংস্কার মাত্র। যাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি আছে তাঁহারা অনায়াসেই দেখিতে পারেন ভারতবর্ষ দিন দিন কিরূপ উন্নতির পথে ছুটিয়াছে। বাংলার সকল প্রকার কর্ম্মীদের আমরা এই মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে অনুরোধ করি। রাজনীতিক আন্দোলনের চরম উৎপত্তি যে এনার্কিজম উহা আমাদের স্বভাব-বিরুদ্ধ, উহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আমাদের অপরাজেয় নৈতিক শক্তিকে জাগ্রত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে। অবশ্য এইরূপ উত্থান আমাদের যে ব্যক্তিগত ক্ষতি ও ত্যাগস্বীকার না করিয়াই হইবে এরূপ বলি না—পদতলে কুশাঙ্কুরও যে বিধিবে না, শরীরে কণ্টক বিদ্ধ হইয়া শোণিত ধারা যে ছুটিবে না এ কথা আমরা বলি না; কঠোর অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়াই আমাদের এই সমুচ্চ আদর্শের পথে ছুটিতে হইবে। আজ অনেকে বাহ্বাস্ফোট বাহাদুরী দেখাইয়া যে সম্মানে ভূষিত হইয়া গর্ব্ব বোধ করিতে ছুটিয়াছেন, জানিও ইহা ক্ষুদ্র-জনেরই লভ্য সামগ্রী; প্রকৃতি-দত্ত বিজয়-তিলক যাহার ভালে শোভা পাইবে তাহাকে জগতের ভাবী মঙ্গলের জন্য কঠোর তপস্যা করিতে হইবে। আমরা প্রবর্ত্তকে আমাদের জীবনের গতি কোন্‌দিকে পরিচালিত করিতে হইবে তাহা ক্রমশঃ খুব স্পষ্ট করিয়া ফুটাইয়া তুলিব। হে সাধক! স্থিতধী হইয়া অপেক্ষা কর, বিধিপূর্ব্বক প্রণতি সহকারে আত্মোৎসর্গ করিবার জন্য প্রস্তুত হও—দেবধাম তোমাদের সম্মুখে।

কলির সত্য

হিন্দুর বিশেষত্ব যে তাহারা ভগবদ্‌বিশ্বাসী। হিন্দু কেবল-ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই নিশ্চিন্ত নহে পরন্তু ঈশ্বর লাভের জন্ত যথাসর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতেও কৃতসঙ্কল্প। ঈশ্বরের স্তুতিনতি পূজা প্রভৃতির দ্বারা ঈশ্বরারাধণার যথেষ্ট করিলাম বলিয়া তাহারা নিরস্ত হয় না অধিকন্তু দেহ প্রাণ মন প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গ দিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে চাহে। হিন্দুর ঈশ্বর সান্ত মুর্ত্তিমান, তিনি ভক্তের সহিত একত্র আহার করেন, বিচরণ করেন; কোথাও তিনি সখা কোথাও প্রভু কোথাও ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ কোথাও বা প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণরূপে ভক্তের সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

* * *

হিন্দু দ্বৈতভাবে ভগবানের সহিত সকল রস উপভোগ করিবারই যে কেবল পক্ষপাতী তাহা নহে। হিন্দু, ভক্ত ও ভগবানকে একাধারে দেখিয়া থাকেন, আপনার স্বাতন্ত্র্য যোগবলে বিলীন করিয়া স্বয়ম্ভু শিবময় হইয়া শিবোহং শিবোহং শব্দে ভারতের আকাশ প্রান্তর মুখরিত করিয়া তুলেন। প্রকৃতির উপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করিয়া দ্বন্দ্বাতীত অবস্থায় জীবকে শিবস্বরূপ জানিতে ভারতের সাধকবৃন্দকেই দেখিতে পাওয়া যায়। কাশীর তৈলঙ্গস্বামীর কথা অনেকেই অবগত আছেন। এই রক্তমাংসের শরীর লইয়া শীততাপ হেলায় সহ্য করিয়া কখন তিনি প্রচণ্ড গ্রীষ্মে মধ্যাহ্নের উৎকট রৌদ্রে মণিকর্ণিকার শ্মশানে প্রজ্জলিত চুল্লিপার্শ্বে উপবিষ্ট আবার কখন বা দারুণ শীতে ভাগীরথীর তুষারশীতল জলে ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছেন। মানুষকে এইরূপ শিবময় অবস্থা প্রাপ্ত হইতে দেখা ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোন দেশে সম্ভব কি?

* * *

আবার আমরা দেখিয়াছি সুজলা বঙ্গদেশের পুণ্যক্ষেত্র তারাপীঠে মহাকৌল বামাক্ষেপাকে। তিনি কখন স্নানান্তে সভক্তি পুষ্পাঞ্জলি লইয়া বশিষ্ঠাশ্রমের প্রস্তর-স্তূপের উপর "ওঁ নমঃ কালিকায় নমঃ" বলিয়া অঞ্জলিপূর্ণ ফুলদল নিক্ষেপ করিতেছেন কখন বা স্ব-আসনে অধিষ্ঠিত শৃগাল

কুক্কুর পরিবেষ্টিত হইয়া সর্ব্বং ব্রহ্মৈব জ্ঞানে একাসনে আহার করিতেছেন। কখন দ্বৈতভাবে ভক্তের মত মহাকালীর পূজায় তন্ময় হইয়া স্তব করিতেছেন আবার কখন বা আপনাকেই সকল তত্ত্বের অধীশ্বর জ্ঞানে 'অহং ব্রহ্ম' 'অহং ব্রহ্ম' শব্দে দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছেন। এই দ্বৈতাদ্বৈত এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ জ্ঞানের চরম পরকাষ্ঠা হিন্দুর জীবনে যেমন বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে কুত্রাপি তাহা সম্ভব হইবে কি?

* * *

ভারতের ধর্ম্মতত্ত্ব আজও মধ্যাহ্ন সূর্য্যের মত দেদীপ্যমান। হিন্দুর সাধনতত্ত্ব যেমনি গম্ভীর তেমনি মহীয়ান্। তত্রাচ হিন্দু কেন বাস্তব জগতে হেয়, অপদার্থ বলিয়া পরিগণিত হয়? এই সমস্যার চূড়ান্ত নিরাকরণ করা চাই।

* * *

কাল প্রভাবে ভারতের ভাগ্যে কলির উদয়, কলির প্রতাপে ভারতবর্ষের ধর্ম্ম একপাদ মাত্র, ত্রিপাদ অধর্ম্ম ভারতের অধিকাংশ ভাব আত্মসাৎ করিয়াছে। এই একাংশের দ্যোতনায় ভারতবর্ষ এখনও আলোকিত; দিন আসিতেছে—আবার চতুষ্পাদ ধর্ম্মের বিকাশ ঘটিবে। অনেকেই মনে করিতে পারেন কলির কি অস্ত হইয়াছে—না, এখনও বহু সহস্র বৎসর কলির পরমায়ু। তবে কলিযুগ এক মহাযুগ, এই যুগে চতুর্যুগের যে লীলা তাহা অভিনীত হইবে।

* * *

শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের পর ৫০০০ হাজার বৎসর অতীত হইয়াছে। এই পাঁচহাজার বৎসরে ভারতের যে কি ক্ষতি হইয়াছে তাহা আর বলিবার নয়। বর্ণাশ্রম ভাঙ্গিয়াছে—কুলক্ষয়জনিত, ভারতবাসীর সে বীর্য্য সে সাহস আর নাই—নির্বিষ গোখুরা পথিকের পদতলে দলিত হইতেছে, বৃথা আস্ফালন দেখিয়া লোকে আর হাস্য সম্বরণ করিতেছে না, পদে পদে সে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হইতেছে। এইরূপ অবস্থায় কলির পূর্ণলীলাকাল অব্যাহত থাকিলে ভারতের চিহ্ন থাকিবে না অথচ যুগ-ধর্ম্মের পূর্ণ প্রভাব ভারতবর্ষই পূর্ণভাবে ভোগ করিবে—ইহাই ভগবানের ইচ্ছা; সেই জন্য কলিযুগের মধ্যেই সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে, এই পাঁচ হাজার বৎসরে যে ক্ষয় হইয়াছে তাহার প্রতিরোধ করিয়া শ্রীভগবান্ আবার তাঁর সত্যলীলা

ভারতের বক্ষে প্রকটিত করিয়া তুলিবেন।

* * *

নিদারুণ নিদাঘে ধরাবাসী যখন পরিত্রাহি চীৎকার করে, নদী নালা খাল বিল জলশূন্য হয়, মাঠ প্রচণ্ড রবিকিরণে ঝলসিয়া উঠে—সেই সময়ে সহসা যদি সমস্ত গগন আচ্ছন্ন করিয়া মেঘমালা ইতস্ততঃ ছুটিতে থাকে, বিদ্যুৎপ্রভার চমকের সঙ্গে গুরু গুরু মেঘগর্জ্জন শুনিতে পাওয়া যায় তখন মর্ত্ত্যবাসীর কি আনন্দ! আবার অমৃতধারার মত অবিরল বারিবর্ষণে বসুন্ধরা যখন সুশীতল হইতে থাকে জীবজগতের তখন আর উল্লাসের সীমা থাকে না। আজ সেই ভারতবর্ষ যখন পাপভারে মৃতপ্রায় —ভারতের বেদবিৎ ব্রাহ্মণ যখন রুদ্ধকণ্ঠ—সন্ন্যাসী তপস্বী ঋষিবৃন্দ যখন গুহাবসী—অকালমৃত্যু দুর্ভিক্ষ মহামারীতে যখন দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে—ঠিক সেই সময়ে ভারতের আকাশ ধ্বনিত করিয়া এক আশার বাণী উপস্থিত হইয়াছে—“ভয় নাই ভয় নাই আমি যাইতেছি”।

* * *

ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে তপঃ তপঃ শব্দ উত্থিত হইয়াছে, বৌদ্ধভিক্ষুগণ একত্র সমবেত হইয়া সিদ্ধার্থের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, কৃষ্ণ-ভক্ত বৈষ্ণবগণ গ্রামে গ্রামে হরিসঙ্কীর্ত্তনের সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিতেছেন অবার কোন্ এক জ্যোৎস্নাবিধৌত প্রদোষে ভাগীরথী তীর-ভূমি মুখরিত করিয়া শ্রীচৈতন্য অমৃতকণ্ঠে কীর্ত্তন আরম্ভ করিবেন বলিয়া। বাসন্তি প্রমুখ থিওসফিষ্টগণ সহস্র সহস্র কণ্ঠে প্রতিদিন সেই মহাগুরুর আহ্বান সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছেন—যিনি হিমালয়ের কোন্ নিভৃত মন্দির হইতে ভারতের মৃত্তিকায় অবতরণ করিবেন, প্রেমে ও শান্তিতে জগৎকে ভরাইয়া তুলিবার জন্য। ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে কি উল্লাস কি উৎসাহ! এককালে যুগপৎ আনন্দ ও আশায় সকলের হৃদয় এমন অভিনব রসে ভরিয়া উঠিল কেন?

* * *

অচিরকালমধ্যে কলির সত্যযুগ উপস্থিত হইবে। দেবতা ভারতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছেন। নিরহঙ্কার হইয়া সকল সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া যে সাধকমণ্ডলী আজ হৃদয় মন সম্পূর্ণরূপে পাতিয়া বসিয়া থাকিতে পারিবেন—অহমিকার একটী ক্ষুদ্র রেখাও যাহাদের হৃদয়ে স্থান পাইবে না—গতানুগতিক

কোন সংস্কারের অধীন না হইয়া কল্পনার কুহক হইতে যাঁহারা আপনাদের মুক্ত রাখিতে পারিবেন—শ্রীভগবান্ তাঁহাদের মধ্যে আসিয়া তাঁর নবলীলা আরম্ভ করিবেন। কে জানে তিনি এবার কিরূপে আসিবেন! তিনি শ্রীকৃষ্ণরূপে একবার আসিয়াছিলেন, সে পাঞ্চজন্যশঙ্খ আর ত দ্বিতীয়বার বাজে নাই--তিনি অমৃতশীতল কণ্ঠে নদীয়ার পুণ্যক্ষেত্রে কীর্ত্তনে জগজ্জনকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, কৈ দক্ষিণেশ্বরে ত সে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন নাই। হে সাধকমণ্ডলি, সাবধান, কোন বিশেষ মূর্ত্তির কল্পনায় দিন গণিয়া যাইও না। সাবধান, তিনি আসিয়া চলিয়া যাইলে আক্ষেপের সীমা থাকিবে না, সারা নিশা জাগিয়া রজনী অবশেষে অলসতায় নিদ্রাপন্ন হইও না, কে জানে এবার তিনি কখন কি বেশে আসিবেন! তবে আমরা বলি ওগো তুমি এস তোমার যেমন ভাবে আসিতে ইচ্ছা তুমি সেই ভাবে এস—আমি চক্ষু মুদিয়া তোমার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিব—তুমি হাত ধরিয়া যখন বলিবে “উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত” তখনই চক্ষু চাহিয়া তোমার মনোহর বেশ দেখিয়া কৃতার্থ হইব।

সঙ্ঘ

আমাদের আশা ও আদর্শকে বস্তুতন্ত্র করে তুল্‌তে হলে আমাদের বল্‌তে এখন যারা তাহাদের বেশ নিরেটভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। এ সঙ্ঘের বাঁধন কেবল কর্ম্ম ও কোন বিশিষ্ট উদ্দেশ্য হলে পর্য্যাপ্ত হবে না, এই মণ্ডলীর মজ্জায় মজ্জায় প্রেমের বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলিয়ে বেড়ান চাই, এই প্রেমের সঞ্জীবনীস্রোতেই আমাদের মণ্ডলীকে অনন্ত বিস্তৃতির পথে পরিচালিত কর্‌তে হবে।

আজ বাংলা দেশে যে সংশয় ও অস্পষ্টতা আমাদিগকে ঘিরে ধরেছে, যে বাধা যে সঙ্কোচ আমাদের অমর জীবনকে সীমাবদ্ধ করে তোল্‌বার উপক্রম করেছে তাকে বাহির থেকে আঘাত করে কিছুতেই সরান যাবে না—ভিতরের ভাব ও তপঃ প্রভাবকে যথারীতি জাগিয়ে তুল্‌তে পার্‌লেই স্বপ্নের মত সকল বন্ধন টুটে যাবে।

হেঁয়ালির মত কথাগুলি মানুষের মনে সর্ব্বদাই দ্বি-অর্থের সৃষ্টি করে, ভাবের কথা প্রায়ই হেঁয়ালির মত শুনায় বটে কিন্তু সে যখন জাগ্রত ও সুস্পষ্ট হয়ে উঠ্‌বে তখন মানুষ দেখ্‌তে পাবে তার উদ্দেশ্য ছাঁদা কথায় লুকান নয়, তা কার্য্যে ও ভাষায় এক [illegible] সেই এতদিন যাহা প্রচার কর্‌ছিল ঠিক সেইটাকেই কার্য্যে পরিণত করে তুলেছে। এই ভিতরের শুদ্ধ ভাব ও তপস্যার মুর্ত্তিটাকে লোকের সম্মুখে ফুটিয়ে না তোলা পর্য্যন্ত আমাদের নানা জনের নানা কথা শুন্‌তে হবে।

বাহিরের সমালোচনা বাহিরের কুটিল দৃষ্টি আমাদের অন্তর ভেদ কর্‌তে যেন কখন সমর্থ না হয়; আমাদের হৃদয় বাহিরের ঝটিকাবর্ত্তে যেন এক তিল কম্পিত হয়ে না উঠে, বাহিরের রোষগর্জ্জন আমাদের নূতন সৃষ্টির চিন্তায় যেন কোন বাধা প্রদান না করে। আমাদের অনন্তমনা হয়ে স্বর্গের প্রতিমাটিকে নিখুঁত করে গড়ে ভারতের শূন্য-মন্দিরে প্রতিষ্ঠা কর্‌তে হবে। তখনই দেখ্‌বে আজ যারা স্বার্থকলুষিতচিত্তে তোমার অনিষ্টচিন্তায় আঁদারে পাঁদারে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে তারাই দু'হাত তুলে সেই জগমন-মোহিনী মাতৃমূর্ত্তির চরণতলে ভূলুণ্ঠিত হবে।

আজ দীর্ঘ যুগের পর বাংলার সাধকমণ্ডলী নিষ্কাম কর্ম্মযোগের প্রভাবে পরিশুদ্ধ হয়ে বুঝেছে তাদের কি কর্‌তে হবে। তীরে দাঁড়িয়ে যে বিজ্ঞেরা সন্তরণপরায়ণ লোকগুলিকে সন্তরণকৌশল শিক্ষা দেয় তারা চিরদিনই হাস্যাস্পদ হতে থাকে। কার্য্যক্ষেত্রে নানা ঘটনার আবর্ত্তনে কোন্ পথে চল্‌লে জগতের কল্যাণ হতে পারে তা যারা এতদিন নিঃস্বার্থভাবে কর্ম্ম করে এসেছে তারা বেশ বুঝেছে। বুঝেছে যে, ভারতের মজ্জাগত যে সনাতন ধর্ম্ম তার অমর প্রভাবের আশ্রয় পরিত্যাগ কর্‌লে তাদের অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠ হতে লোপ পাবে।

আমরা যে ভারতবাসী—আমাদের দেশের জল-হাওয়ায় আমরা যে পাশ্চাত্যদেশবাসী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক উপকরণে গঠিত এ কথা আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। আমরা ম্যাজিনি পড়েছি, ফরাসি-বিপ্লবের ইতিহাস কণ্ঠস্থ করেছি, ইংলণ্ডের শতবর্ষব্যাপী সংগ্রামের সংবাদ রেখেছি, আমেরিকার ওয়াশিংটনের চরিত্রকথা জীবনের পুরোভাগে ধারণ করেছি কিন্তু উহার কোন আদর্শটাই আমাদের জাতির অনুকূল ভাবের দ্যোতক নহে—একথা এতদিন আমরা বুঝি নাই, দেখিয়াও শিখি নাই; আজ ঠেকিয়া

বুঝিয়াছি অতঃপর আমাদের কোন্ পথ অবলম্বন কর্‌তে হবে।

এই দেড় শত বৎসর কঠোর তপস্যায় পাশ্চাত্যের যে শিক্ষা হৃদ্‌গত করেছি তা উদ্গার করে ফেলে দিলেও চল্‌বে না। প্রাচীন ভারতবর্ষের সকল অবস্থার পুনরাবর্ত্তন করাই আমাদের সাধনা নয়, যাহা যায় তাহা আর ফিরে না তবে প্রাচীন ভারতের যে ঐশ্বর্য্য যে গর্ব্ব যে সনাতন ভাব বর্ত্তমান ছিল ভবিষ্যতে তাহাপেক্ষা আরও উচ্চতর মহত্তর ভাবকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা কর্‌ব—নূতন সাধকমণ্ডলীর ইহাই হচ্ছে ভগবৎ-প্রেরণা। এই দেড়শত বৎসরের সিদ্ধি ভারতীয় ভাবের অনুগত করে আমরা উপভোগ কর্‌ব—আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদের জীবনকে আরও ঐশ্বর্য্যময় করে তুল্‌ব—প্রাচ্যের গৌরব ও সত্যকে আরও জীবন্ত ও জাগ্রত করে ধর্‌ব।

আমাদের সকল ভাবই কেবল কথার রাশি হয়ে দাঁড়াবে যদি তার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভাবের মানুষগুলি সঙ্ঘবদ্ধ না হই। এই সঙ্ঘবদ্ধ হবার পথে যত কিছু অন্তরায়, তাকে পশুবল প্রয়োগে দূর করা প্রাচ্য চরিত্রের উপযোগী অস্ত্র নহে পরন্ত নৈতিক বলের দ্বারাই ইহাকে বিদূরিত কর্‌তে হবে। মানুষের সহিত মানুষের যে সম্পর্ক যে মিলনের আকর্ষণ, উহা স্বাভাবিক। ইহাই ভগবানের ইচ্ছা। এই মিলনের পরিপন্থীস্বরূপ যে সকল বাধা তাহা ক্ষণিক, অস্থায়ী। বিশ্বাস ও ধৈর্য্য সহকারে চরিত্রবল নিয়ে আমরা যদি কর্ম্মক্ষেত্রে ছুটে যাই, তবে আমাদের সকল অন্তরায় সূর্য্যপ্রকাশে কুয়াশার মত তিরোহিত হবে।

আমাদের চাই সৎ-সাহস, আমাদের চাই অসাধারণ ধৈর্য্য, আমাদের চাই নিখুঁৎ চরিত্র। ধর্ম্মই আমাদের সহায়, ভগবৎ-শক্তিই আমাদের অবলম্বন। সকল অহমিকার কঠিন পাশ এই বিশ্বাসে খণ্ড খণ্ড করে দূরে নিক্ষেপ করে এস—আমরা বাংলাদেশে এক চরিত্রগত বলের অদ্ভুত নিদর্শন দেখাই—আমরা যে কোন সংস্কারে, কোন বন্ধনে আবদ্ধ নহি তাহাই প্রকাশ করি—আমরা যে মুক্ত স্বচ্ছন্দ, আমরা যে মানবজাতির মঙ্গলসাধনে ব্রতধারী একথা বড় গলা করে প্রচার করি। কালধর্ম্মের যে প্রবল বাধা বিকট মূর্ত্তিতে তোমার সম্মুখে দশনরাশি বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে তার অলীক ত্রাসে যার হৃদয় কম্পিত হয়ে উঠে, এই ভগবৎ কার্য্যে অধিকারী হতে তাহার এখনও বিলম্ব আছে; তাকে নীরবে শক্তি

সাধনে প্রবৃত্ত থাক্‌তে অনুরোধ করি। জগতের সর্ব্বত্র যখন সত্যের দুন্দুভি নিনাদ শোনা যাচ্ছে, ভারতের বর্ত্তমান ভাগ্য-বিধাতা ব্রিটিশ জাতির কর্ণধারগণ যখন মৈত্রী ও স্বাধীনতার জয়মন্ত্র উচ্চারণ কচ্ছেন তখন সেই জাতির আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে এই অবসরে আমাদের জীবনকে স্বচ্ছন্দ ও মুক্ত করে তুল্‌তে পশ্চাদ্‌পদ হব কেন? বাংলার সহস্র সহস্র কর্ম্মীযুবকগণের এবং মান্দ্রাজের মহাশক্তিশালিনী বাসন্তি বিবির অবরোধে হৃদয় ভঙ্গ কর্‌লে চল্‌বে না—এই বিরাট জাতির জাগরণে জাতির তুলনায় এরূপ কয়েকটা জীবন যে কিছু কিছু বিপন্ন হবে ইহা অবধারিত। আজ দেখ যুগপ্রভাবে ভীরু বাঙ্গালী পঞ্চবিংশতিজন চন্দননগরের যুবকও ফরাসীর ভীষণ রণপ্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ—ফরাসীর ;বিখ্যাত 'সেভেন্‌টীফাইভ্‌ সেণ্টিমিটার' কামান চালনা করে জার্ম্মাণ জাতির হৃদ্‌কম্প উপস্থিত কর্‌ছে। দেখ এই পঞ্চবিংশতিজনকে পাঁচ ভাগে বিভাগ করে সেণ্টমিহিএলের নিকটস্থ কতক স্থান রক্ষার ভার প্রদান করে য়ুরোপের একটা জাতি নিশ্চিন্ত হতে সাহসী হয়েছে। তাদের উপস্থিত-বুদ্ধি ও সাহস দর্শনে প্রীত হয়ে ফরাসী গোলন্দাজবাহিনীর অধ্যক্ষ বলেছেন—"বাঙ্গালীর মত যদি ফরাসী জাতির একটা ব্যাটেলিয়ান থাক্‌ত তবে আজ আমরা ফরাসীর সীমারেখায় এক অদ্ভুত যুদ্ধাভিনয় দেখিয়ে শত্রুবাহিনীকে চমৎকৃত করে তুল্‌তুম্"। ইহা বড় কম গৌরবের কথা নয়! আবার অপরদিকে দেখ—যাহা স্বপনের অগোচর ছিল তাহা আজ সুস্পষ্টভাবে বিকশিত, বাঙ্গালীসৈনিকদল দলে দলে মেসোপোটেমিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে বীর হুঙ্কারে ছুটে চলেছে। আজ চতুর্দ্দিকেই জাগরণের সাড়া পড়ে গেছে। হে বাঙ্গালী যুবকগণ! সঙ্ঘবদ্ধ হও, নৈতিক বলের সাহায্যেই আজ তোমরা কার্য্যসিদ্ধি কর্‌বে ইহা ধ্রুব জানিও।

লীলা

(৪)

আত্মসমর্পণ করিবার সঙ্কল্প স্থির হইলে, সাধক, কর্তৃত্বাভিমানশূন্য হইয়া জীবনের উপর দিয়া যাহা কিছু ঘটিয়া যাইবে তাহা নির্ব্বিকারচিত্তে দেখিবে মাত্র। মনে করিবে তোমার সকল কার্য্যের নিয়ন্তা ভগবান্—তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছেন, তুমি দ্রষ্টা মাত্র। স্বীয় আধারকে ভগবদ্ হস্তে সম্পূর্ণরূপে নিয়োগ করিয়া ভগবান যাহা করেন তাহার বিপরীতাচরণ করিবে না বরং সকল কর্ম্মে পূর্ণ অনুমোদন সহকারে কার্য্যাদির ফল অবহিত চিত্তে ভোগ করিয়া যাইবে। কার্য্য ভগবানের--তিনিই শক্তিরূপে কালীমূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, ইহাই তাঁহার লীলা। তুমি উপস্থিত যজমানস্বরূপ সমস্তই উৎসর্গ করিবে—তোমার উৎসর্গীকৃত সকল উপাদান যথারীতি কালী কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণচরণে সমর্পিত হইবে। তুমি প্রত্যেক ঘটনা প্রত্যেক অবস্থা দেখিয়া যাইবে, প্রতিবাদ করিবে না, কেননা যাহা উৎসর্গ করিয়াছ তাহার উপর তোমার আর দাবী দাওয়া নাই, তবে এই জীবন-যজ্ঞের ফল তুমি উপভোগ করিবে। আত্মসমর্পণযোগ গ্রহণ করিবার পর এইরূপ আধারের সকলবিধ কার্য্যাদির কর্তৃত্বজ্ঞান তিরোহিত হইয়া দীর্ঘকাল অবস্থান করিলে তুমি যে কর্ত্তা এ জ্ঞান দূর হইবে। তুমি কেবল দ্রষ্টা মাত্র, কার্য্য করেন কালী, অতএব কোনরূপ কার্য্যের জন্য তুমি দায়ী নহ। এইরূপ অবস্থা লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে জীবকে আধার সম্বন্ধে একটা মোটামুটি জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। যোগ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলিতে এই আধারের ভিন্ন ভিন্ন অংশের বিবরণগুলি লিখিত হইয়াছে। আধার বলিতে শরীর প্রাণ চিত্ত মন ও বুদ্ধি—এগুলি জীবের জাগ্রত জীবন। এইগুলির মধ্যে থাকিয়াই জীবকে সর্ব্বপ্রথমে সাধনা আরম্ভ করিতে হয়, এই সকলের যথারীতি শুদ্ধি ঘটিলে এতদতিরিক্ত যে স্থান আছে, যাহা বুদ্ধিরও অতীত—সেই তুরীয় স্থানে পৌছিতে পারিলে তুমি দেবজীবন লাভ করিবে। নিম্নের এই যন্ত্রনিচয়ের সহিত তোমার সম্পর্ক একান্ত ভাবে জড়িত থাকিলে তুমি কিছুতেই ঊর্দ্ধগতি লাভ করিতে সক্ষম

হইবে না, সেইজন্য সর্ব্বাগ্রে এই জাগ্রত জীবনের সকল আধারের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া উহাদের কালীর হস্তেই সমর্পণ করিতে হয়। আমি যে দেহ প্রাণ মন বুদ্ধি নই, ইহা যথার্থরূপে উপলব্ধি করা অর্থে, এগুলির মধ্যে যে আমার বলিয়া একটি অহঙ্কার বিরাজ করিতেছে তাহাকে অপসারিত করা। সেইজন্যই এই আধারের সকলবিধ কার্য্যই যে ভগবানের এইরূপ অনুভূতি লইয়া সাধককে কিছুদিন অবস্থান করিতে হয়। শরীরের ব্যাধি, প্রাণের উত্তাল তরঙ্গের মত বাসনা কামনা, চিত্তের প্রবল সংস্কার, মনের অতিরিক্ত চাঞ্চল্য, বুদ্ধির উদ্ভট চিন্তা কল্পনা প্রভৃতি যাহা কিছু—তাহার সহিত যে আমার কোন সম্বন্ধ নাই, এ সকল যে আধারগুলির অশুদ্ধি এবং উহার বিকাশ এবং খেলা কালীর ইচ্ছায় ঘটিতেছে এবং তাঁর ইচ্ছাতেই উহার সমতা আসিবে—এইরূপ বিশ্বাস সহকারে কিছু দিন নির্ব্বিকার চিত্তে অবস্থান করিলেই বুদ্ধিরও উর্দ্ধে যে বিজ্ঞানময় স্থান, যে সহস্রদল পদ্ম, যেখানে অবিকৃত সত্য, অনাবিল জ্ঞান ভাব শক্তি আনন্দ একাধারে বিরাজিত, যোগীজনবঞ্চিত এই দিব্য স্থানেরই মানুষ যে তুমি এবং তুমিই যে ঈশ্বর একথা ধারণায় আসিবে। সমর-প্রাঙ্গনে সেনাপতিগণ যেরূপ কামানের বহুদূরে অবস্থান করিয়া কেবল ব্যাটারির সাহায্যে কামান পরিচালনে সমর্থ হয় সেইরূপ এই বিজ্ঞানময় কোষে অবস্থান করিয়া জীব যখন জাগ্রত জীবনকে সঞ্চালন করিতে অধিকারী হয় তখনই সে শুদ্ধ মুক্ত, ভুক্তিই তখন তাহার উপভোগ্য, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দেই তখন তাহার অবস্থান সম্ভবপর।

সত্যযুগ সত্যযুগ করিয়া আধুনিক জীবজগতে যে একটা ভাবের হাওয়া বহিতেছে তাহা আর কিছুই নহে, মানুষ যখন জাগ্রত জীবনের অধিকার এড়াইয়া এই তুরীয় স্থানে পৌছিবে, বাসনা কামনা সংস্কার প্রভৃতির সহিত আপনাকে আর সংলিপ্ত রাখিবে না; পার্থিব আধারের অবস্থা ভেদে আপনার অবস্থাভেদের কল্পনা ছাড়িয়া দিবে, আধার ও আধেয় এই দুয়ের পার্থক্য পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিবে তখনই জগতে স্বর্গরাজ্যের উদয় হইবে। বর্ত্তমান মানবজাতি এই শরীর প্রাণ মন বুদ্ধিকেই তাহাদের সবখানি বলিয়া মনে করে, এইগুলির মধ্যেই তাহারা জাগ্রত লীলারত, উর্দ্ধলোকের সন্ধান রাখিতে চাহে না, উর্দ্ধজীবনের যে অবিচ্ছেদ আনন্দ তাহার কথা সে ভুলিয়া গিয়াছে। আমাদের আজ সকল শক্তিকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে,

আমাদের অহংকে ঊর্দ্ধমুখী করিয়া ধরিতে হইবে, আমরা যে দিব্যলোকের অধিকারী একথা আজ আমাদের জানিতে হইবে; এই সত্যের অনুগামী হইবার জন্যই আমাদের সাধনা তপস্যা। একবার এই স্বর্গধামে পৌঁছিতে পারিলেই আমরা সিদ্ধ মুক্ত হইয়া সত্যের ও আনন্দের লীলাতেই মর্ত্ত্যধামকে বৈকুণ্ঠে পরিণত করিতে সমর্থ হইব। সে যুগে জীব এই ঊর্দ্ধলোকের সন্ধান পাইয়া ইহজগতের সকল সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া এই দিব্যধামে মহানির্ব্বাণের আশায় ছুটিত, আজ আমরা স্বর্গের এই মহামৃতের অধিকারী হইয়াও ইহজগতকে পরিত্যাগ করিব না। ভগীরথ যেরূপ স্বর্গ হইতে ভাগীরথীধারা মাথায় বহিয়া বসুন্ধরা পবিত্র করিয়াছিলেন আমরাও সেইরূপ স্বর্গ হইতে অমৃতভাণ্ড লইয়া এই মরজগতেই লীলা করিব, সত্যযুগের অনির্ব্বচনীয় আনন্দের মেলা বসাইয়া দিব। সে লীলা দেবলীলা। গীতায় শ্রীভগবান্ যে বলিয়াছেন—

"ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥"

মন বুদ্ধি আমাতে সমাহিত পূর্ব্বক 'অত ঊর্দ্ধং' মন বুদ্ধিরও অতীত যে তুরীয় স্থান তাহাতে অর্থাৎ আমাতেই অবস্থিতি করিবে। জীব যখন মায়াদি ভেদ করিয়া মুক্ত হয় তখন সে দেখে ব্রহ্ম এবং সে অভিন্ন—সর্ব্বং ব্রহ্মৈব। হে সাধক, এই ব্রহ্মজ্ঞানে মর্ত্ত্যভূমে বিচরণ করিয়া দিব্যযুগকে ফিরাইয়া আনিবার ভার তোমার উপরেই ন্যস্ত হইয়াছে।

সমালোচনায় "সাহিত্য"

আমাদের দেশে ভেদবুদ্ধি যে কেবল সামাজিক অথবা রাজনীতিক ক্ষেত্রে প্রকট এরূপ নহে, সাহিত্যক্ষেত্রেও ইহার প্রভাব বড় অল্প নয়। মাসিক সাহিত্যে যে সকল সমালোচনা বাহির হয় তাহা নিরপেক্ষতার কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত হয় না। স্বপক্ষের প্রশংসা এবং বিপক্ষের কুৎসা রটনা করাই অধিকাংশ সমালোচকের কার্য্য। আমরা শ্রাবণ মাসের "সাহিত্য" পত্রিকায় "নারায়ণ" কাগজখানির সমালোচনা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি

"ধর্ম্মপ্রচারে রবীন্দ্রনাথ" নামক একটি প্রবন্ধ সর্ব্বপ্রথমে ৩০এ বৈশাখ নবম সংখ্যায় "প্রবর্ত্তকে" বাহির হয়। "প্রবর্ত্তকে" প্রবন্ধলেখকের নাম থাকে না, সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত হইবার জন্য "প্রবর্ত্তকের" লেখকগণ ব্যগ্র নহেন। "প্রবর্ত্তকে"র সকল প্রবন্ধের লেখকগণ সর্ব্বজনবিদিত না হইলেও "ধর্ম্মপ্রচারে রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক সন্দর্ভ যিনি লিখিয়াছেন তিনি কেবল বাংলায় নয়, সমগ্র ভারতে সুপরিচিত। "হেঁয়ালিচ্ছন্দে," "বাগাড়ম্বরে অপপ্রযুক্ত শব্দস্তূপে নিহিত" করিয়া প্রবন্ধ লেখা যদি তাঁহার কর্ম্ম হয় তবে অন্য পরে কা কথা! যাহা হউক এই প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া "সাগর সঙ্গীতের" মনস্বী কবি "নারায়ণ"-সম্পাদক ইহার মূল্য বুঝিয়াছিলেন এবং সেইজন্য তিনি উক্ত প্রবন্ধটা আমাদের অনুমতিক্রমে স্বীয় বিখ্যাত পত্রে স্থান দিয়া গুণের আদর করিয়াছেন। যথাকালে "বেঙ্গলী" পত্রে ইহার যথেষ্ট সুখ্যাতিও বাহির হইয়াছিল। এই প্রবন্ধটী সম্বন্ধে "বেঙ্গলী" বলেন "The article is the product of the deft hand of a master mind." আর এই প্রবন্ধটী সমালোচনা করিতে বসিয়া "সাহিত্য"-সম্পাদক লিখিয়াছেন, "ধর্ম্মপ্রচারে রবীন্দ্রনাথ কে লিখিয়াছেন, তাহা প্রকাশ নাই। হেঁয়ালীর সৃষ্টিকর্ত্তা রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণলেখক হেঁয়ালিচ্ছন্দে নিষ্পন্ন করিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন 'যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ'। 'ধর্ম্মস্য তত্ত্বং' যেমন 'নিহিতং গুহায়াম্', তেমনই রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মপ্রচারের তত্ত্বও লেখকের বাগাড়ম্বরে, অপপ্রযুক্ত শব্দস্তূপে নিহিত—প্রচ্ছন্ন। ইহাই 'নারায়ণে'র নৈবেদ্যের চূড়ার সন্দেশ! ইহাতে অনেক নূতন ও সাংঘাতিক সিদ্ধান্ত আছে। উপসংহারের সিদ্ধান্ত এই যে 'আদর্শ মানুষ যিনি, আদর্শ মনুষ্যত্বের সাধক যিনি, তিনি জগতের সমস্ত দ্বন্দ্বে গা ঢালিয়া দিয়া, জীবনের শত অসুন্দর ব্যাপারের কাদা-মাটীতে লিপ্ত হইয়া তাহারই মধ্য হইতে নিজের অন্তরে বাহিরের জগতে একটা উচ্চতর মহত্তর সুন্দর সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন সৃষ্টি করিয়া চলিবেন। অবশ্য, ইহার সবটার মানে হয় না। যতটুকু অর্থ বুঝা যায় তাহাই কি 'নারায়ণের' creed? আদর্শ মনুষ্যত্বের সাধক বলিয়াই কি 'নারায়ণ' জীবনের শত অসুন্দর ব্যাপারের 'কাদামাটী' এক-ঘেটিয়া করিতেছেন?"

"যারে দেখ্‌তে নারি তার চলন বাঁকা"—যাহা নারায়ণে বাহির হইবে তাহা মনোনিবেশ সহকারে পাঠ না করিয়াই মন্দ বলিতে হইবে, "সাহিত্য

সম্পাদকের এইরূপ একটা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। তাই প্রবন্ধটীর কয়েক লাইন উদ্ধৃত করিয়া সমালোচক গায়ের ঝাল ঝাড়িয়াছেন। আমরা একটু ভাল করিয়া প্রবন্ধটী তাঁহাকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। সঙ্গে সঙ্গে 'প্রবর্ত্তকে'র ত্রয়োদশ সংখ্যায় প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথ ও নেশনত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধটীও পাঠ করিলে আমাদের বিশ্বাস 'সাহিত্য' সম্পাদক অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন প্রবন্ধলেখক নিতান্ত 'হেঁয়ালিচ্ছন্দে হেঁয়ালির সৃষ্টিকর্ত্তা রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ করেন নাই'; দেশপূজ্য রবীন্দ্রনাথের যথার্থ স্বরূপই ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে।

উঠে এসো

এই বৈরাগ্যের বোঝা এই অক্ষমতা-মহাপাপ
আর নয় আর নয়; জীবনের এই অভিশাপ
আর নয় আর নয়; আয় প্রাণ আয় আজি সাজি,'
তোর মাঝে ভীম রবে দামামা নাকাড়া যাক্ বাজি'
শতাব্দীর তন্দ্রামগ্ন লোচনের আলস্য স্বপন
ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে যাক্; হৃদয়ের যতেক ক্রন্দন
উঠুক ফুকারি' আজি দীর্ণ করি, যত শাস্ত্র-পাশ
জ্বলুক জ্বলুক বক্ষে আজন্মের যত অভিলাষ :—
মুক্তি দেরে মুক্তি দেরে ওরে মূঢ় মানবের দল,
তোর কৃপণতা মাঝে ব্যর্থ মহা আঁখি ছল্ ছল্ !

যেখানে সাহস নাই আছে শুধু ত্রাসের কালিমা
সেখানে ফুটাতে চাস্ মানবের গৌরব-মহিমা ?
যেখানে চলিবি পথে প্রতি পদে বাধা মানি' মানি'
সাধ্য কার অমৃতেরে জীবনেতে তার দিবে আনি ?
যেখানে সঙ্গীত-স্বর নাহি ওঠে আপন পুলকে
যেখানে হৃদয়-পদ্ম নাহি ফুটে আপন আলোকে
যেথা প্রাণে নাহি বাজে জীবনের মুক্ত সত্য গান
ব্যর্থ হায় সব সেথা মানুষের শুধু অপমান !

আঁখি খোল্ আঁখি খোল্ নিমীলিত শত শতাব্দীর,
কান পাতি' শোন্ ওরে করুণ ক্রন্দন মাতা ধরিত্রীর;
তারি কোলে অন্ন লভি' তারে হায় এত অবহেলা,
তারি কোলে নীড় বাঁধি' অপমান শুধু তার বেলা?
এতে তোর ভাল হবে? জীবনের বেলায় বেলায়
বাজিবে মুক্তির গান? মরণের দোলায় দোলায়
নিবে তোরে স্বর্গলোকে? মিথ্যা তবে মিথ্যা সৃষ্ট সব,
হৃদয়ের অযুত স্পন্দনে মিথ্যা শুধু করে কলরব,
এ উৎসব মিথ্যা সব আকাশের বাতাসের গান
মিথ্যাময় ব্রহ্মাণ্ডেতে সব চেয়ে মিথ্যা ভগবান!

এই যে দৈন্যের ছায়া নিশিদিন অন্তরে বাহিরে
তার পিছে জাগি' আছে মিথ্যা ত্যাগ-অহঙ্কার ঘিরে।
সেই অহঙ্কার ভেদি' মানুষেরা ফুটিতে না পায়
আপনার সুরে সুরে; জীবন-দেবতা তার হায়
প্রাণের আরতি বিনা কোথা কোন্ অন্ধ তমসায়
অতি দীন অতি হীন জাগে লয়ে' ভীম ব্যর্থতায়,
মর্ম্মতলে শুধু তাই বাজি' ওঠে নিরানন্দ বীণ্
মানুষেরে ব্যর্থ করি'; অনৃতেরে ধরি নিশিদিন
শুধু চারিদিকে তারা ভরি' তোলে দীর্ণ হাহাকার,
বিশ্বমাঝে কোনমতে বাঁচে লয়ে' দুখের সংসার।

তবে আজি উঠে এসো—উঠে এসো শক্তি লয়ে প্রাণে,
কহ আজি—আসি নাই এ মহীতে ত্যাগের সন্ধানে।
কহ আজি উচ্চৈঃস্বরে—চাই চাই পৃথিবীর দান,
চাই স্বাস্থ্য চাই আলো ধন জন গৌরব সম্মান,
চাই যশ চাই মান এ বিশ্বের প্রীতি ভালবাসা,
চাই চাই খেলিবারে এ মহীর লয়ে' কোটী আশা;
বিচিত্র আলোক ফেলি' হিয়া খানি করিয়া রঙিন
বাজাইতে চাই বিশ্বে লক্ষ রাগে জীবনের বীণ্।

বাংলার দলাদলি

ভারতের নূতন শক্তি বাংলায় দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পরস্পর বিপরীতগামী হইল। একটী, কর্ম্মদোষে মরুকান্তার অভিমুখে লুপ্ত হইবার উদ্দেশ্যে ছুটিয়াছে, আর একটী গণতন্ত্রবাদের গৌরব ঘোষণা করিতে করিতে উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিতে তুলিতে মহোল্লাসে মহাশক্তিস্বরূপ অসীম বারিধির দিকে প্রবাহিত। বহুদিন পরে প্রবীণতার চাতুরীজাল ছিন্ন করিয়া দেশের ও দশের আশাকেন্দ্র হীরেন্দ্রনাথ, ব্যোমকেশ, চিত্তরঞ্জন, বিপিনচন্দ্র বাঙ্গালীর মরা প্রাণে নূতন আশা সঞ্চার করিলেন। কংগ্রেস অভ্যর্থনা সমিতির মতভেদে নিরর্থক শান্তি প্রয়াসী অলস জনগণই অনর্থের সৃষ্টি হইল বলিয়া হাহাকার করিবেন, কিন্তু এই দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষণে জাতীয় জীবনে নূতন শক্তিরই পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে ইহা অবধারিত।

সুরাট দক্ষযজ্ঞে দেশ-নেতৃ বলিয়া যাঁহারা দাবী করেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সাধারণের মতবাদের বিপক্ষে দাঁড়াইয়া জাতীয় জীবনকে বহুদিন শক্তিহীন করিয়া রাখিয়াছিলেন। সম্প্রতি লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে বেসান্টের আন্তরিকতায় যে শক্তি সম্মিলিত হইয়া দেশের ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কল্যাণ কামনায় দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াছে তাহারই পূর্ণ অভিব্যক্তির পথে সর্ব্বপ্রদেশেই তথাকথিত নেতৃগণ নানা অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন, কিন্তু বাংলায় কয়েকজন লোকের পরামর্শে সুরেন্দ্রনাথ এই নূতন শক্তির প্রকাশ পথে ভাগীরথীর সম্মুখে মাতঙ্গের মত বাধাস্বরূপ দাঁড়াইয়া যেরূপ হাস্যাস্পদ হইলেন তাহা প্রকাশ করিতেও লজ্জা করে। ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে আজ পর্য্যন্ত কেবল ব্যক্তিগত ভেদ ও স্বার্থ বজায় হইয়া আসিয়াছে, পরন্তু জনসাধারণের মত, সেথায় চিরদিনই উপেক্ষিত—সাধারণের মত ব্যক্ত করিবার জন্য যখনই কেহ অসাধারণ ত্যাগ ও ক্ষতি স্বীকার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে উপক্রম করিয়াছেন তখনই পুরাতনের প্রভাব তাহাদিগকে নানা উপায়ে খর্ব্ব করিয়াছে। কিন্তু আজ বিধাতার কৃপাদৃষ্টিপাতে ভারতের ভাগ্য পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হইয়া উঠিয়াছে। ভারত শাসন-নীতিরও যথেষ্ট

পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, ভারতের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা লর্ড চেমস্‌ফোর্ড বাহাদুর সম্প্রতি দিল্লীতে যে বক্তৃতা দিয়াছেন—পরাধীন ভারতবাসী আজ পর্য্যন্ত শাসকবর্গের মুখে এমন আশার কথা শুনে নাই। ভারতবর্ষে যে অশান্তি যে আন্দোলন তাহা প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির উচ্ছেদ উদ্দেশ্যে নহে তাহা বলাই বাহুল্য। ভারতবাসী শুধু বলিতে চাহে যে ইংরাজ শাসনে ইংরাজ প্রজার মতনই তাহারা সমান সম্মান ও আদর পাইবে এবং সেইদিকেই তাহারা তাহাদের জীবনকে সুপ্রচলিত করিবার আকাঙ্খা করে—এই কথাটা নানা ছাঁদে নানা ভাবে প্রকাশ করিতে গিয়া অনেকেই সিদিশানের ফাঁদে পড়িয়াছেন নতুবা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বিপ্লবপন্থী হইতে চাহেন না, ইহা সত্য।

সুরাট মহাযজ্ঞে এই কথাটা পরিস্ফুট করিবার জন্যই মহামতি তিলক শ্রীঅরবিন্দ এবং ভারতের অনেক মনীষিবৃন্দ চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু বিধির বিপাকে তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্র হইতে কিছুদিনের জন্য অপসৃত হইলেন—এই সকল মহাশক্তিশালী নেতৃগণের অভাব বশতঃই যে ভারতে মুষ্টিমেয় যুবকের দল বিপরীতগামী হইয়া মহা অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা আর কে অস্বীকার করিবে?

আজ ধীরে ধীরে বেসাণ্টের তপঃশক্তি প্রভাবে ভারতের অন্তরের কথা প্রকাশ হইতেছে। মেদিনীপুরে সুরাটে যে অভিনয় করিয়া প্রবীণ রাজনীতিক দল যে কারণে জয় লাভ করিয়াছিলেন, সে কারণ আজ আর নাই—কলিকাতার নূতনদলকে রাজদ্রোহী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার আর উপায় নাই—মানুষের আদর্শ পূর্ব্বাপর অধিকতর বিশদ হইয়া উঠিয়াছে। পুরাতন চাল এ ক্ষেত্রে আর চলিবে না। সুতরাং এই দলাদলিতে বাঙ্গালীর নেতা সুরেন্দ্রনাথ যে সম্মান হারাইলেন তাহা আর পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন না।

এক্ষণে আমাদের কথা, এই যে এতদিন যাহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল—যে বাঙ্গালী দলে দলে সমর শিক্ষা করিয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করিবে, ভারত সচিব স্বয়ং আসিয়া ভারতের অভাব অভিযোগ যে স্বকর্ণে শুনিয়া ইহার প্রতিবিধান করিবেন, বিলাতের মন্ত্রীসভায় ভারতবাসী যে স্থান পাইবে তাহা আজ সফল হইতে বসিয়াছে। ইহা বত্রিশ বৎসর রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে হয় নাই, বিপ্লববাদীগণের দু'একটা রাজনৈতিক হত্যার জন্যও নহে, ইহা বিধাতার দান। য়ুরোপের মহাবিপ্লবে মনুষ্যজাতির মধ্যে একটা

মহত্তর ও উচ্চতর ভাবের-দ্যোতনা প্রকাশ পাইয়াছে, পাশ্চাত্যের প্রবল ও বিচক্ষণ ইংরাজ জাতির মনুষ্যোচিত কর্ত্তব্য বুদ্ধি আজ জাগরিত--ভারতের মত একটা মহাজাতিকে তাহারা আর কাঠের পুতুল করিয়া রাখাকে পাপ বলিয়া স্বীকার করেন। এই মহাযুদ্ধের ফলে জগতের শক্তিকেন্দ্র এশিয়ার উপরই আসিয়া পড়িতেছে, ইংরাজকে যদি সে শক্তিকেন্দ্রের সর্ব্ব প্রধান কর্ণধার হইয়া থাকিতে হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষের সমধিক উন্নতি সাধন করা আশু আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এতদ্‌সম্বন্ধে বম্বে টাইমস্‌ লিখিয়াছেন—"In the light of recent happenings in Russia the whole balance of power in Asia will be disturbed. The Balkan states can not stand alone; they are divided by bitter animosities. Bulgaria and Turkey must fall under the domination of Central Europe in the absence of an effetive Russian enterprise. Asia Minor and Persia will be the battle-ground of Teutonic ambitions even after the certain defeat in the west is consummated. 'Other strong ambitions are being developed in Asia'. The British Empire and India within the Empire are quite strong enough if they are united, but they will need all their strength. They will not be able to put it forward if they are not united, and if there is one great lesson more than another driven home to us by the terrible logic of recent events in Russia; it is the ease with which the forces of disorder can be set in motion and the impossibility of controlling them in the absence of a strong government when they have been set in motion. We recognise fully the point of view of those who say that if publicists are reminded of their great responsibilities the obligation lies on those in authority to permit the free constitutional discussion which is essential to political progress. * * *"

অর্থাৎ—রুষিয়ায় সম্প্রতি যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, তাহারই আলোকে দেখিলে, বুঝা যায় যে এসিয়াতেও শক্তিপুঞ্জের সামঞ্জস্য বিপর্য্যস্ত হইবে। বলকান রাষ্ট্রগুলি একাকী দাঁড়াইতে পারে না, তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতায় তাহারা ছিন্ন ভিন্ন। একটা প্রবল রুষ অভিযানের অভাবে, বুলগেরিয়া ও তুর্কী মধ্য ইউরোপেরই কবলগত হইবে—পশ্চিম রণক্ষেত্রে জার্ম্মণী নিঃসংশয়িতরূপে পরাজিত হইলেও, এসিয়ামাইনর এবং পারস্য টিউটনিক দুরাকাঙ্খানলের ক্রীড়াভূমিতে পরিণত হইবে। ‘এসিয়ায় অন্যান্য প্রবল দুরাকাঙ্খাও প্রধূমিত হইয়া উঠিতেছে।’ বৃটীশসাম্রাজ্য ও ভারতবর্ষ সুসম্মিলিত থাকিলে যথেষ্টই শক্তিশালী বটে, কিন্তু তখনও তাহাদের সমগ্র শক্তির বিনিয়োগ আবশ্যক । তাহারা যদি সম্মিলিত না থাকে, সেই শক্তি বিনিয়োগ করিতে পারিবে না ; আর রুষিয়ার বর্ত্তমান ঘটনারাজির যদি কিছু কঠোর শিক্ষা দিবার থাকে, তবে তাহা এই, যে, বিশৃঙ্খলাকারী শক্তিগুলিকে অতি সহজেই না উদ্দীপিত করিয়া তোলা যায়, এবং একবার এইরূপে উহারা ক্রিয়াশীল হইয়া উঠিলে, কোন মহাশক্তিশালী শাসনতন্ত্র ব্যতীত, অপরের পক্ষে তাহাদিগকে সংযত ও আয়ত্ত করা অসম্ভব হইয়া উঠে। এমন অবস্থায় যাঁহারা বলেন যে জননায়কগণকে তাঁহাদের গুরু দায়িত্ব স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক হইলেও প্রধান দায়িত্ব কর্ত্তৃপক্ষস্থানীয় যাঁহারা তাঁহাদেরই উপর সংন্যস্ত কারণ তাঁহারাই রাজনৈতিক উন্নতির জন্য অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় অবাধ বৈধ আলোচনা করিবার অনুমতি দিতে পারেন—-আমরা তাঁহাদিগেরই সেই মতকে সম্পূর্ন সমর্থন করিতে পারি।

বাংলা দেশে যে স্পর্দ্ধা যে সাহস যে ধর্ম্মবলের অভ্যুদয় দেখা যাইতেছে তাহাও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের শিক্ষায় নহে ; দক্ষিণেশ্বরে ভাবী জগতের মঙ্গল উদ্দেশ্যে যে মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যাঁহার আশীর্ব্বাদ বাণী মাথায় লইয়া বাঙ্গালীর গৌরব স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র জগতে এই অদ্ভুত শক্তির খেলা দেখাইয়া গিয়াছেন—তাঁহারই মন্ত্রশক্তির প্রভাবে বাঙ্গালীর নবীন প্রাণে নূতন আশা ও দৈবশক্তির বিকাশ লক্ষিত হইতেছে।

এক্ষণে আমরা দেখিতে পাই ভারতের রাজনীতিক ক্ষেত্রে দশ বৎসর হইতে দুইটি দল ঘাত প্রতিঘাতে আপনাদের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে ; একটী নরম দল অপরটা জাতীয় দল। বাংলায় অগ্নিময় কর্ম্মক্ষেত্রে দশ বৎসর ধরিয়া এই উভয় দলই বর্ত্তমান আছে, সুরেন্দ্র প্রমুখ নরম দল

এবার বিপন্ন হইলেও ভবিষ্যতে সুযোগ ঘটিলে জাতীয় দলের প্রভাব নষ্ট করিয়া আবার যে জাহির হইবেন না তাহা কে বলিতে পারে? তবে স্পষ্ট কথা জনসাধারণ জাতীয় দলেরই সমধিক পক্ষপাতী—ইহাদের আদর হইলেই জনসাধারণের মনে আশা ও আনন্দের হিল্লোল বহিবে। তবে দুঃখের পাথরে নেতৃবৃন্দের জীবন কষিত হইয়া পরীক্ষিত না হইলে আমরা কোন পক্ষকেই বিশ্বাস করিতে পারি না। কোন দলের কার্য্যে অন্তরায় না ঘটাইয়া বাংলার উদীয়মান তরুণমণ্ডলীকে দূরে থাকিতে হইবে। যে সকল অশুদ্ধতা থাকিলে দেশসেবারূপ মহাব্রতে ব্রতী হইয়াও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্ত নিলজ্জের মত নির্জলা মিথ্যা কথা বলিতে হয়—সেই সকল অশুদ্ধতা হইতে আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে মুক্ত হইতে হইবে। যে তপঃশক্তির অভাবে আজ বত্রিশ বৎসর এতবড় বিরাট ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের প্রতিনিধি একত্রিত হইয়াও ভারতের প্রকৃত উন্নতির পথ নির্দ্দেশ করিতে অক্ষম হইল সেই তপঃশক্তিতেই আমাদের শক্তিমান হইয়া উঠিতে হইবে। এক বিবেকানন্দ যাহা করিয়াছেন সহস্র সুরেন্দ্রনাথ তাহার শতাংশের একাংশ করিতে পারেন নাই কেন? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য দেশ নহে, পাশ্চাত্যদেশের রাজনীতিক ধুরন্ধরগণের মত হাব ভাব লইয়া ভারতের কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইলে কার্য্য সিদ্ধি ত হইবেই না উপরন্তু দেশ আরও পিছাইয়া পড়িবে, ইহা ধ্রুব জানিও। বাঙ্গালীর মেরুদণ্ডে যদি কিছু শক্তি সঞ্চার হইয়া থাকে তবে সে শ্রীবিবেকানন্দের তপঃশক্তি প্রভাবে—আর ভারতের মরা প্রাণে আজ যে ক্ষীণ বিদ্যুৎ বিকাশ দেখিয়া আশায় ও আকাঙ্খায় উৎফুল্ল হইয়াছ তাহাও তপস্বিনী বেসান্টের দীর্ঘজীবনের কঠোর তপশ্চর্য্যায়।

আজ চাই তপস্তা। জাতীয় জীবনের জাগরণকালে বিবিধ বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। রাজনীতিক ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া উভয় দল কর্ম্ম করুন—নৈষ্কর্ম্ম্য অপেক্ষা কর্ম্মই শ্রেয়ঃ কিন্তু যাঁহারা ভগবদ্‌মণ্ডলী গঠন করিবার দুরাশা রাখেন যাঁহারা বহুজনের মধ্যে এক মন এক চিত্ত একই সত্বার স্বপ্ন সফল করিতে প্রয়াসী তাঁহাদিগকে দূরে থাকিয়া এই অনবদ্য অসাধারণ শক্তিসমষ্টি গঠন করিয়া তুলিবার জন্ত তপস্যায় প্রবৃত্ত হইতে বলি। যেখানে বাদানুবাদ নাই, যেখানে চক্ষুর দৃষ্টিতে পরস্পর ভাব বিনিময় হয়, যেখানে একই ভগবৎ-প্রেরণা একই ভাবে বহু জনের হৃদয় স্পন্দিত করিয়া একই

কার্য্যে নিয়োজিত করে সেই দিব্যধামের সৃষ্টি সেই কুণ্ঠাশূন্য বৈকুণ্ঠের প্রতিষ্ঠা—এই ভারতবর্ষেই সফল করিয়া তুলিতে হইবে। যে সকল অশুদ্ধতার জন্য আমরা এতদিন প্রতি পদে বাধা প্রাপ্ত হইয়াছি দীর্ঘ দিনের তপঃ প্রভাবে তাহা শীঘ্রই অন্তর্হিত হইবে। আবার নবীন দলের কুসুম সুকুমার বদনমণ্ডলে উৎসাহের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিবে—দক্ষিণেশ্বরের ধূলিরাশি মাথায় বহিয়া বাংলার উদীয়মান নূতন দল ভারতবর্ষকে অভাবনীয় দিব্য পথ দেখাইয়া দিবে। হে বাংলার সাধকমণ্ডলি! আর নিশ্চেষ্ট থাকিও না, দেখ স্বামিজীর অসমাপ্ত কার্য্যভার তোমাদেরই উপর নির্ভর করিতেছে। পাশ্চাত্যের কুহকিনী আশায় উদ্বুদ্ধ হইয়া ভারতের সনাতন পদ্ধতিকে অবহেলা করিও না।

বৈদিক চিন্তা-প্রসূন

আমাদের সাধারণ জীবন আমাদের নৈমিত্তিক চেতনা হইতেছে তমসাবৃতা নিশা, অন্যূনপক্ষে সে নিশা নক্ষত্রালোকে আলোকিত মাত্র। সূর্য্যরূপী মহাসত্য উদয় হইতে চলিলেই তবে ঊষাদেবী উঠিয়া আসেন—ঊষা, জ্ঞানের সে প্রথম পরিস্ফুরণ। আর ঊষার সহিতই উদ্ভূত হয় যজ্ঞ। এই যজ্ঞের দ্বারাই পুনরাগন্তা নিশার কবল হইতে অপহৃত সূর্য্যকে আমরা প্রতিনিয়ত উদ্ধার করিতেছি, পণিদিগের অন্ধকার গুহা হইতে যূথবদ্ধ জ্যোতিরাজি মুক্ত করিয়া লইতেছি।

* * *

যজ্ঞের প্রভাবেই স্বর্গের অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে বৃষ্টিরাশি আমাদের জন্য নিপতিত হইতেছে, ঊর্দ্ধপ্রতিষ্ঠিত সত্তার সপ্তধা ভিন্ন সলিলধারা এই পৃথিবীর উপর উছলিয়া আসিয়া পড়িতেছে। অহির সে উত্তুঙ্গ কুণ্ডলী সর্ব্বাবরক সর্ব্বাপহারক সে বৃত্র খণ্ডিত হইয়া পড়িতেছে ইন্দ্রের, ভাগবত-মনীষার তড়িৎ বিলসনে। যজ্ঞেই শোধিত হইতেছে সোম মদিরা—এই দিব্য পানীয় তাহার অমৃতায়মান আনন্দধারায় বহিয়া আমাদিগকে ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর, ঊর্দ্ধতম স্বর্গলোকে লইয়া চলিয়াছে।

* * *

যজ্ঞ হইতেছে মহত্তর জীবনের যে শক্তিরাজি উষায় লোকে যে দেবসঙ্ঘ তাহাদের নিকট সকল আহরণ সকল উপার্জ্জন, সকল কর্ম্ম উৎসর্গ করা। সমস্ত জগতই এক বিরামহীন যজ্ঞ—জীবসকল তথায় আবদ্ধ, অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশ্যে অসহায়ভাবে আপনাদিগকে তাহারা বলিরূপে ধরিয়া দিয়াছে। মুক্তিকর বাক্‌টি আবিষ্কার করিতে হইবে, জ্ঞানজ্যোতির্ম্ময় ঋক্‌টি মানুষের মনে ও হৃদয়ের মধ্যে রচিতে হইবে। জ্ঞানতঃ ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াই সে তাহার জীবনকে উৎসর্গ করিয়া দিবে—জীব আর যজ্ঞের বলিমাত্র থাকিবে না, সে হইবে তাহার ঈশ্বর।

* * *

এই যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হইবে যথাযথরূপে। আর নিগূঢ় অন্তরাত্মা হইতে দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসারিত করিয়া দিতে হইবে সেই মহামন্ত্র যাহা সর্ব্বকৃৎ সর্ব্ব প্রকাশক। এই দুইএর সহায়ে মানুষ সকল জিনিষই লাভ করিতে পারে। মানুষ আপনার পূর্ণতা আপনার সিদ্ধিকে জয় করিবেই। প্রকৃতি আপনা হইতে বধূরূপে আসিয়া তাহার নিকট ধরা দিবে, সিদ্ধপুরুষ প্রকৃতির প্রভু, তাঁহার রাজশক্তির দ্বারাই সে নিয়ন্ত্রিত হইয়া চলিবে।

* * *

যজ্ঞ আবার এক মহা যাত্রা। যজ্ঞ চলিয়াছে পথ বহিয়া, উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধে আহার গতি। একটি বিশেষ লক্ষ্যই তাহার গম্যস্থান। সে লক্ষ্য হইতেছে বৃহৎ সত্যপূর্ণ সত্ত্বা, জ্যোতি, আনন্দ। এই লক্ষ্যে পঁহুছিবার যে ঋজু, যে ভদ্র, যে প্রীতিময় পথখানি, সত্যের সে কঠোর অথচ মধুর পন্থা তাহা আবিষ্কার করা তাহাতেই অস্খলিত হইয়া চলাই যজ্ঞের কর্ম্ম।

* * *

ভাগবত ঈষণার যে প্রজ্বলিত শক্তি তাহারই নেতৃত্বে যজ্ঞ পর্ব্বতের সানুদেশ হইতে সানুদেশান্তরে যেন আরোহণ করিতেছে, তরণী সহায়ে যেন সে বিশ্বসত্তার জলরাশী, নদনদী সকল উত্তীর্ণ হইতেছে, গভীর গহ্বর খরধার স্রোত সকল লঙ্ঘন করিতেছে। তাহাকে পঁহুছিতে হইতে হইবে সুদূরস্থ সেই অনন্তের, জ্যোতির মহাসাগরে।

* * *

এ যাত্রা সহজও নয়, বিঘ্নরহিতও নয়—বহু ঋতু ধরিয়া এ এক ঘোর যুদ্ধ। আর্য্যমানবকে অবিরত ক্লেশ সহিতে হইবে, যুদ্ধ করিতে হইবে,

বিজয়ী হইতে হইবে। সে হইবে অক্লান্ত পরিশ্রমী, শ্রান্তিহীন পথিক, নিষ্করুণ যোদ্ধা। রুদ্ধ তোরণ সবলে উন্মুক্ত করিতে হইবে, নগরীর পর নগরী লুণ্ঠন করিয়া লইতে হইবে; রাজ্যের পর রাজ্য অধিকার করিতে হইবে, শত্রুর পর শত্রুকে নির্ম্মমভাবে বিপর্য্যস্ত পদদলিত করিয়া চলিতে হইবে।

* * *

সকল উন্নতিপ্রয়াসই হইতেছে দেবতা ও অসুরে, দেবতা ও রাক্ষসে, ইন্দ্র ও অহির, আর্য্য ও দস্যুর দ্বন্দ্ব। আর্য্য শক্তিরাজীর মধ্যেও আবার আর্য্যবীরের শত্রু আছে, উহাদের সহিতও সম্মুখযুদ্ধে তাহাকে অবতীর্ণ হইতে হইবে। পুরাতন বন্ধু, পুরাতন সহায়, তাহারাই আবার পথের কণ্টক হইয়া উঠে। জ্ঞানের শক্তির আনন্দের অল্পতার মাঝেই তাহারা আর্য্য হৃদয়কে টানিয়া রাখিতে চায়। যে-সকল আর্য্যলোক অধিকার করিয়া পার হইয়া যাইতে হইবে, যে-সকল সত্যকে উপলব্ধি করিয়া ছাড়াইয়া যাইতে হইবে তাহারাই দস্যুদের সহিত মিলিত হয়, তাহারাই সত্যের পূর্ণ অবাধ নিত্য প্রসারণশীল গতিকে মধ্য পথে থামাইয়া রাখিতে চায়।

* * *

বৃত্র, শুষ্ণ, নমুচী, বল, পণি—কত দানব, কত রূপে আর্য্য সাধকের পথে দণ্ডায়মান। অজ্ঞানের, পাপের, দৌর্ব্বল্যের, সকল রকম খণ্ডতার বিভূতি ইহারা মানুষের সাথে প্রতি মুহূর্ত্তে যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছে। অন্তিক হইতে উহারা তাহাকে ঘিরিয়া ফেলে, দূর হইতে তাহার প্রতি তীক্ষ্ণ শররাজী নিক্ষেপ করে, তাহার নব তোরণশোভিত এই আধার ভবনে দেবতার স্থান অধিকার করিয়া বসে। উহাদের বিকৃত মুখে, ক্ষীণ নিশ্বাস প্রবাহে মানুষের অন্তরাত্মার যে সত্য মন্ত্র যে পূর্ণ অভিব্যক্তি তাহা পরিস্ফুট হইতে পারে না।

* * *

এই যে অনার্য্য শক্তিনিচয় আর আর্য্যের মধ্যে যাহারা আর্য্যসত্যের পরিপন্থী তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে হইবে। যে দেবতা চাহে মানুষের মহিমার অনন্ত পরিস্ফুরণ, ব্রহ্মবাণীর পরিপূর্ণ নির্ঘোষ, সত্যের, জ্যোতির, আনন্দের, অমৃতের অখণ্ড বিলাস তাহাদের সহায়ে এই নিশাচর, এই ছায়ালোকবাসী সকলকে শতখণ্ডে বিদীর্ণ করিতে হইতে হইবে, অধঃলোকের অন্ধকার গহ্বরে নিক্ষেপ করিতে হইবে।

ত্যাগের কথা

(৪)

এমন অনেকে আছেন যাঁদের কর্ম্মে কোন আপত্তি নাই কিন্তু ভোগের নাম শুন্‌লে তাঁদের মনে হয় যে সৃষ্টি, সমাজ, সংস্কার, মানুষের ইহকাল পরকাল, তার নৈতিক আধ্যাত্মিক সকল দিক একেবারে রসাতলে গেল। এই ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত বাংলাদেশে ভোগের কথা শুন্‌লে এঁদের অনেকেরই পেটের মধ্যেকার পদার্থবিশেষ চম্‌কে যায়। এঁরা অপরের কানে কানে না হোক্ অন্ততঃ নিজের মনে মনে আওড়াচ্ছেন—"কর্ম্ম কর্‌ব ভোগ কর্‌ব না।" এই যে ভোগ বাদ দিয়ে কর্ম্ম—এই সূত্রটী নিয়ে একটু আলোচনা কর্‌লে ক্ষতি হবে না কিছুই, কিন্তু লাভের সম্ভাবনা আছে বিস্তর। এই ভোগ আর কর্ম্মকে—অথবা সঠিকভাবে বল্‌তে গেলে কর্ম্ম আর ভোগকে আমরা দেখ্‌তে চেষ্টা কর্‌ব দুটো দিক থেকে। প্রথম মানুষের মনস্তত্ত্বের দিক থেকে আর দ্বিতীয় ভগবানের সৃষ্টিতত্ত্বের দিক থেকে। এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা হওয়া দরকার কারণ এই কর্ম্মে আর ভোগে এম্‌নি একটা সম্বন্ধ আছে যে এদের দুটোর মধ্যে যে কোন একটাকে বাদ দিয়ে আর একটাকে নিয়ে জীবনযাপন কর্‌তে চাইলে মানুষের যা মিল্‌বে সেটা কর্ম্মও নয় ভোগও নয় সেটা হচ্ছে কর্ম্মভোগ।

যাঁরা কর্ম্মের পক্ষপাতী অথচ ভোগের বিরোধী তাঁদেকে এই একটা সমিচীন প্রশ্ন করা যেতে পারে যে—তাঁরা যে কর্ম্ম কর্‌তে চান সেটা কি জন্য। এ থেকে বড় প্রশ্নটাও গড়িয়ে আসে যে—মানুষ আদৌ কর্ম্ম করে কেন? এর উত্তর দু'রকমের লোকে দু'রকমে দেখেন। এক রকম যাঁদের দৃষ্টি স্থূল—এই সৃষ্টির ওপরে ওপরেই যাঁদের চোখ পড়ে' থাকে—বাহিরের আবরণ ভেদ করে' যাঁরা সৃষ্টির ভিতরকার আসল সত্যের কাছে পৌঁছতে পারেন না—যাঁরা সমস্ত ঘটনার চর্ম্মচক্ষে দৃশ্যমান কারণটাকেই ভিতরের সত্যম্ ঋতম্, যার ওপরে সেটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে সেইটে বলে ভুল করেন—আর একরকম—যাঁদের দৃষ্টি স্থূলকে অতিক্রম করে' অনায়াসে এ সৃষ্টির রহস্যের অভ্যন্তরে যাতায়াত কর্‌তে পারে—যাঁদের বাহি-

যের দেখার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের দেখাও খুলেছে—যাঁরা চর্ম্মচক্ষুতেও দিব্যি দেখ্‌তে পান—আবার যাঁদের দিব্যচক্ষুরও অভাব নেই।

এর মধ্যে প্রথম রকমের লোকেরা—স্থূল দৃষ্টির লোকেরা বল্‌বেন যে —মানুষ কর্ম্ম করে—সে ত স্পষ্টই দেখ্‌তে পাচ্ছি একটা কিছু লাভ কর্‌বার জন্যে। কেউ বা অর্থ, কেউ বা যশঃ খ্যাতি কেউ বা সম্মান কেউ বা আর একটা কিছু লাভ কর্‌বার জন্য কর্ম্ম কচ্ছেন। এই অর্থ যশঃ মান ইত্যাদিই হচ্ছে কর্ম্ম কর্‌বার কারণ। কর্ম্ম কর্‌বার এইটে যদি কারণ বলে' মানা যায় তবে ভোগ না কর্‌বার কোন মানে হয় না। অর্থ যশঃ মান ইত্যাদি লাভের জন্য কর্ম্ম করে' যখন সেগুলি লাভ হ'ল তখন সেগুলিকে যদি ভোগ না করা যায় তবে কর্ম্ম কর্‌বার যুক্তিও লোপ পায়। কবি যদি খ্যাতির জন্য কাব্য লেখেন, ঔপন্যাসিক যদি যশের জন্য উপন্যাস লেখেন, ব্যবসায়ী যদি অর্থের জন্য ব্যবসা করেন তবে সেগুলি তাদের প্রাপ্য হ'লে, তাঁরা ভোগ কর্‌বেন না কেন? যদি ভোগ না করেন তবে উপরিউক্ত কর্ম্মের কারণ অনুসারে কর্ম্ম কর্‌বার যুক্তিও লোপ পেয়ে যায়। যুক্তি-তর্কের বিচারের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য তাঁদের হয় বল্‌তে হয়—"কর্ম্ম কর্‌ব ভোগ কর্‌ব"—নয় "কর্ম্মও কর্‌ব না ভোগও কর্‌ব না"। স্থূল দৃষ্টির লোকেরা কর্ম্মের যে কারণ নির্দ্দেশ কর্‌লেন সে কারণ অনুসারে ভোগ ছাড়া কর্ম্মের কোন মানেই থাকে না। ভোগ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্ম সন্ন্যাসও আসে। এটা Logic সুতরাং তাঁদের "কর্ম্ম কর্‌ব ভোগ কর্‌ব না" এ সূত্রের কোন যুক্তি সঙ্গত মানে নেই।

কিন্তু ঐ যে দ্বিতীয় রকমের লোকের কথা বলেছি যাঁদের দিব্যদৃষ্টি আছে—যাঁরা সৃষ্টির ভিতরের রহস্য জানবার অধিকারী হয়েছেন—তাঁরা বল্‌বেন যে স্থূলদৃষ্টির লোকেরা কর্ম্মের যে কারণ নির্দ্দেশ কর্‌লেন তা কর্ম্মের কারণ cause নয়—তা প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মের ফল effect. সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ড যেমন বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় যুদ্ধের কারণ নয়—এমন কি কৈসরের, জার্ম্মাণজাতীর রাজ্যবিস্তারের বাণিজ্যবিস্তারের আকাঙ্খাও যেমন এ যুদ্ধের কারণ নয়—এ যুদ্ধের কারণ আরও গভীরে আরও অন্তরে—বিশ্বমানবের হৃদয়-যবনিকার অন্তরালে যেখানকার এক একটা পরিবর্ত্তনে দৃশ্যমান পৃথিবীতে এক একটা প্রকাণ্ড ওলট্‌ পালট্‌ হ'য়ে যায়—এ যুদ্ধের প্রকৃত কারণও গুপ্ত হ'য়ে আছে সেখানে। তেমনি মানুষেরও

কর্ম্ম কর্‌বার যে কারণ—তা তার বাহিরে নেই, তা আছে তার আপনার মধ্যে—তা তার বাহিরে খুঁজ্‌লে হবে না—তা খুঁজ্‌তে হবে তার অন্তরে। মানুষের কর্ম্ম কর্‌বার আসল কারণ হচ্ছে তার স্নায়ুতে স্নায়ুতে পেশীতে পেশীতে যে ওজস্ রয়েছে—তার মনে মনে প্রাণে প্রাণে অন্তরে অন্তরে যে কর্ম্ম প্রেরণা রয়েছে—তার প্রকৃতিতে যে চিৎ রয়েছে—তাই। এই যে ওজস্, এই যে কর্ম্ম প্রেরণা এই যে চিৎ এরা ভগবানসিদ্ধ সুতরাং সৎ। আর সেই জন্যেই মানুষ কর্ম্ম কর্‌তে বাধ্য। কেবল যে বাধ্য তাই নয়—এই কর্ম্ম করার মধ্যেই রয়েছে তার মুক্তি। কারণ সত্যের আশ্রয়েই মুক্তি। আর সত্যকে অস্বীকার কর্‌লেই দুঃখ ও অমঙ্গল। তাই মানুষ কর্ম্ম করেই আনন্দ পায় শান্তি পায়—কর্ম্ম না করে' নয়। ধনই বল মানই বল যশঃ খ্যাতি যা বল এ সমস্তই মানুষের জীবনে accident (গৌণ ঘটনামাত্র)। মানুষের কাছে এদের কোনই মূল্য থাক্‌ত না যদি না থাক্‌ত তার অন্তরে তার প্রকৃতিতে ঐ চিৎশক্তি। সুতরাং এই চিৎ এই কর্ম্মপ্রেরণাই মানুষের কর্ম্ম কর্‌বার প্রকৃত কারণ—আর সেটা সৎ—ভগবানসিদ্ধ। সেই জন্যেই আমরা মানুষের কর্ম্ম কর্‌বার পক্ষপাতী। এই হচ্ছে দিব্যদৃষ্টির লোকদের কথা।

দিবাদৃষ্টি লোকদের ঐ কথা যদি মানা যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে সত্যের খাতিরে এটাও মান্‌তে হবে যে মানুষের প্রবৃত্তিতে যেমন ভগবানসিদ্ধ কর্ম্মপ্রেরণা রয়েছে তেম্‌নি তার মধ্যে ভোগের প্রেরণাও রয়েছে। আর এই ভোগের প্রেরণা যে সৎ ও ভগবানসিদ্ধ নয় তা অনুমান কর্‌বার কোন কারণ নেই। এরও প্রমাণ সমগ্র মানবজাতি। এটা যদি স্বীকার করা যায় তবে ঐ কর্ম্মপ্রেরণা আর ভোগের প্রেরণার মধ্যে একটাকে জীবনে বরণ করে' আর একটাকে ত্যাগ কর্‌ব কেন? একটা সত্যের আশ্রয়ে যদি মানুষের মুক্তি, আনন্দ আসে তবে তার জীবনের আর একটা সত্যের আশ্রয়েও তা আস্‌বে—এটাই হচ্ছে ন্যায্য যুক্তির কথা। সুতরাং ভোগকে ত্যাগ কর্‌বার কি কারণ থাক্‌তে পারে?

ভোগ করে' যে মানুষের আনন্দ হয় সেটা প্রত্যক্ষ সত্য। তবে সে আনন্দকে জীবনে বরণ কর্‌ব না কেন? এমন সহজসাধ্য আনন্দকে জীবন থেকে সরিয়ে রাখ্‌ব কেন? এর উত্তরে ভোগের বিরোধীদল বল্‌বেন যে ভোগের যেটা আনন্দ সেটা আপাত—এর পশ্চাতে গুপ্ত হয়ে রয়েছে

বিরাট অমঙ্গল। যে ভোগকে বরণ কর্‌বে অমঙ্গলকেও তার বরণ করে' নিতে হবে। এই কথাটাই আমরা মানি নে। যে সৃষ্টি আনন্দ থেকে উৎপত্তি হয়ে আনন্দের ওপরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে সেই সৃষ্টির মধ্যে যে ভগবান্ একটা অমঙ্গলকে ঢুকিয়ে দিয়ে বসে আছেন—এইটেই আমরা মান্‌তে পারি না। আসল কথা হচ্ছে এই যে--আগুনে দাহিকা শক্তি আছে। তাতে রান্না করাও চলে আবার ঘর পুড়িয়ে দেওয়াও চলে। তাই বলে' যে আগুনটা অমঙ্গলের এ যিনি বল্‌বেন—আর যাই হ'ন—তিনি বুদ্ধিমানও নন জ্ঞানবানও নন। ভোগে অমঙ্গল আনে তখন যখন সেটা হয় মিথ্যা ভোগ। মিথ্যা ভোগ হচ্ছে সেইটে যেটা মানুষের সামর্থ্যের বাহিরে। মানুষের সত্ত্বাটা মিথ্যা দিয়ে ভরে ওঠে সেই সময় যখন সে তার অন্তরের জীবন-দেবতাকে খারিজ করে' দিয়ে তার মনে সে অহং-দেবতার আসন পাতে। আর অহং-দেবতার যে মিথ্যা সেটা প্রবৃত্তির দিকেও হতে পারে নিবৃত্তির দিকেও হতে পারে—ভোগেও হতে পারে, ত্যাগেও হতে পারে। সুতরাং যেদিক থেকে দেখা যাক্‌না কেন ভোগটাকে জীবন থেকে বাতিল করে' দেওয়ার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কেবল তাই নয় এই ভোগ ত্যাগটা সমস্ত সৃষ্টিতত্ত্বের বিরোধী কথা।

কারণ এই যে সৃষ্টি—এই সৃষ্টির raison d'etre (মূল কারণ) স্থাপিত হয়ে রয়েছে ভোগের ওপর। কি ভোগ? না, আনন্দ ভোগ। কিসের আনন্দ? না, বিভিন্ন বিভিন্ন রসের আনন্দ। নইলে সৃষ্টির কোন মানে থাকে না। কারণ ভগবান্ যখন এক ছিলেন—যখন তিনি বহু হন নি তখন ত তিনি নিরানন্দ ছিলেন না। তবুও তিনি বহু হলেন। কেন? তাঁর ইচ্ছা। এর ওপরে আর কোন কথা নেই। ভগবান যখন এক ছিলেন আর যখন তিনি বহু হলেন—এই দুই অবস্থার আনন্দে তফাৎ কি? একটা হচ্ছে সিন্ধুর অতল তলের আনন্দ আর একটা হচ্ছে স্রোতস্বিনীর গতি-ভঙ্গের আনন্দ। একটা স্থিতির আনন্দ, আর একটা গতির আনন্দ—একটা স্থাণুর আনন্দ, আর একটা রেণুর আনন্দ—একটা অদ্বৈতের আনন্দ, আর একটা দ্বৈতের আনন্দ—একটা বৈদান্তিকের আনন্দ, আর একটা তান্ত্রিকের আনন্দ। একটায় বিভিন্ন বিভিন্ন রসের সমাপ্তি, আর একটায় সর্ব্বপ্রকার রসের পরিণতি। সর্ব্বপ্রকার রসের—তা সে খাদ্যরসই হোক্ অথবা কাব্য রসই হোক্।

সুতরাং যাঁরা সৃষ্টিকে মানেন—ভগবান যে বহু হয়েছেন সেটা স্বীকার করেন অর্থাৎ যাঁরা মায়াবাদী নন তাদের পক্ষে ভোগের বিরোধী হওয়া অত্যন্ত যুক্তিহীন—illogical.

লীলা

(৬)

যোগের তৃতীয়স্তর সর্ব্বভূতে ভগবানকে দর্শন করা। স্বভাবতঃ প্রথম প্রথম সর্ব্বকাল ও সর্ব্বস্থান ব্যাপ্ত করিয়া একই ব্রহ্মের অবস্থিতি অনুমান হইবে, একই অব্যক্ত অব্যয় অচল ব্রহ্মে এই জীবজগতের প্রতিষ্ঠা এইরূপ একটা অস্পষ্ট আভাষের উদয় হইবে, এইরূপ তরল অনুভূতির ভিতর দিয়া সাধক ক্রমশঃ বোধ করিবে জগতের যাবতীয় পদার্থই অলীক মায়া মাত্র। ক্ষণবিধ্বংসী এই কুহকিনী সৃষ্টি অপরিণামী নিত্য সত্য আত্মাকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে, পরন্তু পাঞ্চভৌতিক এই সৃষ্টিচাতুর্য্য একটা মস্ত ইন্দ্রজাল—মিথ্যা, ইহার অতীত যে শুদ্ধসত্তা তাহাই সত্য। কিন্তু জ্ঞান বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাধক দেখিবে—এই অনির্ব্বচনীয় মায়ারাজ্যকে ধারণ এবং পোষণ করিয়াই সেই নিত্য শাশ্বত পরমব্রহ্ম নিরস্ত নহেন পরন্তু তিনিই দৃষ্ট পদার্থগুলিকে আপনার সত্তা দিয়াই পূর্ণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনিই নাম রূপ গ্রহণ করিয়া আপনার কূটস্থ ভাবকে ব্যক্ত ও বিকশিত করিয়া ব্রহ্মাণ্ডময় হইয়াছেন। উপনিষদের ঋষিবৃন্দ যে অমৃতে অভিষিক্ত হইয়া জগতে গভীর জ্ঞান প্রচার করিয়া গিয়াছেন, যে অমরভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া যোগৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতার উপদেশ ভারতসন্তানগণের জন্য গাহিয়া গিয়াছেন তদনুযায়ী আর্য্যসন্তানগণের জীবন সংগঠিত হইয়া উঠিলে আমরা কেবল উপলব্ধি করিয়াই ক্ষান্ত হইব না—প্রত্যক্ষ অনুভব করিব যে সর্ব্বত্রেই আমার বিদ্যমানতা এবং সর্ব্ববস্তুই আমার মধ্যে নিহিত আছে—

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥

"যোগে সমাহিত চিত্ত সর্ব্বত্র সমদর্শী আত্মাকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত দেখেন,

এবং সর্ব্বভূতকে আত্মাতে দর্শন করেন।" সাধক তখন জানিবে ব্রহ্মই জগৎ, সর্ব্ব বস্তুই ব্রহ্ম। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।

অনেকেই কোন অপৌরুষেয় সত্তার উপরই এই অনিত্য জগতের প্রতিষ্ঠা কল্পনা করিয়া ইহবিমুখ হইয়া সেই অব্যক্ত গুণাতীত পরমব্রহ্মের অনুসন্ধানে নিরত রহেন আবার কেহ বা বৌদ্ধশূন্যবাদীর মত জগৎ কারণের পশ্চাদবর্ত্তী নিথর গুণাদিশূন্য অন্তহীন মহাশূন্য ভেদ করিবার উদ্দেশ্যে মহানির্ব্বাণ পথে অভিযান করেন। সেই পরাৎপর পুরুষ এবং জগদসৃষ্টির ব্যবধানে যে মহাতমসাচ্ছন্ন দীর্ঘপথ ইহাই নাকি পরমব্রহ্মকে সংসার মায়াদি হইতে পরিচ্ছিন্ন করিয়াছে। 'পুরুষোবরেণ্যঃ আদিত্যবর্ণস্তমসঃ পরস্তাৎ' কিন্তু আত্মসমর্পণযোগীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট অনুভূতি হইতেছে যখন সে জানিবে জগৎপ্রকাশ কেবল যে ভগবানের ইচ্ছা সম্ভূত, তাঁহার প্রকৃত সত্তার সহিত ইহার কোন ঘনিষ্ঠতা নাই এরূপ নহে, এ লীলা তাঁহারই এবং তিনিই যুগপৎ এই সৃষ্টির আধেয় এবং আধার, তাঁহারই অব্যক্ত সত্তা সৃষ্টিচাতুর্য্যে ক্রম বিকশিত আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া তাঁহাকেই থরে থরে বিরাজিত করিয়াছে। তিনিই আপনার সত্তা দিয়াই সাগর ভূধর বিপুল অরণ্যানি অসংখ্য নদনদী পরিবেষ্টিত অনন্ত কোটী প্রাণিসমাকুল এই ভূমণ্ডল এই গ্রহ উপগ্রহ কোটীসূর্য্য সমন্বিত মানববুদ্ধির অতীত অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন—এই অনন্তসৃষ্ট বস্তুর অন্তস্থিত থাকিয়া তিনিই বিপুল পুলকে বিচিত্র লীলা প্রকটন করিতেছেন। লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ অনাদি অসীম হইলেও তিনি ব্যক্ত-ঈশ্বর; অনন্ত হইলেও সান্ত; শিবময় হইলেও নারায়ণ। আনন্দের পুলকে লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ অনন্তকোটী রূপের সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং অন্তহীন বিভিন্নরূপের সৃষ্টি ঘটিলেও সকলগুলিই সেই একই সত্তার একই প্রেমধারায় সঞ্জীবিত পুলকিত উদ্ভাষিত, একেরই আকর্ষণ একেরই আনুগত্য একেরই প্রভুত্ব সকলের মধ্যে সমানভাবে অবিচ্ছেদ খেলিয়া যাইতেছে, এই অনাদি লীলার মধ্যে তাঁহারই আনন্দ তাঁহারই সৃষ্টিচাতুর্য্য তাঁহারই সৌন্দর্য্য নানাভাবে নানারূপে ব্যক্ত হইতেছে।

জগৎ সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবানের একটা খেলা মাত্র। এ জগতে জড়ের স্থান নাই, জড় বলিয়া যাহা প্রতীত হয় জ্ঞানচক্ষে দেখিতে শিখিলে দেখিবে সমস্তই গুণময়, সত্ত্বরজস্তমাদি গুণভেদে প্রত্যেক পদার্থই চৈতন্যময়। গুণ সংঘাতে পরস্পর সন্নিবদ্ধ ও মিলিত হইয়া কাঠিন্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে

পর্য্যন্ত সাধকের চক্ষে সমগ্র পদার্থই শ্রীকৃষ্ণময়। জগতে এইরূপে অনন্তগুণ রঙ্গের সচ্চিদানন্দের রতিক্রীড়া অনাদি অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়াছে।

যখন এইরূপ অনুভূতি আমাদের জীবনে সুস্পষ্ট এবং জাগ্রত হইয়া উঠে, এইরূপ সনাতন জ্ঞান আমাদের মজ্জায় মজ্জায় স্থায়ীভাবে অবস্থিতি করে, ক্ষণেকের সংশয়ে যখন আমরা আত্মহারা না হই তখনই ক্রোধ ভয় শোক দুঃখ জগতের যতকিছু ব্যাধি আছে সকল হইতে আমরা মুক্ত হই, আমাদের আধার হইতে ধীরে ধীরে অজ্ঞানতাজনিত যতকিছু অনিত্যের খেলা অপসারিত হয়, তখনই উপনিষদের যে চরম সত্য 'আনন্দম্ ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন' এই জ্ঞানে পরিপূর্ণ হইয়া উঠি। ব্রহ্মানন্দে বিভোর হইয়া জগতের কোন বস্তুকে তখন আর ভয়ের চক্ষে দেখি না—যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।

তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমণুপশ্যতঃ॥

যখন সর্ব্বভূতই আত্মার সহিত এক এবং অভিন্ন হইয়া যায় তখন সেই একত্বদর্শী জ্ঞানীর শোকই বা কি আর মোহই বা কি? সমগ্র জগতের মূর্ত্তি তখন সাধকের নিকট ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে, কুৎসিত ও কদাকার বলিয়া কিছুই থাকে না। সমস্ত পৃথিবীটা তখন যেন এক রূপের সাগরে আনন্দের লহরে মঙ্গল এবং মধুর নৃত্য করিতে থাকে, আনন্দের জয়োল্লাসে পরম শান্তি এবং অসীম শক্তি সমন্বিত হইয়া মায়াবাদীর এই অনিত্য জগতই পবিত্র শ্রীবৃন্দাবনের মত শ্রীকৃষ্ণের লীলা নিকেতন বলিয়া মনে হয়। আমরা চতুর্দ্দিকেই তখন শিব শুভ মঙ্গল ও আনন্দের ক্রীড়া নিরীক্ষণ করি, আমরা সকল পদার্থের সহিত একাত্ম হইয়া সর্ব্বভূতকেই আত্মাতে এবং আত্মাকেও সর্ব্বভূতে সন্দর্শন করি। এইরূপ একত্ব অনুভূতির ফলে ভগবানের সহিত আমাদের যুক্ততা সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষীভূত হইয়া উঠে। ইহাই ব্রাহ্মীস্থিতি, এইরূপ ঘটিলে আমরাই সচ্চিদানন্দ খেলার কেন্দ্র হইয়া জগতে শ্রীভগবানের শুদ্ধ জ্ঞান শক্তি ও আনন্দের অমৃতধারাকে সমস্ত জগতে প্রবাহিত করিতে সমর্থ হইব।

সমালোচনা

আমরা Relief-work of the Ramkrishna Mission during flood and famine in Bengal, Assam and in the United Provinces—1915-16 নামক বিবরণী-পুস্তক পাইয়াছি। স্বামিজী বাঙ্গালীর ঘোরতর তমসাচ্ছন্ন জীবনকে তাঁহার অমানুষিক তপঃশক্তি সঞ্চারণে এক নূতন শক্তি ও কর্ম্মপ্রেরণার উদ্বুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার তিরোধানের পর হইতে বাঙ্গালীর মরাপ্রাণ বিদ্যুৎ প্রভাবে চমকিত ও সঞ্চালিত হইয়া নানা কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছে, দরিদ্র ও বিপন্ন নরনারীর সেবা-ধর্ম্ম তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম, এই মহান্ উদ্দেশ্যে বেলুড়ের সন্ন্যাসিগণ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিয়া বিপন্ন দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতেছেন। ১৯১৪ সালের আগষ্ট মাসে য়ুরোপে মহাযুদ্ধের সূচনা হয়। ১৯১৩ সালে টিপারা এবং নোয়াখালির কৃষিক্ষেত্রগুলি বিপুল বন্যায় প্লাবিত হওয়ায় দেশ-বাসীর কষ্টের একশেষ থাকে না, কারণ তাহাদের উপজীবিকাস্বরূপ পাট বিক্রয়ের আশাও যুদ্ধের জন্য নির্ম্মূল হইয়া যায়। ১৯১৩ সালে যে পাটের দর ১০৲ হইতে ১৪৲ টাকা ছিল তাহা ১৸০ হইতে ৩৷০ বিক্রয় করিতে হইয়াছে, সুতরাং গ্রামবাসীগণের মধ্যে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ১৯১৫ সালের মার্চ্চ এবং এপ্রেল মাসের পরই অনশনক্লিষ্ট নরনারীগণ চাঁদপুর এবং নোয়া-খালিতে অসহায় অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হয়—এই সকল দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীর অন্নাভাব দূরীকরণের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন সাধারণের সাহায্য পাইবার পূর্ব্বেই Provident Relief fund হইতে অর্থ লইয়া ১১ জন সন্ন্যাসীকে দুইটী জেলায় পাঠাইয়া দেন; তাঁহারা দুইটী জেলায় ৪টী কেন্দ্র সংস্থাপন করিয়া এক সপ্তাহে ৯০০ জন অন্নহীনের অন্নসংস্থান করিয়া দেন। এই পুস্তকখানিতে টিপারা ও কাছাড় বন্যায় সাহায্য-বিবরণী, ফরিদপুর কোটালিপাড়া, উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলা ও বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ এবং বেনারস বালিয়া বর্দ্ধমানের অজয় নদীর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের সেবা বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য্যে প্রশংসা করা ধৃষ্টতা মনে করি, মিশন ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ মাথায় বহিয়া দেশের ও দশের সেবা করিয়া ভারতে নূতন দিন ফিরাইয়া আনুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

অন্তরীণ

বাঙ্গালীর আজ বড় সমস্যার দিন। জানিনা শ্রীভগবান্ কেমন করিয়া এই কঠোর অগ্নি-পরীক্ষা হইতে বাঙ্গালীজাতিকে উত্তীর্ণ করিবেন। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের শিক্ষিত জনগণ বাঙ্গালীর এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া অত্যাধিক মর্ম্মাহত হইয়াছেন। একজন মাদ্রাজী নেতা না-কি প্রবাসী-সম্পাদককে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন "Bengal has been terrorised by the internments" বাংলা অন্তরীণে দমিয়া গিয়াছে। কথাটা কি সত্য?

ভারতের সকল প্রদেশাপেক্ষা বাংলায় দমননীতি প্রবল। এই আড়াই বৎসরের মধ্যেই বাংলায় সহস্রাধিক কর্ম্মী-যুবক আবদ্ধ হইয়াছে—এখনও যে বাঙ্গালীর বুকে উৎসাহের প্রদীপ জ্বলিতেছে, ইহাই আশার কথা। এরূপ আঘাত পাইলে অন্য কোন প্রদেশ কিরূপ অবস্থা লাভ করিত তাহা বলা বড় দুঃসাধ্য।

১৯০৫ সাল হইতে বাংলায় যে প্রচণ্ড আন্দোলন-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা আজ পর্য্যন্ত অবিরাম গতিতেই ছুটিয়াছে; এই খরতর প্রবাহে বাঙ্গালী নানা ভাবে ব্যথিত ও বিপর্য্যস্ত হইলেও সে যে ক্রমশঃ 'শক্ত মানুষ' হইয়া উঠিতেছে এ কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু কেবল রাজসিক ভাবের কর্ম্মপ্রেরণায় বাংলার যুবকমণ্ডলী যদি চিরদিন নিরত থাকে তাহা হইলে ক্রমশই তাহারা শক্তিহীন হইয়া ধরাপৃষ্ঠ হইতে লোপ পাইবে, এইজন্য তাহাদের গতির পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে।

'প্রবর্ত্তক' শান্তি চাহে—রাজ্যে সুশাসনের পক্ষপাতী, বাঙ্গালীর চরিত্রকে একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভগবৎ ইচ্ছার অনুগত করিবার সঙ্কল্প রাখে, পরন্তু হঠকারিতার বশবর্ত্তী হইয়া কোনরূপ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি যাহাতে না হয় 'প্রবর্ত্তক' সে দিকে চিরদিন দৃষ্টি রাখিবে। "প্রবর্ত্তকের" ভাব ও ভাষাকে ইহার বিপরীত অর্থে যাঁহারা গ্রহণ করেন তাঁহারা ভ্রান্ত, একথা স্পষ্ট বলিয়া, আমরা কয়েকটী কথার অবতারণা করিতে চাহি।

বিধিসঙ্গত আন্দোলনে ভারতে "হোমরুল" প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীমতী বেসাণ্ট যখন দুইজন সহচর সহ বন্দী হইলেন তখন ভারতে সকল প্রদেশের নেতাগণের মধ্যে একটা হা-হুতাশ ও আন্দোলনের সাড়া পড়িয়া গেল, বাঙ্গালী সে আন্দোলনে পূর্ণ মাত্রায় যোগদানে অসমর্থ হইয়া উঠিল। টাউনহল সভার নিষেধপত্র অবলম্বন করিয়া সে যে লীলার অভিনয় করিয়াছিল তাহা সকল শিক্ষিত ভদ্রলোকই জানেন। পরে বাঙ্গালীর নেতা সুরেন্দ্রনাথ যথানামে নিত্যকর্ম্ম শেষ করিলেন। বেসাণ্ট ইংরাজ মহিলা বলিয়াই হউক অথবা ভারতবর্ষের সকল নেতৃমণ্ডলীর কলরবেই হউক তিনি মুক্তিলাভ করিলেন। কিন্তু মহম্মদ আলি ও সাখাৎ আলি, তুমুল আন্দোলনের ফলেও মুক্তি পাইলেন না, কেননা তাঁহারা কেবল বাক্য সংযম করেন নাই বলিয়াই যে বন্দী হইয়াছেন এরূপ নহে পরন্তু রাজশত্রু জার্ম্মণীর স্বপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান অবস্থাতেও তাঁহাদেব মতের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই (their attitude has not been materially changed) কিন্তু বেসাণ্টের মুক্তিতে কেহ কেহ মনে করিয়াছেন যে তাঁহাদের আন্দোলনের ফলেই ইহা সফল হইয়াছে। সেইজন্য অতঃপর সকল রাজনীতিক বন্দিগণের মুক্তির জন্য চতুর্দ্দিকে একটু একটু অস্ফুট শব্দ শোনা যাইতেছে। সেদিন মহিলা সভায় শ্রীমতী প্রতিমা দেবী বাংলার প্রকাশ্য সভায়, এই প্রথম, হতভাগ্যদের মুক্তির জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। তারপর শ্রীমতী বেসণ্টের মুক্তির জন্য উল্লাস প্রকাশের "রাক্ষসী" সভায় শ্রীযুক্ত ব্যোমকশ এই কথার পুনরুত্থাপন করিয়া বাঙ্গালীর অশেষ ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। সংবাদপত্রের মধ্যে "নায়কেই" এতদ্‌সম্বন্ধে দুই একটা কথা লেখা হইত, আজকাল সকল সংবাদপত্রেই ইহার যৎসামান্য আলোচনা হইতেছে।

অধুনা মধ্যে মধ্যে দুই একজন রাজনীতিক বন্দীর মুক্তির বার্ত্তা সংবাদ পত্রে দেখিয়া থাকি। পুকুরে বেড়াজাল দিবার কালে মৎস্য নহে, এরূপ অনেক জীবই তাহাতে আসিয়া পড়ে, সুতরাং সেরূপ দু'একজন নিতান্ত নিরীহ ভদ্রলোকের মুক্তিতে দেশ আশান্বিত হইতে পারে না। মহম্মদ আলি ও সাখাৎ আলির জন্য সমগ্র মুসলমান সমাজ আন্দোলন করিয়াও যদি সে পক্ষে কৃতকার্য্য না হয়, তাহা হইলে বাংলার নন্দদুলালগণের জন্য যে ক্ষীণ আবেদন করা হইতেছে তাহা যে একেবারেই নিষ্ফল হইবে একথা

না বলিলেও চলে। "নায়ক" সত্যই বলিয়াছেন 'বাঙ্গালীর অন্তরীণদিগের মুক্তির আশাও সুতরাং নিরাশায় পরিণত হইল।"

আশা কুহকিনী—এতদ্ সত্ত্বেও মানুষের আশা ত নিবৃত্ত হয় না। উপস্থিত ভারত সচিবের আগমনে ভারতে যদি প্রকৃত শান্তির ছবি প্রকৃষ্টতর করিয়া রাখিতে হয় তবে এই সহস্রাধিক যুবক দোষীই হউক আর নির্দ্দোষীই হউক, ইহাদের মুক্তি দেওয়া যুক্তিসঙ্গত। মহামতি চেম্‌সফোর্ড শান্তির পক্ষপাতী বুঝিয়াই আমরা এই কথাগুলি ভীষণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত বাঙ্গালী গৃহস্থগণের পক্ষ হইতে বলিতেছি। বেসান্টের মুক্তিতে এ্যাংগ্লো ইণ্ডিয়ানগণ যে আন্দোলনের সৃষ্টি করিতেছেন তাহাই লক্ষ্য করিয়া তিনি বলয়াছেন— "It is absolutely necessary that India should be perfectly quiet during Mr. Montagu's sojurn in this country" অর্থাৎ মিষ্টার মন্টেগু যতদিন ভারতে থাকিবেন ততদিন ভারতবর্ষে পূর্ণ শান্তি সাধন একান্ত প্রয়োজন। তাই আমরা বাঙ্গালীর নয়ন-মণিদের মুক্তিদান করিয়া প্রকৃত স্থায়ী শান্তিস্থাপনের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করি।

বাংলার শত শত যুবক যে যে কারণে বন্দী তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। কেহ কেহ রাজনৈতিক হত্যাপরাধ সন্দেহে, কেহ বা রাজনৈতিক ডাকাতির অভিযোগে, কেহ বা এই উভয় কর্ম্মের পোষকতা করিয়াছে বলিয়া; আবার অধিকাংশই হয়ত উপরোক্ত অপরাধীগণের সহিত নানা সংস্রবে জড়িত এইরূপ সংশয়ে অন্তরীণ হইয়াছে। বাংলার সনাতন চরিত্রে এই যে নরহত্যা ও চৌর্য্য অপরাধের আরোপ তাহা খুবই গুরুতর বটে কিন্তু এই সকল যুবক বিপথগামী হইলেও ইহারা পরার্থজ্ঞানে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে। এই সকল ত্যাগী কর্ম্মী যুবকগণ যদি সমাজে যথার্থ কর্ম্ম করিতে পায় আমাদের মনে হয় তবেই অশান্তি চিরতরে বিদূরিত হইতে পারে। দিনাজপুরে রাজনৈতিক অপরাধী শচীন্দ্রনাথ মৃত্যুকালে যাহা লিখিয়াছেন— "I can not remain in bondage in society ……… I can not live in society without being a true member of it and without free activity. ……… I pray to God that I may be born in Bengal with everything good in me." অর্থাৎ আমি মনুষ্যসমাজে বন্ধনদশায় থাকিতে পারি না, সমাজের প্রকৃত বন্ধু হইয়া থাকিতে না পারিলে, আমার কর্ম্মপ্রেরণা অবাধে সম্পন্ন করিতে না

পারিলে বাঁচিতে পারি না। আমি সকল সদগুণ লইয়া আবার যেন বাংলায় জন্মগ্রহণ করিতে পারি, হে ভগবান! ইহাই আমার প্রার্থনা—উহা কি এনার্কিষ্টের উক্তি! গ্রহ চক্রে আজ জোর করিয়া এরূপ সহস্র বাঙ্গালী এনার্কিষ্ট মধ্যে পরিগণিত হইতেছে। আমরা বলি অমিতবিক্রমশালী ইংরাজ এই নিরস্ত্র সহস্রাধিক যুবকের ভয়ে বিন্দুমাত্র বিচলিত নহেন। অতএব যথারীতি বিচার পূর্ব্বক ইহাদের মুক্তি দেওয়া হউক, ইহাদের অতীত জীবনে যদি কিছু অপরাধ থাকে, তাহা মার্জ্জনা করিয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করুন। এই সকল রাজনৈতিক বন্দীযুবকগণ মুক্ত হইয়া যদি দ্বিতীয়বার অপরাধ করে তবে তাহাদিগকে গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে। ফরাসী রাজ্যে এইরূপ এক প্রকার আইন আছে যে প্রথম অপরাধীকে ইহারা যথারীতি বিচার করিয়া ছাড়িয়া দেন, সে বিচারে যাহা শাস্তি হয় তাহার দ্বিতীয় অপরাধে প্রথম এবং দ্বিতীয়বারের শাস্তি একত্র করিয়া তাহাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, আমরা এই একই উপায়ে বাংলার সকল রাজনীতিক বন্দীর মুক্তির আশা করিতে পারি।

তারপর আমাদের কথা। শান্তি অশান্তি, সুখ দুঃখ সকলই বিধাতার ইচ্ছায় সম্পাদিত হয়। শ্রীভগবানের ইচ্ছা হইলেই হতাশ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে আশার প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিবে। বাঙ্গালীর জীবনে যে দেশপ্রীতি জাগিয়া উঠিয়াছে তাহার যথাবিধি বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। আজ এই সহস্রাধিক বাঙ্গালীর অন্তরীণে বসিয়া বসিয়া রোদন করিলে চলিবে না, বাংলার যুবকসঙ্ঘকে নির্ভয়েই পথ চলিতে হইবে। যে দেশের নেতৃমণ্ডলী সমাজের দুঃখ দুর্দ্দশায় আত্মহারা হইয়া বিপদ সম্পদ এক করিতে পারে না, যে দেশের জননেতাগণ কর্ত্তব্যের জন্য ইহজীবনের সকল স্বার্থ পদাঘাতে দুর করিতে পশ্চাৎপদ হয় তাহাদের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিলে আমাদের চলিবে না, একমাত্র ভগবানকে সম্বল করিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। পথের বিভীষিকা, সৎ সাহসের অভ্যুদয়ে বিদূরিত হইবে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে অতঃপর আমরা অস্পষ্ট সংশয় এবং জটীল পথ পরিত্যাগ করিয়া স্পষ্ট নিঃসংশয়িত সরল পথেই পরিচালিত হইব। আমাদের গতির পথে যত বড় বাধাই আসিয়া উপস্থিত হউক না তাহাকে অতিক্রম করিবার জন্য আমরা কোন মতেই কুটীল পন্থা অবলম্বন করিব না। জানি, দেশব্যাপী সংশয় এবং কাপুরুষতায় আবালবৃদ্ধবণিতা মৃতপ্রায়

নতুবা মহাপ্রাণ শচীন্দ্রনাথ মানুষের বাধায় উপায়হীন বলিয়া আত্মহত্যা করিবে কেন? হরিদাস উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিবে কেন? বাঙ্গালী ভুলিয়াছ কি "পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্, মূকং করোতি বাচালম্"। ভগবানের চরণাশ্রয় করিলে জীবন কি ভাঙ্গিয়া পড়ে, জনহিতসাধন কি দুঃসাধ্য হয়? হায়! হায়! ভগবদ্‌ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কবে আবার নানা দুরবস্থার মধ্যে আজন্ম নিগৃহীত হইয়াও বিধিনির্দ্দিষ্ট পথে বীরের মত চলিতে শিখিবে?

সমতা

গীতায় আছে—"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যো সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥

হে ধনঞ্জয়! আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন হইয়া যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর; সমত্বই যোগ বলিয়া উক্ত হয়।

যোগস্থ কি না ঈশ্বরপরায়ণ হওয়া অর্থাৎ ইহসংসারে সকল অবস্থার মধ্যেই শ্রীভগবানের হাত দেখিয়া চলা। সমানভাবে স্থিরচিত্তে জগতের যাবতীয় ঘটনা আনন্দ সহকারে গ্রহণ করিতে পারিলেই অশান্তি দূরীভূত হয় এবং সেই অবস্থাকেই সমতা বলা যাইতে পারে। বহির্জগতের সহিত আমাদের যত প্রকার সম্পর্ক আছে এবং তাহাদের ব্যবহারজনিত যে কোন আঘাতই আসুক না তাহা সমতার চক্ষে দেখিতে হইবে। আনন্দ আসিলে আত্মহারা হইলে অথবা বিষাদের কালমেঘ দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলে চলিবে না। মঙ্গল অমঙ্গল নিন্দা স্তুতি খ্যাতি অখ্যাতি পাপপুণ্য এবং প্রকৃতির সহস্র অত্যাচার শীত গ্রীষ্ম ব্যাধি মৃত্যু এই সমস্তই আমার প্রাণারামের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি, সুতরাং যখন তিনি যে মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হউন না, সমান আদরে সমান আনন্দে সাধককে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে।

* * *

বহিঃপ্রকৃতির প্রিয় অপ্রিয় ভাল মন্দ সকল ঘটনাকে নীরবে অপ্রতি-

রোধী হইয়া বরণ করিয়া লওয়াকে (passive) প্যাসিভ সমতা বলে এবং ঘটনার সম্পর্কে আসিয়া আধারের মধ্যে সমতা সিদ্ধির ফলে যে শান্তি যে আনন্দ অনুভব হয় তাহাকে (active) এ্যাকটিভ্ সমতা বলে। প্যাসিভ ও এ্যাকটিভ্ সমতা ত্রিবিধ। তিতিক্ষা, উদাসীনতা এবং নতি প্যাসিভ সমতার লক্ষণ; রস, প্রীতি ও আনন্দ এ্যাকটিভ সমতার অভিব্যক্তি।

* * *

যে সাধক আধারকে প্রকৃতির সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার সহিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখে, প্রিয় ঘটনায় নিস্পৃহ, অপ্রিয় ঘটনায় অবিচলিত হইয়া অবস্থান করে, স্থিতধী হইয়া সুখ দুঃখ উভয়ের আস্বাদ একই ভাবে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, সেই কঠোর তপস্বী মহাপ্রাণ বীর সাধক; তিনি পৃথিবীর কোন বিভীষিকাতেই বিচলিত হন না; এইরূপ স্থিতপ্রজ্ঞ সাধককেই তিতিক্ষাপরায়ণ যোগী বলা যাইতে পারে।

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোহমৃতত্বায় কল্পতে॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই সকল অনিত্য সুখ দুঃখে নির্ব্বিকার হইয়া যে পুরুষ কোনমতেই অভিভূত না হয়, সেই সদাত্মনিষ্ঠ ব্যক্তি অমৃতলাভ করে।

দুঃখেষনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥

দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা, সুখে বিগতস্পৃহ, অনুরাগ, ক্রোধ ও ভয়শূন্য যে মুনি তাহাকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়।

* * *

তিতিক্ষার অবস্থায় সাধককে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হয়, মুহূর্ত্তের অসাবধানতায় সে যোগভ্রষ্ট হইতে পারে, পৃথিবীর অসংখ্য প্রলোভনের সহিত অবিরত তাহাকে সংগ্রাম করিতে হয়। আকাশের বজ্র অবহেলে মস্তকে ধারণ করিবার জন্য তাহাকে ধারণা করিতে হয় যে সে অমর, সে অনিত্য সুখ দুঃখ ভাল মন্দের অতীত, সে মুক্ত স্বচ্ছ অবিনশ্বর আত্মা, পৃথিবীর কোন ঘটনারই সে অধীন নহে, কিন্তু উদাসীনতায় সাধক সিদ্ধির আরও নিকটবর্ত্তী হয়। তখন তাহার তপস্যার যে কঠোরতা তাহা কোমল এবং প্রীতিপ্রদ হয়, জগতের কোন দ্বন্দ্বেই সে ক্ষুব্ধ হয় না। তিতিক্ষায় ভালমন্দবোধ থাকে, পরন্তু স্বীয় তপস্যাবলে উহাদিগকে সমতার চক্ষে দেখিতে

হয়; উদাসীনতায় সকল বস্তুই অভেদভাবে অনুভূত হয়, শরীর ও মনের অতীত যে সমুচ্চ স্থান সাধক সেইখানে অবস্থান করিয়া জগতের সকল স্পর্শই সমরসে আস্বাদ করে। সে উদাসীন মুক্ত, জগতের কোন বাসনাতেই সে আসক্ত নহে। মরজগতে শোক দুঃখ বিরাগ অনুরাগ ব্যাধি মৃত্যু যত কিছু দ্বন্দ্ব শরীর এবং মনকে স্পর্শ করিলেও, সাধক শরীর এবং মনের অতীত বলিয়া তাহাকে কোন দ্বন্দ্বই ভোগ করিতে হয় না, সে নির্ব্বিকার হইয়া জগতের যাবতীয় ঘটনার মধ্যে পরমানন্দে অবস্থান করে।

* * *

নতি, সিদ্ধির অবস্থা। জীব এবং সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম এখানে এক হইয়া যায়। সুখ দুঃখ এ সকলের বিভিন্নতা লোপ পায়, সকল স্পর্শই ত ভগবানের স্পর্শ, সকলই ত সর্ব্বানন্দময়। দ্বন্দ্ব কোথায়? ভেদ কোথায়? প্রিয়ই বা কি আর অপ্রিয়ই বা কাহাকে বলে? সাধক আত্মানন্দে বিভোর হইয়া এই মহালীলা প্রকটন করে। নতিসিদ্ধ কখন বা তিতিক্ষা-সাধকের মত দুঃখ ভোগ করে। এই দুঃখ যে ভগবানের দেওয়া এইজন্য প্রেমময়ের ইচ্ছাগত শোক দুঃখকে হাসিমুখে বরণ করিবার জন্য আধারকে শক্ত করিয়া ধারণ করে, পোষণ করে, আবার কখন বা উদাসীন যোগীর মত আপনাকে শরীর প্রাণ মনের অতীত জ্ঞানে হর্ষ বিষাদ ভগবানেরই কর্ম্ম, ভগবানেরই ইচ্ছাসম্ভূত সুতরাং উহাদিগকে সমভাবেই দেখিয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণের লীলা মনে করিয়া সর্ব্বাবস্থাতেই আনন্দময় অবস্থায় কালযাপন করে। প্রকৃতির অত্যাচার শরীর প্রাণ মনকেই স্পর্শ করে, উদাসীন যোগী আপনাকে ইহাদের সহিত বিপন্ন না করিয়া সকল অবস্থাকেই অবাধে ইহাদের উপর ভোগ করিতে অনুমোদন করে।

* * *

এইরূপ ভাবে ক্রমাগত তিতিক্ষা ও উদাসীনতা সাধন অবলম্বনে জগতের যাবতীয় ভোগ্য অবাধে ভোগ করিতে করিতে সাধনায় পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করে। দুঃখ সুখ প্রভৃতি সকল দ্বন্দ্ব হইতেই যেন সে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হয়। অতি তুচ্ছ ঘটনার মধ্যেও তখন সে ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ উপভোগ করিতে সমর্থ হয়। এই মনুষ্যদেহের প্রতি অঙ্গ দ্বারাই পৃথিবীর সকল স্পর্শ জীবনের সহস্র দ্বন্দ্ব সহস্র বেদনা আনন্দ বলিয়াই তখন অনুভূত হয়। সাধক তখন সত্য সত্যই অভী হয়, দুঃখ বলিয়া সাধকের নিকট

তখন কিছুই থাকে না ; শরীর প্রাণ ও মনের উপর আনন্দেরই ভোগ হয় বলিয়া সাধককে তখন আর এই সকলের অতীত হইয়া সমুচ্চ স্থানে পলায়ন করিতে হয় না—আনন্দম্ ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

* * *

সাধককে পর পর তিতিক্ষাপরায়ণ হইয়া উদাসীন যোগীর মত সুখ দুঃখের অতীত হইয়া নতিসিদ্ধিতে উপনীত হইতে হইবে। ইহাই পূর্ণ সমতাসিদ্ধি। জয় পরাজয়, সাফল্য নিষ্ফলতা, সুখ দুঃখ, খ্যাতি অখ্যাতি প্রভৃতি বুদ্ধি যোগের দ্বারা সাধককে তুল্যরূপে দেখিতে হইবে। আমি যে শরীর নই, মন নই, প্রাণ নই, আমি যে আনন্দময় আত্মা, প্রতি আঘাতেই বিচারের দ্বারা ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। প্রত্যেক ঘটনাই যে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় সম্ভূত হইয়া জগতে নিত্য মঙ্গল সূচনা করিতেছে, ইহাও প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। নিয়ত ভূয়োদর্শনের ফলে সাধক ক্রমশঃ অমঙ্গলের মধ্যেই মঙ্গলের মনোহর মূর্ত্তি দেখিয়া কৃতার্থ হইবে। আজ কোন বিষয়ে পরাজয় হইয়াছি বলিয়া উহা যে আমার অকর্ম্মণ্যতার পরিচায়ক তাহা নহে, ইহাই ভগবানের ইচ্ছা, এইরূপ পরাজয়ের ভিতর দিয়াই তিনি আমায় পরিণামে বিজয়ী করিয়া তুলিবেন ; দুঃখ এবং বেদনা আনন্দেরই বিপরীত মূর্ত্তি, গোপন মন্ত্র। যে শারীরিক যন্ত্রণা ও মানসিক বেদনায় মানুষকে অস্থির এবং উন্মাদ করিয়া দেয়, সাধক অভিজ্ঞতার ক্রমে তাহার প্রকৃতিরও পরিবর্ত্তন করিয়া উহা মন এবং শরীরের আনন্দদায়ক বলিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। সাধারণ মানুষের শরীরে প্রচণ্ড বেত্রাঘাত করিলে সে যন্ত্রণায় অস্থির হইবে কিন্তু যোগী নিদারুণ বেত্রাঘাতের স্পর্শকেও আনন্দের স্পর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করে না, কিন্তু এই অবস্থা লাভ করিতে হইলে সাধককে সর্ব্বতোভাবে শরীর প্রাণ এবং মনকে জয় করিতে হইবে, শরীর প্রাণ এবং মনের অধীন হইয়া থাকিলে এরূপ সম্ভব হইবে না। যখন আমি পূর্ণরূপে সকলের অতীত হইয়া বুঝিব যে আমি আনন্দময় সত্তা এবং সেই সত্তা দিয়া আমার আধারের প্রতি অংশ পূর্ণ করিয়া তুলিতে সক্ষম হইব তখনই জগতের সকল দ্বন্দ্বের পরপারে দাঁড়াইয়া বলিতে পারিব—অহং শিবম্ শুভম্ অহং সুন্দরম্ মঙ্গলম্।

* * *

সমতা লাভ করিতে পারিলেই তাহার লক্ষণগুলি সাধকের আধারে

স্বভাবতঃই বিকশিত হইয়া উঠে। রসই হইতেছে (active) এ্যাকৃটিভ্‌ সমতার সর্ব্বপ্রথম লক্ষণ। লীলাময় ভগবান্‌ জগতের বিচিত্র রচনার মধ্যে যে রস এবং যে গুণের বিকাশ ঘটাইয়াছেন, এইরূপ বিভিন্ন বিকাশের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রস ও গুণ যেরূপ সম আনন্দে শ্রীকৃষ্ণ উপভোগ করেন এবং যে আনন্দের উচ্ছ্বাসে জগতে তিনি নানা লীলার অভিনয় সম্পাদন করেন, সাধক যোগস্থ হইয়া পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী বিষয়গুলিকে যখন শ্রীভগবানের সহিত একাত্ম হইয়া সম আনন্দে উপভোগ করিতে থাকে তখনই সাধকের মজ্জায় মজ্জায় এক অভিনব রসের সঞ্চার হয়। এই আনন্দ রসসমুদ্রে এই পূত অমৃত মন্দাকিনী প্রবাহে অবগাহন করিয়া সাধক যে আনন্দ উপভোগ করে তাহা অব্যক্ত। এইরূপ অবস্থায় মনের যে অভাবনীয় ভাব হয়, প্রিয় অপ্রিয় মঙ্গল অমঙ্গল সকল ঘটনার মধ্যেও যে রসানন্দ তাহাই প্রীতি, তাহাই আনন্দ; সে দেবভোগ্য অমৃতের আস্বাদজনিত যে বিভোরতা যে নিরবচ্ছিন্ন ভগবদ্‌ সহবাসে অবস্থিতির বিপুল পুলক তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা আছে কি? ভগবানের যে আনন্দহিল্লোলে এই অনন্ত সৃষ্টির উৎপত্তি, যাহার প্রতি তরঙ্গে নিত্য নূতন লীলার উদ্ভব হইতেছে, সে আনন্দ তরঙ্গের মধ্যে যে নিত্য অবস্থিত তার আনন্দের কথা আর বলিতে হইবে কি—

"ভবে সেই সে পরমানন্দ,
যে জন পরমানন্দ মায়েরে জানে॥"

অধ্যাত্ম বিপ্লব

মহনীয় লক্ষ্যের মূলে মহীয়ান প্রারম্ভ আছেই। যেখানে বিকট এবং মর্ম্মভেদী ধ্বংসলীলা দেখিয়া কাতর হইতেছ, নিশ্চয় জানিও সেই প্রলয় তাণ্ডবের মধ্য হইতেই বিরাট্‌ মহান্‌ সৃষ্টির অভ্যুদয় হইবে। ভগবান্‌ শান্ত নিরীহ কবিকণ্ঠের মধুর আলাপনে অথবা বসন্তের কুসুমিত বনভূমে বিহঙ্গমের কল কল সুমধুর কাকলিতেই যে কেবল বর্ত্তমান তাহা নহে, তিনি

কড় কড় কুলিশ নিনাদে প্রলয়াগ্নির ভীম গর্জ্জনে নিদারুণ ঝঞ্ঝাবাতের উৎকট শব্দে সমভাবেই অবস্থান করেন।

বিপুল মৃত্যুলীলার গর্ভেই মুক্ত উদার বিরাট সৃষ্টি সম্ভব। কিন্তু সাধারণতঃ এই মৃত্যু দীর্ঘ বিলম্বিত, অতি ধীর, অতি মন্থর গতিতে সংঘটিত হয়, তাই নূতন সৃষ্টিও সহস্র সহস্র বাধাকে অপসারিত করিতে করিতে অতি মন্থর গতিতেই আবির্ভূত হইয়া থাকে। বিভাবরী পুনঃ পুনঃ প্রত্যাগত হয়, বোধ হয় দিবা যেন মিথ্যা উষাজ্যোতিঃ ললাটে লেপন করিয়া উদিত হইয়াছে। নিরাশ হইও না, অবিচলিত চিত্তে দর্শন কর এবং অনুদ্বিগ্ন চিত্তে কর্ম্ম করিয়া যাও। যাহারা চপল অত্যুগ্র আশায় উদ্ভ্রান্ত, তাহারাই পদে পদে তীব্র নৈরাশ্যে ভাঙ্গিয়া পড়ে। ভয়ও নাই আশাও নাই, ভগবৎ ইচ্ছায় নির্ভরশীল হও—তাঁহার ইচ্ছা পরিপূর্ণ করিবার জন্যই তোমার জীবন।

মহাশিল্পীর নিপুণ হস্তও কখন কখন এমন ভাবে সঞ্চালিত হয়, যেন আপনার প্রতিভায় অমোঘতায় এবং উপাদানরাজির অব্যর্থতায় তাঁহার পূর্ণ প্রত্যয় ও পূর্ণ আস্থা নাই। তাই স্পর্শ করিয়া পরীক্ষা করিয়া পরিত্যাগ করিতেছেন, আবার পুনঃ গ্রহণ করিয়া, কখন সফল কখন ব্যর্থভাবে বিভক্ত বিশ্লিষ্ট করিয়া, তাঁহার তুলিকা অবিরাম চলিয়াছে—যেন তিনি একজন আনাড়ি চিত্রকর। বিস্ময় ও নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া তাঁহার কর্ম্ম সিদ্ধির পথে ধাবমান, সে বিপুল গতির সম্মুখে যাহা নির্ব্বাচিত ছিল তাহা পরিবর্জ্জিত হইতেছে, যাহা পরিত্যক্ত ভাবে পতিত ছিল তাহাই সমাদৃত হইয়া বিরাট প্রাসাদের ভিত্তিস্বরূপ হইতেছে। কিন্তু এই সমুদয়ের অন্তরালে আমাদের জ্ঞান বিচারের অতীত একটী অভ্রান্ত দিব্যদৃষ্টি, অনন্তশক্তিশালী দক্ষ শিল্পীর ভুবনমোহন মৃদুমধুর হাস্য বিরাজ করিতেছে।

অনন্ত কাল ভগবানের সম্মুখে প্রসারিত—তাঁহার দিন ত ফুরাইয়া যাইবে না সুতরাং সর্ব্বদা ত্বরান্বিত হইবার প্রয়োজন নাই। অমোঘ তাঁহার লক্ষ্য, অবিসংবাদিত তাঁহার সিদ্ধি—তাই পূর্ণতর বিকাশের জন্য কৃত কীর্ত্তি শতবার চূর্ণ করিতেও তাঁহার দ্বিধা নাই। আমাদেরও তাই সর্ব্বপ্রথমে সর্ব্বপ্রধানতঃ শিক্ষা করিতে হইবে ধৈর্য্যশীল হইতে। কিন্তু সদাশঙ্কিত, সন্দিগ্ধচেতা; ক্লান্ত, অলস মহদাকাঙ্খাশূন্য দুর্ব্বলজনের তমসাচ্ছন্ন দীর্ঘসূত্রতা ধৈর্য্য নহে—চাই সেই ধৈর্য্য যাহা আমাদিগকে ভরাইয়া রাখে অসীম সমতায়,

আমাদিগকে শিক্ষা দেয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সহকারে পলে পলে তিল তিল শক্তি সংগ্রহ করিয়া মহাক্ষণের অপেক্ষা করিতে—যে শুভ মাহেন্দ্র মুহূর্ত্ত সমীপগত হইলে দুই চারিটি অব্যর্থ আঘাতে কালস্রোতকে সম্পূর্ণ বিভিন্নমুখী করিয়া দেয়।

কেন ভগবান্ তাঁহার এই জীবজগতকে এমন প্রচণ্ড মুদ্গরাঘাতে ব্যথিত করিতেছেন, মৃৎপিণ্ডের মত তাহাকে দলিত নিষ্পেষিত করিতেছেন, বারম্বার রক্তসিন্ধুতে স্নাত করিতেছেন, জলন্ত কালাগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত করিতেছেন? কারণ, মানবসমষ্টি এখনও এমনি অপরিণত, অনুদার পাপিষ্ঠ যে এরূপ নিষ্পেষিত না হইলে তাহারা সরল, নিরাময় ও পবিত্র হইয়া তাঁহার ঈপ্সিত দেবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে না। যেমন রোগ তেমনি তাহার প্রতীকার। উপাদান অনুসারেই তাঁর কঠোর ব্যবস্থা প্রযুক্ত হইয়াছে। আজ যদি মনুষ্যজাতি উপাদানরাজিকে শুদ্ধতর উচ্চতর ধাতুতে পরিণত করিবার জন্য উদ্যুক্ত হয়, ভগবানের আচরণও মৃদুতর, মধুরতর হইবে এবং আরও মহান্, আরও শোভনতর কর্ম্মেই তখন তাহা প্রযুক্ত হইবে।

ভগবানের যখন অনন্ত সম্ভাবনীয়তা ছিল তখন কেন তিনি এইরূপ উপাদানের সৃষ্টি অথবা নির্ব্বাচন করিলেন? কারণ কেবল সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য এবং পবিত্রতাই তাঁহার ভাগবত দৃষ্টির সম্মুখে আদর্শস্বরূপ ছিল না—শক্তি ইচ্ছা এবং মহিমাও তাঁর আদর্শের অন্তর্গত ছিল। শক্তিকে উপেক্ষা করিও না—ঘৃণা করিও না জগতের কুৎসিত দৃশ্যগুলিকে। মনে রাখিও প্রেমই একমাত্র ভগবান্ নহেন। পরিপূর্ণ সৃষ্টির মধ্যে বীরত্বের স্থান থাকিবে, এমন কি অসুরের রুদ্রশক্তিরও স্থান থাকিবে। কঠোর বিঘ্নসঙ্কুলতার ভিতর হইতেই গরিষ্ঠ শক্তি উদ্গত হইয়া থাকে।

শুধু মানুষ যদি দেবতা হইবার সঙ্কল্প করিত তবে এই সকলের পরিবর্ত্তন হইত। কিন্তু তাহার শারীরিক এবং মানসিক প্রকৃতি এই ঊর্দ্ধগতির পরিপন্থী। সে নিখুঁত হইতে চাহে না, সে এই অপরিপূর্ণতাকেই ভালবাসে।

আত্মাই আমাদের সত্যস্বরূপ, আমাদের মন ও শরীর যতক্ষণ অসম্পূর্ণ, ততক্ষণ এই আত্মবিধৃত সত্তার উপর ইহারা ছদ্মবেশমাত্র। পরিপূর্ণতা ঘটিলে, ইহারাই অমর জ্যোতির্ম্ময় আত্মানুরূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। আধ্যাত্মিক তপঃপরায়ণ হইলেও যথেষ্ট হইল না কেন না শুধু আত্মতত্ত্বযোগে অনেককে দ্যুলোকের উপযুক্ত করিয়া তুলে—ইহারা পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া যায়—জগতের আর অবস্থান্তর হয় না। কোনরূপ আপোষের দ্বারাও

নিষ্কৃতির উপায় নাই।

জগৎ ত্রিবিধ বিপ্লবের সহিত পরিচিত। স্থূল বিপ্লব বহু ফলপ্রসূ বটে কিন্তু মানসিক ও নৈতিক বিপ্লব তদপেক্ষা বিপুলতর এবং প্রচুরতর ফলবান্, কিন্তু আধ্যাত্মিক বিপ্লবই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃস্কর।

এই ত্রিবিধ বিপ্লব যদি যুগপৎ সমভাবে কার্য্যপর হয়, তবেই নিখুঁত অনবদ্য কার্য্য সংসাধিত হয়। কিন্তু মানবজাতির মন ও শরীর এখনও আধ্যাত্মিক তরঙ্গাবেগ পূর্ণভাবে ধারণ করিতে সমর্থ নহে, অধিকাংশই অপচিত হয়, অবশিষ্ট যাহা তাহারও সমধিক অংশ বিকৃতভাবে প্রকাশ পায়। প্রচুর আধ্যাত্মিক বীজরাশি বপন করিয়া অতি সামান্য ফল অর্জ্জন করিবার জন্য আমাদের শরীর ও মনের বিরাট বিপ্লবের আয়োজন আবশ্যক হইয়া উঠে।

প্রত্যেক ধর্ম্মই মানবজাতিকে সাহায্য করিয়াছে। “পেগ্যানিজম্” মানবের মনে সৌন্দর্য্যের আলো ফুটাইয়া তুলিয়াছে, মানবজীবনের মহৎ উদ্দেশ্য, তাহার বিশালতা এবং বহুমুখী পরিপূর্ণতার পথ নির্দ্দেশ করিয়াছে; খৃষ্টধর্ম্ম ভগবদ্‌প্রেম এবং দয়া ধর্ম্মের কিছু আস্বাদ মানবসমষ্টিকে দান করিয়াছে; বৌদ্ধধর্ম্ম প্রদর্শন করিয়াছে প্রকৃষ্টতর জ্ঞান, নীতি এবং শুদ্ধতার পথ; জুডা ও ইসলাম ধর্ম্ম শিখাইয়াছে উদার জীবনে ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং গভীর ঈশ্বর-ভক্তি, হিন্দুধর্ম্ম অনন্ত এবং মহিমান্বিত অধ্যাত্মরাজ্যের সিংহদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। এই সমুদয় বিভিন্ন ভগবদ্দর্শন যদি পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে ও পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারিত তাহা হইলে কি মহনীয় ব্যাপার সম্ভাবিত হইত! কিন্তু মতের সঙ্কীর্ণতা, সাম্প্রদায়িক অহঙ্কার সেই সমুচ্চ পথের বিষম কণ্টকরূপে দণ্ডায়মান।

সকল ধর্ম্মই বহু জনকে মুক্ত করিয়াছে, কিন্তু কেহই এপর্য্যন্ত সমগ্র মানবমণ্ডলীকে আধ্যাত্মিক শক্তিতে প্লাবিত করিতে পারে নাই। তাহার জন্য কোন মত, কোন দর্শনশাস্ত্র বা কোন সম্প্রদায়ের আবশ্যক নাই পরন্তু আধ্যাত্মিক আত্মবিকাশকল্পে একটা অনন্ত ধৈর্য্যশীল সর্ব্বব্যাপক সাধনারই প্রয়োজন।

আজ জগতের সর্ব্বত্র যে পরিবর্ত্তনরাজি পরিলক্ষিত হইতেছে সে সকলের আদর্শ এবং উদ্দেশ্য মানসিক, নৈতিক এবং বাহ্যবিপ্লব। আধ্যাত্মিক বিপ্লব স্বীয় যুগাগমনের জন্য পটান্তরালে প্রতীক্ষা করিতেছে এবং ইতিমধ্যে

ইহার দুই একটী মাত্র তরঙ্গ ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিয়াছে। যে পর্য্যন্ত না সেই কাল পূর্ণ হইতেছে, ততদিন বর্ত্তমান ঘটনারাজির সকল ব্যাখ্যা এবং ভবিষ্যৎকে অনুমান করিবার সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইবে। কারণ এই আধ্যাত্মিক মহাবিপ্লবেরই প্রকৃতি, শক্তি, অঘটনঘটনা মনুষ্যজাতির পরবর্ত্তী নবযুগ উদ্বোধিত করিয়া তুলিবে।

পাগলের চিঠি

ভায়া! আগে ভেবেছিলাম আমিই পাগল, এখন দেখ্‌ছি আমার চেয়ে আরও দু'একজন পাগল আছে, তা না হলে আমার অসংলগ্ন কথাগুলো পড়ে, কেউ কি তার আবার পুনরুল্লেখ করে? সেদিন তোমাদের একখানা "প্রবর্ত্তকে" আমাকে উদ্দেশ করে কে একজন কত কি লিখেছে—দোহাই ভায়া ভালবাস বলেই আমার অর্থহীন চিঠিগুলি তোমাদের পাক্ষিকে স্থান দাও একথা এবার স্পষ্ট করে লিখে দিও।

ওগো আমার পিছনে কাউকেই আস্‌তে হবে না, আমিই সবাইকার পিছনে পিছনে দৌড়াতে চাই, আমার এই অবিরাম গতির পথে কেউ যেন অন্তরায় না হয়। সেদিন এক যায়গায় বসে একতারাটা নিয়ে একমনে গান গাইছিলাম, কে জানে আমার আশেপাশে অনেক মানুষ জড় হয়ে, আমার সঙ্গে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিচ্ছিল, চোক চেয়ে আমার বড় ভয় হল, একি সত্য? মানুষ কি তার হাতে গড়া "অচলায়তনের" দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেঙ্গে বাহিরে ছুটে এসেছে—না না, এত অনায়াসে মানুষের প্রাকৃতিক গতির পরিবর্ত্তন ত সম্ভব নয়, তবে কি ভগবানের আগমনকাল পূর্ণ হয়ে এসেছে—তিনি কি প্রস্তুত হয়েছেন? কৈ এখনও যে পৃথিবীর বিপ্লব ভোগবাসনার লেলিহান রসনা বিস্তার করে হু হু করে জলছে, এখনও যে মানুষ তার মন বুদ্ধিকে এক করে আকুলকণ্ঠে সমস্বরে ভগবানের আবাহন সঙ্গীত গাইছে না, কৈ জীবনযমুনার প্রবাহ ত এখনও সেইরূপ নিম্নগামী—সে ত উজান পথে ছুটছে না—হরি! হরি! এরা কাঁদে কেন? আমি না হয় পাগল—এদের বুঝি কাঁদুনে স্বভাব!!

আবার বিপদের কথা শুন। উঠে আস্‌বো কি, একজন গদ গদ কণ্ঠে পা দুটো জড়িয়ে বলে "ঠাকুর কোথা যাও আমায় মন্ত্র দিতে হবে"। কি সর্ব্বনাশ—সেই পুরাতন জগৎ! ঠাকুরের "গুরু কোন্ শালারে" বজ্র-কঠোর শব্দ এদের কানে এখনও পৌছায় নি। ভায়া! অনেক কষ্টে পালিয়ে এসেছি।

পুরাতন পৃথিবীর গলিত শিথিল সংস্কারগুলিকে ঝাঁটিয়ে গঙ্গার জলে ফেলে দিতে পার? মানুষ এত পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাক্‌লে পর, অন্তরাত্মা হুহুঙ্কারে জেগে উঠ্‌বে কেন? মানুষ চায় ক্ষুদ্র হয়ে থাক্‌তে—উদার বিরাট হবার অজপা যে তারে জপ্‌তে হবে একথা তাদের বুঝিয়ে দাও, জানি অধ্যাত্ম-বিপ্লবের দিন আগমনের এখনও বহু বিলম্ব আছে, কিন্তু গতানুগতিক পন্থা হতে মানবজাতিকে উদ্ধার করে তোল্‌বার জন্য অলক্ষ্যে দু'একটা ক্ষেপণী নিক্ষেপ কর্‌তে দোষ কি? মাঝে মাঝে হাঁড়ির ভাত হাতায় করে তুলে টিপে দেখাও ত একটা কর্ম্ম—দূর ছাই কি বল্‌তে কি বল্‌ছি।

এ পৃথিবীতে সবচেয়ে মূর্খ তারা যারা ভগবানের জন্য চোখ্‌ বুজে বসে আছে। আমি একদিন গভীর রাত্রে নারদ মুনির দেখা পেয়েছিলুম, তিনি বীণা নিয়ে তাড়াতাড়ি যাচ্ছেন. একেবারে জাপ্‌টে ধরে বলি, "ঠাকুর এখানে কেন?" মুনি হেসে বল্লেন "বৈকুণ্ঠ যে খালি হয়ে গেছে, এবার পৃথিবীতে খুব বড় লীলা হবে'। যাক্ এও দেখ্‌ছি পাগল।

ভায়া! আজ মনে পড়ে রাম অবতারের কথা, স্বর্গের দেবগণও সেদিন নল নীল গয় গবাক্ষের বেশ ধরে পৃথিবীতে অবতরণ করেছিল। লীলাবসানের সঙ্গে সঙ্গে সরযু-স্রোতে সবাই ভেসে গেল। তারপর দ্বাপর যুগ—সেদিনও নারায়ণ বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগ করে এ পৃথিবীতে আমার তোমার মতই নরদেহ ধারণ করেছিলেন, ইন্দ্র বায়ু বরুণ যম কেউ আর সেদিন স্বর্গে ছিল না, এমন কি মহঃ জনঃ তপঃ সকল স্থান থেকেই সবাই এই লীলার রসাস্বাদ কর্‌তে দৌড়ে এসেছিল—ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে বলভদ্রের অনন্ত সাগরে দেহত্যাগ, যদুবংশধ্বংস, পাণ্ডবের স্বর্গারোহণ—মনে করেছিলুম এইবার বুঝি সপার্ষদ ভগবান্ ছুটি পেলেন। ও হরি! ঈশা মুষা মহম্মদ শঙ্কর বুদ্ধ শ্রীচৈতন্য রামকৃষ্ণ—এদের মধ্যে তবু ত ভগবদ্ ঐশ্বর্য্যের বিকাশ হয়েছিল তারপর "কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব্বঘটে"

তুমি দেখ, এক মুহূর্ত্তও মূর্খ মানুষ যাকে খোঁজে সে এই পৃথিবী ছাড়া হয়েছে কি না। অবশ্য জপ তপ সাধন ভজনে মানুষ স্বর্গলাভ করতে পারে কিন্তু ভগবানকে যদি পৃথিবীতেই পাওয়া যায়, নিজের মধ্যেও তাঁর সন্ধান মেলে তবে আমার স্বর্গের প্রয়োজন?

এই সেদিনকার একটা গল্প বলি শোন। স্বামিজী যখন চিন্তাবেগের তরল তরঙ্গ ভেদ করে ভগবৎ-পথের দুর্গম মরুপ্রান্তরে এসে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর প্রাণ নীরস হয়ে উঠ্‌লো; ধর্ম্ম-জগতের ইহাই সনাতন গতি, প্রথম বেশ রসের অবস্থা, তখন একটা কথাতেই একটা ভগবদ্‌সঙ্গীতের সুরেই হৃদয় তালে তালে হেল্‌তে দুল্‌তে থাকে—কিছুদিন পরে কিন্তু আর এত সহজে শর্ম্মারাম নাচেন না; তখন মনে হয় সব ফাঁকি, সব মিথ্যা অর্থাৎ জাগ্রত সত্যকে লাভ না কর্‌লে সাধক কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না। স্বামিজীর ঠিক যখন এই অবস্থা তখন তিনি উন্মাদের মত ছুটোছুটী কর্‌ছিলেন—সে কালের প্রসিদ্ধ ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামিজী একদিন তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন "মহাশয় ঈশ্বরকে আপনি দেখেছেন"? সে স্বর বজ্রাপেক্ষা কঠোর, স্বামিজীর চক্ষু দুটা দিয়ে তখন প্রলয় আগুণ ছুটে বেরুচ্ছিল—মহর্ষি সে রুদ্রমূর্ত্তি দেখে কি বল্‌বেন স্থির কর্‌তে পার্‌লেন না—স্বামিজী দৌড়ে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে তেমনি বিকট মূর্ত্তিতে তেমনি কুলিশনিনাদ কণ্ঠে হেঁকে বল্‌লেন "মহাশয়, ঈশ্বরকে আপনি দেখেছেন"? মৃন্ময় মূর্ত্তির উপাসক, সখ্য শান্ত দাস্য বাৎসল্য মাধুর্য্য রসের সাধক স্মিত প্রফুল্ল-বদনে উত্তর করিলেন "হাঁগো দেখেছি, এবং তোমাকেও দেখাতে পারি"। তারপর স্বামিজী বিনামূল্যে কার চরণে বিকিয়ে গেছ্‌লেন সে কথা আজ আর না বল্‌লেও চলে।

মানুষ কেবল ফাঁকি চায়, মানুষের কাছে কেউ ধরা দিতে চায় না। প্রেম কি গাছের ফল? আমি বলি মন্ত্র তন্ত্র সব মিছা—প্রেমই সত্য, প্রেমের শিক্ষা প্রেমের দীক্ষাতেই আজ চিরসরস সাতকোটী বাঙ্গালীর হৃদয় মনকে মাতিয়ে তুল্‌তে হবে।

ভায়া! কলিযুগে শিব হয়ে কেউ জন্মায়নি, প্রবর্ত্তকের পাগলও নিরবচ্ছিন্ন পৃথিবীর অশুদ্ধতার সঙ্গে সংগ্রাম কচ্ছে। এই সংগ্রামে যে কি রস কি আনন্দ তা যে তাকে ভালবাসবে, সেই বুঝ্‌বে। এই সমস্ত কথা বলে আজ বিদায় হলুম—তবে একটা গান গেয়ে যাই।

এসেছে ভাবের মানুষ,
ভাবে তারে যায় গো চেনা।
(সে যে) ভাবের ঘরে বসত করে
ভাবের পথে আঁনাগোনা।
অনুরাগের গণ্ডী দিয়ে ভাবের আসন পেতে দেনা।
(বসাও) সযতনে পরম ধনে সুখে কর ভাব সাধনা।
(যদি) ভাবের ভাবী হতে চাস্ মন,
ভাবের মানুষ চিনে নে না।
বিশ্বাসে রতন মিলিবে, অবিশ্বাসে যায় না জানা।
ভাবের পথে কাঁটা আছে
অহঙ্কার নামে একজনা।
আচ্ছা করে' ধরে' তারে ভাব সাগরে ডুবিয়ে দেনা।
যন্ত্রীর হাতে যন্ত্র হয়ে'
সদানন্দে কাল যাপনা।
(যদি) কালকে কলা দেখাবি,
তবে ভাবীর কাছে ভাব শেখনা।
এ সব কথা বেদে গাঁথা, গুরু মুখে যায় গো জানা।
শান্ত, সখ্য, দাস্য, মধুর ভাবে হওরে উদ্দীপনা ॥

সমালোচনা

শ্রীমনোমোহিণী গুহ ঠাকুরতা প্রণীত "আত্মস্মৃতি" সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। পুস্তক খানির মূল্য ।• আনা। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে ৩৪টী গুরুতর সমস্যার বিষয় বিবৃত হইয়াছে; কিন্তু কোনটীই সুস্পষ্ট হয় নাই। লেখক আত্মবোধে যাহা উপলব্ধি করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহাই পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়াছেন। শ্রীভগবানের জন্য উন্মত্ততা লাভ হইতে প্রাণায়াম, ভাব সাধনার সখ্য শান্ত দাস্য প্রভৃতি এবং পঞ্চভৌতিক অস্থি মেদ ত্বক মাংস হইতে ব্রাহ্মীস্থিতি ভাবপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত এক নিঃশ্বাসে বলিয়া গিয়াছেন। পুস্তকখানির উদ্দেশ্য বুঝিলাম না। জগতের সকল বস্তুই যে নিত্য এবং শাশ্বত, জড় বলিয়া কিছুই নাই এইরূপ একটা আভাষ প্রত্যেক প্রবন্ধে পাওয়া যায়।

প্রাপ্তিস্থান—বসু রায় চৌধুরী এণ্ড কোং, পটুয়াটুলী, ঢাকা।

নূতন মানুষ

এই অনতিকাল মধ্যে বাংলাদেশে যে বিরাট আন্দোলন এবং অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে তাহা দেখিলে স্পষ্টই অনুমান হয় যে শীঘ্রই বাঙ্গালীজাতির মধ্যে কোন কিছু মহৎ সৃষ্টি সংসাধিত হইবে। কেননা বৃহৎ সৃষ্টির পূর্ব্বেই বিপুল পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য হইয়া উঠে।

ধর্ম্মজগতে, রাজনীতিক্ষেত্রে, সামাজিক আচার ব্যবহারে সর্ব্বত্রই বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে, পুরাতন নির্ম্মমভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, নূতন পুরাতনের স্থান গ্রহণ করিবার জন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু ভগবান্ কাহাকেও স্থায়ী আসন প্রদান করিতেছেন না—কঠোর অগ্নি পরীক্ষায় পরিশুদ্ধ হইয়া না উঠিলে ধর্ম্মে রাজনীতিতে সামাজিকতায় কাহারও স্থায়ী প্রতিষ্ঠা এক্ষেত্রে সম্ভবপর নহে।

কিন্তু বাঙ্গালীজাতি অতি দ্রুতবেগে জাগিতেছে; সে প্রকৃতির অতি সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণে সহস্রবার নিক্ষিপ্ত উপেক্ষিত হইলেও, সহস্রবার আপনাকে পুনঃ প্রস্তুত করিয়া প্রকৃতির পরীক্ষা-মন্দিরে উপনীত করিতেছে। বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের যত কঠোর প্রশ্নই হউক না সে তাহার সমাধান করিবে, এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্পে দলে দলে নবীনদল অগ্নিপরীক্ষায় আগুয়ান; বিদলিত নিষ্পেষিত লাঞ্ছিত হইলেও তাহাদের দৃঢ় পণ, জগতের সমক্ষে তাহাদের শ্রেষ্ঠতা যেমন করিয়াই হউক জ্ঞাপন করিবে।

সম্মোহনমন্ত্রে অভিভূত বাঙ্গালী এতকাল আপনাদিগকে অপদার্থ বলিয়াই জানিত; তাহারা জনকজননীর স্নেহপাশ হইতে মুক্ত হওয়াকে পাপ বলিয়া মনে করিত, পুত্রকলত্রের সহিত কৃমিকীটের মত নিকৃষ্ট জীবনযাপনকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া স্বীকার করিত। সে অন্ধতা আজ তাহাদের দূর হইয়াছে—তাহারা বুঝিয়াছে এই মায়াপাশ, এই তামসিকতার লৌহ শৃঙ্খল

প্রবল আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া সবলে দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে। প্রকৃষ্টতর জীবনলাভের উপায়, জাতিগত জীবনের স্বচ্ছন্দ বিকাশের উপরেই নির্ভর করে; ব্যক্তিগত জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যে অন্ধ হইয়া জাতির উন্নতি-পথ প্রশস্ত করিতে না পারিলে ভবিষ্যৎ-বংশ দারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে। মানুষের সহিত মানুষের বংশপরম্পরার যে অমর সম্বন্ধ তাহা আজ প্রত্যেক কর্ম্মীর হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে—অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া স্বীয় মুক্তির জন্ম সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করা অপেক্ষা মানবজাতির কল্যাণ ও মঙ্গল বিধানে নিরত থাকাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা বলিয়া লোকের মনে দৃঢ় প্রত্যয় হইতেছে—তামসিকতার ঘনঘটা উদ্ভিন্ন করিয়া রাজসিকতার রক্ত-তিলক ললাটে ধারণ করিয়া নবসূর্য্য উদিত হইতেছে। বাঙ্গালী আজ ফরাসীর রণক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া শ্বেতাঙ্গগণেরই মত অতি বৃহৎ কামান চালনা করিতেছে, অশ্বারোহণে অপরাপর শ্বেতাঙ্গগণকে পর্য্যুদস্থ করিয়া হো হো রবে হাসিয়া ভাবিতেছে—আমরা নিকৃষ্ট কিসে? মেসোপটমিয়ার রণ-প্রাঙ্গণেও দুর্ব্বল বাঙ্গালী মদমত্ত চরণে বীরদম্ভে চলিয়াছে—পৃষ্ঠে তার রণসম্ভার, হস্তে প্রলয়ঙ্করী অগ্নিনালিকা—বাঙ্গালীর জীবনে এই অভিনব পরিবর্ত্তন—ভবিষ্যত মহৎ ও মঙ্গল সৃষ্টির সূচনা নহে কি?

কিন্তু এই সকল নূতন ঘটনারাজি আবির্ভূত হইবে, মানুষের জীবনে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন দেখা দিবে, এইরূপ সহজ এবং সরল পথ দিয়াই ভগবান্ আমাদিগকে নানা দিকে নানা ভাবে গড়িয়া তুলিবেন—এই সকল ধারণা কি আমরা করিতে পারিয়াছিলাম? আমাদের ঘোর তামসিক জীবনে যেদিন প্রথমে ভগবানের অঙ্গুলিস্পর্শে তড়িৎ খেলিয়া গেল সেইদিন হইতে আমরা নানাদিকে ছুটিয়াছি বটে কিন্তু তখনও আমাদের অন্ধচক্ষু উন্মিলিত হয় নাই—পরস্পর মাথা ঠোকাঠুকি করিয়া অনেক সময়, অনেক সামর্থ্য অপচয় করিয়াছি। যদিও জাতির জাগরণকালে এইরূপ ঘটনার সম্ভাবনীয়তাই অধিক, তাহা হইলেও আজ আমাদের দিন আসিয়াছে যখন বেশ স্পষ্ট করিয়াই আমাদের চাহিতে হইবে, ভগবানের দিব্য জ্যোতির্ময় পথ অনুসরণ করিয়াই ভক্তের মত, অনুগত যন্ত্রের মত আমাদের পরিচালিত হইতে হইবে।

মানুষের মধ্যে ভগবানের যে স্বভাবসিদ্ধ প্রেরণার খেলা তাহারই ইঙ্গিতে আমরা কর্ম্মপর হইব, জগতে আমাদের যে সিদ্ধি তাহা নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে

ভোগ করিব। দেবতার ভোগ যদি বৃত্র, বল, নমুচি প্রভৃতি অসুরে আগ্‌লাইয়া বসে তাহা হইলে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সংগ্রামে তাহাদিগকে অপসারিত করিয়া মানুষের ন্যায্য প্রাপ্য অধিকার করিব। সেই ধর্ম্ম-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইলে আমাদের ভিতরে যে দৈবশক্তি আছে অহংকারের নিরসনে তাহাকেই সর্ব্বাগ্রে উদ্বোধিত করিয়া তুলিতে হইবে। ব্যক্তিগত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলেই যথেষ্ট হইবে না, সমগ্র জাতিটাকে সেই সনাতন ভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে।

এই মহাকার্য্য সংসাধনের জন্য বাংলাদেশে অসংখ্য কর্ম্মীর প্রয়োজন। আজ সর্ব্বত্র দারুণ ভীতি ও জড়তা এই মহাকার্য্য সম্পাদনে ভীষণ অন্তরায়স্বরূপ অবস্থান করিতেছে। আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি—বাহির হইতে কোন সুবিধাই কখন উপস্থিত হইবে না, তপস্যা দ্বারাই, যে ভীষণ অস্পষ্টতা আমাদের সুমহান্‌ চরিত্রকে আবরিত করিয়া ফেলিয়াছে তাহাকে দূর করিয়া দিতে হইবে। বাঙ্গালীর চরিত্রে দস্যু তস্কর রাজদ্রোহী নরঘাতক প্রভৃতি যে দুরপনেয় কলঙ্ক-লেখা কারণে অকারণে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা মুছিয়া ফেলিতে হইবে; পূত হিন্দু জীবনের যে মহান আদর্শ, প্রাচীন ঋষিগণের যে যোগলব্ধ জ্ঞান, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের যে সুমহান্‌ কীর্ত্তি এই সকলের অবলম্বনে আমাদের নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিতে হইবে। জাতির জাগরণে বহুমুখী আন্দোলনে উদ্‌ভ্রান্ত না হইয়া সনাতন গতিটাকে কর্ম্মপর করিয়া তুলিবার জন্য সহস্র সহস্র বাঙ্গালী যুবককে সন্ন্যাসী হইতে হইবে। এই কর্ম্ম সমগ্র মানবজাতির মঙ্গল উদ্দেশ্যে হইলেও যুগ প্রভাবকে প্রতিহত করিতে হইবে বলিয়া ইহা বিঘ্নবিরহিত নয়। সেইজন্য ভগবদ্ভাবে অনুপ্রাণিত, দেবকার্য্যে সর্ব্বস্ব উৎসর্গীকৃত, অধ্যাত্মশক্তিসমন্বিত তপস্বী হিন্দুসাধকই ইহার উপযোগী। জানিনা প্রকৃতির নিরালা কুটীরে বহুদিন ধরিয়া ভগবান্‌ যে নূতন মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিতেছেন তাহার আবির্ভাবের আর কত বিলম্ব আছে?

বৈদিক অঞ্জলি

ঋগ্বেদ—১ মণ্ডল, ১৭০ সূক্ত।

ছন্দ—১ বৃহতী। ২—৪ অনুষ্টুপ্। ৫ ত্রিষ্টুপ্॥

ইংদ্রঃ

ন নূনমস্তি নো শ্বঃ কস্তদ্বেদ যদদ্ভুতং
অন্যস্য চিত্তমভি সংচরেণ্যমুতাধীতং বি নশ্যতি ॥ ১ ॥

অগস্ত্যঃ

কিং ন ইংদ্র জিঘাংসসি ভ্রাতরো মরুতস্তব।
তেভিঃ কল্পস্ব সাধুয়া মা নঃ সমরণে বধীঃ ॥ ২ ॥

ইংদ্রঃ

কিং নো ভ্রাতরগস্ত্য সখা সন্নতিমন্যসে।
বিদ্মা হি তে যথা মনোঽস্মভ্যমিন্ন দিৎসসি ॥ ৩ ॥
অরং কৃণ্বংতু বেদিং সমগ্নিমিংধতাং পুরঃ।
তত্রামৃতস্য চেতনং যজ্ঞং তে তনবাবহৈ ॥ ৪ ॥

অগস্ত্যঃ

ত্বমীশিষে বসুপতে বসূনাং ত্বং মিত্রাণাং মিত্রপতে ধেষ্ঠঃ।
ইংদ্র ত্বং মরুদ্ভিঃ সংবদস্বাধ প্রাশান ঋতুথা হবীংষি ॥ ৫ ॥

⁂

বঙ্গানুবাদ

ইন্দ্র

তিনি এক্ষণে অথবা কল্যে নহেন। সেই অদ্ভুত সর্ব্বোত্তমকে কে জানিতে পারে? অন্যের চেতনায় তাঁহার গতি ও লীলা ফুটিয়া উঠে; কিন্তু চিন্তা যখন তৎসমীপগত হয়, তখন তিনি অন্তর্হিত হন ॥ ১ ॥

অগস্ত্য

হে ইন্দ্র, আমাদিগকে হনন করিবার অভিলাষ কেন? মরুৎগণ তোমার

ভ্রাতা। তাহাদিগের দ্বারা পূর্ণত্ব সম্পাদন কর। আমাদের এই দ্বন্দ্বে আমাদিগকে বধ করিও না ॥ ২ ॥

ইন্দ্র

হে ভ্রাতঃ অগস্ত্য, তুমি আমার সখা হইয়াও আমাকে অতিমনন (মননের দ্বারা অতিক্রম) করিতেছ কেন? কারণ আমি নিশ্চয় জানি তুমি আমাদিগকে মন সমর্পণ করিতে ইচ্ছুক নহ ॥ ৩ ॥

তাহারা বেদী প্রস্তুত করুক; পুরোভাগে তাহারা অগ্নি প্রজ্বলিত করুক। অমৃতের চেতনা তথায় বিদ্যমান, এস উভয়ে যজ্ঞ আস্তীর্ণ করি ॥ ৪ ॥

অগস্ত্য

হে সকল বসুর (বস্তু) উপর বসুপতি, তুমিই শক্তিমান্ প্রভু, হে মিত্রগণের মিত্রপতি, তুমিই বিধৃত করিতে যোগ্যতম। হে ইন্দ্র, তুমি মরুৎগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া যথাবিধি হব্যরাজি সম্ভোগ কর ॥ ৫ ॥

* *
*

টীকা টিপ্পনি

চিন্তামাত্র সম্বল করিয়া, জীবনের সম্যক্ পরিণতি ঘটিবার পূর্ব্বেই, যখন মানুষ ধর্ম্মজীবনের ক্রমোন্নত স্তরের পর স্তর বিধিপূর্ব্বক অতিক্রম না করিয়া জগতের আদিকারণ অন্বেষণে তীব্রবেগে ছুটিতে থাকে তখন তাহার জীবনে যে অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়, এই রূপ এক সাধকজীবনের অপরিণত অবস্থার ভাব লইয়া এই স্তোত্র রচিত। যে দেববৃন্দ মানুষের জীবন এবং সমগ্র জগতের অধিষ্ঠাতা তাঁহারা এই প্রয়াসের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। জগতে ভগবল্লীলা প্রকাশের অনুকূল দেবশক্তির সহিত মানবহৃদয়ে তখন জীবের অহং-শক্তির ভীষণ দ্বন্দ্ব চলিয়া থাকে।

এইরূপ অবস্থাতেই ঋষি অগস্ত্য অন্তর্জগতে দেবরাজ ইন্দ্রের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছেন—এই ইন্দ্র স্বর্লোক অর্থাৎ বিশুদ্ধ মনীষারাজ্যের অধিষ্ঠাতৃদেবতা। ইঁহারই ভিতর দিয়া ঊর্দ্ধগামী জীবাত্মা ভগবানের সহিত সম্মিলিত হয়।

ইন্দ্র প্রথমে অগস্ত্য যে অজ্ঞের জগৎ-কারণের অন্বেষণচেষ্টায় অধীর হইয়াছিলেন, তাঁহারই কথা বলিতেছেন। তিনি কালান্তর্গত নহেন। বর্ত্তমান কিম্বা ভবিষ্যৎ কোন কালেই তিনি অবস্থিত নহেন। তিনি আজ আছেন অথবা কল্য হইবেন এরূপও নহে। ইনি স্থানকালের অতীত সুতরাং দেশকালান্তর্গত কোনও কিছুর দ্বারা স্বরূপতঃ তাঁহাকে জানা যায়

না। মন তাঁহার স্বরূপ না হইলেও মনের ভিতর তাঁহার রূপ ও লীলা প্রকাশিত হয়, সেই রূপ ও লীলার ভিতর দিয়াই তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে—ইহাই সেই বিকাশের অভিপ্রায়। কিন্তু যদি জীব চেষ্টা দ্বারা তাঁহাকে স্বরূপতঃ বুঝিতে এবং পাইতে চায়, তিনি তাহার চিন্তা হইতে অন্তর্হিত হন, এবং মনে হয় তিনি বুঝি নাই।

তত্রাচ অগস্ত্য, তাঁহার সমস্ত হৃদয় মন যাঁহাকে চায়, সর্ব্বভূতেরই যিনি ধ্রুবলক্ষ্য তাঁহার অন্বেষণপথে এইরূপ ভীষণ অন্তরায় কেন বুঝিতে পারিলেন না। মরুৎগণ চিন্তাশক্তিপুঞ্জ। তাহাদের আপাত-প্রতীয়মান সংহারিণী গতিদ্বারা তাহারা ঊর্দ্ধগতির অনুকূল নূতন গঠনের জন্য পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে। ইন্দ্র শুদ্ধ-জ্ঞানের অধিদেবতা—মরুৎদিগের ভ্রাতা—যদিও অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ, তথাপি সমপ্রকৃতির। অগস্ত্য যে পূর্ণতার পথে ছুটিয়াছেন, ইন্দ্র মরুৎগণের সহায়তায় তাহা সম্পূর্ণ করিবেন, তিনি তাহার শত্রু হইবেন না, এই ভীষণ দ্বন্দ্বময় সিদ্ধিপথে তাঁহার সখাকে বিনাশ করা তাঁহার সমুচিত নহে।

ইন্দ্র বলিলেন—অগস্ত্য তাঁহার ভ্রাতা এবং সখা; উভয়ে একই পরমাত্মার অংশসম্ভূত সন্তান সুতরাং ভ্রাতা; একই উদ্দেশ্য পথের যাত্রী বলিয়া তাঁহারা সখা; আবার তাঁহারা অভিন্ন কেন না ভগবানে এবং মানুষে যে প্রেম তাঁহারা সেই স্বর্গীয় প্রেমে সম্মিলিত। এই ভ্রাতৃত্ব এবং বন্ধুত্বের সাহচর্য্যেই অগস্ত্য তাহার সাধন পথে চলিতে চলিতে এই বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে অগস্ত্য ইন্দ্রকে নিকৃষ্ট শক্তিজ্ঞানে তদীয় রাজ্যাধিকারে আপনাকে সম্যক্ অনুশীলন না করিয়াই অনন্তের দিকে চলিতে চাহে। বিশ্বজ্ঞানের নিকট অগস্ত্য তাহার চিন্তা শক্তি উৎসর্গ করিলে উহা তাহার ভিতর দিয়া মানবজাতির আধ্যাত্মিক সম্পদ পরিবর্দ্ধিত করিত এবং তাহাকে সত্য পথে অগ্রসর করিয়া দিত; কিন্তু অগস্ত্য ইহার পরিবর্ত্তে তাহার বর্দ্ধিত চিন্তাবৃত্তিগুলি নিজে অভীষ্টসিদ্ধির জন্য পরিচালিত করিতে চাহে। জীবের অহঙ্কারপূর্ণ উদ্যম বন্ধ হইয়া যাউক, মহাযজ্ঞ পুনরায় আরব্ধ হউক; পুরোভাগে হোতা ও নেতারূপে ভাগবত তপঃশক্তি—সেই অগ্নি প্রদীপ্ত করা হউক। অগস্ত্য এবং ইন্দ্র—বিশ্বজ্ঞান এবং জীবাত্মা সম্মিলিত হইয়া জ্ঞানময় কোষের সিদ্ধিপ্রদ ক্রিয়াগুলির সুশৃঙ্খলা সম্পাদন করিবেন,—এইরূপে উহা তথায় সম্যক্ বিকাশলাভ করিয়া অনন্তের পথে ছুটিয়া চলিবে। কারণ,

জীব ধীরে ধীরে ভগবৎ-শক্তির নিকট আত্মনিবেদন করিলেই, মরজীবের সসীম আত্মচৈতন্য, অসীম অমৃতের দ্যুতিতে উদ্ভাসিত হইবে—ইহাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য।

অগস্ত্য সেই দেবতার ইচ্ছা শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া আত্মসমর্পণ করিল। ইন্দ্রের কর্ত্তৃত্বাধীন হইয়া সে সেই সর্ব্বোত্তমকে উপলব্ধি করিতে এবং লাভ করিতে প্রস্তুত হইল। মন, প্রাণ, শরীর এই ত্রিলোকের ভিতর দিয়া যে বস্তুরাজি বিকশিত স্বধাম হইতেই ইন্দ্র তাহাদের প্রভু ; সেইজন্য প্রকৃতির লীলাখেলার জগতে যে ভাগবত সত্য স্বতঃই প্রকাশমান, সেই সত্যের দিকে যাহাতে সেগুলি প্রধাবিত হয়, তদনুযায়ী তাহাদিগকে সুচারুরূপে গড়িয়া তুলিবার শক্তি তাঁহার আছে। যে আনন্দ এবং প্রেম এই একই দেহ, মন, প্রাণ সমন্বিত জীবাধারে প্রকটিত, ইন্দ্র তাহারও সর্ব্বময় অধিস্বামী ; সেইজন্য সেই রসবিকাশকে প্রকৃতির নিত্যলীলায় সামঞ্জস্যপূর্ণ করিয়া পরিণত করিবারও শক্তি তাঁহার আছে। স্বীয় সাধনলব্ধ যাহা কিছু জ্ঞানৈশ্বর্য্য সমুদয় ইন্দ্রের হস্তে যজ্ঞের বলিস্বরূপ উৎসর্গ করিলে, ইন্দ্র উহাদিগকে যথাযথভাবে অগস্ত্যের জীবনে সন্নিবেশিত করিয়া নবজীবনের অনুকূল করিয়া অভিনব গঠনের দিকে পরিচালিত করিবেন, এতদুদ্দেশ্যে অগস্ত্য এক্ষণে ইন্দ্রদেবতার সমীপে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিলেন। এইবার অগস্ত্যের আত্মার উর্দ্ধমুখী শক্তিরাজির সহিত ইন্দ্র বন্ধুভাবে সম্মিলিত হইয়া, বিশুদ্ধ জ্ঞানের ভিতর দিয়া আগত আলোক প্রেরণার সহিত সেই সাধক ঋষির চিন্তাগুলির সখ্যসংস্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অতঃপর, সেই বিশ্বদেব ভগবানের ঋতময় সনাতন বিধান অনুসরণ করিয়া অগস্ত্যের জীবনে যজ্ঞের হব্যরাজি সম্ভোগ করিবেন।

প্রাণের দায়

আজকার পৃথিবীতে যে সব জাতি শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করে রয়েছে তাদের আর আমাদের মধ্যে একটা প্রভেদ এই যে তাদের বেঁচে থাকার মধ্যে মানের দায়টা বেশী আর আমাদের বেঁচে থাকার মধ্যে প্রাণের দায়টা বেশী। আর এই প্রাণের দায় ও মানের দায়ে এই প্রভেদ যে

যেখানে মানের দায় আছে সেখানে প্রাণ আস্‌বেই আর যেখানে প্রাণের দায় আছে সেখানে মান খস্‌বেই। তাই আজ আমাদের কোন মান নেই কিন্তু সেইসব শ্রেষ্ঠ জাতির দিব্যি প্রাণ আছে।

বিষয়টা যদি এখানেই শেষ হয়ে যেত তবে কোন কথা ছিলনা। কিন্তু যেদিন থেকে এই প্রাণের দায় আমাদেকে আশ্রয় করেছে সেদিন থেকে এমন কতগুলো সদ্‌গুণ আমাদেকে নিরাশ্রয় করে চলে গেছে যে সেজন্যে এখন জগতে আমাদের ভদ্রতা রক্ষা করে বাস করা কঠিন হয়ে উঠেছে। আর সেই জন্যেই এ সম্বন্ধে শুধু দু'এক কথা নয়, হাজার হাজার কথা বলে দেশের এক প্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্য্যন্ত তোলপাড় করে তোলা উচিত। কারণ তোলপাড়ের আর যে-কোন দোষই থাক্ না কেন এর একটা মস্ত গুণ এই যে তা মানুষকে কখন বসে থাক্‌তে দেয় না—ঘরের কোণেও না, মনের কোণেও না। আর আমরা ঘরের কোণে ও মনের কোণে এম্‌নি করে এতকাল বসে ছিলেম যে তাতে আমাদের শরীরে ও মনে পক্ষাঘাত দেখা দিয়েছে। এখন সময় থাক্‌তে থাক্‌তে আমাদেকে উঠে দাঁড়াতে হবে, একটু চলা ফেরা কর্‌তে হবে—এমন কি একটু দৌড়ধাপ কর্‌লেও কোন দোষ হবে না—সেটা প্রথম প্রথম যতই অশোভন যতই হাস্যকর হোক্ না কেন এর পরিণামফল শুভ হতে বাধ্য। কারণ মানুষ স্থাবর নয়—মানুষ হচ্ছে জঙ্গম—মানুষের ধর্ম্মই হচ্ছে চলা—ভিতরে ও বাহিরে। আর ধর্ম্মেই যে শুভ ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে একথা বোধ হয় কোন সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত না করেও আজ বাংলাদেশে নিরাপদে বলা চল্‌তে পারে। এই প্রাণের দায়কে আশ্রয় করে আজ আমাদের কর্ম্মও গিয়েছে ভোগও গিয়েছে, যায়নি শুধু কর্ম্মভোগ। কারণ কোন মানুষই কর্ম্মকে আর ভোগকে এড়াতে পারে না। যে এ দুটোকে এড়াতে চাইবে তার কাছেই ঐ দুটো একসঙ্গে হয়ে কর্ম্মভোগরূপে দেখা দেবে। এ-কথাটা ব্যক্তিগত হিসেবে যতটা না খাটুক জাতি হিসেবে এ-কথাটা একেবারে সুদে আসলে খাটে। প্রমাণ—আমরা।

এই যে মানের দায় তা আমাদের যে কোন্ দিন খসল তা ঠিক করে বলা মুস্কিল, কিন্তু এই প্রাণের দায় যে কোন্ দিন থেকে আমাদেকে আশ্রয় কর্‌ল তার একটা আন্দাজ করা তত কঠিন নয়, কারণ তার একটা চিহ্ন আমাদের জাতির মনের গায় বেশ ফুটে উঠেছিল তার সঙ্গে সঙ্গেই। সে

চিহ্নটা হচ্ছে এই যে, যেদিন থেকে আমরা একটু বেশী রকম আধ্যাত্মিক হয়ে জগৎটাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কর্‌তে কোমর বেঁধে লেগে গেলেম।

কারণ আর যাই হোক্ না কেন হিন্দুর সূক্ষ্মবুদ্ধির মারপ্যাচ যেমন তেমন আর কারও নয়। এই প্রাণের দায়ের সঙ্গে সঙ্গে জীবনটা যখন গলগ্রহ হয়ে উঠ্‌ল, সংসার যাত্রাটাও তখন অসুখের হয়ে পড়্‌ল। আর তখন আমাদের দেশটাও ছেয়ে গেল তাদের দ্বারা যাদের নাড়ীতে নাড়ীতে প্রাণের স্পন্দন মিনিটে মিনিটে একশ তিরিশ বার করে টক্ টক্ করে বেরিয়ে আস্‌বার জন্যে তাগিদ্ দিচ্ছে—যাদের হৃদয়টা জগতের রঙে রঙীন হয়ে উঠেছে—যাঁদের বেঁচে সুখ, মরে সুখ—কর্ম্মে আরাম, ভোগে আনন্দ। আমাদের কর্ম্ম ভোগ অধিকার করে বস্‌ল তারা—আমাদের ধন জন কাজে লাগা'ল তারা—আমাদের মন প্রাণকে দাস করে আপনাদের কার্য্য সিদ্ধ কর্‌তে লাগ্‌ল তারা। কিন্তু বলেছি হিন্দুর সূক্ষ্মবুদ্ধির মারপেঁচের কথা। সে ভুল্‌তে পারে নি যে তার পূর্ব্বপুরুষ একদিন বড় ছিল—তারা সিংহল বিজয় করেছিল, বালি জাভায় উপনিবেশ গেড়েছিল। তাদেরি সভ্যতা মিশরে, মিশর থেকে ক্রীটে, ক্রীট থেকে গ্রীসে, গ্রীস থেকে রোমে, রোম থেকে সমস্ত ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। আর তাদেরি বংশধর যারা তারা কি ছোট? না, কিছুতেই না। তারা বল্‌লে—ওগো আমাদের এমন চেহারা দেখে তোমরা ভুল বুঝ না। আমরাও বড়—খুব বড়—বিন্ধ্যগিরির চাইতেও বড়—হিমাদ্রির চাইতেও বড়। তবে এখানে নয়। আমরা বড় সেইখানে—সেই সত্যলোকে। যেখানে আত্মা দেহ ছেড়ে দিব্যি বেড়িয়ে বেড়ায়। আমাদের যে আজ ষত্ব ণত্ব জ্ঞান লোপ পেয়েছে তার মানে যে আজ আমরা বেজায় রকমের সত্ত্ব। আমরা যে আজ কর্ম্মের ও ভোগের ধার ধারি না, তার কারণ যে আজ আমরা বেজায় আনন্দে আছি। ব্রহ্মতেজে যে-আজ আমাদের ললাট থেকে আগুনের শিখা বেরিয়ে আসে না, তার মানে যে আমরা ক্ষমাশীলতার শীতলতা দিয়ে সে শিখাকে নিভিয়ে দিয়েছি—কি জানি যদি কেউ তাতে পুড়ে যায়। আমরা ঘোর রকমের আধ্যাত্মিক বুঝ্‌লে হে? আরও একটা গোপন কথা বলি শোন—এই যে দেখ্‌ছ জগৎটা এটা একটা ভেল্কি—তাই ত আমরা ওটার দিকে বড় একটা দৃষ্টি দিই নে। আসল কথা আমরা ওর উপরে উঠে গেছি। আমরা আজ ভীষণ রকম বড়।

কিন্তু জগৎটা এম্‌নি বোকা যে আমাদের এ কথা কেউ মান্‌তে চায় না। ওকথা শুনে কেউ কেউ আমাদের পানে আড়চোখে চেয়ে চেয়ে একটু মুচ্‌কে হেসে চলে গেল। কেউ বা ভাব্‌লে আমরা পরিহাস কচ্ছি। আবার সহৃদয় দু'এক জনা মুরুব্বিয়ানা দেখিয়ে বল্‌লে—হাঁ হাঁ তোমরা বড় বটে—আর সেটা, তোমরা জন্মাবার চার পাঁচ হাজার বছর পূর্ব্বে যে-সব বই লেখা হ'য়েছে, যে বইগুলো তোমাদের মধ্যে হাজার-করা একজনা পড়্‌তে পারে—লক্ষ-করা আধজনা বুঝ্‌তে পারে—সেই বইগুলো থেকে সূত্র তুলে' প্রমাণ করাও যায় বটে। জগতের লোকগুলোর এই ভাবভঙ্গী দেখে আমাদের সন্দেহ পর্য্যন্ত রইল না যে জগতের লোকগুলো সব ভীষণ রকম অজ্ঞানান্ধকারে—এমনি কালো সে আঁধার যে একেবারে আল্‌কাতরার চাইতেও কালো। আর জগতের মধ্যে একলা জ্ঞানী শুধু আমরা। সেদিন থেকে আমরা বসে রয়েছি সেই দিনের অপেক্ষায় যেদিন পরলোকে ব্রহ্মার এজ্‌লাসে বিষ্ণু মহেশ্বরকে এসেসার ধরে' বিচারে প্রমাণ হয়ে যাবে যে আমরাই শ্রেষ্ঠ।

আমাদের সংস্কৃত গ্রন্থসমূহে জগৎ ঈশ্বর লীলা—এসম্বন্ধে যে কত মত আছে তার বোধ হয় ঠিক নাই। কিন্তু আমাদের জাতির মনের কাছটায় যে "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা" "মায়াবাদ" প্রভৃতি মতগুলোই সত্য হয়ে উঠ্‌ল এরও কারণ ওই প্রাণের দায়। কারণ মানুষ ভিতরের সঙ্গে খাপ না খেলে কোন কিছুকেই সত্য বলে গ্রহণ করতে পারে না। ভগবান্ ত সত্য কিন্তু নাস্তিকের কাছে ভগবান্ এমন স্পষ্ট রকমের অসত্য যে ভগবান্ যারা মানে তাদের অজ্ঞতা দেখে সে আশ্চর্য্য। যদি কোন জাপানীকে বলা যায়—ওহে, এ সব কি কচ্ছো। এ জগৎটা সব মিথ্যা। তবে সে নিশ্চয় উত্তর দেবে—হতে পারে তোমার জগৎটা মিথ্যা। কিন্তু আমার অন্তরে অদম্য বেগে যে প্রাণের স্পন্দন খেল্‌ছে সেটা ভীষণ রকম সত্যি। সেটা এমন স্পষ্ট রকমের সত্যি যে সে সম্বন্ধে আর আমার ভুল করবার কোন সম্ভাবনাই নেই। আর এই প্রাণের স্পন্দনের এম্‌নি তেজ যে এর আলো লেগে এ জগতটার যে রূপ খুলেছে তাতে আমি এম্‌নি মুগ্ধ হয়ে গেছি যে তাতে করে ভগবানকে স্পষ্টতর করেই দেখ্‌ছি। জগতের এ রূপ যদি তোমার চোখে পড়ে' না থাকে তবে মস্ত [illegible] তোমার, ক্ষতি আমার নয়। তোমার হাত পা চোক কানগুলো যদি তোমার আনন্দের

কারণ না হয়ে তোমার বোঝার মত হয়—কর্ম্ম করে যদি আরামের পরিবর্ত্তে শুধু বেদনাই পাও--ভোগ করে যদি পাপ অর্জ্জন ক্‌রছ বলেই মনে হতে থাকে তবে দুর্ভাগ্য তোমার—দোষ জগতেরও নয় ভগবানেরও নয়। এর উত্তরে মায়াবাদী যাই বলুন না কেন—যত পুরাতন সংস্কৃত শ্লোকই হাজির করুন না কেন এর পিছনে রয়েছে ওই প্রাণের দায়। কারণ আমাদের ঋষিদের চিন্তা এত বিভিন্নমুখীন, এমন বিচিত্র ছিল যে এমন কোন মত নেই যেটা তাদের কারো-না-কারো বাক্য দিয়ে সমর্থন করা না যায়। এ সত্বেও যে মায়াবাদীর লোলুপদৃষ্টি যে শ্লোকগুলো "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা" বল্‌ছে সেই শ্লোকগুলোর মাঝেই আটকে রইল, তার মানেই হচ্ছে এই যে তার নিজের প্রাণের অবস্থাটা বড় সঙ্গীন।

সুতরাং আমাদেকে আমাদের এই প্রাণ জিনিষটাকে জাগিয়ে তুল্‌তে হবে। কারণ এই প্রাণ জিনিষটার এমনি গুণ যে এর সাহচর্য্যে আমাদের হাত পা চোখ কানগুলো সব একচোটে একেবারে হালকা হয়ে যাবে। কেবল তাই নয়। এই প্রাণের স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে দেখ্‌ব যে এ জগতটাও একটা অপরূপ সাজ সেজে আমাদের চোখে ধরা দিয়েছে। তখন দেখ্‌ব যে জগতটা মিথ্যা হওয়ার চাইতে সেটা সত্য হওয়ার আনন্দ হয় অনেক বেশী। তখন বুঝ্‌ব যে আমরাই সবার চাইতে বুদ্ধিমান নই—বুদ্ধিমান তারা যারা মানুষকে স্বীকার করেছে, জগতকে স্বীকার করেছে। যখন মানুষের দেহ প্রাণে ভরপুর হয়ে উঠ্‌বে তখন বুঝ্‌ব যে তার প্রত্যেক পাদক্ষেপে আনন্দ রয়েছে—তার প্রত্যেক কর্ম্ম, প্রত্যেক আশা, প্রত্যেক আকাঙ্খায় একটা সার্থকতা রয়েছে—এমন কি তার প্রত্যেক ব্যর্থতায় একটা তৃপ্তি রয়েছে। আর তাতে মানুষের মঙ্গল আস্‌বে, সমাজের মঙ্গল আস্‌বে, জাতির মঙ্গল আস্‌বে, দেশের মঙ্গল আস্‌বে সুতরাং জগতেরও কল্যাণ হবে।

একজন "মুক্তিপ্রাপ্ত" নজরবন্দীর আত্মহত্যা

(উদ্ধৃত)

শচীন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত নামক একজন কলেজের ছাত্র পুলিসের সন্দেহভাজন হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট তাহাকে নজরবন্দী করেন। তাহার পিতা রংপুরের উকীল শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাসগুপ্ত তাহার তত্ত্বাবধানের ভার লইতে রাজী হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট তাহাকে তাহার পিতার গৃহেই নজরবন্দী করিয়া সুবিবেচনার পরিচয় দেন। তাহার পর সে "মুক্তি" লাভও করে। কিন্তু ইহা নামমাত্র মুক্তি। সে গবর্ণমেণ্টের নিকট রংপুরের কলেজে ভর্ত্তি হইবার অনুমতি চায়। অনুমতি পায় নাই। পুলিস তাহাকে কোন সমবয়স্ক সঙ্গীর সহিত খেলা করিতে নিষেধ করে, কথা কহিতে নিষেধ করে, সাধারণ পাঠাগারে গিয়া পড়িতে নিষেধ করে। এইরূপ "মুক্তি" তাহার পক্ষে অসহ্য হওয়ায় সে আত্মহত্যা করিয়াছে। তাহার এইরূপ ধারণা হইয়াছিল যে সে যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে, তাহার দ্বারা কাহারও কোন উপকার হইবে না, অধিকন্তু তাহার পিতার বাড়ী পুনঃ পুনঃ খানাতল্লাসী হইবার আশঙ্কা থাকিবে, এবং যাহাদের সঙ্গে সে মিশিবে তাহারাও সন্দেহভাজন এবং দণ্ডার্হ বলিয়া বিবেচিত হইবে। মৃত্যুকালে তাহার বয়স ২১ বৎসর হইয়াছিল। সে মাজিষ্ট্রেটকে, একজন পুলিসের কর্ম্মচারীকে, এবং পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতিকে পত্র লিখিয়া রাখিয়া যায়। কোন কোন পত্র কাগজে বাহির হইয়াছে। পুলিসের একজন কর্ম্মচারীকে ইংরেজীতে লিখিত পত্রে আছে, "আমি যে-দেশে যাইতেছি, সেখানে তুমি কিম্বা আর কোন পুলিসের লোকে আমাকে জ্বালাতন করিতে পারিবে না।"

শচীন্দ্র তাহার পিতাকে যে পত্র লিখিয়া গিয়াছে, আমরা তাহার একটি নকল পাইয়াছি। তাহার কোন-কোন অংশ আমরা মুদ্রিত করিতেছি। যাহা ছাপিতেছি, তাহাতে কোন-প্রকার সংশোধন করা হয় নাই। কেবলমাত্র যে-যে বাক্যে গবর্ণমেণ্টের তীব্র সমালোচনা আছে, বা গবর্ণমেণ্টের প্রতি স্পষ্ট অবিশ্বাস প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বাদ দিয়াছি। তাহাতে এরূপ কথা আছে যে তেজস্বী ও শক্তিমান ছেলেদের মুক্তি দিতে রাজকর্ম্মচারীরা রাজী হইবেন না, দুর্ব্বলপ্রকৃতির

লোকদিগকে ছাড়িয়া দিতে পারেন; এবং যাহারা মুক্তি পাইবে তাহারা যাহাতে কেবলমাত্র আহার নিদ্রাদি দ্বারা পশুবৎ জীবনই প্রধানতঃ যাপন করে, সে ব্যবস্থা পুলিস করিবে। ইহাও এক জায়গায় আছে যে বর্ত্তমান ধরণের শাসন-প্রণালী টিকিতে পারে না, কারণ ইহাতে অবিচার ও উৎপীড়ন হইতেছে। চিঠিখানির ভাব ভাষা অপেক্ষা মানসিক পরিপক্কতার পরিচায়ক। এইজন্য বোধ হয়, নকল করিতে কিছু ত্রুটি হইয়া থাকিবে।

"শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

"বাবা, আমি যে আত্মহত্যা করিতেছি তাহাতে আপনি যে কতদূর শোকে অভিভূত হইবেন তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি। আমি যে কেন আত্মহত্যা করিতেছি তাহা জানিলে হয়ত আপনার শোকের কিছু উপশম হইতে পারে।

"আমি যে আজকাল নিষ্কর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়া আছি তাহাতে আমি বড়ই অসন্তুষ্ট এরূপভাবে জীবন যাপন করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি কাহারও সঙ্গে বেড়াইলে সেটি পুলিসের তদন্তের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। আমি সংশয়ে (সংসারে ?) কাহারও কোন উপকার করিতে গেলে পুলিস ভাবিবে যে পরের উপকার করিতেছে দেশের লোকের sympathy পাইবার জন্য। পুলিস অথবা Gvt. চায় যে আমি পশুপক্ষীর মত আমার নিজের উদর পূরণ করিয়া আমার জীবনটি কাটাইয়া দিই, কিন্তু আমার পক্ষে তাহা অসম্ভব। সংসারে যখন আসিয়াছি তখন শুধু নিজের জন্য আসি নাই মানবের হিতার্থেই আসিয়াছি। আমার কোন দিনই অনেক টাকাকড়ি উপার্জ্জন করিবার কিম্বা সম্মান অর্জ্জন করিবার আশা ছিল না। আমার চিরকালই ইচ্ছা যে আত্মার উন্নতি এবং পরের উপকার সাধন করিয়া এ জীবন অবসান করিব। কিন্তু এ-জীবনে আর তাহা হইবার নহে। এ জীবনে প্রত্যেক কাজে আমাকে Gvt.এর বাধা পাইতে হইবে। আপনারা আশা করিতেছেন যে Montagu সাহেব আসিয়া সব ঠিক করিয়া দিবে। কিন্তু সে আশা বৃথা।

* * *

"আপনি বেশ জানেন যে সংসারে শুধু বাঁচিয়া থাকা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। ফুল যে ফোটে তাহার চরম সার্থকতা সেইখানে যেখানে সে আপনার গন্ধে দশদিক আমোদিত করে অথবা ভগবানের পায়ে আত্মদান করে। আমাদেরও সেইরূপ। আমাদের মত এই বয়সে অনেক উচ্চকথা মনে আসে, আর পরে তাহা সংসারের চাপে নষ্ট হইয়া যায়। তখন সমস্ত মনটুকু আপনার সংসারের চিন্তায়

থাকে, অন্যকথা ভাবিবার অবসর হয় না। এমন কি আপন সংসারের উন্নতির জন্য অকাতরে অপরের অনিষ্টের জন্য প্রস্তুত হয়। আপনি কি আমাকে সেইরূপ জীবন যাপন করিতে বলেন? এইরূপ বাঁচিয়া থাকাই কি জীবনের উদ্দেশ্য সফল করে? আমার এই বয়সে ভালমন্দ হইবার দুই পন্থা পড়িয়া রহিয়াছে। যদি এইরূপ অলসভাবে আমাকে সমস্ত সৎসংসর্গ ছাড়িয়া কিছুদিন আরও কাটাইতে হয় তাহা হইলে আমি পশুত্বের স্তরে উপনীত হইব। আমি মনে করি যে ইহা হইতে আজ যে আমি পবিত্র জীবন যাপন করিয়া আর এক জন্ম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতেছি ইহা আপনার পক্ষে গৌরবের বিষয়। আপনি সকলের সাম্‌নে মুখ উঁচু করিয়া বলিতে পারিবেন যে আমার পুত্র অসৎ ত্যাগ করিবার জন্যই মৃত্যুর পথে সত্যের সন্ধানে ধাবিত হইয়াছে। যদি আমি কোনরূপ পাপ করিয়া অথবা কলঙ্ক-যুক্ত হইয়া দীর্ঘ জীবন যাপন করিতে পারিতাম তাহা হইলে বোধ হয় আপনার পক্ষে দুঃখের বিষয় ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমি জীবন ত্যাগ করিতেছি, এই উদ্দেশ্য লইয়া, যে, আবার জন্মগ্রহণ করিতে পারিব, হৃদয় লইয়া অপরিমিত দৈহিক ও মানসিক শক্তি লইয়া বিশ্বের মঙ্গলে আত্মবিসর্জন করিব। ইহা হইতে আর উচ্চ আশা হয় না। আশা করি আপনিও যেন ভগবানের নিকট আমার এইরূপ ভবিষ্যৎ জীবনের কামনা করেন। আপনার হয়ত আশা ছিল যে আমরা কয় ভাই বড় হইয়া উপার্জ্জন করিলে সংসারের দুঃখ কষ্টের অবসান হইত। কিন্তু এই সঙ্গে এই কথাও ভাবিয়া দেখিবেন যে এই ভারতবর্ষে ১০ কোটি লোক এক বেলার বেশী খাইতে পায় না। শীত ও বর্ষায় তাহারা বনের পশুপক্ষীর মতই কষ্টভোগ করে। আর কোনও দেশ এত সুজলা সুফলা হইয়া তাহার অধিবাসীদিগকে এত কষ্ট দেয় না। কিন্তু ইহাতে আমাদের কোনই হাত নাই। আমরা তবুও অনেক পরিবার হইতে অনেক সুখে আছি। এইভাবে যদি দিন কাটাইতে পারেন তাহা হইলে আমি ভগবানকে ধন্যবাদ দিই।

"তাহার পর আমরা আট ভাই সেই আট জনের মধ্য হইতে আজ আমি একজন যাইতেছি যাহা দ্বারা সংসারের খুব বেশী কোন উপকার হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। আর সাতজন বাঁচিয়া থাকিলে আমাদের কোন কষ্ট থাকিবে না। এমন সংসার খুব কমই আছে যে সংসারে সুখের (দুঃখের ?) ছায়াপাত হয় নাই। শান্তিবাবুর দাদার কথা মনে করুন তাহা দ্বারা সংসারের কত উপকার হইত কিন্তু অকালে তাহাকে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইল। আর আমা দ্বারা এখন কাহারও কোন উপকার হওয়ার সম্ভাবনা নাই। আমি যদি এখন কোন ছেলের অনু-

[illegible] জন্য দুই তিন রাত্রি কাটাই তাহা হইলেও আমাকে তাহার জন্য শাস্তির জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। যদি কোন ভাল কাজ করি তাহা হইলেই C.I.D. আমাকে কুচক্ষে দেখিবে। এরূপভাবে আমি আমার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম সময় নষ্ট করিতে পারিব না। তাই জীবন বিসর্জ্জন করিতেছি যে আবার নূতন জন্ম গ্রহণ করিয়া এই জীবনের মহৎ আশাগুলি পূর্ণ করিব। এই সকল কারণে আপনি মোটেই শোক করিবেন না। জানিবেন যে আমার মৃত্যুকালের শেষ প্রার্থনা যে আপনি আমার জন্ত বৃথা শোক করিয়া শরীর ক্ষয় না করেন। আপনার মুখের দিকে চাহিয়া এই এত বড় সংসারটি বাঁচিয়া আছে। আপনার আশায় এই সংসারের ছোট ছোট শিশুরা দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে।

"আমি আজ বড়ই গৌরবান্বিত। আজ আমি এই আনন্দের সহিত মরিতে পারিতেছি যে এমন পিতা আমার যাঁহার আদর্শে যাঁহার শিক্ষায় আজ আমি অসৎজীবন যাপন করিব না বলিয়া প্রাণ দিতেছি।

"তাহার পর আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে কোন Political ব্যাপারে মিশিব না। কিন্তু যে দিন-কাল আসিতেছে তাহাতে Politics ছাড়া কেহ উঠিতে পারিবে না। তবে যাহারা স্বার্থময় পশুজীবন যাপন করিতে চাহে তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। আমি আজ মৃত্যুকে আহ্বান করিয়া প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্ত হইলাম। * * * * ইতিহাসের দিকে চাহিয়া দেখুন, ইটালি, Belgium, France, Russia এবং আজকাল Irelandএর কথা মনে মনে চিন্তা করুন। Gvt. আমাকে যে পড়িতে দেয় নাই তাহাতে Gvt. কোন আইন অনুসারে [কাজ] করেন নাই।

* * * * তাহার পর আপনারা আমার অবস্থা লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন ও ভাবিতেন। আর কাহারও অবস্থা প্রাণের সহিত ভাবিতেন না। আজ আমার এই মৃত্যু আপনাদের দুঃখ বিশ্বজনীন করিয়া তুলিবে। আপনাদের প্রাণ আমার সমাবস্থাপন্ন সকলের জন্য কাঁদিয়া উঠিবে। ভগবান আপনাদের মন সংকীর্ণ গণ্ডী হইতে বৃহৎ গণ্ডীতে লইয়া যাইবেন।

"আমি দাদাকে ইন্দুকে ও বৌদিদিকে আমার সম্বন্ধে চিঠি লিখিয়া দিয়াছি। আপনি সংসারের মধ্যে স্থির ধীর ও বুদ্ধিমান আপনি তাহাদিগকে বুঝাইবেন। আপনি আমাকে কতদূর ভালবাসিতেন তাহা আমি বলিয়া শেষ করিতে পারিব না। আমি যে আপনার মত না লইয়াই এ পথে যাত্রা করিতেছি সেজন্য আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

"আমার এ মৃত্যুতে দেশের মধ্যে একটি প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হইবে। আমার এ মৃত্যুতে Gvtএর আর এরূপ বে-আইনী কাজ করিতে বেগ পাইতে হইবে। যদি আমার এই মৃত্যুতে আমার অবস্থাপ্রাপ্ত আর কাহারও কোন উপকার হয় তাহা হইলে আমি ভগবানকে ধন্যবাদ দিই। আপনারা হয়ত বলিবেন যে আমি আত্মহত্যা করিয়া নির্ব্বোধের কাজ করিতেছি। কিন্তু আমি যে-সকল কথা লিখিলাম সেই সকল কথা চিন্তা করিয়া দেখিবেন সত্যই আমি নির্ব্বোধের কার্য্য করিয়াছি কিনা। আমার মৃত্যুতে আপনাদের গর্ব্ব উচ্চ বই খর্ব্ব হইবে না। আমি আপনাদের কাছে এই মিনতি করিতেছি আপনি যেন শেষে অত্যধিক কাতর না হন। আমার মৃত্যুকালীন শেষ প্রার্থনা আপনি রাখিবেন বলিয়া আমার ধারণা। আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন এবং বড়মাকেও দিবেন। বড়মা যেন শোকে কাতর না হন। আপনি যেন সকল কথা বুঝাইয়া বলেন। আমার সকল কথা বলা হইয়াছে। আপনার পদে আমার শতকোটী প্রণাম। নিবেদনমিতি।

সেবক 'সদা'"

এই তেজস্বী, মানবহিতৈষী, সদাশয় যুবকের আত্মহত্যা গভীর শোকের বিষয়। স্বাধীনদেশে জন্মিলে ইহার দ্বারা মহৎ কাজ হইতে পারিত; এ-দেশে আত্মহত্যা দ্বারা সে নিষ্কৃতি পাইল।

ঘোরতর দুষ্কর্ম্ম করিয়া যাহারা জেলে যায়, তাহারাও জেলে কোন-না-কোন কাজ করে, এবং খালাস পাইয়া কোন কাজ করিয়া খায়। এই যুবকের জীবনটিকে আলস্যের দ্বারা ব্যর্থ করিবার বন্দোবস্ত পুলিস কাহার হুকুমে কোন্ আইন অনুসারে করিয়াছিল? এরূপ হুকুম বা আইন থাকিলে, তাহা কি পরমেশ্বরের বিধানের অনুযায়ী?

[illegible] এই আশা লইয়া মরিয়াছে যে তাহার মৃত্যুতে দেশের মধ্যে একটি প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হইবে। তাহা হইতেছে কি না, সকলে বুকে হাত দিয়া বলুন। (প্রবাসী কার্ত্তিক, ১৩২৪)

নিশীথ চিন্তা

স্তব্ধ গভীর নিশীথে বসিয়া ভাবিতেছি। কিসের ভাবনা ? কি ভাবিতেছি তাহার নিরাকরণ নাই—কেবল ভাবিতেছি। সদ্যপুত্রশোকাতুরা জননী মর্ম্মভেদী হাহাকার করিতে করিতে সেও ক্ষণেকের তরে নিদ্রাভিভূতা, অনাহারে জীর্ণতনু দীনদরিদ্রও বিরামদায়িনী নিদ্রাদেবীর সুকোমল অঙ্কে নিশ্চিন্ত, আর আমি ভাবিতেছি--ললাটে ঘর্ম্মবিন্দু, নয়নে অগ্নিশিখা, হৃদয়ে নিদারুণ জ্বালা—আমার নিদ্রা নাই, আমি জাগিয়া বসিয়া আছি। উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিও এই গম্‌গমে রাত্রিকালে চক্ষু মুদিয়াছে—উত্তমর্ণের রক্তচক্ষুর কথা ভুলিয়া অধমর্ণও প্রশান্তচিত্তে ঘুমঘোরে অচেতন—মহাকুরুক্ষেত্রের গুরু গুরু কামানগর্জ্জনও বুঝি স্তব্ধ—আর আমি চিন্তামগ্ন—কিসের চিন্তা ?

আমার চতুর্দ্দিকে বিপ্লব, চতুর্দ্দিকে সর্ব্বনাশের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে—আজ আমার অস্তিত্ব লইয়া পৃথিবীর সকল সামগ্রীর সহিত তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে—এই যুদ্ধের তুলনায় কি ছার ইউরোপের সমরাভিনয়—সে যুদ্ধ ত বাহিরের। আমার অন্তর যে আততায়ীর আগ্নেয়াস্ত্রে পুড়িয়া পুড়িয়া ছাই হইতেছে, আমি যে কিছুতেই আপনাকে রক্ষা করিতে পারিতেছি না, আমার দুর্জ্জয় দুর্গ যে শত্রুকরতলগত হয় হয় হইয়া উঠিয়াছে--বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, ক্লান্তি নাই, অবসর নাই—কি ভীষণ সংগ্রাম।

আমার প্রধান সেনাপতি অহঙ্কার--সেও পদে পদে লাঞ্ছিত অপদস্থ হইয়া রণে ভঙ্গ দিতেছে—আমার দুর্জ্জয় সংস্কারসেনাবাহিনী মন্ত্রাহত হইয়া কে কোথায় পলায়নপর—আমি একা--তথাচ পরাজয় স্বীকার করিতে পারি না—আমার অস্তিত্বের বিলোপ যাহাতে না হয় তাহার জন্য আমার এই অবিরত শক্তিপ্রয়োগ। আমি চাহি কি ? সর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াও কোন্ আশায় কাহার জন্য এই মরজগতে অবস্থান করিতে প্রস্তুত ? ইহাই আমার চিন্তার বিষয়।

ষড়রিপু মহাযোদ্ধার সহায়ে অসংখ্য সংস্কারসেনা পরিবেষ্টিত হইয়া প্রধান সেনাপতি অহঙ্কার আমায় আজ পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত রাখিয়াছিল, বাহিরের সহিত আমার ত কোন সম্পর্কই ছিল না—পৃথিবীতে যে আমার এত আততায়ী তাহাত আমি এতদিন জানি নাই। আজ কোন্ শক্তিধর চিরবিজয়ী, আমার পরম সহায়ক রক্ষকগুলিকে শাণিত সায়কে বিনাশ করিয়া আমায় উত্ত্যক্ত করিল!” আমায় এমন করিয়া চিন্তা করিতে হয় নাই—আজ চতুর্দ্দিকেই অভাব, চতুর্দ্দিকেই বিপ্লব, চতুর্দ্দিকেই অশান্তি, আজ আমি সহায়সম্পদহীন কিন্তু সহস্র আঘাতেও ত আমার বিনাশ হয় না, অজস্র অস্ত্রপাতেও আমার মৃত্যু নাই, আঘাতে আঘাতে বুঝিতেছি আমি ক্ষুদ্র নই, আমি তুচ্ছ নই, আমি দুর্ব্বল নই, তাই সংগ্রাম করিতেছি বিনিদ্র হইয়া—আরামের দিন আমার ফুরাইয়াছে।

যাহাদের মুখাপেক্ষায় এতকাল নিশ্চিন্তচিত্তে অলসতাকেই সুখ বলিয়া মনে করিয়াছিলাম আপনাকে পঙ্গু জ্ঞানে যাহাদের সহায়তাবিহীন হইলে জীবন নিরর্থক হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিতাম আজ তাহাদের তিরোধানে জীবনের আস্বাদ বুঝিতেছি—আমি যে কত বৃহৎ, কত শক্তিধর, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি; কিন্তু এখনও জানার শেষ হয় নাই—আমার উপস্থিত অভিজ্ঞতা অপরিপূর্ণ, পূর্ণভাবে আপনাকে জানিব, পরিপূর্ণভাবে আপনাকে পাইব—ইহাইত আমার চিন্তা, ইহার জন্যইত আমার সংগ্রাম, এই অবিরাম বিপ্লবের মধ্যেই আমাকে বুঝিতেছি—তাই বিপ্লবই আমার আনন্দের খেলা বলিয়া প্রতীত হইতেছে।

যতখানি আপনাকে বুঝিতে পারিলে পূর্ণানন্দলাভ হয়, ততখানি বুঝিবার জন্য আমার যে ব্যাকুলতা, আমার যে প্রচেষ্টা যে উৎসাহ তাহারই উত্তাপে আমার নিদ্রা আজ সুদূরপরাহত, ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে অবস্থিত—মহাসংগ্রামের ভিতর দিয়াই আপনাকে বিশেষরূপে পাইব এবং এরূপ ঘটিলে আজ যাহাদিগকে হারাইয়াছি তাহাদিগকেও আমারই অমৃতত্ব দিয়া আমার করিয়া লইতে পারিব; পূর্ব্বে তাহারা ইচ্ছামত আমার রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিল—এইরূপ হইলে আমিই তাহাদিগকে আমার অমর অস্তিত্বের জন্য সশস্ত্র করিয়া দুর্গরক্ষার ভার প্রদান করিতে পারিব—আমি যে ভুলিয়াছিলাম আমিই ঈশ্বর, আমিই সর্ব্বশক্তিমান্ কর্ত্তা, আমার আদেশের অনুগত হইয়া চলাই যে তাহাদের কর্ম্ম; ইহার বিপরীত আচরণ করিতে

গিয়াই আমি বিপন্ন, এবং আমার সহচরবৃন্দও বিপর্য্যস্ত।

মুক্ত স্বাধীন ভাবে আমার এই অবাধ লীলা মরজগতে প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে আমার অপরাজেয় মহাশক্তিকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। অপরিসীম শক্তির সহায়তা না পাইলে আমার এই অনন্ত ঐশ্বর্য্য মহাকালের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বজায় থাকিবে না; প্রভু হইয়া ভৃত্যগণকে যথেচ্ছাচারী হইতে দিয়াছি তাই পদে পদে অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব হইয়াছে, আমি মুক্ত হইয়াও আবদ্ধবৎ ধারণা জন্মিয়াছে কিন্তু আজ দেখিতে হইবে কাহার সুতীব্র অস্ত্রাঘাতে আমার কদাকার শবভার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আমাকে মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ করিয়া দিল।

শুদ্ধ সত্ত্বগুণহারা হইয়া অমিশ্র রজশক্তির দ্বারা যখন জীবনের খেলা চলিতে থাকে, তখন স্বভাবতঃ ঘোরতর তামসিকতা আসিয়া জীবনকে লঘু ও তুচ্ছ করিয়া দেয়, কিন্তু আত্মা অবিনাশী, সুতরাং তাহার কার্য্যাদিও গুণভেদে পরিবর্ত্তনশীল হইলেও তাহারও মধ্যে মুক্ত দিব্যানন্দের খেলা লুকায়িত আছে। সেই জন্য তমঃশক্তির অভ্যুদয়ে যে জড়ত্ব মানুষের অমর জীবনে বোঝার মত চাপিয়া বসে, স্বয়ং মহাবিষ্ণু জ্ঞান-সুদর্শন-চক্রে তাহার উচ্ছেদসাধন করিয়া আবার শুদ্ধ সাত্বিকভাবে মানবজীবন ভরাইয়া তুলেন— তখন আবার জগতে নূতন যুগের আবির্ভাব হয়। সংগ্রামে যে সাধক শিবের মত শুদ্ধ ও আনন্দময় হইয়া উঠিতে পারে, তাহারই অটল আত্মার ভিতর হইতে স্বর্গের অমৃতধারা বহির্গত হইয়া থাকে—মহাসাধকের সর্ব্বাঙ্গ বাহিয়া সেই পুণ্যস্রোত ধারারূপে সমগ্র পৃথিবীকে পবিত্র করিয়া তুলে। হে সাধক! আজ বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে আবার অমৃতধারা ক্ষরিত হইবার উপক্রম হইয়াছে—এই মহাশক্তিস্রোত ধরাতলে প্রবাহিত করিতে হইলে শিবের মতনই ইহাকে মাথা পাতিয়া ধারণ করিতে হইবে। তাই বসিয়া ভাবিতেছি আর কতদিন সংগ্রাম করিব, কবে সেই মহাবিজয়া আসিবে, যেদিন অচঞ্চলশিরে অকম্পিতচরণে ধারণ করিব পুণ্যপ্রবাহকে—যে প্রবাহ পবিত্র করিবে, উদ্দীপিত করিবে তমোময় জাতিকে, ধন্য হইবে বসুন্ধরা স্বর্গের পূত মন্দাকিনী-স্পর্শে—ইহাই আমার চিন্তা।

চিন্তা বীথি

আমরা শিখিয়া আসিয়াছি শ্রেয়কে প্রেয় হইতে চিরকাল পৃথক করিয়া দেখিতে। প্রিয়ঙ্কর যাহা তাহা বর্জ্জন করিতে হইবে, তবেই শ্রেয়ঙ্কর যাহা তাহা লাভ হইবে। প্রাণে যাহা ভাল লাগে তাহা কখন মঙ্গলের হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়কে যাহা তৃপ্তি দেয়, আত্মার পক্ষে তাহা বিষ। নিত্যনৈমিত্তিক জীবন যাহার সহায়ে রসায়িত মুঞ্জরিত হইয়া উঠিতেছে, আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে তাহাই যেন সাহারার সে উত্তপ্ত 'সিমুম'।

* * *

কিন্তু ভারতের আধ্যাত্মিকতা যেদিন ছিল সজীব নির্ভীক কুণ্ঠাহীন, সেদিন শ্রেয়ের ও প্রেয়ের মধ্যে এইরূপ কোন ব্যবচ্ছেদরেখা টানিয়া দেওয়া হয় নাই। ধর্ম্ম সাধনা অর্থ যখন ছিল জীবনসৃজন তখন জীবনের যাবতীয় প্রিয়বস্তুর মধ্যেই শ্রেয়ঙ্কর পদার্থটি অব্যর্থ সামঞ্জস্যে রচিয়া উঠিয়াছে। ভূতলের মনোহর ভোগরাজী দেখিয়া বৈরাগ্যের মন্ত্রকে উচ্চারণ করিতেছি আর দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িতেছি--সে কাল আসিয়াছিল অনেক পরে। সে ইহবিমুখতা, সে হীনবীর্য্যতা, সে ধারণসামর্থ্যহীনতার যুগ যেদিন আরম্ভ হইয়াছে সেই দিন হইতেই প্রকৃত ভারত লুপ্ত হইয়াছে।

* * *

ঋগ্বেদ ভারতীয় সাধনার নবীন উষার নবীন জ্ঞানের নবীন অনুভূতি। ঋষিগণ দেখিয়াছেন ঋজুদৃষ্টিতে সত্যের ঋজু প্রকৃতি, তাহার পূর্ণ মূর্ত্তিটি। কোথাও কোন গতানুগতিক সংস্কার, কোন ভিত্তিহীন কল্পনা, কোনরূপ কিছু ইতস্ততা তাঁহাদের অনুভূতির সমগ্রতাকে খণ্ডিত করিতে পারে নাই। তাই যাহাই তাঁহারা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে পাই এক উদার প্রসার পূর্ণ সম্মেলন সুষমা। সঙ্কীর্ণতা একদেশদর্শিতা কোথাও কিছু নাই। নবীনতম সাধক যাঁহারা তাঁহারা যেন এই প্রাচীনতম সাধকদিগেরই অক্ষত অনুভূতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে চেষ্টা করিবেন।

* * *

ঋষিগণ ছিলেন দিব্যজীবনের সাধক। এই দিব্যজীবনকে তাঁহারা গঠন

করিতে চাহিয়াছিলেন দুইপ্রকার অমৃতত্বে ভরিয়া দিয়া—আধ্যাত্মিক অমৃতত্ব ও আধিভৌতিক অমৃতত্ব। একদিকে পরা প্রতিষ্ঠানের আনন্দ আর একদিকে অপরাপ্রতিষ্ঠানের আনন্দ, একদিকে আত্মরতি আর একদিকে বিষয় ভোগ, একদিকে স্বরাট্ আর একদিকে সম্রাট্—অথবা তাঁহাদিগের ভাষায় একদিকে ময়ঃ আর একদিকে প্রয়ঃ।

* * *

শরীরের মধ্যে, জগতের মধ্যে, প্রকাশের মধ্যে আপনাকে ছড়াইয়া দিয়া যে আনন্দ তাহাই প্রয়ঃ আর নিজের মধ্যে নিজে রহিয়া সকল দিক হইতে আপনাকে টানিয়া লইয়া, নিরালম্ব আত্মস্থ হইয়া যে আনন্দ তাহাই ময়ঃ। দেহকে দেহ দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া দেহগত যে আনন্দ তাহা হইতেছে প্রয়ঃ, আর আত্মাকে আত্মার সহিত মিলাইয়া দিয়া আত্মার মধ্যে যে আনন্দ তাহা হইতেছে ময়ঃ। প্রয়ঃ ও ময়ঃ এই উভয়কেই লইয়া পূর্ণ ভাগবত জীবন।

* * *

সৃষ্টি সাতটি লোক, মানুষ সাতটি স্তরের সমষ্টি। জীবনের বীণা সাতটি তন্ত্রী লইয়া খেলিতেছে, সাতটি সুরে মিলিয়া সম্পূর্ণ সঙ্গীত—শরীর, চিত্ত, মন, বিজ্ঞান, আনন্দ, তপঃ ও সৎ। শরীর, চিত্ত ও মন হইতেছে ঐহিক আধার আর সৎ চিৎ (তপঃ) আনন্দ হইতেছে তাহার পারত্রিক-স্বরূপ। বিজ্ঞান এই উভয়কে সংযুক্ত সম্মিলিত করিয়াছে, বিজ্ঞানের প্রতিভাতেই উভয়ের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য নিগূঢ় রহিয়াছে।

* * *

এই সাতটি ক্ষেত্রের প্রত্যেকটিই আবার এক বিশেষ রস বিশেষ আনন্দের লীলাভূমি। শরীরে কামানন্দ ও বিষয়ানন্দ, চিত্তে প্রেমানন্দ, মনে অহৈতুকানন্দ। এই আনন্দত্রয়ই হইতেছে প্রয়ঃ। সৎ হইতে সদানন্দ, চিৎ হইতে চিদানন্দ আর আনন্দের আনন্দ হইতেছে শুদ্ধানন্দ—এই আনন্দত্রয় লইয়া ময়ঃ। বিজ্ঞানের যে আনন্দ তাহার নাম চিদ্ঘনানন্দ—ময়ঃ ও প্রয়ঃ একীভূত হইয়াছে বিজ্ঞানের এই চিদ্ঘনানন্দে।

* * *

দেবজীবনেও যে পশুজীবনের স্থান নাই তাহা নয়। পশুজীবনকে প্রতিষ্ঠা করিয়াই দেবজীবন গঠিত। তাই দেখি পৌরাণিক কল্পনায় প্রত্যেক দেব-

দেবীরই আছে এক একটি পশু বাহন। পদতলে এই পশুকে রাখিয়া তাহার উপর ভর করিয়াই দেবতা দাঁড়াইয়া আছেন, আপন কর্ম্ম আপন ব্রত সম্পাদন করিতেছেন।

* * *

পশু চাই কিন্তু সে পশু থাকিবে পশুপতির পদতলে, সে চলিবে আপন অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অঙ্গুলী সঙ্কেতে। পশু যখন পৃষ্ঠ হইতে আপন দেবতাকে সরাইয়া ফেলিয়া স্বৈরচারী হইয়া উঠে তখনই বিশৃঙ্খলা অসামঞ্জস্য, তখনই অকল্যাণ। কিন্তু যে পশু চলিয়াছে দেবতার অনুপ্রেরণায় সে দেবধর্ম্মের সহায়, দেবকর্ম্মের যন্ত্র, দেবতারই অঙ্গীভূত।

"সাংঘাতিক সিদ্ধান্ত"

মাসিক পত্রিকা "সাহিত্যের" কর্ণধার "নারায়ণের" মারফতে "প্রবর্ত্তকের" একটা সাংঘাতিক সিদ্ধান্তের সংবাদ পেয়েছেন। কি জানি পাছে এই সাংঘাতিক সিদ্ধান্তের খবর পেয়ে "প্রবর্ত্তকের" পাঠকবর্গ চম্‌কে যান সেইজন্য আমরা এর একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া কর্ত্তব্য বলে মনে কর্‌ছি—অন্ততঃ নিজেদের ছাপাইয়ের জন্য। বিশেষতঃ যেটার সবটা মনীষী "সাহিত্য" সম্পাদকই বুঝ্‌তে পারেন নি প্রবর্ত্তকের সাধারণ পাঠক হয়ত সেটার আরও কমটা বুঝবে—সেটা ধরে নেওয়া যেতে পারে। আর এটা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, কোন কিছু একেবারে না বোঝা বরং ভাল কিন্তু তার কোন একটা অংশ বুঝলে বিপদ হতে পারে।

সাংঘাতিক সিদ্ধান্তটী হচ্ছে এই—"আদর্শ মানুষ যিনি, আদর্শ মনুষ্যত্বের সাধক যিনি, তিনি জগতের সমস্ত দ্বন্দ্বে গা ঢালিয়া দিয়া জীবনের শত অসুন্দর ব্যাপারের কাদামাটীতে লিপ্ত হইয়া তাহারই মধ্য হইতে নিজের অন্তরে বাহিরের জগতে একটা উচ্চতর মহত্তর সুন্দর সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন সৃষ্টি করিয়া চলিবেন"। কিন্তু এ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা সুরু কর্‌বার আগে আমরা একটা কবিতা এখানে তুলে দিতে চাই—কবিতাটী রবীন্দ্রনাথের। সেটি এই—

যতকাল তুই শিশুর মত
রইবি বলহীন,

অন্তরেরি অন্তঃপুরে
থাক্‌রে ততদিন।
অল্প ঘায়ে পড়্‌বি ঘুরে,
অল্প দাহে মর্‌বি পুড়ে,
অল্প গায়ে লাগ্‌লে ধূলা
কর্‌বে যে মলিন—
অন্তরেরি অন্তঃপুরে
থাক্‌রে ততদিন॥

কিন্তু—

যখন তোমার শক্তি হবে
উঠ্‌বে ভরে প্রাণ,
আগুন-ভরা সুধা তাঁহার
কর্‌বি যখন পান,—
বাইরে তখন যাস্‌রে ছুটে
থাক্‌বি শুচি ধূলায় লুটে
সকল বাঁধন অঙ্গে নিয়ে
বেড়াবি স্বাধীন,— (গীতাঞ্জলী—১৩৭)

রবীন্দ্রনাথের ঐ কবিতাটীর সম্বন্ধে আমরা আশা করি "সাহিত্য" সম্পাদক মহাশয়ও স্বীকার কর্‌বেন যে তার মধ্যে সাংঘাতিকত্ব কিছু নেই। আমাদের বিশ্বাস যে প্রবর্ত্তকের "সাংঘাতিক সিদ্ধান্তের" সঙ্গে উপরের কবিতার দ্বিতীয় কলির (Stanza) অর্থের একটা দিকের মিল আছে। কতকটা সেই সাহসেই মনীষী "সাহিত্য" সম্পাদকের আবিষ্কৃত সাংঘাতিক সিদ্ধান্তের একটা ব্যাখ্যা দিতে অগ্রসর হয়েছি।

"প্রবর্ত্তক" সম্বন্ধে যিনি যে ভুলই করুন না কেন প্রবর্ত্তকের নিয়মিত পাঠকদের কেউই একটা বিষয়ে বোধ হয় কোন ভুল কর্‌বেন না—আশা কর্‌তে পারি, সে বিষয়টা হচ্ছে এই যে—"প্রবর্ত্তক" সংসার ছাড়্‌তে চায় না। কারণ তার বিশ্বাস যে এই যে জগত, এই যে লীলা তা দাঁড়িয়ে আছে ভগবানের ইচ্ছার ওপরে। আর ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ "প্রবর্ত্তক" কর্‌তে পারে না। প্রবর্ত্তকের সেটা "creed" নয়। বিশেষতঃ প্রবর্ত্তক এটাও বুঝেছে যে যারাই ভগবানের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এ জগতে তাদের সুদশার চাইতে দুর্দ্দশা হবে অনেক বেশী।

তাই "প্রবর্ত্তক" বরাবর চেষ্টা করে এসেছে যাতে তার দেশবাসী জগতকে অস্বীকার করে সংসার বিমুখ না হয়। কারণ আমরা ঠেকে দেখ্‌তে পাচ্ছি

যে আমরা জগতকে অস্বীকার কর্‌লেও জগতটা কিন্তু আমাদেকে অস্বীকার মোটেই কর্‌ছে না। সেই জন্তই ত জগতের মাঝে আমাদের স্থানটা আজ কৈবল্য-মুক্তি থেকে অনেক দূরে আর চিদ্‌ঘন আনন্দের মোটেও কাছে নয়।

সুতরাং এটা ঠিক দাঁড়াল যে “প্রবর্ত্তক” সংসারেই থাকৃতে চায়। কিন্তু কি ভাবে থাকৃতে চায় সে সেখানে? কোন রকমে দুটী খেয়ে জীবনটা গড্ডালিকা প্রবাহের মত কাটিয়ে দিয়ে? না—একটা ভীষণ রকম মোটা অক্ষরের—“না”। সে চায় এ জগতে “আদর্শ মানুষ” হয়ে থাকৃতে “আদর্শ মনুষ্যত্বের সাধক” হয়ে থাকৃতে। কিন্তু আদর্শ মানুষ জিনিষটা কি? তবে আগে দেখ্‌তে হবে মানুষ পদার্থটা কি? তবে এখানে আমরা “প্রবর্ত্তকের”ই প্রথম বর্ষের ২২শ সংখ্যায় প্রকাশিত “মানুষের কথা” প্রবন্ধের এক অংশ তুলে দিতে চাই—দেখি তাতে আমাদের উত্তর মেলে কি না, অংশটী হচ্ছে এই—

> “প্রথমতঃ ধর্ম্ম কি? ধর্ম্ম হইতেছে সত্যম্‌ ঋতম্‌। যাহাকে আশ্রয় করিয়া এই সৃষ্টির প্রকাশ হইয়াছে, এই সৃষ্টির স্থিতি সম্ভব হইয়াছে, যাহাকে স্বীকার করিয়া বহু আপন আপন স্বাতন্ত্র্য লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, যাহাকে আশ্রয় করিয়া মানুষের মনুষ্যত্ব, বিড়ালের বিড়ালত্ব, বৃক্ষের বৃক্ষত্ব। আবার যাহার প্রেরণায় ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বৈশ্য, শূদ্র শূদ্র। মানুষ বিড়াল বৃক্ষ সকলেই এক—সকলেই সেই এক পরমাত্মার বিভূতি। আবার ইহারা সকলেই স্বতন্ত্র। ইহাদের স্বাতন্ত্র্য আসিল কোথা হইতে? ইহাদের পৃথক পৃথক গুণ হইতে। এই গুণের জন্ম হইল কি করিয়া? ইহাদের স্ব স্ব ধর্ম্ম হইতে।
>
> “সুতরাং এই সৃষ্টির যে ব্যষ্টির ব্যষ্টিত্ব, বহুর যে অনন্তগুণের খেলা—তাহার ভিত্তি হইতেছে বহুর আপন আপন ধর্ম্ম। আর এই ধর্ম্মের উদযাপনেই সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, মুক্তি, আনন্দ। কারণ এই যে ধর্ম্ম—তাহা কাহারও মনগড়া নয়। ইহা উদ্ভূত হইয়াছে ব্রহ্ম হইতে, সৎরূপ লইয়া—আনন্দ হইতে, অমৃতবহ হইয়া---লীলার জন্য।
>
> “সুতরাং মানুষের যে ধর্ম্ম, মানুষের যে মনুষ্যত্ব তাহা রহিয়াছে তাহার দেহের মধ্যে, মনের মধ্যে, চিত্তের মধ্যে, বুদ্ধির মধ্যে, বিজ্ঞানের মধ্যে—ইহাদের প্রেরণার মধ্যে।”

ওপরের ঐ কথা যদি স্বীকার করি—তবে একথা মান্‌তে হবে যে বৃক্ষের মধ্যে রয়েছে—পরমাত্মা × বৃক্ষত্ব। বিড়ালের মধ্যে রয়েছে—পরমাত্মা × বিড়ালত্ব। মানুষের মধ্যে রয়েছে—পরমাত্মা × মনুষ্যত্ব। সুতরাং গণিতশাস্ত্রের মতো করে দেখ্‌লে দেখা যাবে যে এই জগত-লীলার প্রকাশটা হয়ে আছে এই রকমে—পরমাত্মা (বৃক্ষত্ব + বিড়ালত্ব + মনুষ্যত্ব + ইত্যাদি + ইত্যাদি…)
সুতরাং বৃক্ষ বিড়াল মানুষের মধ্যে যে প্রভেদটা দেখ্‌ছি "সেটা পরমাত্মা যেখানটায় আছেন সেখানটায় নেই—এ প্রভেদ হচ্ছে এদের দেহ মন ইন্দ্রিয়াদিতে—তাদের শক্তিতে। সুতরাং দাঁড়াল এই যে মানুষ হচ্ছে—আমাদের মতই হস্ত পদ চক্ষু কর্ণধারী জীবটা তার ইন্দ্রিয়াদি ও সেইসব ইন্দ্রিয়াদির শক্তি। কারণ ইন্দ্রিয়ের শক্তি ছাড়া ইন্দ্রিয়ের কোন মানে নেই, চোখ্‌টা চোখ যখন সেটা দেখে—কাণটা কাণ যখন সেটা শোনে। আর আদর্শ মানুষ বল্‌ব তাকেই যে মানুষ এই ইন্দ্রিয়াদিকে অস্বীকার করে নি, পরিহার করে নি—যে এদেরকে আলিঙ্গন করে এই জগতলীলায় ভগবানের খেলায় সঙ্গী হয়ে আছে। কারণ বলেছি যে ইন্দ্রিয়াদির পরিহার কর্‌লে বা যা থাকে সেটা হচ্ছে পরমাত্মা—সেটা মানুষ নয়। কারণ মানুষ মানে পরমাত্মা × মনুষ্যত্ব। আর পরমাত্মার স্থান মহর্লোক, সত্যলোক, ধ্রুবলোক যে লোকই হোক্—এ মর্ত্তালোক নয়। এ মর্ত্ত্যলোক হচ্ছে মানুষের লীলার জায়গা—তার Birth-right.

সুতরাং আমরা মানুষকে পেলেম, মনুষ্যত্বকে পেলেম। এখন দেখ্‌তে হবে "আদর্শ মনুষ্যত্ব" জিনিষটা কি? আদর্শ মনুষ্যত্ব হচ্ছে যখন মানুষ তার মনুষ্যত্বকে অর্থাৎ তার দেহ মন চিত্ত ইন্দ্রিয় জ্ঞান বিজ্ঞান ইত্যাদিকে তাদের আপন আপন শক্তিকে highest perfectionএ এনে ফেলেছে, যখন মানুষের মধ্যে এদের truest expressionএর খেলা হচ্ছে।

আর এটা কর্‌তে হলে মানুষের এ জগতে Non-touchism নিয়ে থাক্‌লে চল্‌বে না কিছুতেই। তাকে থাক্‌তে হবে "জগতের সমস্ত দ্বন্দ্ব"র মধ্যে "জীবনের শত অসুন্দর ব্যাপারের কাদামাটী"তে। যে মাঝি কখন সমুদ্রে একটী তরঙ্গও থাক্‌বে না সেই সময়ের জন্য অপেক্ষা কর্‌বে তার নৌকো ভাসাবার জন্যে, তাকে জন্ম জন্মান্তরই অপেক্ষা কর্‌তে হবে—আর সে মাঝির মাঝিত্ব কোন দিনই ফুট্‌বে না। যে মাঝি মাঝি হতে চায় তাকে ঐ তরঙ্গের মধ্যেই নৌকো ভাসাতে হবে। আর যে মাঝি

প্রকৃত মাঝি, ভাল মাঝি সে ত ক্ষুদ্র তরঙ্গকে কেয়ারই করে না. প্রকাণ্ড ঝড়েও সে আপনার নৌকোকে বাঁচিয়ে দিব্যি চালিয়ে যায়—কেবল তাই নয়, এতেই মাঝির প্রকৃত মাঝিত্ব। আর এই মাঝিত্বে শক্তির পরিচয় আছে—সুতরাং আনন্দ আছে।

সেই রকম যে মানুষ তার ইন্দ্রিয়াদিতে তাদের শক্তির highest perfection, truest expression চায় তাকে থাকৃতে হবে এই জগতে—তা সে জগত দ্বন্দ্বময়ই হোক্ আর অসুন্দরই হোক্। বরং এই জগৎ দ্বন্দ্বময় অসুন্দর বলে তার আরও সুবিধা। কারণ এই রকম জগতেই মানুষের ইন্দ্রিয়াদির, তার শক্তির অনুশীলন সম্ভব। এই অনুশীলনকে আমরা mysterious ভাষায় বলি যোগ। যোগের উদ্দেশ্য চিরকালই ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভুত্ব করা। কিন্তু প্রচলিত যোগ আর "প্রবর্ত্তকের" যোগে প্রভেদটা হচ্ছে ঐ প্রভুত্ব করার রকমটা নিয়ে। প্রচলিত যোগের উদ্দেশ্য ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া সুতরাং তার চেষ্টা হচ্ছে ইন্দ্রিয়াদিকে খেতে না দিয়ে মেরে ফেলা অথবা আবরকাটা ছাড়া আর কিছু না করতে দিয়ে পঙ্গু করে রাখা। সেইটে হচ্ছে তার ইন্দ্রিয়ের ওপরে প্রভুত্ব। "প্রবর্ত্তক" জগত লীলাকে মানে সুতরাং তার ইন্দ্রিয়ের ওপরে প্রভুত্ব অর্থ—তাদেকে জাগ্রত করে তোলা শক্তিমান করে তোলা—আর সে ইন্দ্রিয়াদিকে একটা Provincial Autonomy গোছের দেওয়া আর সেই Provincial Autonomyর ওপরে সে থাকৃবে কর্ত্তা। আর এই "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" হবে যখন তখন।

যাহোক্ এ সম্বন্ধে এখানে আর বেশী কিছু বলার প্রয়োজন নেই। বল্‌তে গেলে দেড় বছর ধরে "প্রবর্ত্তক" যা বলে এসেছে সেই সব কথা আবার ফিরে বল্‌তে হয়। তবে শেষ কথা হচ্ছে এই যে মানুষ যখন আপনার ঈশ্বরত্ব খুঁজে পাবে তখন দেখ্‌বে যে বাহিরের দ্বন্দ্ব অসুন্দরতা তার কাছে আর অমঙ্গল হয়ে দেখা দিচ্ছে না সে তখন তার ভিতরে থেকেই তার "অন্তরে ও বাহিরের জগতে একটা উচ্চতর মহত্তর সুন্দর সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন" খুঁজে পেয়েছে। তখন সে ধূলায় লুটেও শুচি থাক্‌বে তখন তার জীবনদেবতা তাকে passport দেবে এই বলে যে—

সকল বাঁধন অঙ্গে নিয়ে
বেড়াবি স্বাধীন।

পরিশেষে একটা কথা বলে আমরা খালাস হব। কথাটা হচ্ছে এই যে "প্রবর্ত্তকের" ঐ কথাটা "নারায়ণের" পৃষ্ঠায় বিচ্ছিন্ন ভাবে পড়েই বোধ হয় যত গোলমাল ঘটেছে। "সাহিত্য" সম্পাদক যদি মাঝে মাঝেও প্রবর্ত্তকের দু'এক সংখ্যা পড়্‌তেন তবে বোধ হয় তাঁর ঐ "সাংঘাতিক সিদ্ধান্ত" আবিষ্কার কর্‌বার কোন অবসর ঘট্‌ত না।

পূর্ণযোগ

(৯)

পূর্ণ-যোগের কার্য্যপ্রণালী

আমাদের পরাপ্রকৃতি যখন আমাদের অপরাপ্রকৃতির উপর অখণ্ডভাবে খেলিতে থাকে, আমাদের প্রাকৃতস্বভাবের সমস্তখানির মধ্যে যখন ভাগবত-স্বভাব নামিয়া আসিতে থাকে, তখন উহা যে ভাবে যে প্রণালীতে কার্য্য করিতে থাকে তাহার তিনটি লক্ষণ আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। প্রথমতঃ দেখি সেখানে যথাবিহিত অকাট্য নিয়ম বা পরম্পরা কিছু নাই। বিশেষ বিশেষ যোগপ্রণালীতে আছে ধরাবাঁধা আইন, সাধক সেখানে চলিয়াছেন নিজেকে আঁটিয়া বাঁধিয়া, একটির পর একটি করিয়া স্তরের পর স্তর পার হইয়া। পূর্ণ-যোগের সাধক কিন্তু চলিয়াছেন একটা মুক্ত যথেচ্ছগতির মধ্য দিয়া। সাধনার শক্তি সেখানে কাজ করিতেছে বিক্ষিপ্তভাবে, কোন বিশেষ বিধানের মধ্যে তাহা নিঃশেষ ধরা দিতেছে না, তবুও সে শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, নিগূঢ়ভাবে তাহার উদ্দেশ্য সাধন করিতে করিতেই সে চলিয়াছে। সাধকের ব্যক্তিগত প্রকৃতি, সে প্রকৃতির মধ্যে যে সব উপকরণ হইতেছে শুদ্ধির সিদ্ধির সহায় আর যে সব অন্তরায় সেই সকল অনুসারেই শক্তি নিয়মিত পরিচালিত হইতেছে। বিশেষ যোগের সাধক-সকলকে চলিতে হইতেছে একই পথে একই ভঙ্গিমায়—সরলরেখায় ঋজুভাবে। পূর্ণযোগের সাধক নিজের অন্তঃস্থিত নিগূঢ় প্রয়োজনের বশে চলিয়াছে ঘুরিয়া ফিরিয়া, একটা উদার প্রসারের মধ্য দিয়া, আপনার সমস্ত প্রকৃতিটিকে লীলায়িত বর্ণয়িত হইয়া উঠিবার যথেষ্ট অবকাশ দিয়া। পূর্ণ-

যোগের প্রত্যেক সাধকেরই স্বতন্ত্র পথ, প্রত্যেক সাধকই স্বভাবের প্রয়োজন অনুসারে নিজ নিজ সাধন উপায় সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া সকলের মধ্যে সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া যে কিছু নাই তাহা নয়। কোন কঠিন সঙ্কীর্ণ ছাঁচের মধ্যে না ঢালিয়া ফেলিয়া, আমরা পূর্ণ-যোগেরও কার্য্যে একটা প্রণালী ধরিয়া দিতে পারি, পূর্ণ যোগেরও একটা শাস্ত্র কিছু পাইতে পারি। প্রকৃতির কার্য্যপ্রণালীতে রহিয়াছে কেমন মুক্ত স্বচ্ছন্দ গতি, সেখানে নাই জড়যন্ত্রের অলঙ্ঘ্য গতানুগতিকতা, পদ্ধতির বাধ্যবাধকতা—কিন্তু তবুও সেখানে আছে একটা নিয়ম একটা ধর্ম্ম, তবু তাহা হইতেছে উদার সূক্ষ্ম, তাহা রহিয়াছে সকল প্রকার স্বাতন্ত্র্য স্বৈরাচারকে আলিঙ্গন করিয়া, তাহা প্রাণের, ধর্ম্ম। পূর্ণ যোগের মধ্যে খেলিতেছে প্রকৃতির এই প্রাণের ধর্ম্ম।

দ্বিতীয়তঃ, পূর্ণযোগের কার্য্যপ্রণালী হইতেছে পূর্ণ অখণ্ড, সাধকের সমগ্র প্রকৃতিটি লইয়া। সুতরাং আমাদের সমস্ত অতীতের পরিণতিস্বরূপ আজ যে প্রকৃতির আধার আমরা হইয়া উঠিয়াছি, তাহার কোন প্রয়োজনীয় উপকরণই বর্জ্জিত হয় না, সবই কেবল পরিবর্ত্তিত হইয়া ভাগবত সত্তায় ভরিয়া উঠে। আমাদের মধ্যে প্রত্যেক জিনিষটিই এক মহাশিল্পী আপন হাতে করিয়া লন এবং বর্ত্তমানে অতি ক্ষীণ অস্পষ্টভাবে যে বস্তুটিকে সে প্রকাশিত করিতে চাহিতেছে, সেই বস্তুটিরই অনবদ্য মূর্ত্তি করিয়া তাহাকে গড়িয়া তুলেন। আমাদের উপলব্ধি, আমাদের দৃষ্টি যতই স্পষ্টতর পূর্ণতর হইতে থাকে ততই আমরা বুঝিতে থাকি আমাদের নিম্নতর প্রকৃতি, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আধার কোন্ কোন্ উপকরণে গঠিত, ততই দেখিতে থাকি উহার মধ্যে যত কিছুই ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, হেয়, বিকৃত বলিয়া প্রতীয়মান হউক না কেন সকলেরই মধ্যে নিগূঢ় রহিয়াছে একটা সত্য একটা বস্তু দিব্য ভাগবত প্রকৃতির মহাসামঞ্জস্যে যাহার স্থান ও কর্ম্ম যথানির্দ্দিষ্ট আছে। মানব প্রকৃতির সকল স্তরের, আধারের প্রতি অঙ্গেরই আছে একটা সত্য আত্মা সত্য ধর্ম্ম সত্য কর্ম্ম সে সকলই ফুটাইয়া তুলিয়া, তাহাতে প্রতিষ্ঠা করিয়া পূর্ণযোগ ভগবানের পূর্ণতা গড়িয়া লইতেছে।

তৃতীয়তঃ, পূর্ণযোগ আমাদের অন্তঃস্থিত ভাগবত শক্তি আমাদের সমগ্রজীবনটিকেই উপায় স্বরূপ কার্য্যে লাগাইয়াছে। আমাদের প্রত্যেক অভিজ্ঞতা, বাহ্যজগতের সহিত প্রত্যেক স্পর্শ যতই অকিঞ্চিৎকর অথবা

যতই বিপুল মারাত্মক হউক না কেন সকলকে ধরিয়া কার্য্য করিয়া চলিয়াছে। অন্তরের প্রত্যেক অনুভূতি, প্রত্যেক মর্ম্মন্তুদ যাতনা, সাধনার পথে প্রতি পদস্খলনও আমাদের সহায় হইয়াছে, সিদ্ধির দিকে অব্যর্থভাবে লইয়া চলিয়াছে। আমাদের চক্ষু খুলিয়া যায়, আমরা অনুভব করিতে থাকি ভগবান্ জগতের মধ্যে যে প্রণালীতে কার্য্য করিতেছেন, আমাদের অন্তরেও ঠিক সেই প্রণালীই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। জগতে দেখি অন্ধকারের ভিতর হইতেই আলোক বাহির করিতেছেন, দুর্ব্বলের পতিতের মধ্যেও শক্তির অভ্যুত্থানের বীজ বপন করিতেছেন, যাহা দুঃখদায়ক যাহা কষ্টকর তাহাকেও আনন্দের উৎস করিয়া গড়িতেছেন। প্রাকৃত জগতে যাহা দেখি, আধ্যাত্মিক জগতেও দেখি সেই একই লীলাভঙ্গিমা। তবে প্রাকৃতজগতে শক্তি কার্য্য করিতেছে অতি ধীরে, অজ্ঞানতঃ আর অপরটিতে শক্তি ক্ষিপ্র, জাগ্রত চেতনাময়, স্ব যে সে চিনিয়াছে স্বীকার করিয়াছে স্বামীকে প্রভুকে।

বিশ্বজীবনই হইতেছে প্রকৃতির যোগ। প্রকৃতির চেষ্টা আপনার মধ্যে নিগূঢ় ভগবানকে প্রকটিত করিবার জন্য। এই বিশ্বপ্রকৃতির আপনাহারা চেষ্টা মানুষের মধ্যে যখন সচেতন আত্মজ্ঞানে পূর্ণ হইয়া উঠে, আপন উদ্দেশ্যকে যথাযথ পরিপূর্ণ করিবার সামর্থ্য যখন তাহার জন্মায় তখনই আমরা প্রাকৃতিক স্তর হইতে উঠিয়া গিয়াছি আধ্যাত্মিক স্তরে, তখন প্রাকৃতিক শক্তির স্থানে আবির্ভূত হইয়াছে যোগ-শক্তি। প্রকৃতির মধ্যে যে শক্তি বিক্ষিপ্ত অসংবদ্ধ স্তিমিতপ্রবাহ অথচ বিপুল সর্ব্বব্যাপী তাহাকেই একত্র একমুখী চক্ষুষ্মান্ করিয়া কার্য্য করিতেছে পূর্ণযোগশক্তি।

বাঙ্গালী সৈনিক

জীবনটা খেলা বটে, কিন্তু সেটা যে নিতান্ত ছেলেখেলা নয়; সেটা যে এখন আমাদের সামনে এসে রয়েছে একটা সাধনা, একটা কঠোর তপশ্চর্য্যা, একটা রক্তপূত সংগ্রামেরই রূপ—এই সরল কথাটা আমরা যদি মনের

ভিতর জীবন্ত জাগ্রত করে সর্ব্বদা ধারণ করে না রাখতে পারি, তা'হলে আমরা মানুষ হয়ে উঠ্‌তে পার্‌বো না। সে আর খুব অনেক দিন না হলেও, দেখ্‌তে দেখ্‌তে বৎসরাধিক কাল হয়ে গেল—ক্ষুদ্র এক দল নবীন উৎসাহভরা লোক গৃহ, পরিজন, ছোট ছোট স্নেহমমতার পাশ টান দিয়ে ছিঁড়ে, কি জানি কোথাকার কোন্ অজানা আকুলকরা সুর শুনে তারই অনুসরণ করে ছুটে বেরিয়ে পড়েছিল। তারা ক্ষুদ্র ছিল বটে, কিন্তু তারা যে তুচ্ছ কিছুতেই নয় এটা কে তাদের গা থেকে শতাব্দীর জড়তা-মাখান ধূলি আবর্জ্জনা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, প্রাণে প্রাণে হেঁকে বলে দিয়েছিল তাই তারা পিছন দিকে তাকায়নি, পিছনের পুতুল খেলা পিছনেই ফেলে রেখে, এক রকম দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়েই যেন, গত-জীবনের ভালমন্দ সমস্তের উপর বুদ্ধের কথামত একটা দীর্ঘ পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল অকূল সে কিসের বুকে? একটা কঠিন কঠোর, একটা দারুণ নির্দ্দয়, একটা নির্ম্মম সংগ্রামের বুকে—সে সংগ্রাম অন্তরে, সে সংগ্রাম বাহিরে। সেই অতি নিষ্ঠুর তপঃসাধনাকেই জীবনের সর্ব্বস্ব, একমাত্র সম্বল করে সেইদিন বেড়িয়ে পড়েছিল সেই ছাব্বিশ জন বাঙ্গালী সেনা।

কিন্তু প্রথম আঘাতটাই আধখানা যুদ্ধের মত হলেও, মনুষ্যত্ব জয়যুক্ত হয়ে ওঠে না একদিনেই। স্থূল রক্তমাংসের যে যুদ্ধ, যাতে অসংখ্য নালিকা-মুখের ঘনঘোর অগ্নিগোলকবর্ষণে জল স্থল আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, কোটী কোটী নৃকঙ্কালে রণভূমি বীভৎসরকমে উর্ব্বর হয়ে উঠ্‌ছে, এক-একটা দিনের রণব্যয় নির্ব্বাহ কর্‌তে গিয়ে জলস্রোতের মত অজস্রধারে অর্থরাশি অগ্নিমুখে বারিগর্ভে আহুতি দেওয়া হচ্ছে তারই একটা সুস্পষ্ট বিজয়ের সম্ভাবনা পর্য্যন্তও আজও দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠ্‌ছে না---তা এই সকল কর্ম্মের, সকল সংগ্রামের, সকল সিদ্ধির মূল কর্ম্ম, সংগ্রাম, সিদ্ধি---সেটা আসা কত দূরের, কত দুরূহ কথা। আমাদের মানুষ হতে হবে, এই সোজা কথাটা সব সময়ে সমান গৌরবে সমান ভাবে উঁচু করে ধরে থাকাটাই কত শক্ত! নীচে থেকে যখন বাসুকী সহস্র ফণা নাড়া দিয়ে উঠেন, ইন্দ্রিয়গুলার লেলিহান জিহ্বা যখন লক্ লক্ করে লোলুপদৃষ্টিতে ব্যগ্রভাবে ভোজ্য অন্বেষণে ছুটে চলে, যখন চারিদিকে ভোগের সামগ্রী, বিলাসের মদিরা, নায়িকা মায়াবিনীর লোল-কটাক্ষ থরে থরে মোহিনী মায়ার ফাঁদ

বিস্তার করে, অজগরের মত মরণ শ্বাসের দুস্ত্যাজ্য আকর্ষণে অসহায় মানুষটাকে টান্‌তে থাকে, হায়! তখন কত, কত শক্ত তার পক্ষে মনে রাখা, যে সে মানুষ যে, মানুষ—সে মানুষের মত মানুষ হতেই চলেছে, সে মনুষ্যত্বের মহাব্রত নিয়েই কর্ম্মসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, সয়তানের শত প্রলোভন বীরদর্পভরে বিদলিত বিমর্দ্দিত করে', তাকে যে সেই মানুষের মত খেলাই জীবনে খেল্‌তে হবে যে মানুষের কাছে 'আগুন তার খেলার জিনিষ, মৃত্যু তার পায়ের দাস,' যে মৃত্যুঞ্জয়ী মানুষ একভাবে অমর দেবতাগণের চেয়েও বড়। শুধু কি তাই? যখন অবসর বুঝে ক্ষুদ্র নীচ স্বার্থ মনকে ছেয়ে ফেলে দেয়, মানুষকে ভুলিয়ে দেয় যে ভ্রাতার সঙ্গে ভ্রাতার, সখার সঙ্গে সখার যে নির্ম্মল পবিত্র মধুর স্বর্গের সম্পর্ক, তাকে হিংসার, বিদ্বেষের গরল দিয়ে বিষাক্ত করে তুল্‌লে তাতে যে শুধু নিজের হৃদয়েই অশান্তির বহ্নিজ্বালা জ্বলে উঠে ছারখার করে দিতে থাকবে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে একটা সজাগ বিস্ফারিত-নয়ন জগতের সাম্‌নে বিদেশীদের কাছে একটা প্রাচীন নবজাগ্রত মহাজাতির উন্নত নির্ম্মল ললাট বিদ্রূপের কলঙ্কে লাঞ্ছিত করে' অবনত করাও হবে। হায়, হায়, জীবনের তুফানে পড়ে, দুর সমুদ্রে পাড়ি দিতে গিয়ে, কত শক্ত প্রেমের ধ্রুবতারার পানে অচঞ্চলদৃষ্টিতে চেয়ে থাকা, পরস্পরের ধুলামাটি আপনারই অঙ্গ অঙ্গের মলিন আবর্জ্জনা বলে গায়ে মেখে নিয়ে উমানাথশঙ্করের মত ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা নিয়ে অকম্পিত অস্খলিত চরণে কর্ত্তব্যের পথে চলা।

তাদের মনুষ্যত্ব জয়যুক্ত হবে সেইদিন, মহা আহবে একদিন যারা মহোল্লাসভরে নেমেছিল, তাদের সত্য বিজয়-গৌরব-লাভ হবে সেইদিন, যেদিন তারা এই শক্ত, অতি শক্ত কথাটা মনে রাখ্‌তে পারবে, যে মানুষ তারা মানুষ। দেবতারা জয় দুন্দুভি বাজিয়ে আনন্দের রাজ্য পৃথিবীতে পেতে বস্‌বে সেইদিন, সাধক যখন স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে পদাঘাতে দূর করে দেবে অবিদ্যার মোহিনী বাহিনীকে, নীলকণ্ঠের মত, ভিতরের বাহিরের, আপনার অপরের সকল কলুষ কালিমা গরলরাশিকে গলাধঃকরণ করে ফেল্‌বে, ভারতবর্ষের মহাদেবতা তাঁর গূঢ় মর্ম্মবাণী দূর দূরান্তের দেশে ব্যক্ত হ'য়ে আসুক যদি ইচ্ছা করে থাকেন, তবে তাহা সফল হইবে সেইদিন।

সাধক ৺নলিন চন্দ্র

"যোগস্থ, কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়"—গীতার এই যোগোপদেশ ভারতের মজ্জায় মজ্জায় যেমন দৃঢ়প্রতিষ্ঠ এমন আর কোথাও নহে। ভারতের সাধনাই যোগস্থ হওয়া; যোগযুক্ত না হইয়া কেহই সর্ব্বানন্দলোকের অধিকারী হয় না। আর অন্ততঃ এই অধঃপতিত বাংলাদেশে নিতান্ত দুর্ব্বল সঙ্কীর্ণচিত্ত পিতার ঔরসে, ভীষণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন জননীর গর্ভে, যে সকল সন্তান জন্মগ্রহণ করিতেছে তাহারা বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কেমন করিয়া উদার ধর্ম্মের পথে অনুরাগী হইয়া উঠিতেছে তাহা দেখিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই আশ্চর্য্য হইতেছেন—কিন্তু বস্তুতঃ আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই। ভারতের এই উন্নতিযুগে যোগসিদ্ধ ঋষিগণ বর্ত্তমানে অসিদ্ধ ক্ষেত্রেই আগমন করিতেছেন; স্থান কাল এবং পারিপার্শ্বিকের শোচনীয় বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াই তাঁহাদিগকে নূতন আনন্দরাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে। যাঁহারা বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন তাঁহারা জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগের মত শ্রান্তকলেবর বর্জ্জন করিয়া আবার উত্তমক্ষেত্রের সন্ধানে ধাবমান। এইরূপ একটী ঘটনা আজ আমাদিগকে নিদারুণরূপে ব্যথিত করিতেছে। আর্য্যপ্রবর্ত্তিত ও "প্রবর্ত্তক" প্রচারিত নূতন সাধনায় একনিষ্ঠ সাধক শ্রীমান্ নলিনচন্দ্র রক্ষিত গত ২১শে আশ্বিন শনিবার কৃষ্ণাত্রয়োদশী তিথি রাত্রি ৮ ঘটিকার সময়ে "জয়কালী" "জয়কালী" বলিয়া ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। নলিনচন্দ্র কিশোর বয়স হইতেই শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ-সঙ্কল্প করিয়া অহঙ্কারের সহিত ক্রমাগত সংগ্রাম করিতেছিলেন। কলেজের পড়া সমাপ্ত করিয়া তিনি চিকিৎসক হইয়া বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের পরম আনন্দের কারণ হইয়াছিলেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্টের বেতনভোগী হইয়া যশোরের গ্রামে দরিদ্রগ্রামবাসীর রোগের চিকিৎসার জন্য প্রেরিত হন। সেখান হইতে দুর্দ্দম ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত হইয়া বাটী ফিরিয়া আসেন। এই দুইবৎসর দারুণ রোগাধিকারে কতবার বলিয়াছেন, যে এ শরীর ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, শীঘ্রই নূতন শরীরের আবশ্যক। কবিরাজী চিকিৎসায় তিনি বেশ সারিয়া উঠিতেছিলেন, কিন্তু বিধাতার অলঙ্ঘ্যবিধানে সহসা নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া পিতামাতা ভ্রাতা বন্ধু পত্নী প্রভৃতির অঙ্কে নলিনচন্দ্র ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। মরণের দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে নলিনচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল "নলিনচন্দ্র, তুমি বাঁচিবে কি"? তিনি সগর্ব্বে উত্তর দিলেন "আমি যোগী, আমার ইচ্ছা মরিতে, অতএব এবার মরিব, কিন্তু আবার শীঘ্রই আসিতেছি—নূতন শরীর, নূতন উৎসাহ আনিব, সম্মুখে কি আলো, কি উজ্জ্বল দৃশ্য!" মরণের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নলিনচন্দ্রের চৈতন্য বর্ত্তমান ছিল। বন্ধুবান্ধবগণের তারস্বরে সচ্চিদানন্দময়ী কালীনাম শ্রবণ করিতে করিতে তিনি দিব্যধামে গমন করিয়াছেন। নলিন চন্দ্র আবার আসিবেন—অতএব শোকের কারণ নাই।

প্রবর্ত্তক—২য় বর্ষ, ২১শ সংখ্যা।

“সন্ধা”র আত্মহত্যা

শচীন্দ্র চন্দ্র আত্মহত্যা করিয়াছে। জ্যোতিষ চন্দ্রের মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ দেখা গিয়াছে—তিনি বহরমপুরে। আর যাহারা আত্মহত্যা করে নাই বা পাগল হইয়া যায় নাই অন্তরীণ অথবা কারাবাসের ফলে তাহাদের কেহই যে বিদ্যাবুদ্ধি হারাইয়া, মনের তেজ শরীরের বল খোয়াইয়া জড়ভরত বা পশুবৎ হইয়া পড়িবে না সেটাও খুবই অস্বাভাবিক। দেশের আশাস্থল যাহারা সেই যুবকমণ্ডলীর মধ্যে এইরকম একটা মড়কের প্রাদুর্ভাব হইলে দেশের যে কি ক্ষতি তাহা ভাবিয়া আমরা শিহরিয়া উঠিতেছি। দেশের যুবকহৃদয়েই দেশের প্রাণ, দেশের ভবিষ্যৎ সেখানে যদি এতটুকু পক্ষাঘাতের চিহ্ন দেখিতে পাই তবে অজ্ঞাতসারেই আমাদের চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইতে চায়।

কারণ আমরা বিশ্বাস করি না এই যে আত্মহত্যাদি ঘটিতেছে তাহা এখানে ওখানে পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধশূন্য দুই একটি ঘটনা মাত্র, শুধু একটা ব্যক্তিগত বিকৃত মেজাজের ফল। আমরা মনে করি এ সকল ঘটনা একটা সাধারণসূত্রের সাথে গাঁথা—দুই একটি বিচ্ছিন্ন আকস্মিক দুর্ঘটনা মাত্র নয়। ভগবান না করুন, দেশের অবস্থা, যুবকসকলের হৃদয়ের ভাব যদি বর্ত্তমানে যেমন আছে তেমনি থাকে তবে এইটিই যে সাধারণ ও স্বাভাবিক নিয়ম হইয়া উঠিতে পারে তাহাও একেবারে অসম্ভব কিছু নয়। তাই আমরা সকলকেই আহ্বান করিতেছি, যুবকদের অভিভাবক, দেশের নেতা ও গবর্ণমেণ্ট সকলকেই এই বিষয়টি বিশেষরূপে ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

আমরা দেখিতেছি বাংলার যুবকমণ্ডলীর মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে একটা সদভিলাষ, উচ্চাকাঙ্খা, আত্মপরতার এমন কি নিজের সংসারখানি লইয়া যে গণ্ডী তাহার সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া দশের, দেশের, বিশ্বের উদার কর্ম্মক্ষেত্রে আপনাকে ছড়াইয়া দিবার অধীর আবেগ। হইতে পারে সেজন্য অনেকে সৎপথটি ধরিতে পারে নাই, বিপথের কুপথের “আর”

অনুচরবৃন্দ তাহাদের কাহাকেও ভুলাইয়া লইতে পারিয়াছে। কিন্তু যাহারা এইরূপে পথখানি ভুলিয়াছে তাহারা সেরূপ বোধ করে না। আর এমন অনেক আছে—আর ইহাদের সংখ্যাই বেশী বলিয়া আমরা মনে করি—যাহারা বাস্তবিকই সৎপন্থাটি ধরিতে পারিয়াছে, যাহারা চাহিতেছে মহত্তর উদারতর জীবন কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতার পথে যাইয়া পড়ে নাই। তাই যখন তাহারা দেখিতেছে জীবনের গণ্ডী সঙ্কীর্ণ, তাহাদের প্রাণের খাদ্য মিলিতেছে না, কর্ম্মের উদারক্ষেত্র জুটিতেছে না, একে একে আকাশকুসুম সব ঝরিয়া পড়িতেছে, ব্যর্থতার যবনিকা আসিয়া তাহাদের সব গ্রাস করিতেছে, তখন নিরাশায় তাহারা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে—কেহ আত্মহত্যা করিয়া মুক্তজীবন পাইতে চাহিয়াছে, কেহ পাগল হইয়া ব্যর্থতার বৃশ্চিকজ্বালা এড়াইয়াছে আর কেহ পশু বা পাথর হইয়া শান্তি পাইয়াছে।

তাই আজ যাহারা অন্তরীণে, কারাগারে, দ্বীপান্তরে তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া, তাহাদের আশা আকাঙ্খা কর্ম্মপিপাসা চরিতার্থের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্রটি উন্মুক্ত করিয়া—দেশের যুবকমণ্ডলীকে পিষিয়া নয়, ছাড়িয়া দিয়া, সৎপথে সৎকার্য্যে মহত্তর জীবনে চলিবার পূর্ণ অবকাশ দিয়াই যে রাষ্ট্রের সমাজের দেশের মঙ্গল কিনা তাহা রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিগণ দেশনেতৃগণ অনুধ্যান করিয়া দেখিবেন। আমাদের সে সম্বন্ধে কিছু বলিবার নাই। গবর্ণমেণ্টের যাহা কর্ত্তব্য, নেতাদিগের যাহা কর্ত্তব্য তাহা তাঁহারা বুঝিবেন। বিষয়টি আমরা অন্যদিক দিয়া দেখিব এবং দেশের যুবকমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করিয়া কয়েকটি কথা বলিব।

ব্যক্তির জীবনে যেমন সাধনা আছে, সমষ্টির জীবনেও তেমনি সাধনা আছে। ব্যক্তির সাধনায় যেমন উত্থান পতন প্রত্যবায় আছে, সমষ্টির সাধনাতেও তেমনি উত্থান পতন প্রত্যবায় আছে। ভবিষ্যৎ-বাঙ্গালীর সমষ্টিজীবন একটা বিরাট কঠোর সাধনার মধ্য দিয়া চলিয়াছে। শচীন্দ্র তাহার পিতার নিকট যে পত্রখানি লিখিয়াছে তাহাতে নব্যবাঙ্গলার অন্তরের সমস্ত চিত্রখানিই প্রতিফলিত হইয়াছে। শচীন্দ্র যাহা লিখিয়াছে তাহা শচীন্দ্রের কথা নয়, তাহা আজকার নব্যবাঙ্গলার প্রাণের কথা, সাধনার যে সঙ্কটস্থলে সে দাঁড়াইয়াছে তাহারই যথাযথ প্রতিকৃতি। সে কথাটি কি? তাহা হইতেছে রাজসিক আবেগের ব্যর্থতা, ঘোর তমের মধ্যে অশুদ্ধ রজের পরিনির্ব্বাণ। বাঙ্গালা রাজসিক প্রবৃত্তি লইয়া উঠিয়াছিল, তাহার কর্ম্মস্পৃহা

জলিয়া উঠিয়াছিল এই রজঃশক্তির তীব্ররাগে। সে রাজসিক প্রবৃত্তি ক্রমে হইয়া উঠিল আসুরিক। এই আসুরী উত্তেজনা পরিশেষে কিরূপে আপনাকে ব্যর্থ অসমর্থ নিরাশ বোধ করিতেছে তাহাই দেখাইতেছে শচীন্দ্রচন্দ্র। অশুদ্ধ রজঃশক্তির পরিণতি চিরদিনই তমঃ, নিধন, লয়। অশুদ্ধ রজঃশক্তির পীঠস্থান ইউরোপ আজ এই কথারই সাক্ষ্য দিতেছে, শচীন্দ্রচন্দ্রও বাঙ্গলার অশুদ্ধ রজের ভারখানির নীচে পিষিয়া গিয়াছে।

রাজসিক আবেগের ধর্ম্ম এই যে সে চায় বাহিরের একটা কিছু ধরিয়া চলিতে আর বাহিরের এই আশ্রয়স্থলটি সে যদি কোনরূপে হারাইয়া ফেলে তবে সে আর থই পায় না, তাহার সব শক্তি কোথায় অন্তর্হিত হয়—আর সে দাঁড়াইতে পারে না। শচীন্দ্র তাহার পিতাকে মন্তেগু সাহেবের উপর কোন ভরসা করিতে নিষেধ করিতেছে। কিন্তু সে নিজেও ত আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে অতিমাত্র বাহিরেরই জিনিষের উপর। বন্ধুবান্ধবদের সাথে তার মেল মেশা নিষেধ, লাইব্রেরীতে যাওয়া নিষেধ, কলেজে পড়া নিষেধ, লোকের চোক্ষে সে অকর্ম্মণ্য—তাই না তার জীবন দুর্ব্বহ? কিন্তু এ সকলই যে বাহিরের। বলি না, এ সকলের কোনই দরকার নাই, মহৎজীবনের সাধক যে তাহাকে এ সব উপকরণ ত্যাগই করিতে হইবে, তুচ্ছই করিতে হইবে। মোটেও নয়। কিন্তু এসব সব নয়, এসব প্রধান নয়। "আত্মানং বিদ্ধি"। শচীন্দ্র তুমি বিত্তের আকাঙ্খা করিয়াছ কিন্তু মৈত্রেয়ীর মত বলিতে পার নাই "যে সকল জিনিষ আমাকে অমৃতত্ব দিতে পারে না সে সব লইয়া আমি কি করিব"? কি আসে যায় বিশ্ব হইতে তুমি যদি বাহ্যতঃ পৃথক হইয়া পড়, আলো আকাশ বাতাস সৃষ্টির ঐশ্বর্য্যরাজি তোমার চোখে লুপ্ত হইয়া যায়, পৃথিবীর গভীর গহ্বরে তুমি সমাধিস্থ হও? জানিও সকল ঐশ্বর্য্য সকল শক্তি সকল কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা তোমার অন্তরেই। সেই প্রতিষ্ঠা, সেই মূল উৎস খুঁজিয়া পাও। তারপর দেখিবে ব্যর্থতা বলিয়া কিছু নাই সবই চলিয়াছে, সার্থকতার দিকে। আত্মার মধ্যে যদি প্রতিষ্ঠিত হও তবে দেখিবে সব বন্ধন তোমার টুটিয়া গিয়াছে, অন্তরীণের বন্ধন ত তুচ্ছ স্থূল--তবুও সময় আসিলে সে বন্ধনটিও কাটিয়া তোমার ভাগবত কর্ম্মশক্তি বাহিরে ছুটিয়াছে।

নব্য বাঙ্গালা চাহিয়াছিল শক্তি, চাহিয়াছিল বীর্য্য, চাহিয়াছিল কর্ম্মপ্রেরণা। সে শক্তি, সে বীর্য্য, সে কর্ম্মপ্রেরণা অবতীর্ণ হইয়াছে। অবতীর্ণ হইয়াছে কিন্তু পুরাতন, কত শতাব্দীর সংস্কারজীর্ণ আধারে। তাই

দেখিতেছি অনেক স্থলে আধারটী সে শক্তির ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। বাংলার যুবকমণ্ডলীকে এখন শুদ্ধসত্ত্ব হইতে হইবে, তাহার আধারের চাই ধারণ-সামর্থ্য। শুধু ব্যাপ্ত নয়, বিক্ষিপ্ত করিয়া নয়, নিজের মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শক্তিকে ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা পাইতে হইবে—আধার হইবে "আপূর্য্যমানং অচলপ্রতিষ্ঠং"। তবেই সে শক্তি সুপথে ধীর স্থির অটুট প্রেরণায় প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে। অন্ধভাবে ছুটিয়া চলিবার রোখটি সমাহিত করিতে হইবে, বাহির হইতে টানিয়া তাকে ভিতরের দিকে চালিত করিতে হইবে। কর্ম্ম চাই, মহান আয়াস চাই, সুবিপুল জীবন চাই কিন্তু সে জন্য সর্ব্বপ্রথম এইটি দরকার যে এ সকলকে ক্ষেত্রের অন্বেষণে বাহিরে ছুটিতে না দিয়া, তাহাদের মুখ ফিরাইয়া, তাহাদের রশ্মিপাতে অন্তরাত্মার নিগূঢ় প্রতিষ্ঠাকে, ভগবানের দিব্যভাবকে জাগরুক করিয়া ধরিতে পারি। দিব্যজীবনের গঠন আরম্ভ সেইখান হইতে—সেইটি ধরিতে পারিলে আর মোহ নাই, আর শোক নাই, আর ব্যর্থতা নাই।

আদর্শ কর্ম্মী যিনি, জগতে বীরব্রত যাঁর তাঁহাকে একদিকে সন্ন্যাসীর মতনই হইতে হইবে নিরালম্ব, তিনি কিছুরই অপেক্ষা করিয়া রহিবেন না। বাহিরের জগৎ যদি তাঁহার দৃষ্টি হইতে মুছিয়া যায় তাঁহার কোন দৃক্পাত নাই—এমন কি অন্তরের উপলব্ধি যদি ক্ষণতরে তমসাবৃত হইয়া আসে, ভগবানও যদি অন্তর্হিত হন, তবুও তিনি বিচলিত নহেন, অন্তরের বাহিরের সকল বিপর্য্যয়ের মধ্যেও কি একটা অপরূপ স্থৈর্য্যে শান্তিতে শ্রদ্ধায় তিনি সুপ্রতিষ্ঠ, মন প্রাণ দেহ বিধৃত এক দিব্য উদাসীনতায়। অন্তরের অন্তরে যিনি নিরালম্ব, যিনি উদাসীন তিনিই শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া উঠিতেছেন, তাঁহারই জন্মিতেছে অপার ধারণ-সামর্থ্য, পূর্ণশক্তি তাঁহারই মধ্যে প্রকট হইবার অবসর পাইয়াছে। যাঁহার আত্মরতি, কর্ম্মে যাঁহার তৃষ্ণা নাই তাঁহারই বিষয়ভোগ, ঐশ্বর্য্য লাভ, তাঁহারই কর্ম্মের জীবনের বিশুদ্ধ আপূর্ণ অবাধ তরঙ্গায়িত লীলা।

নিত্যের খেলা

জীবনের দু রকম খেলা—প্রথম খেলা অনিত্যের আর দ্বিতীয়টী নিত্যের। পৃথিবীর পনের আনা তিন পাই এই অনিত্যের খেলায় মেতে আছে। বালকবালিকাগণ যখন খেলাঘর পেতে বসে—তাদের খেলা যখন খুব জমে উঠে, তখন পিতামাতার আহ্বান শুনেও তারা সে খেলা ভাঙতে পারে না, খেলাঘর ছেড়ে যেতে চায় না। সেই রকম আমরা অনিত্যের খেলায় এমনি মজেছি যে জীবন মরণের অনতিক্রমণীয় বাধার মধ্যে কোটী কোটী বার ঘুরে মরচি অথচ এই তুচ্ছ খেলার সংস্কার পরিহার কর্‌তে পারছি না। নিত্যের মধুর আহ্বানে কর্ণপাত করি না—একই চক্রে কত জন্ম আর ঘুরবো ?

* * *

সাধককে একবার মরে যেতে হবে। এই মরা শরীর ছেড়ে যাওয়া নয় কেননা সে রকম ত বহুবার মরেছি—সে মরায় ত ফলোদয় নেই। এবার জ্যান্তে মরা হতে হবে, ধান্য সিদ্ধ হলে যেমন তার অঙ্কুর উদগমের শক্তি থাকে না, সেইরূপ জীবনের সংস্কারগুলিকে পুড়িয়ে ছাই করতে হবে, আমার আমার বলে যে একটা অভিমান আছে, সেটাকে একেবারে ধ্বংস করে ফেল্‌তে হবে। বাহিরের আবরণটার কোনরূপ অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন না ঘট্‌লেও ভিতরের সামগ্রীগুলির রূপান্তর হওয়া চাই, তাদের পূর্ব্ব স্বভাবের আমূল পরিবর্ত্তন কর্‌তে হবে, আমি এইরকম মরণকেই আহ্বান করছি।

* * *

‘আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল’। এই আমির মরণ হলেই নিত্যের খেলা আরম্ভ হবে। নিত্যের খেলার নিদর্শন আছে। অনিত্যের খেলায় মানুষ যেমন কখন হাসে কখন কাঁদে কখন ভালবাসে, কখন হিংসা করে, কখন উৎসাহ প্রকাশ করে আবার কখন বা অবসাদগ্রস্ত হয়, নিত্যের এমন অসদৃশতা দেখা যায় না—যে খেলায় অপূর্ব আনন্দ, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, একটানা আনন্দ, জীবনে আনন্দ, মরণে আনন্দ, নিদ্রায় আনন্দ,

সুখ্যাতিতে আনন্দ, ঐশ্বর্য্যে আনন্দ, দারিদ্র্যে আনন্দ—এমনই আনন্দলহরী যখন জীবন মাঝে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌বে তখনই বুঝ্‌বে তোমায় জীবন নিয়ে নিত্যের খেলা আরম্ভ হয়েছে।

* * *

নিত্যের খেলায় সচ্চিদানন্দময়ী মা জেঁকে বসেন। তখন জীবনটা হয় ক্রীড়নক, মায়ের আনন্দের অভিব্যক্তিস্বরূপ ইহার গতি, তাই এই নিত্য-লীলায় নিরানন্দ থাক্‌তে পারে না, প্রতি ঘটনার মধ্যেই আনন্দের আভাস থাকে, এই আনন্দের উচ্ছ্বাসেই তখন জীবের কর্ম্মপ্রবৃত্তি জেগে উঠে। বাসনা অহংকারেরই সহচর, অহংকারের বিনাশেই বাসনা কামনা নষ্ট হয়ে যায়, ভগবদ্ উদ্দীপনাতেই সাধক তখন সংসারে বিচরণ করে, সংসারের ভালমন্দ সবের ভিতরেই সে পাঁকাল মাছটীর মত নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করে।

* * *

কি এসে গেছে যদি তিনি আমার মত একটা যন্ত্রকে চিরদিন অকর্ম্মণ্য ভাবে সংসারের এক কোণে ঠেলে রেখে দেন? আমার অহংকার থাক্‌লেই, এই অবস্থার প্রতিকূলে যাবার জন্য একটা উদ্ভট প্রচেষ্টা করবো কিন্তু যদি জীবনে নিত্যের সন্ধান পাওয়া গিয়ে থাকে, তা হলে বুঝবো এই তাঁর লীলা, এই তাঁর ইচ্ছা—ইহাতেই তাঁর আনন্দ। পৃথিবীর একটা পরমাণুর পশ্চাতেও যখন তাঁর শক্তি অবস্থান করে' তাকে একস্থান থেকে অন্যস্থানে নেড়ে নিয়ে যাচ্ছে তখন আমার তোমার কথা ছেড়ে দাও। হে সাধক, একবার মরে যাও. জীবনের বোঝা বয়ে' বয়ে' পঙ্গু হয়ে গেলে। ভগবৎ-শক্তির হাতে সর্ব্বস্ব ছেড়ে দিয়ে অপেক্ষা কর, লক্ষ্য কর তিনি তোমায় কি ভাবে কোথায় নিয়োগ করেন।

* * *

আমরা কোন আদর্শের দাস নই, কোন বিশিষ্ট কর্ম্মের অধীনতা স্বীকার করি নাই, গতানুগতিক পন্থার যতবড় প্রবল আকর্ষণই হউক না তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছি সর্ব্ব নিয়ন্তা মায়ের দিকে, নাই হোক আমার জীবন দিয়ে জগতের কোন মহৎ কার্য্য—আমি আজ যেমন দাঁড়িয়েছি এমনি অচল হিমাদ্রির মত মায়ের মুখ পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌বো একটি আদেশের প্রতীক্ষায়—কোটী জন্ম যদি অপেক্ষাই কর্‌তে হয় তাহাতেও আমার ক্ষতি নাই, জগতের যাবতীয়

বাধা যদি আমায় ফিরে যেতে জোর করে, এই পার্থিব অবয়ব না হয় কোটী কোটী বার একই ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ত্যাগ করবো আবার গ্রহণ করবো। আমার বিশ্বাস, আমি পরিপূর্ণ ভাবে যে দিন মর্‌তে পারবো, ঠিক সেই দিনই আমার জীবন নিয়ে মায়ের খেলা আরম্ভ হবে, আমি এই খেলাটাকেই নিত্যের খেলা বল্‌ছি।

* * *

এই মায়ের খেলা নিত্যের লীলা, এই দেবজীবন লাভ কর্‌বার জন্য আজ পৃথিবীর মাতৃভক্ত প্রত্যেক সন্তানকেই তপস্যা কর্‌তে হবে। এই বিরাট তপঃক্ষেত্রে পৃথিবীর সকল জাতির স্থান আছে, জগৎজুড়ে যে দেব-জাতি গড়ে উঠ্‌বে তার মধ্যে পৃথিবীর কোন বাঁধনই থাক্‌বে না। এখানে বালক বৃদ্ধ যুবা, পুরুষ নারী সকলেরই সমান অধিকার। এই মর্ত্ত্যধাম, যেখানে ভগবানের চরম বিকাশ ফুটে উঠেছে, সেইস্থান থেকে অব্যাহতি লাভ কর্‌বার জন্য বিগত কয়েক শতাব্দীর সাধকগণ তপস্যা করেছেন, এ পৃথিবীতে পুনরাগমন না কর্‌তে হলেই তাঁরা পরম পুরুষার্থ লাভ কর্‌লেন এই রকম মনে করেছেন আর আমরা এই পৃথিবীকেই এমন ভাবে গড়ে তুল্‌বো যেমন জন্মভূমি পরিত্যাগ করে প্রবাসে যাবার সময় মানুষ কেঁদে আকুল হয় তেমনি এ পৃথিবী ছাড়তে তাদের ক্লেশ হবে, তারা বল্‌বে 'আজ মর্‌ছি কাল যেন আবার এ জগতে জন্ম গ্রহণ করি'। আমি যে কান্নার কথা, টানের কথা বল্‌ছি, ইহা মায়ার টান নয়, ইহা লীলার টান, নিত্যের টান যেখানে রূপে রসে গন্ধে ভগবানকে সর্ব্ব ইন্দ্রিয় দিয়ে মধুর ভাবে ভোগ করা যায়।

* * *

বন্ধুগণ! এস, ইহজীবনকেই এমন ভাবে গড়ে তুলি যেন ইহা দেবতার লীলাক্ষেত্রস্বরূপ হয় আর এই পৃথিবী, ইহা যেন লীলাময় জগদীশ্বরের সুপবিত্র শ্রীবৃন্দাবনে পরিণত হয়। পূর্ণলীলার ইহাই যে উপযুক্ত ক্ষেত্র।

সাধকের পত্র

স্নেহের ভাইটী,

তুমি একটা কিছু করিতে চাহিতেছ। চুপ করিয়া বসিয়া থাকা তোমার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কি যে করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিতেছ না। যাহাতে হাত দিতে যাইতেছ মনে হইতেছে তাহা অতি ক্ষুদ্র নগণ্য কাজ—তোমার অন্তরাত্মার সাথে কেমন যেন খাপ খাইতেছে না। মনের মত কাজ কিছু খুঁজিয়া পাইতেছ না। কিন্তু দেখিতেছি গোড়াতেই একটা মস্ত বড় ভুল ধারণা লইয়া তুমি আরম্ভ করিয়াছ। এই কথাটি মনে গাঁথিয়া রাখিও "করা"টাই জীবনের মূল কথা নয়, মূল কথা হইতেছে "হওয়া"। আগে একটা কিছু "হও", "করা" আপনিই আসিবে। "করা" হইতেছে "হওয়া"র ফল, তাহার সহজ বিকাশ বা পরিণতি। তুমি কি হইয়াছ, কতখানি হইয়াছ তাহার উপরই নির্ভর করিতেছে তুমি কি করিবে, কতখানি করিবে। "হওয়া" হইতেছে অন্তরে অন্তরে গড়িয়া ভরপুর হইয়া উঠা। তোমার অন্তরাত্মা কাহার সহিত মিশিয়া গিয়াছে, কোন্ সার বস্তু জড়াইয়া ভরাট হইয়া রহিয়াছে কতখানি সুগভীর দুর বিস্তৃত বোধ করিতেছে তাহাই তোমার "হওয়া"। জগতের এই একটা খুব মস্ত সাধারণ ভুল যে মানুষকে সে বিচার করে তার কর্ম্ম দেখিয়া। কি করিতেছ, কি করিতে পারিলে বা না পারিলে তাহাই যেন মানুষত্বের পরিমাপ। জগতের অবশ্য অন্য কোন মানদণ্ড নাই। কারণ সে দেখিতে পারে কেবল বাহিরের জিনিষ, অন্তরে প্রবেশ করিবার তাহার সামর্থ্যও নাই, অবসরও নাই। কিন্তু তুমি সাধক, তোমাকে সেরূপে চলিলে হইবে না। কি কর বা না কর, বাহিরে তুমি অকর্ম্মা বা নিষ্কর্ম্মা এমন কি বিকর্ম্মাই হও না কেন তাহাতে খুব আসে যায় না। ঠিক কোন্ কাজ করিতেছ, কতখানি করিতেছ তাহা দিয়া তোমার উন্নতি, তোমার ক্ষমতা, তোমার মহত্বের বিচার করিও না। এ সকল জিনিষ খুব সূক্ষ্ম, ইহাদের বীজ অন্তরে অন্তরে, ক্রমে ক্রমে উহা বাড়িতে থাকে—ধীরে ধীরে লোকচক্ষুর অগোচরে, তোমার নিজেরও অগোচরে।

তুমি এখানে আপত্তি তুলিবে, কিন্তু আপনারাই ত শিক্ষা দিয়াছেন কর্ম্মযোগ, কর্ম্মের মধ্য দিয়াই মানুষ গড়িয়া উঠে, শক্তির প্রয়োগেই শক্তির বিকাশ, "করিতে করিতে"ই মানুষ "হইয়া উঠে"। ঠিক কথা। কিন্তু তোমাকে কিছু করিতে ত আমি নিষেধ করিতেছি না। তুমি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতেছ, খাওয়াদাওয়া করিতেছ, লেখাপড়া করিতেছ, খেলাধূলা করিতেছ, লোকজনের সাথে মিলামিশা করিতেছ, সাংসারিক কর্ম্মও কিছু করিতেছ—এ সকলই ত "করা"। তুমি বলিবে, না, এ সকল কিছু "করা" নয়। এ ত সকলেই করে। সাধারণলোকের সাথে আর মহৎজীবনের সাধকের সাথে তবে প্রভেদ রহিল কোথায়? কিন্তু মনে রাখিও কর্ম্মযোগ অর্থে এমন নয় যে একটা বিরাট বিপুল অসাধারণ কিছু কর্ম্ম করিতে হইবে। অর্জ্জুনের মত কোন কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের কর্ম্মী না হইলে যে কর্ম্মযোগ হয় না তাহা নয়। আর সকলে যাহা করে শুধু তাহাই করিলেও তোমার কর্ম্মযোগের কিছু হানি হইবে না। সবই নির্ভর করিতেছে তোমার ভাবের উপর, কোন্ চক্ষু দিয়া তুমি জগৎ দেখিতেছ, কি রকম প্রেরণায় তুমি চলিতেছ। তুমি যেমন অবস্থায় আছ, যে সকল পারিপার্শ্বিক কর্ম্মশৃঙ্খলার মধ্যে তোমার বর্ত্তমানের জীবন খেলিতেছে তাহার মধ্যে থাকিয়া, সেই সকলই সম্পাদন করিয়া নিজের সত্তাটির পরিচয় পাইতে হইবে, নিজের ধর্ম্মটি জানিতে হইবে, নিজের কর্ম্মরাজ্যটি টানিয়া বিকশিত করিতে হইবে—ইহাই প্রকৃত কর্ম্মযোগ। ইহার জন্য ঘরবাড়ী ছাড়িবার প্রয়োজন নাই, মনের মত কর্ম্ম পাইবার জন্য ছুটাছুটি করিবার দরকার নাই। ভিতরের ভাব যতদিন পরিবর্ত্তন হয় নাই, মনকে যতদিন কিছু "হওয়াইয়া" তুলিতে পার নাই ততদিন মনের মত কর্ম্ম সম্মুখে পাইলেও সে কর্ম্মকে চিনিতে পারিবে না। আমি এমন বলিতেছি না তুমি আজ যে কর্ম্মজগতে লিপ্ত চিরদিন একান্ত তাহার মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া থাকিবে—আদৌ নয়। আমি শুধু বলিতে চাই, কর্ম্মের পরিবর্ত্তন, পারিপার্শ্বিক পরিবর্ত্তন করাটাই মূল জিনিষ নয়। তাহার প্রয়োজন হইতে পারে কিন্তু অন্তরে যতদিন একটা কিছু না গাঁথিয়া তুলিতে পারিয়াছ ততদিন এ বাহ্য কর্ম্মস্পৃহা চঞ্চলতা অস্থিরতা মাত্র, শুধু ধোঁয়া, শুধু ফেনা, অন্তরাত্মার মধ্যে তাহা গভীর স্থিরপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠে নাই।

কর্ম্মযোগ অর্থে দিগ্বিদিকশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিয়াই যাওয়া নয়। আমাদের

সাধনায় কর্ম্মযোগ হইতেছে প্রতিষ্ঠাকেন্দ্র, জ্ঞানযোগের সহায়েই সেখানে গড়িয়া তুলিবে তোমার মহত্তর জীবন-সৌধ। সাধনার লক্ষ্য নিজেকে পরিবর্ত্তন করা, ভাগবত প্রতিভাকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করা। সেজন্য আগে চাই চিন্তার মতির ভাবের পরিবর্ত্তন। আর ভাবের পরিবর্ত্তন হয় প্রধানতঃ ভাবের দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা, ইচ্ছাশক্তি তপঃশক্তির দ্বারা। কর্ম্মজীবনের সংঘর্ষ এই ভাবপরিবর্ত্তনের সহায় হইলেও হইতে পারে কিন্তু তাহা সহায় মাত্র। নিজের জীবনের উপর, কর্ম্মের উপর চক্ষু ফিরাইতে শিখ, বাহিরকে নিরীক্ষণ কর এই চিন্তার এই ভাবের এই ভিতরের দৃষ্টি দিয়া। কোন্ ভাব হইতে ভিতরের কোন্ স্তর হইতে তোমার কর্ম্ম উদ্ভূত, তোমার জীবন পরিচালিত, তাহা দেখিতে চেষ্টা কর। শুধু বাসনার, শুধু আবেগ, স্নায়ুর চাঞ্চল্যের ফল কি তোমার কর্ম্ম? তবে স্থিতধী হইয়া দেখ, অনুভব কর তা সবার অন্তরালে কোন্ ভাগবত ঈষণা, অন্তরাত্মার কোন্ দৈবী প্রেরণা ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে—তাহার পরিচয় পাইয়া তাহাকে ফুট করিয়া তোল, চারিদিকের আবর্জ্জনা সরাইয়া দাও, তাহারই পূর্ণতেজে পরিচালিত হও। ইহাই প্রকৃত কর্ম্মযোগ—কর্ম্মের মধ্যে রহিয়া (তাহা যে কর্ম্মই হউক না কেন) জ্ঞানের তপঃশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। এইটি যখন—অন্ততঃ কথঞ্চিৎ—অধিকার করিবে তখনই তোমার প্রকৃত কর্ম্ম আরম্ভ, তখনই যথাযথ প্রকাশ হইতে থাকিবে ভগবান্ তোমার সাহায্যে কি সৃজন করিতে চাহিতেছেন।

লীলা

(৭)

অনন্ত ব্রহ্মের ছেদ নাই, তিনি অখণ্ড। পৃথিবীর সকল বস্তুই ব্রহ্ম দ্বারা পূর্ণ, অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডও পরিপূর্ণ ব্রহ্মেরই প্রকাশ। তিনি জগদ্ব্যাপ্ত হইলেও তাঁহার পূর্ণতার হানি হয় না কেননা তিনি নিত্য পরিপূর্ণ, পূর্ণতাই তাঁর স্বভাব।

ওঁ পূর্ণমিদঃ পূর্ণমদঃ পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

সুতরাং কেবল চৈতন্যময় সত্ত্বার মধ্যেই যে নারায়ণ, শিব ও শক্তিকে উপলব্ধি করিব তাহা নহে, বিশ্বের যাবতীয় অচেতন বস্তু নিচয়ের মধ্যেও শ্রীভগবান্‌কে লক্ষ্য করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের জড়চক্ষু পৃথিবী খুঁজিয়াও ব্রহ্ম দর্শন করিতে পারে না। কোটী কোটী জন্ম অন্ধের মত হা ভগবান্, হা ভগবান্ করিয়া বেড়াইলে কোন কালেই ভগবৎ-দর্শন হইবে না। যে দিন স্বর্গের পবিত্র কিরণে আমাদের চক্ষের অন্ধকার দূর হইবে, জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় যে দিন আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম অপসারিত হইবে সেই দিনই আমরা ধন্য হইব, সেই ভুবনমোহন সচ্চিদানন্দময় রূপ দেখিয়া সেই দিনই ভক্তিগদগদকণ্ঠে গাহিব "সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়া এনেছ তোমার দুয়ারে"। এই দিব্যচক্ষু উন্মীলিত না হইলে সাধনা কেবল কথার রাশি মাত্র, এই জ্ঞানচক্ষু লাভ করিলে তবেই দেখিবে অচেতন বলিয়া কোন পদার্থই নাই, সবই সচ্চিদানন্দময়; সবের ভিতরেই প্রাণ মন বিজ্ঞান অধিষ্টিত। সকলের মধ্যেই লীলাময় শ্রীহরি বিরাজ করিয়া তাঁহার অনন্ত গুণের অপার আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। পৃথিবীর সকল বস্তু ব্যক্ত, অব্যক্ত অথবা প্রকাশোন্মুখ—যাহাদের অভ্যন্তরে পরাৎপর পুরুষ সম্পূর্ণ আত্মগোপন করিয়া আছেন, যাহার প্রকাশে চৈতন্যের কোন নিদর্শনই উপলব্ধি হয় না, চক্ষুরুন্মিলনে তাহাদের মধ্যেও শ্রীভগবানের নিত্যলীলা দেখিয়া চরিতার্থ হইবে, পত্রে পুষ্পে, পাষাণ মৃত্তিকায়, বৃক্ষে লতায় সমুদয় সৃষ্টির মধ্যেই একটা বিশেষ বিশেষ আনন্দ আছে, আনন্দের অভিব্যক্তিস্বরূপই এই সৃষ্টিচাতুর্য্য, প্রত্যেকটীর মধ্যেই শ্রীহরি চিদ্-রূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন রসানন্দ ভোগ করিতেছেন। একই ব্রহ্মের বহু প্রকাশ দেখিয়া কেহ যেন মনে করিবেন না তিনি খণ্ড এবং অসংলগ্ন হইয়া এই অনন্ত বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন। ভগবানের ফাঁক নাই; তিনি কাল, স্থান ও কারণের বশবর্ত্তী নহেন, অভেদ হইয়াই যুগপৎ অনন্ত সৃষ্টির ভিতর সমভাবে লীলারত। যেমন একখণ্ড দীর্ঘ সূত্র নানা বর্ণে রঞ্জিত করিলে প্রত্যেক বর্ণের একটা করিয়া সীমা থাকিলেও, সূত্রটীর সীমা তাহাতে নির্দ্ধারণ হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মের বিবিধ সৃষ্টির ব্যবধান দেখিয়া ব্রহ্মের ভেদ নিরাকরণ করিবার হেতু নাই। তিনি প্রতি আধারে অনুপ্রবিষ্ট, অবশ্য স্থূল জড়ভাবে এই অনুপ্রবেশের অর্থ ধরিলে চলিবে না—সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে তাঁহার চিন্ময় স্বরূপই বিরাজিত। তিনি সচ্চিদানন্দময়—বিজ্ঞান, মন, প্রাণ, আধার তাঁর সৃষ্টি—"ঈশা বাস্য মিদং

সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।" সমস্ত পৃথিবী এবং প্রকৃতির অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থই তাঁর অবস্থানহেতু সৃষ্ট হইয়াছে। চিত্রকর পরিপ্রেক্ষাযোগে যেমন ইচ্ছামত বস্তুনিচয়কে দূরে নিকটে, ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ আকারে, স্পষ্ট অথবা অস্পষ্ট করিয়া সন্নিবেশিত করেন, সমগ্র জগতের সকল স্থান কালগত ব্যবধান ও রূপভেদ সেইরূপ—সেই একই স্রষ্টার সৃষ্টিসৌকর্য্য মাত্র।

চেতন এবং অচেতন পদার্থ সমূহের মধ্যে শ্রীহরির অধিষ্ঠান দেখিলেই যথেষ্ট হইল না—মনে রাখিও জগতের ঘটনারাজিও তিনি, মানুষের তরল মস্তিষ্কে যে সকল চিন্তা-লহরী অবিরাম উঠিতেছে পড়িতেছে সে সকলও তিনি, চিত্তের ও মনের যে অনুভূতি, প্রাণের উদ্বেলিত বাসনা, জগতের সকল রকম কার্য্য এ সমুদয় তিনি, তিনি ভিন্ন কিছুই নাই, ভাব ভাষা, প্রেম, ঘৃণা, পাপ, পুণ্য, পৃথিবীর লোক যে সকল গুণের কথা জানে এবং যাহা এখনও জানে নাই সমস্তই তিনি।

এক্ষণে এই "সর্ব্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম" ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে হইলে সাধককে যাহা করিতে হইবে তাহাই বলিব। সর্ব্বপ্রথমে তোমার জীবনের সকল কার্য্যের ফলই শ্রীভগবানে সমর্পণ করিতে চেষ্টা কর। দ্বিতীয়তঃ—তোমার কর্ম্মপর্য্যন্ত তাঁর চরণে উৎসর্গ করিয়া দাও। কর্ম্মও তাঁর ফলও তাঁর, তুমি তাঁর যন্ত্রমাত্র, যন্ত্রের কি কর্ম্মস্পৃহা আছে না যন্ত্রের দ্বারা যাহা সম্পন্ন হয় তাহার ফল যন্ত্র ভোগ করে! যাঁর কর্ম্ম তিনিই ফলভোক্তা, তোমার কর্তৃত্বাভিমান আর কিসের জন্য? কর্ম্মফল ভগবৎ-চরণে উৎসর্গ করিয়াছ বলিয়া ফলবিমুখ যে হইতে হইবে এরূপও কোন কথা নাই অথবা কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের অভিমুখে চলিতে যে পরাঙ্মুখ হইবে এরূপও মনে করিও না, এরূপ ভাব আসিলে নিশ্চয় জানিও তোমার কর্তৃত্বাভিমান দূর হয় নাই, তুমি ভগবানে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিতে পার নাই। কেননা তাঁর চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া যে তোমায় বৈরাগ্য গ্রহণ করিতে হইবে এইরূপই বা মনে হয় কেন? তোমার সর্ব্বস্ব উৎসর্গের পর তোমার কিছু করা না করা সেত ভগবানের ইচ্ছা। তোমার যাহা ইচ্ছা তোমার যাহা অভিপ্রায়, তোমার যাহা ধারণা, এরূপ হইলে এরূপ ঘটিবে, এইটা এক্ষণে আবশ্যক, এইটা অনাবশ্যক, এইটা করিলে এই ফল পাওয়া যাইতে পারে ইত্যাকারে চিন্তা করিবারও তোমার প্রয়োজন নাই। তোমার কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য ভাল মন্দ বিচারের ভার শ্রীভগবানের, তিনি যাহা করি-

যেন তাহা তোমার পক্ষে অনাবশ্যক হইলেও দৃঢ়চিত্তে মনে করিবে, ইহাই আবশুক, তোমার ধারণায় তাহা অন্যায় হইলেও, ইহা যখন তিনি করিয়াছেন তখন ইহাই কর্ত্তব্য। এরূপভাবে কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিয়া যাইতে হইবে, ফল যাহাই হউক, তাহার দিকে তোমার লক্ষ্য রাখিবার প্রয়োজন নাই। তুমি যাহা চাও, তুমি যাহা ইচ্ছা কর, তাহা দূর করিয়া ভগবান্ যাহা চাহেন ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহাই বুঝিতে হইবে। তোমার বুদ্ধিকে বিশ্বাস করিও না, তোমার বাসনাগুলিকে জলাঞ্জলি দাও, অর্জ্জুনের মত সকলবিধ অতীত সংস্কারের আকর্ষণ পদতলে দলিয়া শ্রীকৃষ্ণের আদেশমত কর্ত্তব্য কর্ম্মে অগ্রসর হও। দৃঢ় জানিও, জগতে একটি কর্ম্মও ঘটিতে পারে না যাহা তাঁহার অভিপ্রেত নয়; আমাদের আশানুরূপ, আমাদের ইচ্ছানুরূপ ঘটনার সমাবেশ না হইতে পারে, কিন্তু নিশ্চয় জানিও, ভগবানে সরলান্তঃকরণে সকল কর্ম্ম ও ফল সমর্পণ করিয়া নির্দ্বন্দ্ব হইয়া যখন দাঁড়াইতে পারিবে তখন জানিবে তোমার জীবন দিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মই সম্পাদিত হইতেছে। অহঙ্কার যতদিন থাকিবে ততদিন জীবনের অনেক কর্ম্মই অপ্রিয়বোধ হইবে, নিরানন্দজনক বোধ হইবে, কিন্তু মনে করিবে, তাহাতে আমার কি, কর্ম্ম ও ফল, এ উভয়ইত আমি পরিত্যাগ করিয়াছি। আমার জীবন লইয়া তিনি যাহা খেলিতেছেন তাহাই তাঁহার ইচ্ছা, এইরূপ ঠিকে ঠিক দিয়া চলিলে বুঝিবে তোমার সাধন আরম্ভ হইয়াছে। কোন্ কর্ম্ম মঙ্গলজনক, কোন্ কর্ম্ম অমঙ্গলের হেতু তাহা তোমার জানিবার আবশ্যক কি? যে শক্তি সমগ্র পৃথিবী পরিচালিত করিতেছেন সে শক্তি তোমাপেক্ষা নিশ্চয় চতুরা এবং জ্ঞানযুক্তা; তোমার সহিত পরামর্শ করিয়াই যে তাঁহাকে তোমার জীবন লইয়া খেলা করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই, স্বয়ং ভগবান্ তোমার কার্য্যের দ্রষ্টা। তুমি মুক্ত, তুমি শুদ্ধ, তুমি সদানন্দময়।

অনেক সময় কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি এই লইয়া অনেকের দ্বন্দ্ব আসে। ঠিক ঠিক ভাবে আত্মসমর্পণ সুসিদ্ধ হইলে সাধক আর কোন প্রশ্নই করে না কিন্তু সাধন গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে সাধককে অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করিতে হয়। যাঁহারা ইংরাজী পড়িয়াছেন এই কর্ত্তব্য কর্ম্মের তাঁহারা ইংরাজী প্রতিশব্দে বলিবেন, ইহা (Duty) ডিউটী। ডিউটী শব্দের ব্যাখ্যা করিতে হইলে তাঁহারা বলিবেন যাহা ন্যায়সঙ্গত, নীতিসঙ্গত, যাহা মানুষের বিবেক বুদ্ধির অনুশাসিত তাহাই করা কর্ত্তব্য। সমাজ দেশ

জাতির হিতৈষণা করিতে আমাদিকে প্রণোদিত করে যাহা তাহাই করা কর্ত্তব্য। এইরূপ আদর্শের অনুগত হইয়া যাহারা চলিতে চায় স্বভাবতঃ তাহাদের জীবন মহৎ হইয়া উঠে, জগতে তাঁহারা সৎলোক বলিয়া সুখ্যাতিও অর্জ্জন করেন, কিন্তু অনেকক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতি কামনায় অথবা জাতি বা বিশিষ্ট ধর্ম্মের অনুশাসনে পড়িয়া মানুষ এমনিই পঙ্গু হইয়া যায়, জীবনের অনেক অশুদ্ধ সংস্কার অহঙ্কার এবং বাসনা কামনার বীজগুলি মধ্যে গুপ্ত ও আবদ্ধ রাখিয়া সংসারে বড় বড় কার্য্যে যোগদান করে যে লোকচক্ষে ইহারা উত্তম পুরুষ বলিয়া আখ্যালাভ করিলেও, যোগের যে উদ্দেশ্য, যে পরিপূর্ণ জীবনলাভের তপস্যা তাহা কখনই সুসিদ্ধ হয় না। বরং কামনাগুলি একরকম ফলের পরিবর্ত্তে অন্যরূপ ফলের আকাঙ্খায় পরিপুষ্ট হইয়া উঠে এবং মানুষ এই আপাতমধুর সমুচ্চ ফলাশায় অধিকতর প্রয়াস করিতে থাকে, পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক উত্তেজনায় উন্মত্ত হইয়া উঠে। যদি আশাভঙ্গ হয় তাহা হইলে ইহারা নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া দারুণ অবসাদহেতু চিরতরে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। মানুষ যাহা সত্য বলিয়া অবধারণ করে এবং আমিও যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেছি তাহার জন্য আমি না করিতে পারি এমন কার্য্য নাই। এইরূপ স্বতঃসিদ্ধ লোকের যে চেষ্টা, যে উত্তেজনা তাহা অতি উৎকট; ইহাদের ক্রোধও বড় ভীষণ; ইহাদের অহঙ্কার এমনিই সুদৃঢ় যে কিছুতেই তাহা টলাইতে পারা যায় না, ইহাদের সমক্ষে ভগবানের বিধান মূর্ত্তিমান হইয়া আসিলেও তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। যদিও এইরূপ মহাকর্ম্মীর অন্তরে বিফলাশার জন্য খেদ আসে না তত্রাচ ইহাদের দুর্জ্জয় কর্ত্তৃত্বাভিমান ইহাদিগকে রাজসিক কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিয়া বৃথা ক্লেশ এবং দ্বন্দ্ব ভোগ করায়, তাহাতে তাহারা ব্যস্ত হইয়া পড়ে এবং অবশেষে দারুণ অবসাদগ্রস্ত হয়। ইহারা কোন কালে ত্রিগুণাতীত হইয়া বিশ্বনাথের যে অপার আনন্দ তাহা ভোগ করিতে পারে না, গুণাদির অধিকারে চিরদিন আপনাদিগকে আবদ্ধ করিয়াই রাখে।

জগৎ

তোমার জগৎ তোমার খেলা আমরা তারি সঙ্গী
তোমার ব্যথা তোমার গাথা আমরা শুধুই রঙ্গী
সুরটি সে যে তোমার বাঁশীর আমরা করি নৃত্য
নয় ত মোরা পরবাসী এই যে মোদের তীর্থ।

তোমার বাঁশীর একটী সুরই বাজায় হাজার মূর্চ্ছনা
প্রেম বিরহ মিলন—আশা দুঃখ বিষাদ লাঞ্ছনা
সব রাগিণীই বাজে তাতে মধ্যে শুধুই একটী সুর
সঙ্গে তোমার সঙ্গী মোরা জগৎ যে 'আনন্দ'-পুর।

তোমার কেমন ছল্ ছলনা বেড়াও সদা অন্তরালে,
তাই ত তোমায় পাইনে খুঁজে হতাশা তাই পলে পলে,
তাই দেখি সব মায়ার সৃজন তাই ত করি অভিমান
তাই ত ভাবি ত্যজ্‌ব তোমার এমন মধুর সৃজন দান।

তুমি থাক কাছে কাছে তাই ত তোমার পাইনে সাড়া
তাই ছুটে যাই গহন বনে এমনি মোদের মোহকারা,
তাই জানি না হাজার রাগে বাজে বাঁশীর একটী সুর
তাই বুঝি না সৃজন তোমার জগৎ যে 'আনন্দ'-পুর।

কিন্তু যখন শুনি তোমার বাঁশী গাহে এক কাহিনী
আকুল তোমার সপ্তগ্রামে বাজায় হাজার রাগ রাগিণী
তখন তোমার পাইনে দেখা কেমন মধুর কেমন সুর
তোমার খেলা তোমার লীলা জগৎ যে 'আনন্দ'-পুর।

সমালোচনা।

Reports of the Ramkrishna mission, Branch centre, Dacca—1899-1915 and 1916.

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রারম্ভ হইতে ১৯১৬ অবধি মিশন যে সমস্ত কার্য্য করিতেছেন তাহাই এই দুইখানি পুস্তকে বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। ১৩০৮ সালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা বিভাগের কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথমে ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের নিজস্ব কোন বাস-ভবন ছিল না কিন্তু কয়েকটী মহৎ-প্রাণ জমীদারের সাহায্যে সম্প্রতি মিশনের একটি বাস-ভবন এবং সেবা কার্য্যের জন্য আর একটী বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে। মিশনের তিনটি মহৎ উদ্দেশ্য—(১) ধর্ম্মপ্রচার (২) শিক্ষা বিস্তার, (৩) সেবাকার্য্য। ইহার সভ্যগণ দুর্ভিক্ষ, বন্যা এবং মহামারী

প্রপীড়িত নানা স্থানে সেবাকার্য্যে গমন করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে দামোদরের বন্তা এবং দিঘিরপাড়, বজ্রযোগিনী, টাঙ্গিদত্তপাড়া এবং নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে কলেরা ও বসন্ত প্রাদুর্ভাব কালে এবং চাঁদপুর দুর্ভিক্ষে ইহাদের সেবাকার্য্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বেলুড় হইতে সন্ন্যাসীগণ মধ্যে মধ্যে ঢাকায় গমন করিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকেন। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি ক্ষুদ্র বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, ইহা ছাড়া সাধারণের উৎসাহে মিশন একটী পুস্তকাগার খুলিয়াছেন এবং স্থানীয় অনেক দরিদ্র ছাত্রের শিক্ষা ব্যয় বহন করিতেছেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ঢাকার সমিতি বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং এক্ষণে উহার সমস্ত কার্য্যই বেলুড়ের কেন্দ্র সমিতির উপদেশানুসারে হইতেছে। যাঁহারা এই কার্য্যের প্রধান উদ্যোগী তাঁহারা সাধারণের আনুকূল্যে, দীন দরিদ্রের আশীর্ব্বাদ মাথায় বহন করিয়া কার্য্য করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

প্রেমের ডালি—শ্রীরসিকলাল দে প্রণীত। সোণামুখী (বাঁকুড়া)। মূল্য আট আনা। ভক্তির উচ্ছ্বাসপূর্ণ কবিতা-গ্রন্থ। কবিতা, বিশেষতঃ ভক্তের হৃদয়োচ্ছ্বাস সমালোচনার বহির্ভূত থাকাই ভাল। ফুল যেমন আপনার আনন্দে ফুটিয়া আপনাকে দেবতার পাদপদ্মে অর্ঘ্যস্বরূপ অর্পণ করিয়াই সুখী হয়, কোন সমালোচকের হাস্য বা ভ্রূকুটির অপেক্ষায় বসিয়া থাকে না—ভক্তের আরাধ্য সমীপে আত্মনিবেদন তেমনি হওয়াই স্বাভাবিক। একটা কথা মনে রাখা উচিত, ভক্তি ও প্রেম মানবহৃদয়ের শ্রেষ্ঠ দৈবী সম্পদ্—সেই শ্রেষ্ঠ বৃত্তিকে যখন কেবল রমণী-সুলভ অতি কমনীয়তার মধ্যেই আত্মহারা হইতে দেখি—তখন অজ্ঞাতে যে মনের কোণে একটু দুঃখ জন্মে না, এমন নহে। ভাবপ্রবণতা (Sentimentalism) সত্য রসবৃত্তির (emotion) বিকৃত মূর্ত্তি মাত্র। বাংলার অনেক নব্য কবিতা-গ্রন্থই এই যুগের কঠোর যুগধর্ম্মের সহিত সমপদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে না বলিয়াই আমরা এতগুলি কথা অতি দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইলাম। অবশ্য গ্রন্থকারের উদ্যমকে দমিত করিবার আমাদের বিন্দুমাত্রও অভিপ্রায় নাই। গ্রন্থখানিতে অনেকগুলি সুন্দর ভাবপূর্ণ কবিতা আছে, তন্মধ্য হইতে একটী ক্ষুদ্র অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

> "তুমি মঙ্গলময়, করুণা-নিলয়, অতুল তোমার করুণা।
> তুমি যাহা বুঝ, তাই দাও প্রভো, আমি কি চাহিব জানি না।
> যাহা দিবে তাহা লব শির পেতে,
> কথাটি কব না, কভু কোন মতে,
> সুখ দুঃখ স'ব অতি হরষেতে,
> তুমিই ভাবিবে ভাবনা।"

কবির আত্মনিবেদনের সকল তাঁহার জীবনে সার্থক হউক। গ্রন্থবিক্রয়লব্ধ অর্থ বাঁকুড়া "গরীব ভাণ্ডারে" যাইবে—আশা করি পুস্তকের বহুল প্রচারে তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য সফল হইবে।

তপঃ তপঃ তপঃ

বঙ্গীয় প্রাদেশিক-সম্মিলনীর সভাপতি চিত্তরঞ্জন বাবু বলিয়াছিলেন “প্রাণ যখন জাগে তখন হিসাব করিয়া জাগে না”। কথাটা খুবই সত্য, দ্বাদশ বর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালীর মরা প্রাণে যখন জোয়ার আসিয়াছিল তখন তাহাদের ক্ষিপ্র চরণাঘাতে, কত আবশ্যক অনাবশ্যক জিনিষ যে ভাঙ্গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। তাহাদের চঞ্চল এবং উচ্ছৃঙ্খল গতির পুলক উচ্ছ্বাসে জাতির জীবনে যে একটা অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হইয়া উঠিতেছে তাহাও তাহারা হিসাব করিয়া দেখিল না, তাহাদের গতির প্রতিকূলে যে কত বড় বাধা কত বড় বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে তাহার চিন্তা করিবারও তাহাদের অবসর ছিল না, তাহারা বহুদিনের আড়ষ্ট জীবনের মধ্যে একটা চেতনার সঞ্চার অনুভব করিয়া কেবল দৌড়িয়াছিল; কোথায় যাইব, কি করিব, ইহার পরিণাম কি, এত কথা তলাইয়া বুঝিবার তখন তাহাদের প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু ভগবান্ যখন এই উদ্দাম গতির সম্মুখে হিমালয়ের মত এক প্রকাণ্ড বাধা উপস্থিত করিলেন তখন কেহ বা মোড় ফিরিলেন, কেহ বা ভাবিতে বসিয়া গেলেন আবার কেহ বা বাধাটীর শক্তি সামর্থ্যের বিষয় সম্যক্ অবগত না হইয়াই স্ব স্ব ক্ষুদ্র চেষ্টার দ্বারা ইহার উপর আঘাত করিতে লাগিলেন। এইরূপে জাতির একটানা গতিটা অকস্মাৎ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া এক বিকৃতাকার ধারণ করিল। বাংলার আজ যে বিপ্লববাদের প্রসঙ্গ লইয়া মহামতি রোনাল্ডশে হইতে সাধারণ ভদ্রলোক পর্য্যন্ত আলোচনা করিতেছেন ইহাও এই জাগরণের বিকৃতাংশের এক রূপ মাত্র।

হিন্দুর সনাতন জীবনে পাশ্চাত্যের অশুদ্ধ রজঃশক্তির প্রচণ্ড প্রভাব অনুকৃত হইয়াই বাংলায় এনার্কিজিমের উৎপত্তি। জাতির উত্তম গতি, সুপ্রসারিত পথের অভাবেই, কুটিল পন্থার অনুসরণ করিয়া বহুসংখ্যক বাঙ্গালী যুবককে ভারতীয় চরিত্রের বিপরীত পথে লইয়া যাইতেছে। বৈদেশিক রাজশক্তির অপেক্ষা স্বদেশপ্রেমিক দেশনায়কগণেরই এদিকে অধিকতর

দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য। কোন্ পন্থা অনুসরণ করিলে জগতের এই নূতন যুগে বিপথগামী এইরূপ দেশপ্রাণ যুবকগণ, মহান্ আদর্শের পথে পরিচালিত হইয়া ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষকে সর্ব্ববিষয়ে সমুন্নত করিয়া তুলিতে পারে দেশনায়কগণকেই তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে হইবে এবং সহস্রাধিক যুবকগণের যাহাতে সুবিচার হয় এবং তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই যদি অপরাধী হয় তাহা হইলেও তাহাদের জীবনের দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে তাহাদিগকে উত্তম কর্ম্মক্ষেত্রে পরিচালিত করিতে হইবে। মহামতি Ronaldshay বাহাদুর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় খুব জোর দিয়াই বলিয়াছেন—"Do you seriously suggest that it would be in the best interest of society at large, that these men should be released to continue their career of conspiracy and crime ?" ইহার উত্তরে এমন কোন নেতাই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা এবং চরিত্র-বল লইয়া বলিতে পারেন কি—'না, ইহারা বাহির হইয়া এরূপ অপরাধ আর করিবে না।' অবশ্য এই গুরুতর দায়িত্বভার গ্রহণ করিবার অসমর্থতার নানা কারণ আছে; দেশের সকল কর্ম্মক্ষেত্রগুলিই যে তাঁহাদের অনধিকারে। এ অবস্থায় একমাত্র গভর্ণমেণ্টই এই সকল অনর্থকারী যুবকগণের উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র সৃষ্টি করিতে পারেন; ইহাদিগকে পিষিয়া যদি এই অস্বাভাবিক সৃষ্টির অবসান ঘটিত তাহা হইলে ভারতের ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া আমরা অবহেলে এই সকল যুবকের ক্ষতি স্বীকার করিতাম, কিন্তু বাংলার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা লাট বাহাদুরের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া আমরাও বলি—"Let them ask themselves, if they should not rather strike to help East and West to join hands in raising up on the ruins of this world-wide conflagration a future for mankind worthy of the infinite sacrifice which humanity has been called upon to make." এই কার্য্যকে সুচারুরূপে সুসিদ্ধ করিতে হইলে ইংরাজ বিদ্বেষের মূল পর্য্যন্ত ধ্বংস করা চাই এবং এই কার্য্যে প্রজার অধিকতর স্বার্থ থাকিলেও রাজশক্তির প্রচুর সহায়তা ও উদারতার একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করিয়া উচ্চ

ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীর মহৎ হৃদয়েও ভগবানের শাসনশক্তির অংশটুকু যেরূপ বিকশিত, পোষণশক্তির সেরূপ অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইজন্ত তাঁহারা শাসন যেমন করিতে পারেন, পোষণকার্য্যের অধিকাংশ তারই প্রজার অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে। এবং এই জন্তই সম্প্রতি রোনাল্ডশে বাহাদুরের বক্তৃতায় মধ্যে আমরা বাংলার শাসনযন্ত্রের যতটা কর্কশ শব্দ অনুভব করিলাম পোষকতার মৃদুমধুর আশ্বাস ত ততটা পাইলাম না। বাঙ্গালী বিপ্লবপন্থী বলিয়া শাসনযন্ত্রের আবর্ত্তনে পতিত হইলেও তাহারা যে ব্রিটিশ প্রজা, তাহাদের দিকটাও যে শাসনকর্ত্তাদের নিরপেক্ষভাবে দেখিতে হইবে। এত বড় তত্ত্বটা আজ পর্য্যন্ত কোন শাসনকর্ত্তাই উপলব্ধি করিতেছেন না, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

এইবার আমাদের কথা বলি। আমরা জানি ভারতবর্ষের যে ভবিষ্যৎ স্বর্গ-যুগ তাহার অধিকাংশ উপকরণই সংগ্রহ করিতে হইবে ব্রিটিশরাজের ছত্রতলে দাঁড়াইয়া, কিন্তু আজ আমাদের জীবনবিকাশের পথে অকারণে যে সকল বাধা পাইতেছি অতঃপর তাহাতে বুদ্ধিভ্রষ্ট না হইয়া অপেক্ষা করিব, ভগবানের ইচ্ছা স্মরণ করিয়া। তিনি আমাদের মানসিক বলের সম্যক্ পরিপুষ্টির জন্তই ত এত বাধার সৃষ্টি করিতেছেন। আমরা যদি কিছু হইতে পারি তবেই কিছু লাভ করিব। আর যদি তপঃশক্তি প্রভাবে সে অজেয় ধারণ-সামর্থ্য এই আধারে আনিতে পারি তাহা হইলে অমৃতেরই অধিকারী হইব। ক্ষুদ্র দানের জন্ত মাথা কোটাকুটি করিয়া অযথা শক্তির অপচয় করিব কেন! আজ সকল ঘটনাকেই ভগবানের দান মনে করিয়া আইস আমরা নীরবে তপস্যা করি। এতদিন তমঃপ্রভাবে মৃতপ্রায় হইয়া মরণের দ্বারে চলিয়াছিলে আজ বিধাতার ইচ্ছায় তপঃশক্তি তোমার মৃতকল্প জীবনে সঞ্চারিত হইয়াছে, আশা ও বাসনায় সম্মোহন সঙ্গীতে আত্মহারা হইয়া, আবার দীর্ঘ নিদ্রার সূচনা করিও না। সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বে সাধকের সম্মুখে বহু মিথ্যা সাফল্য ও সুযোগের মূর্ত্তি আবির্ভূত হয়, তাহাদের ক্ষীণশক্তির সহায়তা লাভে অনন্তশক্তি ভগবানের আশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত হইও না। চক্ষু মুদ্রিত কর, কর্ণে অঙ্গুলি দাও, শ্বাস পর্য্যন্ত বন্ধ কর, কি জানি কোথা দিয়া জগতের বিঘ্ন তোমার যোগভঙ্গ করিয়া দিবে। তপঃ, তপঃ তপঃ, এখনও তপস্যার বাকী আছে; এখনও অহঙ্কারের বিকট মূর্ত্তি অনুচরসহ আমাদের বেড়িয়া বেড়িয়া নৃত্য করি-

তেছে, এখনও আমরা, আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি সামর্থ্য ও যোগ্যতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে আস্থাহীন হই নাই—তাই বলি তপঃ তপঃ তপঃ।

তপঃশক্তির বিমল আভায় জগতের অন্তঃস্থল লক্ষ্য কর, বাহিরের প্রলোভন হইতে সর্ব্ব ইন্দ্রিয়কে প্রত্যাহার করিয়া ভিতরের অফুরন্ত শক্তি-উৎসের প্রতি নিয়োগ কর, দৈবশক্তিই তোমায় উত্তম বর প্রদান করিবেন, ভগবৎ-শক্তির নির্দ্দেশেই যে আমরা চলিয়াছি, তাঁর ইচ্ছারই ত আমরা অমোঘ যন্ত্র, একথায় কদাচ আস্থাহীন হইও না। তপঃ তপঃ তপঃ।

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম

রবীন্দ্রনাথ সবুজ পত্রে "আমার ধর্ম্ম"* নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উহা আমাদেরই "ধর্ম্মপ্রচারে রবীন্দ্রনাথ"§ শীর্ষক প্রবন্ধটির জবাবস্বরূপ লেখা হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। রবীন্দ্রনাথকে আমরা যে ভাবে বুঝিয়াছি সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের কি অভিমত তাহা জানিবার জন্য আমরা স্বতঃই উৎসুক ছিলাম, তাই বিশেষ আগ্রহের সহিত তাঁহার প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াছি। কিন্তু তবুও দেখিতেছি আমাদের ধারণা কিছু পরিবর্ত্তিত হইতেছে না। এমন কি বর্ত্তমানে তিনি যে রাষ্ট্রনীতির সঙ্কুলযুদ্ধে আবার ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন তাহা দেখিয়াও আমাদের ভুলটি ধরিতে পারিতেছি না। প্রবন্ধটি পড়িয়া আমাদের মনে হইল রবীন্দ্রনাথ যেন ক্ষুব্ধ হইয়া একটু অভিমান করিয়াই লিখিয়াছেন। তিনি যেন বলিতে চাহেন, "আমি ত শক্তিকে কোনদিন অবহেলা করি নাই, আমি ত কত শক্তিমন্ত্র গাহিয়াছি, রুদ্রের বন্দনা আমার সাধনায় যে কিছু কম, এমন নয়, তবুও কেন লোকে বিপরীত কথা বলে? আমার ধর্ম্ম শান্তির ধর্ম্ম স্বীকার করিলাম; কিন্তু যে শান্তি আমি চাহিয়াছি শক্তিরই পরিণতিরূপে, জীবের জড়ের যে শান্তি, জগতের জীবনের দ্বন্দ্বকে কোনরূপে ফাঁকি দিয়া যে শান্তি, সে শান্তির ত আমার ধর্ম্মে কোন স্থানই নাই, তবুও কেন এ

---

*সবুজ পত্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক, ১৩২৪।

§প্রবর্ত্তক, ২য় বর্ষ, নবম সংখ্যা (অথবা নারায়ণ, আষাঢ়, ১৩২৪)

অখ্যাতি ?" "তবুও কেন", এই কথাটিই আজ আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমে বলিতেছেন তাঁহার ধর্ম্মটা কি তাহা নির্দ্দেশ করিয়া আমরা তাঁহার প্রেতাত্মাটিই বাহির করিয়া ফেলিয়াছি। কারণ কোন মানুষের কি ঠিক ধর্ম্ম তা তার শেষ অভিব্যক্তিটি না দেখিলে আগে হইতেই কি করিয়া বলা যায় ? জীবনের সাধনার অর্দ্ধপথ পর্য্যন্ত যে সত্য পাইয়াছি, সেখানে আসিয়াই থামিয়া যাই নাই, তাহাই ত আমার শেষ কথা নয়। খাঁটি ধর্ম্মটি জানিতে হইলে শেষ উপলব্ধি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করাই ন্যায়সঙ্গত—নতুবা মানুষের উপর অবিচারই করা হইবে। এ আপত্তির উত্তর দেওয়া আমরা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। রবীন্দ্রনাথ এ আপত্তি তুলিয়াছেন শুধু আপত্তি তুলিবার জন্য—এ কথা একটু পরে তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। কারণ মানুষের শেষ অভিব্যক্তি শেষ উপলব্ধি কবে কোথায় ? ঠিক মরণের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে ? কিন্তু মরণের সঙ্গে সঙ্গেই ত অভিব্যক্তির অবসান হয় নাই। এ জীবনের পরে আরও কত জীবন ধরিয়া তাহার নূতন নূতন উপলব্ধি ফুটিয়া উঠিতেছে—তবে শেষ কথা পাইব কবে ? তবে ত মানুষকে চিনিবার ধরিবার কোন উপায়ই কোন কালে নাই !

সে যাহা হউক, তবুও রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্বের একটা বিশদ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন—এই তাঁহার শেষ কথা কি না জানি না, কিন্তু শেষ কথা হউক আর না হউক, আমরা তাঁহার যে ধর্ম্মটি নির্দ্দেশ করিতে সাহসী হইয়াছিলাম তাহা এ রকম কিছু ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না, এ রকম শেষ কথার উপর নির্ভর করে না। কারণ রবীন্দ্রনাথ দেখিতেছেন তিনি কি হইতে চাহেন, তাঁহার নিজের সাধনার লক্ষ্য কি, আমরা কিন্তু দেখিয়াছি রবীন্দ্রনাথ কি হইয়াছেন, জগৎকে তাঁহার কি দেওয়ার আছে। রবীন্দ্রনাথ খুঁজিতেছেন তাঁহার বুদ্ধির ধর্ম্ম, আমরা দেখাইয়াছি তাঁহার প্রাণের ধর্ম্ম। বুদ্ধির ধর্ম্মটি তাঁহার অন্তরজীবনের জন্য তাহার ব্যক্তিগত সাধনার জন্য তাঁহার কাছে বেশী মূল্যবান বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু আমাদের কাছে যে রবীন্দ্রনাথ পরিচিত, তাঁহার যে ভাগটির সহিত জগৎ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিয়াছে, যেটুকু স্থায়ী সত্য সম্বন্ধ তাহা হইতেছে তাঁহার এই প্রাণের—ধন সেই সত্যটি যাহার সত্যতা কেবল বুদ্ধি দিয়াই উপলব্ধি করেন নাই কিন্তু যাহা তাঁহার

অন্তরাত্মা হইতেই উৎসারিত হইতেছে। আমরা দেখাইতে চাহিয়াছি তাঁহার অধিগত তাঁহার লব্ধ বস্তুটি, তাঁহার প্রাণের উপলব্ধি আর তাহা হইতে কোন্ তত্ত্ব বাহির হইয়া পড়িতেছে, শুধু তাঁহার কথায় নয় তাঁহার কার্য্যেও নয় কিন্তু কথার কার্য্যের ভাবে, তাঁহার দৃষ্টির মৌলিক ভঙ্গিমায় কোন্ তত্ত্ব কোন্ ধর্ম্ম প্রকাশ পাইতেছে।

তাই আমরা আবার বলি শক্তি জিনিষটি রবীন্দ্রনাথের বাঞ্ছনীয় বস্তু হইতে পারে, উহার প্রতি তাঁহার লক্ষ্য থাকিতে পারে, তিনি শক্তির সাধক হইলেও হইতে পারেন—কিন্তু শান্তি কোমলতা জিনিষটি রবীন্দ্রনাথের লব্ধ অধিগত সহজাত বস্তু, এখানে তিনি একেবারে সিদ্ধ। তাই প্রেম প্রীতির কথা, সুষমা সামঞ্জস্যের কথা তাঁহার মুখ হইতে যেমন একটা সহজ সত্যে ভরিয়া বাহির হয়, দ্বন্দ্বের কথায় বিক্রমের কথায় তেমনি একটা কৃত্রিমতা অথবা অবাস্তবতার আভাস রহিয়াই যায়। একটির মধ্যে পাই অযত্নসুলভ সারল্য ঋজুতা, আর একটির মধ্যে পাই চেষ্টা, কষ্ট-কল্পনা। একটি আপনা হইতেই তাঁহার ভিতর হইতে অবাধে বাহিরে ছুটিয়া আসিতেছে, আর একটিকে কেমন জোর-জবরদস্তি করিয়া তবে আনিতে হয়। বুদ্ধির ধর্ম্মের উপর প্রাণের ধর্ম্ম সর্ব্বদাই টেক্কা দিয়া চলে ইহার আর ব্যতিক্রম নাই। তাই কখন দেখি রবীন্দ্রনাথ যেখানে শক্তির কথা বলিয়াছেন সেখানে রহিয়াছে কেমন একটা বাগাড়ম্বর, একটা আতিশয্য—ভিতরে যাহার অসদ্ভাব তাহাকে সম্মুখে বিরাট বিপুল করিয়া না ধরিতে পারিলে যেন তাহার সত্তা সত্যতা সম্বন্ধে স্থির আশ্বস্ত হইতে পারি না। আবার কখন দেখি শক্তির কথা তিনি বলিয়াছেন কিন্তু এমন মোলায়েম করিয়া, মনোলোভা করিয়া যে শক্তির শক্তিত্ব সেখানে প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যেন রুদ্রের বিকট বীভৎস মূর্ত্তির সম্মুখে পড়িয়া অজানিতেই তাঁহার প্রাণের নিগূঢ় তন্ত্রীটা কাঁপিয়া উঠিয়াছে, তাই সে যেন ডাকিতেছে—রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং, হে রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ সেইটিই দেখাও, সেইটি দিয়াই আমাদিগকে সতত রক্ষা করিও। এতগুলি কথায় সে ভাব তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন কি না তাহা জানিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু কথায় না বলিয়া থাকিলেও ভঙ্গিমায় তাহা আমরা স্পষ্টই যেন ধরিতে পাই। বস্তুতঃ শক্ত কথা বলাতেই শাক্তের পরিচয় নয়, নরম কথাও শক্তভাবে বলিতে পারাতেই শাক্ত-ধর্ম্মটি আরও

স্পষ্ট ফুটিয়া উঠে।

রবীন্দ্রনাথের সকল শক্তি বীর্য্য যুদ্ধ বন্দনার পশ্চাতে কেমন একটি ভাব রহিয়াছে যে এ সকলকে কোনরূপে কাটাইয়া উঠিতে হইবে—সংঘর্ষের মধ্য দিয়াই শান্তিতে পৌঁছিতে হইবে, মৃত্যুর করাল বক্ত্রের ভিতর দিয়াই অমৃতত্বের রাস্তাটি প্রসারিত—ইহার অন্যথা হইবার নয়। কিন্তু তাঁহার প্রাণটি চাহিতেছে যত শীঘ্র এ রাস্তাটি পার হওয়া যায়, এক চুমুকেই যদি সকল বিষ পান করিয়া নীলকণ্ঠ হওয়া যায়! রুদ্রের দক্ষিণ মুখটি তিনি কখন ভুলিতে পারিতেছেন না, উহাকে সম্মুখে জাগ্রত করিয়া রাখিয়াই তিনি সে ক্ষুরধার দুর্গম পথে চলিয়াছেন। রুদ্রের যে বাম মুখটি তাহার প্রতি তিনি যেন বাম হইয়াই চলিয়াছেন। তিনি যতই বলুন না, "ওগো মরণ, হে মোর মরণ"—তাহার মধ্যে আমরা অনুভব করি মরণের সে সুখালিঙ্গন, কি একটা অজানা তৃপ্তি শান্তি। কিন্তু কই, পাই না ত মৃত্যুর মর্ম্মন্তুদ বেদনার তাহার মধ্যে একটা ঘোর কিছুর কোন আভাস! আমরা জিজ্ঞাসা করি, মৃত্যুর কি ঠিক ততটুকুই সার্থকতা যতটুকু সে আমাদিগকে অমৃতের আস্বাদন দিতেছে, দ্বন্দ্বের ততখানি মর্য্যাদা যতখানি সে আমাদিগকে শান্তির মধ্যে লইয়া চলিয়াছে? ইহাই কি ঠিক? ইহাই কি সব? আমরা ত মনে করি দ্বন্দ্বের পরিণতি শান্তি, মৃত্যুর লক্ষণ অমৃত হইতে পারে, কিন্তু রুদ্র যিনি, শাক্ত যিনি, বীরকর্ম্মী যিনি দ্বন্দ্বকে দ্বন্দ্বরূপে ধরিয়াই একটা অপরূপ রসভোগ করেন, তাঁহার মধ্যে এ রকম কোন arriere pensée নাই যে দ্বন্দ্বটা অতি প্রয়োজনীয় হইলেও সাময়িক, অনিত্য, ইহার মধ্যে গুরুতর সঙ্গীন কিছু নাই, মূলতঃ ইহা এক রকম ভুল বা মিথ্যা, ইহার পরে যে শান্তি যে মিলন যে সুষমা তাহাই শাশ্বত সত্য সুন্দর মঙ্গল। এই arriere pensée টুকু নাই বলিয়া তিনি যে দ্বন্দ্বকেই, যুদ্ধকেই চরম বলিয়া ধরিয়া থাকিবেন এমন কোন কথা নাই তবে উহার মধ্যে থাকিয়া তাঁহার কোন চাঞ্চল্য কোন অসন্তোষ নাই, উহাকে ছাড়াইয়া উঠিবার অধীরতা নাই, তাঁহার প্রকৃতি ঐখানেই যেন কি একটা চরম সার্থকতা লাভ করিতেছে; চরম শান্তি পাইলেও সে সার্থকতাটুকু কিছু ক্ষুণ্ণ হইবে না, 'মায়া নু মতিভ্রমো নু' বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে না। প্রেমের সৌন্দর্য্যের ভগবানই সর্ব্বদা রহিয়াছেন রুদ্র যাহা কুৎসিত যাহা তাহার পশ্চাতে—এই চিন্তাটুকু রবীন্দ্রনাথ কখনও দূর করিতে

পারেন নাই। রুদ্রের মধ্যে, কুৎসিতের মধ্যে যে প্রেমময় সৌন্দর্য্যময় আত্মা রহিয়াছে তাহাই খুঁজিয়াছেন, রুদ্রের রুদ্রত্ব কুৎসিতের কুৎসিতত্বও যে সে আত্মারই অপূর্ব্ব প্রতিভা তাহা তিনি ধরিতে পারেন নাই। তাই রবীন্দ্রনাথে পাই না বীরসাধকের সে তপ্ততেজ, বীর কর্ম্মে তাঁহার মধ্যে পাই তিতিক্ষা, পাই একটা অনুমতি, কিন্তু পাই না জাগ্রত উল্লাস, পাই না কালীর অট্টহাস।

কালীর অট্টহাসে যে কি চরম সত্য কি চরম রস, আমাদের ধারণা রবীন্দ্রনাথ তাহা প্রাণের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, সর্ব্বদাই তিনি আভাষে ইঙ্গিতে হাবে ভাবে তাহার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন কৃষ্ণের মোহন মুরলী। কৃষ্ণের মোহন মুরলীই চরম সত্য, সেটি যাহাতে পুর্ণতররূপে উপভোগ করিতে পারি তার জন্য আগে শুনা প্রয়োজন কালীর অট্টহাস, কৃষ্ণকে পাইবার জন্য কালী পন্থামাত্র অথবা কৃষ্ণই আপনার মধ্যে কালীকে আত্মসাৎ করিয়া রহিয়াছেন—এ কথা আমরা মানি না। আমরা বলি কৃষ্ণ কালী একই বস্তু, দুই নয়। কৃষ্ণকে ঘিরিয়া কালী, কালীকে ঘিরিয়া কৃষ্ণ।

দরকার

দরকার জিনিষটা—necessity জিনিষটা—ইয়োরোপীয় সভ্যতার কথা—সৃষ্টির মূলে কিন্তু এর কোন অস্তিত্ব নেই। বল্‌ছি না যে দরকারের ওপরে ইয়োরোপীয় সভ্যতা গড়ে’ উঠেছে—বল্‌ছি যে ইয়োরোপীয় সভ্যতার ভিতরেই দরকার জিনিষটা গজিয়ে উঠেছে। তাই আমরা শুন্তে পাই—Necessity is the mother of invention—একটা প্রকাণ্ড মিথ্যে কথা—Necessity, inveutionএর mother ত নয়ই, মাসী পিসীরও কেউ নয়—চোদ্দ পুরুষের কেউ নয়। ওটা একটা নিতান্ত প্রাকৃতজনের কথা “ধরতাই বুলির”ই একটা বুলি। Inventionই বল discoveryই বল এর মূলে রয়েছে মানুষের আনন্দ—সৃষ্টি কর্‌বার আনন্দ।

এই দরকার জিনিষটার পাল্লায় পড়ে’ কিন্তু আমরা জগতের কারবারে বেজায় ঠকে গেছি। তবে আমরা এই দরকারের পাল্লায় পড়েছি তির

রকমে। ইয়োরোপ বল্‌ছে—আমার এটা দরকার, ওটা দরকার, সেটা দরকার। তাই তার চারপাশে রাশিকৃত বস্তু আর বিষয় জমা হয়ে উঠেছে—জলে স্থলে আকাশে তার আর সাজ সরঞ্জামের ইয়ত্তা নেই। তার দেহে মনে প্রাণে এমন একটু ফাঁক নেই যেখানে অবসর নামক জীবটা এসে দু'দণ্ড বস্‌তে পারে। তার সব দরকার। এ জগতে যা কিছু দেখ্‌ছি শুন্‌ছি কর্‌ছি সবই তার "দরকার"—তার Comfortএর জন্যে। আমরা কিন্তু এই দরকারকে দেখ্‌ছি নিছক "দরকার" করে'। আমরা বল্‌ছি—এ জগতের কাছ থেকে নেব সেটুকু ঠিক যেটুকু আমার "দরকার"। ইয়োরোপের দরকারটা হচ্ছে বড়মানুষী দরকার, আর আমাদের দরকারটা হচ্ছে কৃপণতার দরকার। আমরা বল্‌ছি—কাপড়টা ত লজ্জা নিবারণের জন্যে? বেশ একটুকু কৌপীনই যথেষ্ট। ভাল পোষাকের দরকারটা কি? শুধু কতগুলো টাকা খরচ বইত নয়। বাজে খরচ—যার কোন দরকার নেই। খাওয়াটা ত বেঁচে থাকার জন্যে? দুটো চাল আর কাঁচকলা—ব্যস। চব্য চোষ্য লেহ্য পেয়ের দরকারটা কি বাপু? এই যুক্তি তর্কই বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে অগ্রসর হয়ে হয়ে আমরা এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছালেম যেখান থেকে আমাদের দিব্যি মালুম হয়ে গেল যে—আমাদের বেঁচে থাকাটারই কোন দরকার নেই। সেদিন থেকে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের পাতায় পাতায় নির্ব্বাণ মুক্তির তত্ত্বটা খুব জোর ফুটে উঠ্‌ল।

এই যে ইয়োরোপের দরকারের ব্যাখ্যা আর আমাদের দরকার তত্ত্ব, এ দুটোর মধ্যে কিন্তু আমাদের দরকারতত্ত্বের মধ্যেই মানুষের সম্বন্ধে একটা গভীরতর দার্শনিক সত্য নিহিত রয়েছে। বাস্তবিক মানুষের কিছুরই দরকার নেই। এমন কিছু নেই যা না হলে মানুষের একেবারেই চলে না। এই যে জামাটা পরছি, জুতোটা পায়ে দিচ্ছি—এই যে এটা ওটা সেটা—এসব না হলে কি মানুষের দিন কাটবে না? খুব কাটবে। ঐ যে মানুষ গাড়ীর আগে ঘোড়া লাগিয়ে ছুটছে—লোহার রেল পেতে তার ওপর দিয়ে এঞ্জিন চালিয়ে দেশ বিদেশে যাচ্ছে—আবার এরোপ্লেনে আকাশে উড়্‌ছে—এ সব না হলেও যে মানুষের খুব চলে তার প্রমাণ যে এ সব যখন ছিল না তখনও মানুষ ছিল—আর এ সব ছিল না বলে যে তারা কেঁদে কেঁদে দিন

ব্যতীত তারও কোন প্রমাণ নেই। এটা খুব সত্যি কথা যে মানুষের কিছুরই দরকার নেই। এ সম্বন্ধে আমাদের কোনই ভুল হয়নি। কিন্তু আমরা ভুল কর্‌লেম তখন, যখন সিদ্ধান্ত কর্‌লেম যে মানুষের যে এই কিছুরই দরকার নেই সেটাই হচ্ছে মানুষের সম্বন্ধে চরম-জ্ঞান—আর নির্ব্বাণ মুক্তিটা—পরব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া থিওরিটা এই চরম জ্ঞানেরই স্বাভাবিক পরিণতি অর্থাৎ logical conclusion.

কিন্তু এই যে "মানুষের কিছুরই দরকার নেই" এত বড় একটা সত্য রয়েছে—এ সত্বেও কেন আজকার মানুষ এমন? তার চার পাশে অদরকারী হাজার জিনিষের স্তূপ—হাজার হাজার বস্তু দিয়ে বিষয় দিয়ে সে আপনাকে এমনি করে' ফুলিয়ে তুলেছে যে তার আর আসল স্বরূপ দেখ্‌বার জো নেই—তার চামড়াও দেখা যায় না, গায়ের রংও দেখা যায় না। কেন এমন? তার কারণ হচ্ছে যে "মানুষের কিছুরই দরকার নেই" এ সত্যের চাইতেও একটা বড় সত্য মানুষের সম্বন্ধে আছে সেটা হচ্ছে এই যে মানুষের সত্বাটা আনন্দময় আর তার প্রকৃতি চিন্ময়ী। আর সেই জন্যেই মানুষ এ জগতে negative হয়ে থাক্‌তে পারে না কিছুতেই।

শিশু যে কাদা দিয়ে পুতুল গড়ে আর বৈজ্ঞানিক যে লোহা দিয়ে এরোপ্লেন তোয়ের করে—এর একটা যেমন অকেজো আর একটাও তেমনি অদরকারী। তবুও শিশুই বা পুতুল গড়ে কেন আর বৈজ্ঞানিকই বা এরোপ্লেনে ওড়ে কেন? এ দুটোর পিছনে একই সত্য কাজ কর্‌ছে—সেটা হচ্ছে শিশুর ও বৈজ্ঞানিকের প্রাণের আনন্দ—তাদের সৃষ্টি কর্‌বার আনন্দ। ঐ পুতুল আর এরোপ্লেন যতই মিথ্যা হোক্ যতই অদরকারী হোক্—কিন্তু শিশু আর বৈজ্ঞানিকের অন্তরের আনন্দের একটা মূল্য আছে সেটা অতি সত্য—আর ঐ পুতুল আর এরোপ্লেন মানুষের ঐ আনন্দ সত্যেরই দুটো সাকার মূর্ত্তি। এই হিসেবে ওদের মূল্যের অন্ত নেই।

বালকের অর্থহীন গোলমালই বল আর কবির ছন্দোবদ্ধ গানই বল এ দুয়ের পিছনেই রয়েছে তাদের সত্বার—তাদের existenceএর আনন্দ। আর এই যে আনন্দ-সত্য তা আমাদের ঐ দরকার-তত্ত্বের চাইতে বড়। কারণ আমাদের দরকার তত্ত্ব হচ্ছে a philosophy of negation—আর এই আনন্দ-সত্য হচ্ছে positive কিছু। আর সবার চাইতে মজার কথা হচ্ছে এই যে, এই আনন্দ-সত্য আজ আমরা সজ্ঞানে অবহেলা কর্‌ছি

আর ইয়োরোপ আজ তা অজ্ঞানে পালন কর্‌ছে।

তাই আমরা আজ যা কিছু কর্‌ছি সব আমাদের কাছে মিথ্যা হয়ে উঠ্‌ছে—নিরর্থক হয়ে উঠ্‌ছে। কারণ বস্তুর সার্থকতা ত বস্তুর মধ্যে নেই—বস্তু ত জড়। তার সার্থকতা আমার মনের মধ্যে আছে—আমার প্রাণের আনন্দ-ভাবের মধ্যে আছে। এই আনন্দই শুধু আমাকে সার্থকতা মিলিয়ে দিতে পারে। তাই ইয়োরোপ যা কিছু করে তার মধ্যে সে আপনার একটা সার্থকতা খুঁজে পায়। কারণ তার প্রাণের আনন্দ তার কাছে সত্য। তার প্রাণের আনন্দের সংস্পর্শে যা কিছু আসে তাই প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। অথচ আমাদের বলার কামাই নেই যে ইয়োরোপ জড়ের সেবক। আসল কথা হচ্ছে যে ইয়োরোপ যদি জড়ের সেবক হত তবে সে জড়কে এমন আপনার করে' নিতে পারত না—এমন করে' সে জড়ের ওপরে আপনার আধিপত্য বিস্তার কর্‌তে পার্‌ত না। ইয়োরোপ বিশিষ্টার্থে আধ্যাত্মিক নয় নিশ্চয়—কিন্তু জড় ইয়োরোপকে বাঁধে নি—তার দেহকেও না—তার মনকেও না। ইয়োরোপ যে দেহসর্ব্বস্ব নয় তার প্রমাণ—বর্ত্তমান যুদ্ধ। আর তার মনটা যে বদ্ধও নয় অন্ধও নয় তার প্রমাণ—তার সচলতা।

জড়, জড় তখন যখন মানুষের মন হয়ে ওঠে অচল। অচল মনের ওপরে যা কিছু পড়ে তাই তার বোঝা হয়ে ওঠে। পাষাণ-প্রতিমা পাথরের টুকরো হয়ে ওঠে তখন যখন পূজকের মনে আর পূজার আনন্দ নেই—আছে শুধু পুণ্যলাভের কল্পনা—স্বর্গলাভের কামনা। তাই আজ আমরা যা কিছু কর্‌ছি তা আর আমাদেরকে অমৃত মিলিয়ে দিতে পার্‌ছে না—দিচ্ছে আমাদেরকে বন্ধন পরিয়ে।

এটা খুব সত্যি কথা যে মানুষের কিছুরই দরকার নেই। তার শুধু একখানি কৌপীন আর দুটী চাল হলেই চলে যায়। কিম্বা কৌপীনটাকেও বাদ দেওয়া যেতে পারে—উলঙ্গতেই বেশ চলে যায়—শুধু দুটী চাল হলেই হল। কিম্বা চালেরও দরকার নেই—কারণ তার বাঁচারই বা দরকার কি? কিছুই না। মানুষের দিক থেকে ত কোনই দরকার নেই—ভগবানের দিক থেকে কোন দরকার আছে কি না তা ত আমরা জানিই না—আর যদি বা থাকে সেটা ত আমরা মানিই না। কিন্তু তবুও যে মানুষ বেঁচে আছে—তার অন্তরে বাহিরে হাজার বিষয়ের হাজার স্তূপ সাজিয়ে—কেন? কারণ মানুষ একটা negative formula নয়—মানুষ হচ্ছে

একটা positive জীব। এই জীবকে বাঁচিয়ে রেখেছে আনন্দ—আর মানুষের সম্বন্ধে যা কিছু তা এই আনন্দেরই অভিব্যক্তি।

ত্যাগের মধ্যেও রয়েছে ত্যাগীর আনন্দ। যে ত্যাগী তার ত্যাগের মধ্যে কোন আনন্দ পায় না, তার ত্যাগ মিথ্যা। আর মিথ্যা যেটা সেটাই মানুষের বোঝা—সেটাই তাকে দুঃখ পাইয়ে দেয়। যদি বল যে দুঃখ পাইয়ে দিক্ কিন্তু এই দুঃখের ভিতর দিয়ে মানুষ এমন একটা পরম স্থানে গিয়ে পৌঁছে যাবে যেখানে সকল দুঃখের অবসান—যেখানে সে পাবে শুধু অন্তহীন আনন্দ। কিন্তু মানুষের যেটা মিথ্যা সেটা তার অধর্ম। এই মিথ্যার ভিতর দিয়ে কোন দিন সে সত্যে পৌঁছাতে পার্‌বে না—অধর্ম্মের ভিতর দিয়ে কোন দিন তার মুক্তি মিল্‌তে পারে না—যদি বা মেলে তবে সেটা গোঁজা মিলনের মতো একটা কিছু। শাক্যসিংহ ত্যাগ করেছিলেন, ঐশ্বর্য্য আর ভোগ তাঁর মিথ্যা হয়ে উঠেছিল বলে—আর সেই জন্যেই তাঁর ত্যাগে ছিল তাঁর আনন্দ—তাই তিনি হয়েছিলেন শুদ্ধ বুদ্ধ—তাই তিনি পেয়েছিলেন ঐ পথে অমৃত। কিন্তু সেই দেখাদেখি যদি আজ ভারতের যত রাজপুত্র আছে তারা সমস্ত ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যায় তবে তাতে তাদের লাভ হবে শুধু দুঃখ আর দারিদ্র্য—এই দুঃখ আর দারিদ্র্যের মাঝে তাদের অমৃত মিল্‌বে না কিছুতেই। কারণ কোন বিষয়েই মানুষের অমৃত মিলে না যদি না মানুষের অন্তরের ঠাকুর সেটাকে বরণ করে নেন। আর মানুষের অন্তরের ঠাকুর যে দুঃখ দারিদ্র্যেরই একান্ত পক্ষপাতী তার প্রমাণ আমরা মানুষের ইতিহাসে এ পর্য্যন্ত পাই নি।

আসল কথা মুক্তিই বল আনন্দই বল তা মানুষের ত্যাগেও নেই ভোগেও নেই আছে তার সত্যের মধ্যে—তার জীবনদেবতার প্রেরণার মধ্যে—তার "ঠাকুর যা চান" তার মধ্যে।

এই যে মানুষের অসংখ্য বস্তু বা বিষয় আহরণের ক্ষমতা, ভোগের ক্ষমতা—এটা তার আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপন্থী নয়—এটা তার প্রাণের আনন্দ-প্রাচুর্য্যেরই চিহ্ন। রোগীর আহারে অরুচি যেমন তার ত্যাগের ফল নয়—সেটা তার রোগেরই একটা চিহ্ন—তেমনি যে-জাতির এই জগতের প্রতি অরুচি দেখা দিয়েছে সেটা সে জাতির আধ্যাত্মিকতার চিহ্ন মোটেই নয়—সেটা তার অসুস্থতারই চিহ্ন—আনন্দহীনতার লক্ষণ—সেটা হচ্ছে তার মৃত্যোন্মুখ প্রাণের মৃদুস্পন্দন জ্ঞাপক। কারণ আনন্দের ধর্ম্মই

হচ্ছে মিলন—অন্তরের সহিত বাহিরের—মানুষের যে প্রাণের আনন্দ সে আনন্দের রতিই হচ্ছে গতিতে—বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে—রূপ থেকে রূপান্তরে—রস থেকে রসান্তরে। কারণ আনন্দের ধর্ম্ম Subtraction নয় আনন্দের ধর্ম্ম হচ্ছে Multiplication. আর তাই অদরকারী হলেও হাজার হাজার বস্তু ও বিষয় দিয়ে মানুষ আপনাকে ফুলিয়ে তুলেছে।

সুতরাং আজকাল যে আমরা আমাদের চরম Simplicity নিয়ে যখন তখন বড়াই করি সেটা হচ্ছে আমাদের প্রাণের আনন্দহীনতার লক্ষণ—মানুষের বেঁচে থাকায় যে একটা স্বাভাবিক আনন্দ আছে আমরা সেটার অনুভব হারিয়েছি। ভগবানের নিয়মানুসারে—সৃষ্টির ধর্ম্ম অনুসারে এই আনন্দ মানুষের অত্যন্ত সহজলভ্য—তেম্‌নি সহজলভ্য যেমন সহজলভ্য তার নিশ্বাস নেবার বাতাস। যার জীবনের এই আনন্দ ধর্‌বার জন্তে দিনে দশবার করে’ কুম্ভক কর্‌তে হয়—পঞ্চাশ বছর ধরে এক প্রাণায়াম করেই কাটিয়ে দিতে হয়—তখনই বুঝ্‌তে হবে যে তার নির্ব্বাণের দিন ঘনিয়ে এসেছে। কারণ আনন্দই সৃষ্টির সত্য—নিরানন্দ মিথ্যা। সত্যের চাইতে মিথ্যাটা সত্য হয়ে ওঠে সৃষ্টির ধ্বংসেরই জন্তে। যেমন মানুষের স্বাস্থ্যই সত্য। যার স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে ডোজে ডোজে অশ্বগন্ধা ওয়াইন খেতে হয়, হাজার হাজার পঞ্চতিক্ত বটিকা গিল্‌তে হয়—তার দেহটা পচ্‌বার বড় বেশী বিলম্ব থাকে না। ইয়োরোপ কুম্ভকও করে না প্রাণায়ামেরও ধার ধারে না কিন্তু তার জীবনে যে আনন্দ আছে তা আমাদের নেই। আর সেইজন্যে ইয়োরোপের লোক আপনার জীবনটাকে যতখানি সত্য করে’ পায় সার্থক করে’ পায় আমরা তা পাইনে। এর উত্তরে অবশ্য একটা সনাতন জবাব আছে যে ইয়োরোপ জীবনটাতে মজে আছে বলে সে মরণটাকে ভয় করে। ইয়োরোপের লোক মর্‌তে ভয় পায়—এটা একটা ঘোর মিথ্যা কথা—তার চাইতে ঢের বেশী ভয় পাই আমরা যদিও আমরা জগৎটাকে মায়া বলে নিতান্তপক্ষে নশ্বর বলে উড়িয়ে দি। এর উত্তরে কেউ হয়ত বল্‌বে—জীবন মরণের কথা ছাড়। ইয়োরোপ ভগবানকে পায় নি। আমরাই যে ভগবানকে পেয়েছি—আমাদের মুখ চোখ দেখলে—আমাদের অন্তরের স্পন্দন শুন্‌লে কোন বুদ্ধিমানেরই তা মালুম হবে না। আসল কথা ইয়োরোপ ভগবানকে পায় নি—আমরাও ভগবানকে হারিয়ে বসে আছি। কিন্তু ইয়োরোপ বেঁচে থাকায় যে সহজ-

সত্য আনন্দ তা থেকে আজও বঞ্চিত হয় নি। আর আমাদের মধ্যে যারা একটু adventurous ধরণের লোক তারা এই আনন্দকে ধর্‌বার জন্তে দু'বেলা বেলের পাত চিবিয়ে—চার ঘণ্টা আসন করে' কাটিয়ে—ছ'ঘণ্টা অনুষ্টুপ ছন্দের মন্ত্র আওড়িয়ে—জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত কাটিয়ে দিচ্ছে। আর তাতে দশজনের বাহাবাও লাভ কর্‌ছে।

জীবনের এই যে স্বাভাবিক সহজলভ্য আনন্দ তা আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠা করা ত দূরের কথা—সে-আনন্দ আমাদের জীবনে ফিরিয়ে আনবার পথে যত বাধা বিঘ্ন সম্ভব তা আমাদের ধর্ম্মব্যাখ্যাতারা জড় করে' সাজিয়ে রেখেছেন। প্রথমতঃ—সৃষ্টিতত্ত্বের যে আনন্দ দিয়ে অন্তর পূর্ণ কর্‌তে চাচ্ছি—ধর্ম্মব্যাখ্যাতা বল্‌ছেন যে সেই সৃষ্টিটাই মিথ্যা—মায়া ফাঁকি ভগবানের দাগাবাজি—এখানে সৃষ্টিও নেই আনন্দও নেই। বোসো পদ্মাসন হয়ে—নিশ্বাস টেনে—চোখ উল্‌টিয়ে যদি আনন্দ চাও। আবার যারা ভগবানকে নেহাৎ তেমন জুয়োচোর বল্‌তে নারাজ তারা বল্‌ছেন হাঁ—সৃষ্টিটা একরকম আছে বটে তবে ওটা নশ্বর। এই সব কথা শুন্‌তে শুন্‌তে এম্‌নি অবস্থায় আমরা এসে পড়্‌লেম যে আমরা মনে মনে বল্‌তে লাগ্‌লেম যে এই সৃষ্টি যদি মিথ্যাই হয় তবে এই সৃষ্টির সঙ্গে কারবারটা উঠিয়ে দেওয়াই ভাল। সেদিন থেকে আমাদের জাতিটার মধ্যে এমন একটা Unconscious Will এর সৃষ্টি হল যে Will টা আমাদের বেঁচে থাকার আনন্দের ওপরে একটা প্রকাণ্ড অচলতার ভার চাপিয়ে দিলে। ধীরে ধীরে যখন আমরা এই আনন্দকে সম্পূর্ণ করে' হারিয়ে ফেল্‌লেম তখন এই সৃষ্টিটা বাস্তবিকই আমাদের কাছে অসত্য হয়ে উঠ্‌ল। কারণ মানুষের যাতে আনন্দ নেই তাতে তার সত্যও নেই। কারণ আনন্দই হচ্ছে গোড়ার কথা—তারপর চিৎ—তারপর সৎ।

এখন আবার সেই সৃষ্টির সহজলভ্য আনন্দকে জীবনে ফিরিয়ে আন্‌তে হলে আমাদের ঠিক উল্‌টো দিকে দাঁড় টান্‌তে হবে। আমাদের জাতির মনে এমন একটা Conscious Willএর সৃষ্টি কর্‌তে হবে যেটা বল্‌বে যে এই জগৎ সত্য—এই জগতেই আছে অমৃত—আছে আনন্দ। এ যেন এক রকমের মন্ত্র। এই মন্ত্রের গুণে আমাদের বুকে বুকে যে স্পন্দন শতাব্দী শতাব্দী ধরে থেমে ছিল তা ধীরে ধীরে দেখা দেবে—যে প্রাণের স্রোত নিষ্ক্রিয়তার বালিতে ভরাট হয়ে উঠেছিল তা আবার অদম্য বেগে ছুট্‌বে—মনের

আশা আকাঙ্খা বা সংকীর্ণ হয়ে হয়ে শুধু উদরের দুটী শাক অন্নে এসে ঠেকেছিল তা আবার সারা বিশ্বকে আলিঙ্গন কর্‌তে চাইবে। এমনি করে' ধীরে ধীরে আমাদের জীবনে ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, অক্ষমতার বদলে বৃহত্তের, উদারতার, সামর্থ্যের প্রতিষ্ঠা হবে—তখন আমরা আমাদের স্বরূপকেও বুঝ্‌ব—আর ভগবানকেও চিন্‌ব তখন। কারণ নিজেকে না জান্‌লে ভগবানকে জানা যায় না—আর তার কারণ হচ্ছে এই যে God made man in his own image. কিন্তু এ জানার মানে নিজের কিছু বাদ দিয়ে জানা নয়—"নেতি নেতি" করে' জানা নয়—"ইতি ইতি" করে' জানা। এই রকম করে' আমরা দেখ্‌তে পাব যে আমাদের ইন্দ্রিয়-খানি জ্ঞানের দ্বারই নয়, ভোগের দ্বারও বটে, ভগবানের দ্বারও বটে। মানুষ যেদিন তার ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়ে ভগবানকে আর ভোগকে একসঙ্গে তার জীবন-দেবতার কাছে পৌঁছে দিতে পার্‌বে সেদিন মানুষ হয়ে উঠ্‌বে সত্যতম, দীপ্ততম, মুক্ততম। আর আমাদের অন্তরটাও সেদিন পূর্ণ হয়ে উঠ্‌বে আনন্দে—কারণ যেখানেই মানুষ সত্য সেখানেই তার আনন্দ।

যেদিন আমরা আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ব সেদিন দেখ্‌তে পাব যে এই সৃষ্টিটা অদরকারী বলেই এ পৃথিবীর হাজার বস্তু হাজার বিষয় মানুষের অপ্রয়োজনীয় বলেই তাতে মানুষের এত আনন্দ। কারণ যেখানেই দরকার সেখানেই দাসত্ব। হাজার হাজার জিনিষ মানুষের কোন দরকার নেই বলেই তাতে তার মজা। এ সৃষ্টির ভিতরের কথাটাও ঐ।

যে ভগবান-সিদ্ধ সত্যে গড়া সেই সত্যে যেদিন আমরা সত্য হয়ে উঠ্‌ব সেদিন আমরা ঐ কৃপণতার দরকারকে অতিক্রম করে' বড়মানুষী দরকারে গিয়ে উঠ্‌ব। কারণ আমাদের অন্তরটা তখন বড়মানুষ হয়ে উঠ্‌বে—মানুষের বেঁচে থাকার সহজলভ্য আনন্দের ঐশ্বর্য্যে। আর অন্তরটা যেদিন আমাদের বড়মানুষ হয়ে উঠ্‌বে সেদিন বাহিরেও আর কেউ আমাদেরকে ছোট করে' রাখ্‌তে পারবে না। কারণ মানুষের বাহিরটা তার অন্তরের সত্যেরই প্রতিবিম্ব অর্থাৎ reflection.

কালী

ব্রহ্মাণ্ডের অসীম গগনে পথহারা ভ্রষ্ট মহীতল
—ভয়ঙ্করী কে তুমি রূপসী ?—শ্বাসে তব কাঁপে টল্‌মল্ !
মূর্ত্ত হেরি জাগে বিভীষিকা—বাঞ্ছা তবু করালবদনি !
হৃদে ধরি ঐ পদাম্বুজে পূজি তোমা ভীষণা পাষাণী ;
রক্তমাখা বক্ত্র দিয়া তব উদ্গারিছ হলাহল বিষ
তবু ছুটি ঐ রাঙ্গাপায় কুড়াইতে তব শুভাশীষ !

ক্ষিপ্ত হয়ে ধ্বংস সাথে ছুটে প্রভঞ্জন ইঙ্গিতে তোমার,
অন্তরালে তার শুনি বাজে মঙ্গলের মোহন ঝঙ্কার !
মরণের অন্ধ বিভীষিকা গ্রাসে যবে সকল স্বপন,
অন্তরালে দেখি, দীপ্ততর স্বপ্নখানি রেখেছ গোপন !
অমঙ্গলে ঢাকি' বীরবপু কে তুমি গো মঙ্গলদায়িনী
পিশাচীর সাজে সাজিয়াছ ত্রিভুবনে কিনি ছায়াখানি ?

নিঠুর-বিরহ-মধু-গীতি প্রণয়ের বিরতিবিহীন,
হুথানল পাষাণিয়া হৃদি করে আঁখি শুষ্ক বারিহীন,
অমঙ্গল মঙ্গল প্রসূতি, প্রলয়ের সৃজন-বারতা,
নিয়তির চিত্রপটখানি বক্ষে তব সবই দেখি গাঁথা !
মদমত্ত মূঢ় ভ্রান্ত জীব অসহায় জলবিম্ব প্রায়
তব হুহুঙ্কারে ভাসি পুনঃ কটাক্ষের ইঙ্গিতে মিলায় !

ভ্রম সংশোধন

৩৪৪এর পৃষ্ঠা দরকার প্রবন্ধের প্রথম প্যারায়

৩	লাইনে	বল্‌ছি	এর পরে	‘এই’	বসিবে।
৯	„	discoveryই বল	„	‘আর যাই বল,’	„
৯	„	মানুষের আনন্দ—	„	‘প্রকাশ কর্‌বার আনন্দ’	„

অন্তঃ-প্রেরণা

সেথায় অয়নে—মানুষের গভীরতর প্রেরণা; কিন্তু প্রবৃত্তির লক্ষ তরঙ্গে পড়িয়া প্রতিনিয়ত সেই মহৎ-লক্ষ্য-চ্যুত হইয়া মানুষের বুদ্ধি ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। তাই ত করিতে হইবে তপস্যা—বিভ্রান্তকারী যে শত মনোলোভা দৃশ্য নয়ন সমক্ষে ফুলঝুরির মত ফুটিয়া উঠিতেছে, বাহিরের দিকে আশার কুহকিনী ছলনায় মুগ্ধ করিয়া চিত্তকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, মানুষের কল্পনাকে আকাশকুসুমের মোহময় স্বপ্নস্তবক রচনায় ব্যাপৃত রাখিয়া আত্মার গভীরতম বাণী শ্রবণ দুরূহ করিয়া তুলিতেছে—নবীন বাংলাকে কঠোর তপশ্চর্য্যায় সেই সমস্ত বিভ্রম ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া সরল সত্যের পথে চলিতে আরম্ভ করিতে হইবে।

এ একটা গতানুগতিকতাবিরুদ্ধ সম্পূর্ণ নূতন পথ। আমাদের বহির্ম্মুখী যে তরল আবেগময়ী প্রবৃত্তি উপরে ভাসিয়া ভাসিয়া চলিতেই জানে, সর্ব্বাগ্রে তাহাকে মোড় ফিরাইয়া অন্তরের মণিকোটায়, যেথানে অলোজ্জ্বল নিত্য-উৎসারিত আত্মজ্যোতিঃ—তাহারই অভিমুখে সঞ্চালিত করিতে হইবে। আত্মার সে উদ্ভিন্ন আলোকচ্ছটা না পাইলে, সহজ ও সুরম্য মার্গকেই সত্যের, অমৃতত্বের পথ বলিয়া পদে পদে ভ্রম করিব, ফেণায়িত যে উর্ম্মিমালা উপরে ফুটিয়া ফাটিয়া পড়িতেছে, তাহাকেই বস্তুতন্ত্র বলিয়া আঁকড়িয়া ধরিতে ছুটিব, যতটুকু হইয়াছে, তাহারই চতুষ্কোণের মধ্যে যাহা হইতে হইবে, সেই অন্তরের অফুরন্ত ভবিতব্যকে সীমাবদ্ধ করিয়া সত্যের অনন্ত বিকাশ বিলম্বিত করিবার বৃথা প্রয়াস করিব।

ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি—সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্ববিভাগে আমাদের চিত্ত তারল্য প্রতিবিম্বিত হইয়া পড়িতেছে। প্রদেশে প্রদেশে যে হাস্যোদ্দীপক প্রহসনাভিনয়টা হইয়া গেল—সেটা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। এই যে মহানগরী কলিকাতার একটা বৈঠকে সারা ভারতের হিন্দু মুসলমান জননেতৃমণ্ডলী রাজনৈতিক, সামাজিক ধর্ম্মসম্মিলনে ভাগ্যগবেষণায় প্রবৃত্ত হইবেন, এই যে সহস্র সহস্র মুদ্রাব্যয়ে নির্ম্মিত বক্তৃতামঞ্চের উপর দেশের সমষ্টীকৃত মনীষার বিনিয়োগে জাতির

আত্মশাসন-তন্ত্র লাভের সঙ্কল্প নিরূপিত হইবে, এই যে একটা বিপুল উৎসাহপূর্ণ, উত্তেজনাময় উদ্যোগ ও আয়োজন—ইহা মনোমুগ্ধকর আত্মপ্রকাশ সন্দেহ নাই। আমার দেশ, আমার জাতি আজ যাহা হইয়াছে, যে চরিত্রসম্পদ লাভ করিয়াছে এ সকল অসংশয়ে তাহারই বিচিত্র বিকাশ—আমার জাতির এই যে নিখুঁত আলেখ্য নয়ন সমক্ষে পাইতেছি, তাহা নয়ন ভরিয়াই দেখিব—কিন্তু দৃষ্টি ঝলসিত হইতে দিলে চলিবে কেন? নয়নের অভ্যন্তরে যে নয়ন, সে যে আজ দেখিতে চায়, এই প্রত্যক্ষ বাহ্যবিকাশের অন্তরালে, অন্তরের গভীরতম তলে ভগবানের কোন্ মহা অভিপ্রায় জ্বলিয়া উঠিতে ব্যাকুল—আত্মার গভীর কন্দরে কান পাতিয়া না থাকিলে কেমন করিয়া ভগবানের সেই অভ্রান্ত বাণী ঝঙ্কৃত হইতে শুনিব?

এই মহাজাতির মধ্যে ভগবান্ আপনার প্রকাশ চাহিতেছেন—কিন্তু উত্তেজনাপূর্ণ চপল বাহ্যতরঙ্গকেই যদি সারসর্ব্বস্ব মনে করিয়া, হৃদয়ের আধ্যাত্মিক দৈন্যকে শূণ্যগর্ভ মনশ্চাঞ্চল্যে, আবেগময় অধীর বুদ্‌বুদবিকাশের দ্বারাই ঢাকিয়া রাখিতে চাই, তাহা হইলে কোন দিন আমরা সে মহাসত্তার সন্ধান আপনার মধ্যে পাইব না। কাল, শক্তি, চিন্তা, উৎসাহ—এ সকল বিধাতার কর্ম্মোপকরণ--তাঁহার উপকরণ তাঁহারই চরণে উৎসর্গপূর্ব্বক শুদ্ধ করিয়া না লইলে, ক্ষুদ্র বুদ্ধির মুগ্ধকরী ছলনার বশে আশার মরীচিকার অনুধাবনে সে সকলের বৃথা অপচয়মাত্র হইবে। অহঙ্কার স্বেচ্ছায় আত্মসংশোধন না করিলে, একদিন প্রকৃতি কঠোর বজ্রাঘাতের দ্বারা সে সংশোধনের ভার আপনার স্কন্ধে লইবেই লইবে।

বুদ্‌বুদ রঙ্গীন হইলেও তাহা বুদ্‌বুদ—অন্তরে যদি তপস্যার ভার না থাকে, অহঙ্কার মানুষকে আকাশে এই বুদ্‌বুদ উড়াইবার খেলাই খেলাইবে—ইহাই স্বাভাবিক। দেশের মনীষীবৃন্দ এমন এক স্থানে গিয়া উপনীত হইয়াছেন, যেখানে হাওয়ায় মানুষ উড়ানটাই স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে—আগ্রহ থাকিলেও, সে উচ্চ মঞ্চ হইতে নামিয়া তাঁহারা দেশের মর্ম্মস্থল কোনখানেও স্পর্শ করিবার সামর্থ্য হারাইয়াছেন, ক্ষণপ্রভার চকিত আলোকে দেশের দিগ্‌ভ্রান্ত চিন্তাশক্তি জাতির প্রাণকেন্দ্র হইতে কক্ষচ্যুত, জাতির তলে তলে পুঞ্জীভূত মর্ম্মবেদনার ফল্গুধারায় অবগাহনে অক্ষম---দেখিতেছি, এই বিষম ব্যামোহ ভেদ করিয়া একমাত্র কবির ভবিষ্যদৃষ্টিই জাগ্রত, সুদূর

প্রসারিত। প্রণিধান কর রবীন্দ্রনাথ মরীচিকালুব্ধ প্রমত্ত জাতিকে ডাকিয়া যে কালোপযোগী সতর্কতাবাণী শুনাইয়াছেন—ধর্ম্মের, ত্যাগের, তপস্যার, অপরাজেয় চরিত্রবলের উপরই নেশনের বনিয়াদ গড়িতে হইবে—নতুবা শুধু বাক্যছলায়, চঞ্চল নাট্যলীলায় (Sensational demonstrations) যে স্বপ্নপুরীর রচনা করিব জগতের হাটে তাহার মূল্য দাঁড়াইবে কতটুকু!

উদীয়মান্ নবীন জাতিকে বলি—উত্তেজনায় আর আত্মবিহ্বল হইয়া অন্তরের প্রেরণাকে ব্যর্থ করিবার অনর্থক প্রয়াসে শক্তিক্ষয় করিও না। যে প্রেরণার মূলে শুধু আশার সুখস্বপ্ন, আত্মোৎসর্গের বিশ্বজয়ী পণ নাই, বাহিরের উত্তেজনা-তরঙ্গেই যাহার গতি ও রতি, অস্থি মজ্জা নিঙড়াইয়া উপযুক্ত মূল্যে অভীষ্ট ক্রয় করিবার সামর্থ্য ও প্রচেষ্টার যেখানে অভাব—তাহা আজ যতই বস্তুতন্ত্র, যতই বিরাট মহামন্দির গড়িয়া তুলুক না কেন, স্বপ্নতরঙ্গের মত দুর্ব্বার কালস্রোতে কোথায় ভাসিয়া যাইবে। এ সব শৈবালমালা যেমন স্রোতে ভাসিয়া আসিয়াছে, তেমনিই স্রোতে ভাসিয়া চলিয়া যাক্—ভ্রুক্ষেপ করিও না—এস তুমি সত্ত্বার সেই অগাধ জলধিগর্ভে নামিয়া—আত্মার সেই দেবজন্মের আদেশবাণী যেখানে উদাত্তস্বরে ধ্বনিত হইতেছে—সেই আদি বীজধ্বনি শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া যাও—এই তপস্যা ভিন্ন অহঙ্কার-ক্ষয়ের আর অন্য পন্থা নাই—স্থির জানিও এই অহঙ্কারের সমাধির উপর যে মহাপ্রেরণা জাগিবে—সে দীপ্ত দিব্যপ্রেরণার সম্মুখে কোন বাধা, কোন প্রত্যবায় একদণ্ড তিষ্ঠিতে পারিবে না—"নেহাতিক্রমনাশো ঽস্তিপ্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে"।

ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ

উপনিষদ গাথার তুলনা নাই। উহা কেবল পড়িবার জিনিষ নয়, উহা ধ্যান করিবার জিনিষ। এমন কি শুধু ভাবমুগ্ধ হইয়াও উহার সমস্তখানি সত্য সৌন্দর্য্য মহত্ত্ব আমরা আস্বাদন করিতে পারি না। কারণ ভাবাবেশে আমরা পাই আবছায়া কথা, বেশীর ভাগ তাহা মনগড়া কল্পনার সৃষ্টি, বড় জোর না হয় ধরিতে পারি মোটামুটি বক্তব্য যতটুকু। কিন্তু উপ-

নিষদ এই রকম খুব সাধারণভাবে বুঝিলে কিছুই বুঝা হইল না। উপনিষদের প্রত্যেক বাক্য, প্রত্যেক শব্দ, এমনি প্রত্যেক বর্ণ চয়ন করিয়া তবে বসান হইয়াছে, উহার প্রত্যেকটিই দরকারী বিশেষ অভিব্যঞ্জনা, বিশেষ অর্থদ্যোতনার জন্য। একখানি চিত্রে যেমন থাকে একটা সাধারণ-ভাব, সেই সাধারণ ভাবটি সমস্তখানি পটে ছাইয়া রহিয়াছে কিন্তু এই সাধারণ ভাবটিকে অর্থগৌরবে ভরাট করিয়া ফুটাইয়া তুলিবার জন্য দরকার হইয়াছে প্রত্যেক টান প্রত্যেক রং প্রত্যেক ভঙ্গিমা—ইহাদেরও আছে একটা বিশেষ ভাব বিশেষ অর্থ। উপনিষদের গাথার মধ্যেও সেই-রকম কোন কিছু নিরর্থক, নিষ্প্রয়োজন বা অপ্রয়োজন নাই—তাহার মধ্যে পাদপূরণ বলিয়া কিছু নাই—সবই Significant.

* * *

অন্য কথায়, আমাদের উপনিষদ শুধু দর্শন নয়, শুধু কবিতা নয়, আমাদের উপনিষদ হইতেছে মন্ত্র। আজ কাল আমরা মন্ত্র বলিয়া কিছু আছে তাহা মানি না, বলি এসব কুসংস্কার বর্ব্বরসুলভ নির্ব্বুদ্ধিতা। কিন্তু মন্ত্র জিনিষটি যে আদৌ কি রকম বস্তু তাহা বুঝিবার কোনই আয়াস লই না। আমরা মনে করি, সচরাচর মুখে যেমন কথা বলি, সেই রকমই একটা কথা স্থানের অভাবে, অবসরের অভাবে সুবিধার জন্য সংক্ষেপে গড়িয়া লই আর ইহাকেই নাম দেই মন্ত্র, এরকম কথার আবার বিশেষ কি মাহাত্ম্য থাকিতে পারে? কিন্তু বাস্তবিক তাহা মোটেও নয়। হ্রীং ক্লীংকে শিশুর প্রলাপ বলিয়া উপহাস করি কিন্তু ধীর স্থির হইয়া বিচার করিতে চেষ্টা করি না, যাঁহারা এই প্রলাপকেই জীবনসাধনার ব্রত করিয়া লইয়াছিলেন তাঁহারা এত বড় মূর্খ হইলেন কি করিয়া, না, তাঁহারাও একটা সত্যকেই পাইয়াছিলেন, এই সত্যকেই ধরিয়া সাধনা করিতেছিলেন।

* * *

ব্রহ্ম বা আত্মা বা মূল সত্য যাহা তাহা শুধু সৎ নয়, তাহা আবার তপঃ অর্থাৎ তাহাতে রহিয়াছে শক্তির গতি—শক্তির এই গতি-তরঙ্গ হইতে উত্থিত হইতেছে এক মূর্চ্ছনা, এক ছন্দ, এক শব্দ, এক ধ্বনি। মূল শক্তি যেমন বহুধা হইয়া ক্রমে আপনাকে সূক্ষ্ম হইতে স্থূলতর রূপে ঢালিয়া দিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে, সেই সঙ্গে যুগপৎ সেই মূল শব্দব্রহ্ম সেই

অনাহত বাণীরও ক্রমবিবর্ত্তন চলিয়াছে। মানুষের ভাব চিন্তা জ্ঞান তপঃশক্তির চৈতন্যের দিকটা প্রতিফলিত করিতেছে, মানুষের ভাষাও তেমনি তপঃশক্তিরই বীজধ্বনি লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে—মন্ত্র চেষ্টা করিয়াছে ভাষার মধ্যে সেই মূল অবিকৃত নাদব্রহ্মকে স্ফুট জাগ্রত করিয়া ধরিতে। কারণ, মানুষ যতই তাহার আদিম অধ্যাত্ম প্রকৃতি হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছে, দিব্যজ্ঞানের পরিবর্ত্তে আসিয়াছে বিচার বিতর্ক অনুমান সিদ্ধান্ত, তাহার ভাষাও হারাইয়া ফেলিয়াছে বীজধ্বনির, মন্ত্রের প্রতিভা, অর্থের যে আপন বিগ্রহ বাক্ তাহার পরিবর্ত্তে সে রচিয়াছে মনগড়া শব্দ বাক্য। অর্ব্বাচীন যে ভাষা তাহার মধ্যে যাঁহারা কবিশ্রেষ্ঠ তাঁহাদেরই মধ্যে কথঞ্চিৎ পাই এই মন্ত্রের দ্যোতনা, তাই তাঁহাদিগকে বলি মন্ত্রদ্রষ্টা, ঋষিকবি। উপনিষদের ঋষি কবির মধ্যে এই মূল আদিম মন্ত্রশক্তির দ্যোতনা আরও স্পষ্ট, আরও নিবিড়।

* * *

এই উপনিষদের মন্ত্র কিন্তু আমরা পড়ি ও বুঝিতে চেষ্টা করি একটা অস্পষ্ট অনুবাদের মধ্য দিয়া। তাই সেখানে যে সব সূক্ষ্ম বর্ণসম্পাত রহিয়াছে তাহা কিছু ধরিতে পারি না—একটা স্থূলহস্তের অবলেপে সে সকলকে একাকার করিয়া ফেলি। উপনিষদ যে সকল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহাদের বর্ত্তমান কালে যে অর্থ সেই অর্থ দিয়াই আমরা উপনিষদের ব্যাখ্যা করি। অথবা বর্ত্তমান কালে সে শব্দের ব্যবহার না থাকিলে বর্ত্তমান কালের শব্দের যে মূল্য দিয়া থাকি তাহারও সেই মূল্যই নিরূপণ করি। আধুনিক ভাষা সকলের ন্যায়, উপনিষদের ভাষাও অর্থের একটা কৃত্রিম বাহন মাত্র—এরূপ বলিলে একটু ভুলই হইবে। উপনিষদের প্রত্যেক শব্দের সহিত কিন্তু মিশিয়া রহিয়াছে সেই শব্দেরই একটা মৌলিক ভাব, একটা নৈসর্গিক অর্থ ব্যঞ্জনা—সেইটুকুর না ব্যাখ্যা দিতে পারিলে উপনিষদ গাথা অব্যাখ্যাতই রহিয়া যায়।

* * *

ধর উপনিষদের এই প্রশস্তি গাথাটি—

স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভিঃ।
ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥

ইহার একটি প্রচলিত অনুবাদ এইরূপ আছে দেখিয়াছি: "স্থিরতর

অঙ্গসম্পন্ন দেহে স্তোত্রপরায়ণ হইয়া দেবগণের হিতকর যে আয়ু তাহা যেন ভোগ করিতে পাই"। মহামন্ত্রের যে মহত্ত্ব, যে গাম্ভীর্য্য, যে চমৎকারিতা তাহার নিদর্শন কিছু পাওয়া দূরের কথা, এ কথাগুলির যে কোন বিশেষ অর্থ আছে তাহা আমরা জানি না। অনুবাদক উপনিষদের ভাবরাজ্যে মোটেও যাইতে পারেন নাই; কোন চেষ্টাও করেন নাই। মূলে যাহা আছে যথা সম্ভব সেই কথাগুলিই হুবহু অনুবাদে বসাইয়া দিয়াছেন, ঋষিকবি সে শব্দগুলির দ্বারা কোন্ অর্থ কোন্ ভাব ফুটাইতে চাহিয়াছেন তাহার কোন ইঙ্গিত এখানে পাই না।

* * *

উপনিষদ বলিতেছেন, সেই "আয়ু", সেই জীবন, সেই প্রাণশক্তিতে ভরপুর জীবন প্রবাহ যাহা নিহিত দেবসত্তার মধ্যে, যাহাকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিয়া ধরিয়াছে ভাগবত সত্ত্বা (দেবহিতং), সেই জীবনকেই যেন আমরা অধিকৃত অধিগত করিতে পারি, উহাই যেন ভোগ করিতে পারি আর সেই অধিকার সেই ভোগ হইবে না অল্প, হইবে না খণ্ডিত, তাহা হইবে সুবিস্তীর্ণ, বিপুল, পূর্ণ-ভূমা (বি+অশেম)। এই বিরাট দিব্যজীবন পূর্ণরূপে ভোগ করিতে হইলে, তাহার অধিকারী হইতে হইলে কি প্রয়োজন? সে জন্য চাই প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইবে স্থির অচঞ্চল, "আপূর্য্যমানং অচলপ্রতিষ্ঠং" —দেবজীবনের যে মহান্ অর্ণব তাহাকে ধারণ করিবার ভরপুর সামর্থ্য, সে তাহার সকল ঐশ্বর্য্য সকল বিভূতি লইয়া আবির্ভূত হইবে কিন্তু কোন ইন্দ্রিয় শ্রান্ত হইবে না, টলিবে না। আধারের প্রতি অঙ্গ, আর প্রতি অঙ্গের যে প্রতি তনু, প্রতি আয়তন, প্রতিক্ষেত্র—দেহ মন প্রাণ প্রভৃতি সকল স্তরের, সকল ধর্ম্ম সকল কর্ম্ম সকল ভোগ—এ সকলের মধ্যে, সকলকে ঘিরিয়া উদ্বোধিত করিব সেই স্তোম, সেই মন্ত্র, সেই ব্রহ্মবাণী, সেই ভাগবত প্রেরণা যাহা সে 'দেবহিত' জীবনকে প্রতিনিয়ত বিধৃত রাখিবে, স্থিরপ্রতিষ্ঠ করিবে (তুষ্টুবাংসঃ)।

* * *

জীবন চাই, প্রাণের খেলা চাই, এই পার্থিব আয়তনে যে লীলা তাহাই চাই। এই আয়ুকে বিপুল করিয়া, মহৎ করিয়া, সম্পূর্ণরূপে কুণ্ঠাহীন হইয়াই ভোগ করিতে চাই। কিন্তু সে জীবন এক দিকে যেমন বিরাগীর জীবন নয়, অন্যদিকে তেমনি পশুরও জীবন নয়। তাহাকে গড়িয়া

তুলিতে হইবে দেবতার সত্তা দিয়া, ভগবানের মুখনিসৃত তপঃবাণীর তেজে ভরিয়া। পশুর মত এ জীবনলীলা মত্ত অন্ধ চঞ্চল অধীর হইবে না কিম্বা সাধু সন্ন্যাসীর মত রসের দুই প্রকার প্রকরণের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে না—তাহা হইবে সকল রকম ঐশ্বর্য্যে বৈচিত্র্যে তরঙ্গায়িত, যত দেবতা যতরূপ ধারণ করিয়া যত ভোগ গ্রহণ করিতে পারে সকলেরই স্থান এই বিরাট্ এই সুদৃঢ় মন্দিরে, সকলের জন্যই আমাদের অন্তরাত্মায় বাণী অচ্যুত আসন রচিয়া দিবে।

পূর্ণ-যোগ

(১০)

পূর্ণযোগের ফল

পূর্ণযোগের সাধন-প্রণালীটি যেমন পূর্ণ অখণ্ড, তাহার ফলও তেমনি পূর্ণ অখণ্ড।

প্রথম হইতেছে ভাগবতসত্তার পূর্ণ অখণ্ড উপলব্ধি। ভগবানকে পূর্ণরূপে পাইয়াছি অর্থাৎ তাঁহার যে ভেদহীন অদ্বিতীয় একত্ব শুধু সেইটুকুই নয়, কিন্তু তাঁহার যে অনন্ত রূপবৈচিত্র্য তাহাও উপলব্ধি করিয়াছি—আত্মার মধ্যে যে একত্ব শুধু তাহা নয়, হৃদয়ঙ্গম করি আবার সেই একত্ব যাহা রহিয়াছে কর্ম্মের, সৃষ্টির, জীবসকলের নানাত্বের খেলায়।

আর সেইজন্যই পূর্ণ অখণ্ড মুক্তি। শুধু সাযুজ্য মুক্তি নয়—সাযুজ্য মুক্তিতে আত্মার ব্যক্তিগত সত্তা ভেদজ্ঞান দ্বন্দ্ববোধের মধ্যেও স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে ভাগবতসত্তাকে। শুধু সালোক্য মুক্তি নয়—সালোক্য মুক্তিতে আমার চেতনা রহিয়াছে জাগিয়া সেই ভাগবত লোকে, সচ্চিদানন্দের মধ্যে। কিন্তু পূর্ণযোগ দেয় আবার সাধর্ম্ম্য মুক্তি, অর্থাৎ যখন আমার ও ভগবানের একই ধর্ম্ম, আমার আধারের নিম্নস্তরটি—তাহার সকল সত্তা, সকল কর্ম্ম সম্পূর্ণরূপেই গড়িয়া উঠে, পরিচালিত হয় ভাগবত সত্তায় ভাগবত প্রেরণায়, ভগবানই ধারণ করেন মানুষী রূপ।

এই অখণ্ড উপলব্ধি আর এই অখণ্ড মুক্তির ফল জ্ঞানের প্রেমের কর্ম্মের পূর্ণ সামঞ্জস্য। কারণ তখন অহং জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তখন তখন চেতনায় একীভূত হইয়াছি সকলের মধ্যেও সকলকে ছাড়িয়া আছে যে এক তাহার সাথে। আর এই চেতনা এই জ্ঞান যখন খণ্ডিত নয় তখন ত সহজেই কৈবল্যের একত্বের আনন্দ যেমন উপভোগ করি, ঠিক তেমনি নানার বৈচিত্র্যের যে রস তাহাও উপভোগ করি। সত্তার সে নিগূঢ় সমুচ্চ প্রতিষ্ঠানে প্রেমময়ের সহিত যুক্ত হইয়া এ জগতেরই বহুবিধ সম্বন্ধের মধ্যে প্রেমানন্দের আসনটি প্রসারিত করি। আর জগতকে জীবনকে যখন এইভাবে আলিঙ্গন করিতে পারি, অন্তরাত্মায় যখন সেই উদার মুক্তি পাই যাহা জগৎ হইতে বিমুখ হওয়ার উপর নির্ভর করে না কিন্তু জগৎকে ধরিয়াই যাহা অব্যাহত রহিয়াছে তখন ত আমার দেহে মনে সেই ভাগবত প্রেরণাস্রোতই বহিয়া চলে, জগতে আমার মধ্য দিয়া ভাগবত কর্ম্মই সম্পাদিত হইতে থাকে।

ভাগবত জীবন যাহা তাহা শুধু মুক্তিতে নয়, তাহাতে আছে আবার শুদ্ধি, ভুক্তি, সিদ্ধি। অখণ্ড শুদ্ধি একদিকে ভাগবত সত্তাটিকে আমাদের সত্তার মধ্যে পূর্ণ প্রতিফলিত করিয়া দেয় আর একদিকে সত্তার যে সত্য-ধর্ম্ম সত্যকর্ম্ম—ঋত—তাহাকেও ফুটাইয়া তুলে আমার কর্ম্মজীবনের মধ্যে। যে জটিল যন্ত্র সমষ্টি লইয়া আমার আধার তাহা যতদিন শুদ্ধ না হইতেছে, যতদিন ভাগবত প্রেরণার প্রণালী না হইয়া উঠিতেছে ততদিন পূর্ণ মুক্তি নাই। আর এই শুদ্ধি যখন পাইয়াছি তখন পাইয়াছি পূর্ণ ভুক্তি—জগতের অতীতে যে আনন্দঘন তাহাও উপভোগ করি আর জগতে যত কিছু বস্তু সে সকলেরও রসভোগ করি সেই আনন্দস্বরূপের প্রতীকরূপে। আধার শুদ্ধ হইলে, তাহার স্তরে স্তরে ভাগবত আনন্দ প্রতিষ্ঠা হইলে, মানুষ হইয়া উঠে মানবধর্ম্মাবলম্বী ভগবান—তাহাই সিদ্ধি। মানবের প্রকৃতিতে ভগবান তখন আবির্ভূত হন, তাহার সত্তায়, তাহার প্রেমে, তাহার আনন্দে, তাহার জ্ঞানে, তাহার কর্ম্মে প্রকটিত হন সেই ঈশ্বর যিনি যুগপৎ এক ও বহু, যিনি জ্ঞান ও শক্তি, যিনি সৎ ও তপঃ—মানুষ মানুষ হিসাবেই তখন পূর্ণ, সার্থক—কোন অংশকে, কোন অঙ্গকে, কোন প্রতিষ্ঠানকে বর্জ্জন করিয়া নয়, সকলকেই আলিঙ্গন করিয়া, আপন অখণ্ড সমগ্রতায় মানুষ তখন মহীয়ান।

সিদ্ধির অর্থ আবার মনের সিদ্ধি ও শরীরের সিদ্ধি। সুতরাং রাজযোগের ও হঠযোগের যাহা ফল তাহাও রহিয়াছে পূর্ণযোগে। শুধু তাহাই নয়, মনের শরীরের পূর্ণ সিদ্ধিই দেয় পূর্ণযোগ, নতুবা সে যোগের পূর্ণতা নাই। তবে মনের ও শরীরের মধ্যে বিকশিত হইবে তাহদের নিগূঢ় আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম। মনের জন্যই মন নয়, শরীরের জন্যই শরীর নয়—আত্মার ভগবানের জন্যই মন, আত্মার ভগবানের জন্যই দেহ। সুতরাং প্রাকৃতিক জগতে আমরা যে দেখিতে পাই তিনটি স্তর তিনটি প্রতিষ্ঠান বিকশিত হইয়াছে বা হইতেছে—স্থূল জগৎ, মানসিক জগৎ আর আধ্যাত্মিক জগৎ—পূর্ণযোগই তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতেছে। স্থূলজগৎ হইতেছে প্রতিষ্ঠা, ভিত্তিভূমি, মানসিক জগৎ হইতেছে করণ, যন্ত্র, প্রণালী আর আধ্যাত্মিক জগৎ সেই আদর্শ, সেই লক্ষ্য, সেই সাধ্য—যাহাকে এই অন্তঃকরণের, এই মধ্যবর্ত্তী লোকের সহায়ে বাহিরে স্থূলজগতে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। পূর্ণযোগ এই জগতে রহিয়া জগতেরই সকল কার্য্যে লিপ্ত হইয়া অতিজগতের অধ্যাত্ম প্রতিভাটিকে মূর্ত্তিমান্ করিয়া ধরিতেছে।

আর এই যে অখণ্ডতা পূর্ণতা তাহা বিশ্বমানবকে লইয়া। ব্যক্তির মধ্যে যদি শুধু উহা আবদ্ধ থাকে তবে তাহা প্রকৃত পূর্ণতা হইবে না, হওয়া সম্ভবও নয়। কারণ যখন পূর্ণ ভগবানকে উপলব্ধি করিয়াছি, যখন সে ভগবান্ আমার ভিতরে যেমন বাহিরেও তেমনি, আমার নিজের মধ্যে যেমন আর সকল মানুষের মধ্যেও ঠিক তেমনি তখন নিজের পূর্ণতা নিজের সিদ্ধি সম্ভব সকলের পূর্ণতা সকলের সিদ্ধির মধ্য দিয়াই, বিশ্বমানবের সহিত যে একাত্মতা অনুভব করিতেছি, তাহা ত অব্যর্থভাবেই আমাকে চালাইয়া লইবে আমি যে অমৃতত্ব পাইয়াছি সকলকেই তাহার অধিকারী করিয়া তুলিতে। আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধির লক্ষ্য বিশ্বমানবেরই সিদ্ধি।

ইহাই পূর্ণযোগ—মানুষের যে স্থূলজীবন, ব্যক্তিহিসাবে জাতিহিসাবে তাহার যে ঐহিক প্রয়াস মানসিক নৈতিক চর্চ্চার দিকে সে সকলকে দিব্যভাবে ভরিয়া দিতে হইবে, একটা বিরাট বিপুল আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এ সকলকে অখণ্ড সামঞ্জস্যে বিধৃত পুষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। এই মহান্ আয়াসই হইবে লক্ষ্য ও ফল সকল ব্যক্তিগত সকল সমষ্টিগত সাধনায়।

আর ইহাই হইতেছে সেই অন্তরের স্বর্গরাজ্যের প্রতীকস্বরূপ বাহিরেরও স্বর্গরাজ্য, পৃথিবীতে সেই কৃতযুগ যাহা সকল দেশের সকল যুগের ঋষিগণ, কবিগণ, সাধকগণ কল্পনা করিয়া আসিয়াছেন। আর আমরাও আজ এই অর্ব্বাচীনযুগের সাধক, আমরা যাহারা দেখিতেছি ভগবান আপনাকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন মানবজাতিরই মধ্যে, আমরা এই কল্পনাকেই কার্য্যে পরিণত করিতে সচেষ্ট হইয়াছি—ইহাই যে মানুষের একমাত্র যোগ্য সাধনা।

কংগ্রেস

শিক্ষিত ভারতবাসী অতি দ্রুতবেগে জাগিয়া উঠিতেছে। এই জাগরণ সর্ব্বাঙ্গীন হইলেও, রাজনীতিক অধিকার লাভের চেষ্টাই ইহার মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে। কলিকাতা মহানগরীতে এবার যে দ্বাত্রিংশ জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইল, ইহাতে শিক্ষিত ভারতবাসীর যে উৎসাহ, যে আকাঙ্খার আভাস পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহাতে আমাদের মনে হয়, ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের মনেই এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়াছে, যে "হোমরুল" অথবা "স্বায়ত্ত শাসন" না পাইলে জাতির কোন দিকেই উন্নতির আশা বিড়ম্বনামাত্র। অধিকন্তু ভারতসচিব মন্তেগু সাহেবের আশাবাণীতে আশ্বস্ত ও উৎসাহিত হইয়া ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ হইতে সহস্র সহস্র প্রতিনিধি এই কথারই পূর্ণ সমর্থন করিতে সমবেত হইয়াছিলেন।

আজ আমাদের বাঙ্গালীর নব জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে এই জাতীয় মহাসমিতি লইয়া নানা রঙ্গের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে ১৯০৬ সালের কংগ্রেস-কাহিনী—জাতির জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে নরম গরম দলের অভ্যুদয়, পরস্পরের সহিত পরস্পরের মতবিরোধ; ভারতের উন্নতিপথের পরিপন্থী সম্প্রদায়বিশেষের পরামর্শে, একদল অপর দলের উচ্ছেদ সাধনে কিরূপ প্রচেষ্টা করিয়াছিল। সুরাটের মহাযজ্ঞে যে বিকট অভিনয় জাতির মজ্জায় মজ্জায় কলঙ্ক-প্রলেপ লেপিয়া দিয়াছিল, ১৯০৬ সালের কংগ্রেসের অধিবেশনে সেই লীলাই সংঘটিত হইত, যদ্যপি মনীষী সুরেন্দ্র প্রমুখ কয়েকজন বিচক্ষণ

রাজনীতি-বিশারদ, দাদাভাই নৌরজীকে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিতে না আহ্বান করিতেন। দেশপ্রেমিক নৌরজী ১৯০৬ সালের জাতীয় অধিবেশনে অত্যন্ত চতুরতার সহিত উভয় দলের মনস্তুষ্টি করিয়া বিরোধ মিটাইয়া দিলেন, তিনি এক "স্বরাজ" কথা প্রচার করিয়া ভারতের জাতীয় জীবনে নূতন শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। *এই নূতন শক্তি-তরঙ্গে সকল বিভিন্ন দলকে ভাসাইয়া একই কেন্দ্রে সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তথাকথিত চরমপন্থীদের "বয়কট" "স্বদেশী" "জাতীয় শিক্ষা" প্রভৃতি মন্তব্যগুলি সেবারকার কংগ্রেসে সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু দলাদলির যে বিদ্বেষ-হলাহল পরস্পর-বিরোধী দলের মধ্যে সঞ্চিত ছিল, মহাসমিতির অবসানে তাহার বন্যায় জাতির ভবিষ্যৎকে বিষময় করিয়া তুলিল। সুরাটের কংগ্রেস-অভিনয়ের কলঙ্কের কথা শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেই অবগত আছেন। জাতির অস্থিমজ্জায় যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ খেলিবার উপক্রম করিতেছিল গৃহ-বিবাদের ফলে তৎস্থলে জাতির জীবনে একটা অবসাদের চিহ্ন আসিয়া দেখা দিল। উন্নতিশীল দলের ভুল ভ্রান্তি বিদূরিত করিয়া তাহাদের শক্তি সামর্থ্যের উপযুক্ত ব্যবহার করিবার দিকে, তখনকার রাজনীতিবিদ্ স্বদেশপ্রেমিকদের কোন চেষ্টাই পরিলক্ষিত হয় নাই, বরং নূতন দলের উচ্ছেদ যাহাতে হয় তাহার কামনা অনেকেই মনে মনে পোষণ করিয়াছিলেন, এবং এই গর্হিত মনোভাব কার্য্যে পরিণত করিতেও কেহ কেহ কুণ্ঠিত হন নাই। ইহার পর হইতে বাংলার অনেকেই কংগ্রেস সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। জাতির মধ্যে অন্তর্বিরোধ হেতু, সনাতন চরিত্রে পাশ্চাত্যের উৎকট বিষ প্রবেশ করিল, সুযোগ্য নেতৃ-অভাবে কর্ম্মোৎসাহী বাংলার নন্দদুলালগণের কোমল অন্তঃকরণে প্রতিহিংসার তীব্র জ্বালা জ্বলিয়া উঠিল, তাহার পর হইতে নরহত্যা দস্যুবৃত্তি প্রভৃতি কি বিকট কর্ম্মের অবতারণা হইতে আরম্ভ হইল! এই দশ বৎসর বাংলার কি দুর্দ্দিন যাইতেছে তাহা আর বলিয়া জানাইতে হইবে না। গত বৎসর লক্ষ্ণৌ জাতীয় মহাসমিতিতে বিদুষী বাসন্তির প্রচেষ্টায় আবার দলাদলি মিটাইয়া একই মত ও পথে হিন্দু-মুসলমান সমবেত ভাবে চলিতে প্রতিশ্রুত হইল।

এই দশবৎসর ধরিয়া নানা আবর্ত্তনে ভারতবর্ষ যাহা হইয়াছে তাহারই প্রকাশস্বরূপ এই কংগ্রেস। সুরাটের কংগ্রেসে যে গুপ্ত ষড়যন্ত্র চলিয়াছিল, কলিকাতাতে তাহারই পুনরাভিনয় করিবার জন্য কয়েকজন তথাকথিত

নেতা চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু এই দশবৎসর ধরিয়া দেশ যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে তাহাতে ১৯০৭ সালের মত ঘটনার সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব, তাই আমরা এই মহামিলনের অভ্যর্থনা সভা হইতেও কয়েকজনকে অপসৃত হইতে দেখিতে পাই। ধন্য সুরেন্দ্রনাথ! তিনি দীর্ঘ দিন ধরিয়া বাংলার এই রাজনীতিক জটীল সম্প্রদায়-বিশেষের নৈবেদ্যের চূড়াস্বরূপ অবস্থান করিয়াও, দেশের ও জাতির গতি নির্ণয় করিয়া চলিয়াছেন।

সুরাটের দক্ষযজ্ঞে, লাঞ্ছিত অপমানিত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া যে নেতৃমণ্ডলী এত দিন নীরবে জাতির ভবিষ্যৎ-গতি নির্ণয় করিতেছিলেন তাঁহারাই আজ আবার সদলবলে নবোত্থিত শক্তিসহযোগে জাতির কর্ণধার হইতে অগ্রসর হইয়াছেন। রাজনীতিক ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া যে সকল কর্ম্মবীর, ভারতবর্ষের উন্নতিকল্পে অগ্রসর হইতেছেন, ইহা তাঁহাদের পক্ষে আশা ও উৎসাহের কথা বটে! অসাধারণ বুদ্ধি ও মেধাসম্পন্না, কার্য্যতৎপরা, দৈবশক্তিশালিনী বাসন্তি বিবির ভারতের জটীল রাজনৈতিক মহাসমুদ্রে ঝম্পপ্রদান—ইহা সুলক্ষণ ও কর্ম্ম সিদ্ধির পূর্ব্ব পরিচায়ক। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানের নিকট এই সহস্র সহস্র ইংরাজী-শিক্ষিত প্রতিনিধিবর্গের আশা ও আকাঙ্খা যাহাতে সকল হয় তাহার জন্য প্রার্থনা করি, ভগবান ইহাদের অন্তঃকরণে সাহস ও শক্তি প্রদান করুন—যেন তাঁহারা ভারতবর্ষের কল্যাণ ও উন্নতিবিধানকল্পে অবিচলিতচিত্তে সকল বাধা ও বিঘ্নকে বিদলিত করিয়া অগ্রসর হইতে পারেন।

তারপর আমাদের কথা। আমরা তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া বলিতে চাই, যাঁহারা পূর্ণযোগের সাধক, যাঁহারা স্পর্দ্ধা রাখেন এ-মরজগতেই ভগবানের লীলা প্রকটিত করিয়া তুলিতে, এই জীবন উৎসর্গ করিয়া দেব-নিবাসের উপযোগী করিতে, তাঁহাদিগকে জাতির এই অদ্ভুতপূর্ব্ব বিকাশে আত্মহারা না হইয়া ইহার শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করিতে অনুরোধ করি। ভারতবর্ষ যে অভিনব সত্য ও স্বতন্ত্র আদর্শ গড়িয়া তুলিতে চায়, যে মহান উদ্দেশ্যের পথে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া, মাত্র ভগবানকে অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইতে চায়, সে আদর্শ ও উদ্দেশ্যের অনুপাতে আজিকার এই বিকাশ কতটুকু? যে নিপুণ সূক্ষ্মদর্শী বৈজ্ঞানিক, জাগতিক এই মহামেলার পশ্চাতে লোকচক্ষুর অগোচরে অবস্থান করিয়া রাশির পর রাশি সংযোগে এই অঙ্কপাতের সৃষ্টি করিতেছেন, তিনি কবিদৃষ্টির সাহায্যে

বাহিরে না চাহিয়াই বুঝিতেছেন, এখনও মহান্ আদর্শের পরিমাপ-রাশি উদ্ভূত হইতে বিলম্ব আছে। তিনি পরীক্ষার পর পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন, ক্রমশঃই অভিজ্ঞতার ফল মহাসিদ্ধির সমীপবর্ত্তী হইলেও স্থূলজগতে প্রকাশ করিয়া তুলিবার মত অবস্থা এখনও তাঁহার আসে নাই, তবে মহাদেবতার হৃদয়মধ্যে যে মহাকালীর নৃত্য আরম্ভ হইয়াছে, সে মঙ্গল ও মধুর নৃত্যের ব্যঞ্জনা জগতের বক্ষে একদিন ফুটিয়া উঠিবেই। তাই যোগীর লক্ষ্য অব্যর্থ, সাধকের হৃদয়মধ্যে যে চিন্ময় মূর্ত্তি আজ বিকশিত সে তাহাকে বস্তুতন্ত্র করিয়া তুলিবেই। নবীন বাংলাকে এই মহাতান্ত্রিকের অভ্যর্থনার জন্ত প্রস্তুত হইতে বলি। আজ যাহার অভিনয় করিতেছ, ভবিষ্যতে তাহা সত্য ও সফল হইবে।

লীলা

(৮)

কুরুক্ষেত্রের সমরপ্রাঙ্গণে পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াও, অর্জ্জুন এই ব্যক্তিগত ধর্ম্ম ও সামাজিক বিধানের বশবর্ত্তী হইয়া, ধর্ম্মযুদ্ধে বিরতির ভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পার্থের অকাট্য যুক্তির বিরুদ্ধে দুইটী আদর্শ সংস্থাপন করিয়াছিলেন—একটি মুমুক্ষুদিগের জন্ত, অপরটি মুক্তপুরুষদিগের জন্য। প্রথমটি শাস্ত্র, দ্বিতীয়টি উৎসর্গ। ভগবৎ-চরণে কর্ম্মফলসমর্পণ উৎসর্গের শেষ মন্ত্র নহে, কর্ম্ম পর্য্যন্ত সমর্পণ করিতে হইবে।

বদ্ধাবস্থায় যে সকল নরনারী মুক্তিপ্রার্থী হইয়া শ্রীভগবানের করুণা-ভিখারী, তাঁহাদের জন্য তিনি যে শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার মূল আদর্শ হইতেছে, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের আশা আকাঙ্খা, বুদ্ধি বিবেচনা, যুক্তি তর্ক, সাধ আহ্লাদ, বাসনা কামনা, সকল অহঙ্কারের বাহিরে একটী দিব্য বিধান, যাহার অনুগামী হইয়া জীবন-তরণী পরিচালন করিলে কেবল যে সংযমী ও স্থিতধী হইব এরূপ নহে, অধিকন্তু, সাত্ত্বিক অহঙ্কারের নিরসন করিয়া, মুক্ত হইবার জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত করিয়া

তুলিতে পারিব। মানুষের অহমিকার বাহিরে, সর্ব্ববিধ সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতার পরপারে, এই শাস্ত্রীয় বিধানে মানুষের জীবনকে কোন অতীত যুগ হইতে পৃথিবীর সহস্রবিধ আবর্ত্তনে ধ্বংস হইতে দেয় নাই। প্রাচীন যুগে, এই শাস্ত্র ছিল বৈদিক ধর্ম্ম। মানুষের আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উপরই ইহার প্রতিষ্ঠা—জাগতিক দিব্য নিয়মের উপরই ইহার ভিত্তি। এই শাস্ত্রানুসারে জীবনযাপন করিয়াই মানুষ আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিত, স্বীয় স্বভাবের অনুযায়ী করিয়াই আপনাকে সুন্দররূপে গঠিত করিয়া তুলিত। কালের সঙ্গে সঙ্গে, এই উত্তম বৈদিক ধর্ম্ম স্মৃতির বিধানে পরিণত হইল। বেদোক্ত চাতুর্ব্বর্ণানুসারে মনুষ্যজাতিকে বিভক্ত করিয়া স্মৃতি ও বেদানুযায়ী গম্য পথ নির্দ্দেশ করিতে লাগিল। কিন্তু স্মৃতির বিধান, বৈদিক ধর্ম্মের মত এতটা পরিপাটী ও সূক্ষ্ম নহে, স্মৃতি মোটামুটী ভাবে মানবজাতিকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করিল। তারপর কলিযুগ। অধুনা সর্ব্বোত্তম শাস্ত্রনীতি মানুষের স্বাভাবিক আচার বিচার ও সামাজিক ব্যবহারের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে অবস্থান করিতেছে, এক্ষণে শাস্ত্র বলিতে যাহা বুঝায় তাহা কালধর্ম্মে এরূপ পরিবর্ত্তিত—ইহা যে সেই আর্য্যঋষি প্রণোদিত বৈদিক রীতি নীতি তাহা আর নির্দ্দেশ করা যায় না। কিছু না থাকার অপেক্ষা ইহাও ভাল। কেননা মানুষের পক্ষে বাসনাপরবশ স্বেচ্ছাচারী হওয়া অপেক্ষা এইরূপ একটা লোকাচারের অধীন হওয়াও কতক অংশে শ্রেয়ঃ। ইহাতে মানুষের দুর্জ্জয় অহঙ্কার কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত হয়। যদিও এইরূপ বিধানের শক্তি কিছুই নাই, এবং মুক্তির পথ নির্দ্দেশ করিতে ইহা কিছুতেই সক্ষম নহে বরং ইহা মানুষের একটা বন্ধনবিশেষ, তত্রাচ অজ্ঞদিগের জন্য বর্ত্তমান প্রচলিত শাস্ত্রবিধিরও প্রয়োজন আছে। যাহাদের ধর্ম্মের অহঙ্কার আছে, সংস্কারের অহঙ্কার আছে, আত্মমত অভ্রান্ত বলিয়া যাহাদের গর্ব্ব আছে, এইরূপ দাম্ভিক জনগণের হস্তে উচ্চ শাস্ত্রবিধিরও অপব্যবহার হইয়া থাকে। ঠিকভাবে শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া চলিতে পারিলে, শাস্ত্র মুক্তির পথ প্রস্তুত করিবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করে। শাস্ত্রই শব্দব্রহ্ম।

কিন্তু যাঁহারা ভগবানের হস্তে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছেন, যাঁহারা আত্মাকে নিত্যমুক্ত বলিয়াই অবধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যাঁহারা তনু-প্রাণ-মন দিয়া কর্ম্ম এবং কর্ম্মফল উভয়ই উৎসর্গ করিয়া মুক্ত সাধক হইয়াছেন, তাঁহারা আর উদ্যোগপর্ব্ব লইয়া পরিতুষ্ট থাকিতে পারেন না,

শাস্ত্রীয় বিধান-অনুসারে আপনাকে আবদ্ধ রাখিবার তাঁহাদের প্রয়োজন নাই। সর্ব্বোৎকৃষ্ট শাস্ত্র বিধিরও পরপারে দাঁড়াইয়া ইহাঁরা সর্ব্বকর্ম্মে সর্ব্বাবস্থায় আনন্দ উপভোগ করেন, ইঁহারা মুক্ত। ভগবচ্চরণে যাহার সর্ব্বস্ব সমর্পিত হইয়াছে তাহার আবার বন্ধন কি? "শব্দব্রহ্ম অতিবর্ত্ততে"।

শ্রীকৃষ্ণচরণে কর্ম্ম পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিবার উৎকৃষ্ট বিধান হইতেছে প্রকৃতিকে উপলব্ধি করা—আমাদের সমস্ত কর্ম্মই ভগবৎ-আদেশে প্রকৃতি সম্পন্ন করিতেছেন, এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল করিতে হইবে। আমাদের স্বভাবের ভিতর দিয়াই ভগবান কর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিতেছেন। যে মুহূর্ত্তে এইরূপ বোধ হৃদয়ে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইবে সেই মুহূর্ত্ত হইতেই অবধারণ করিবে, সকল কর্ম্মেরই নিয়ন্তা শ্রীভগবান্, তুমি নহ; কোন কর্ম্মের জন্যই তোমার দায়িত্ব নাই, কর্ম্মবন্ধনও তোমায় ভোগ করিতে হইবে না। ভগবান যাহা করেন তাহার জন্য তিনি কাহারও নিকট দায়ী নহেন, তিনি সর্ব্বময় কর্ত্তা, তিনি মুক্ত সচ্চিদানন্দময়।

শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে পরিচালিত সাধকবৃন্দের কর্ম্ম স্বভাবনিয়ত, প্রকৃতি কর্ত্তৃক সুশৃঙ্খলিত—সেইজন্যই উহা ধর্ম্ম। আমাদের কর্ম্মগুলিও স্বভাবনিয়ত ত বটেই, উপরন্তু এই স্বভাব যন্ত্রস্বরূপ শ্রীভগবানের হস্তেই নিয়মিত ও সুসংযতভাবে সুপরিচালিত হইতেছে। খণ্ড সংস্কারে অভিভূত আমরা, আমাদের পক্ষে এইরূপ উৎকৃষ্ট জ্ঞান লইয়া সতত অবস্থান সহজ ও সম্ভবপর নহে, কিন্তু নিম্নলিখিত অবস্থাত্রয়ের মধ্য দিয়া আমরা অতি শীঘ্র এইরূপ পরাজ্ঞান লাভ করিতে পারি। প্রথম, "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" এই মন্ত্রশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া অবস্থান করা। সকল অবস্থাতেই মনে করিতে হইবে "হে হৃষীকেশ, আমার হৃদ্দেশে অবস্থিত থাকিয়া আমায় যাহা করাইতেছ তাহাই করিতেছি"। শয়নে ভোজনে ভ্রমণে কথোপকথনে, শ্বাসে প্রশ্বাসে এই মন্ত্র জপিতে হইবে, যখন এই ভাব আমাদের অস্থি মজ্জায় প্রবেশ করিবে, যখন আমরা সর্ব্বকর্ম্মের মধ্যেই হৃষীকেশের নির্দ্দেশ দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিব। এই অমর ভাবে আমাদের হৃদয়-কমল যেদিন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে, সেইদিন সাধনার দ্বিতীয় স্তর অত্যন্ত সহজ ও সরল হইয়া উঠিবে। গীতার যে বিদ্যুৎশক্তি সঞ্চারিণী মহামন্ত্র—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া"॥

শ্রীভগবান সর্ব্বজীবের অন্তঃকরণে অবস্থান করিয়া 'গুণত্রয় সহযোগে মায়াকর্ত্তৃক, ভূতগণকে যন্ত্রারূঢ় করিয়া পরিভ্রমণ করাইতেছেন, এই মহাভাব তোমার উপলব্ধি হইবে। তুমি বুঝিবে গুণত্রয় তোমার মধ্যে কিরূপে কর্ম্মোৎপাদন করিতেছে এবং যন্ত্রারূঢ় তোমার আধার, যন্ত্রসাহায্যে কিরূপ স্বভাবতঃ পরিচালিত হইতেছে। তখন আর তুমি পূর্ব্ব মন্ত্রের "তথা করোমি" না বলিয়া, বলিবে "গুণাবর্ত্তন্ত এব" আমি করিতেছি না, গুণাবলীই আমাকে করাইয়া লইতেছে এবং এই গুণত্রয় শ্রীভগবানেরই। এই অবস্থার বিশেষ বিপদের কথা এই যে, বিশেষতঃ যখন আমরা গুণাদি-জনিত কর্ম্মগুলিকে বাছিয়া লইতে পারি না, আমাদের স্বভাবজনিত দারুণ অশুদ্ধতার প্রকাশ হয়, এবং আমাদের কল্পিত পাপ এবং পুণ্যবোধ আমাদিগকে পীড়িত করিতে থাকে। এইরূপ অবস্থায় যখন পাপের পঙ্কিল হ্রদে নিমগ্ন হই তখন হাহাকার করিয়া উঠি, আবার যখন আমাদের পূর্ব্ব সংস্কারানুযায়ী কোন পুণ্যজনিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই, তখন হর্ষে আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়ি। কিন্তু আত্মসমর্পণযোগীকে স্মরণ রাখিতে হইবে—যে মুহূর্ত্তে সে আপনাকে ভগবানের হস্তে সমর্পণ করিয়াছে, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তাহার জীবনের সকল কার্য্যই ভগবানের। তিনি আমার জীবন লইয়া পাপ অথবা ধর্ম্মের খেলা খেলিতে পারেন, আমাকে কেবল সাবধান হইতে হইবে যেন আমি না উক্ত খেলায় আসক্ত হইয়া পড়ি। আমায় যন্ত্রারূঢ় করিয়া তিনি যেমন নাচাইবেন আমি তদ্রূপই নৃত্য করিব। আমার পাপই বা কি, আর পুণ্যই বা কি? মনে রাখিও করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ অনাহত শব্দে আমাদের অভয় দিতেছেন। গীতায় তিনি বলিয়াছেন "প্রতিজানে" আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি 'ন মে ভক্ত বিনশ্যতি' যে আমার ভক্ত—তাহার বিনাশ নাই'। হে নবীন যুগের সাধক! আইস, হিন্দুর আদর্শ দেবতা শ্রীকৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্র মহাসমরে ভবিষ্যৎ ভারতের মহত্তর বিকাশের জন্য যে মহামন্ত্র প্রচার করিয়া গিয়াছেন--সেই অমর মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া নূতন যুগকে আবাহন করি।

বর্ষশেষে

দেখিতে দেখিতে বর্ষচক্র আবর্ত্তিত হইল! পুরাতন, চক্রনেমির নিম্নে অন্তর্হিত হইল, নূতন উপরে আসিয়া দেখা দিল। আজ যাহা নূতন বলিয়া প্রতীত হইতেছে, কাল আবার তাহা পুরাতন হইবে। পুরাতন পুনরায় নূতন পরিচ্ছদে সুশোভিত হইয়া নবীন বেশে দেখা দিবে, কালচক্রে এইরূপ নূতন পুরাতনের খেলা চিরন্তন ঘটিতেছে। 'প্রবর্ত্তকের'ও আজ দুই বৎসর পূর্ণ হইল। আগামী সংখ্যায় তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিবে। আরও নূতন ভাব নূতন ভাষার সহযোগে 'প্রবর্ত্তক' পাঠকবর্গের হৃদয় মনে নূতন সন্দেশ বহন করিবে। নবীন সাধকদিগের হৃদয় প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন করিয়া নূতন হইয়া উঠিতেছে, 'প্রবর্ত্তক' তাহারই দ্যোতক, সুতরাং "প্রবর্ত্তক" চির নবীন থাকিবে।

বিঘ্নসমাকুল ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া আজ দুই বৎসর ধরিয়া শিশুর মত অস্ফুট কণ্ঠে "প্রবর্ত্তক" যে প্রাণের সঙ্গীত গাহিয়া আসিতেছে, ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী জাতির হৃদয় যে সহসা তাহাতে মাতিয়া উঠিবে না, সে কথা আমরা জানি। তবে তাহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তার জীবন-বীণার তার ক্রমশঃ উচ্চ সুরে ধ্বনিত হইতেছে—সে সমুচ্চ উদাত্ত সঙ্গীতধ্বনিতে নূতন বাংলা যে দিন দিন জাগিয়া উঠিবে এ কথা আজ আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া বসিতেছে। শত বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া বাংলার উদার হৃদয়ক্ষেত্রে যে সকল উন্নতির বীজ রোপণ করা হইয়াছিল, সে গুলি ক্রমশঃ ফলপ্রসূ হইয়া, কালের অন্ধকার-আবরণে আত্মগোপন করিবার উদ্যোগ করিতেছে। যুগপ্রবর্ত্তক রামমোহন রায়ের অপূর্ব্ব প্রতিভা বিজলীর মত দশদিক আলোকিত করিয়া, আবার নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবার জন্য পথান্বেষণ করিতেছে। ভারতবর্ষের উজ্জ্বল মণিময়বিশেষ মহারাষ্ট্রী তিলক, উদারপ্রাণ মহাতপস্বী গান্ধী, শ্বেতদ্বীপবাসিনী অপরূপ শ্রী-শক্তিস্বরূপা-বিবি বাসন্তী, ঋষিপ্রতিম রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি আজ ভারতের গগনে সমুদিত হইয়া

যে তীব্র উজ্জ্বল কিরণজাল বিস্তার করিতেছেন, তাহাতে বাংলার অতীত যুগের ইতিহাস বিমলিনপ্রায়, বর্ত্তমানের সমুজ্জ্বল বিকাশের নিকট তাহার তুলনাই করা যায় না, কেবল অতীত স্মৃতির অন্ধকার যবনিকা ভেদ করিয়া ক্ষুদ্র নক্ষত্রের মত বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি কয়েকটী মনীষী দীপ্তি পাইতেছেন, আর বৈরাগ্যজ্ঞানপ্রদীপ্ত ভাস্বর দেবমূর্ত্তি ঠাকুর রামকৃষ্ণ এবং তদীয় অনুসঙ্গী বীরসাধক স্বামী বিবেকানন্দের পবিত্র মনোহর মূর্ত্তি উজ্জ্বল দিবাকরের মত অতীত যুগের প্রাধান্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। এতদ্ব্যতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বহু ঘটনার সমাবেশ থাকিলেও, বর্ত্তমান যুগের উপর আর কাহারও প্রভাব ততটা পরিলক্ষিত হইতেছে না।

দক্ষিণেশ্বরে বসিয়া ভগবান্ রামকৃষ্ণ যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, আজ তাহার সকল বিকাশও বর্ত্তমানের অত্যুজ্জ্বল আলোকসম্পাতে ম্লান বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, বর্ত্তমানের বহুবর্ণে বিচিত্র সুদৃশ্য রামধনুই আজ আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। কিন্তু ইহা অনতিবিলম্বেই কালপটে মিলাইয়া যাইবে। ঠাকুরের সর্ব্বসমন্বয়কারী মহাবীজ মহামহীরুহরূপে, ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। কিন্তু শ্রীভগবানের পূর্ণলীলার পরিপন্থী সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর আসক্তি আজ এই সুমহান্ কর্ম্মে সমুহ বাধা প্রদান করিতেছে, হিন্দুর হৃদয় হইতে এই দুর্জ্জয় অহঙ্কার বিদূরিত না হইলে, এই অহমিকার সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভাব সাধকদিগের হৃদয় হইতে তিরোহিত না হইলে, শ্রীকৃষ্ণের মহামহিমান্বিত বিরাট লীলার—হিন্দুস্থানে পরিস্ফুরণ হইবে না। তাই ভাগীরথীর পুণ্য প্রবাহ অধ্যুষিত বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের গভীর আবর্ত্তে আপনাকে নিক্ষেপ করিয়াও, যিনি অতীত সংস্কার হইতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিয়াছেন, যিনি পৃথিবীর সকল সম্পদ সকল. গৌরবের অসারত্ব প্রতিপাদন করিয়া, মাত্র জগজ্জননী মহাকালীর আশিষকেই জীবনের সর্ব্বস্ব বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন, যিনি বর্ত্তমানের খরতর কর্ম্মপ্রবাহের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া, পূর্ণ ভাগবদ লীলার অভিনয় আরম্ভ করিবার জন্য, ধীর ও প্রশান্ত চিত্তে, জননীর আদেশ-প্রতীক্ষায় যোগাসনে উপবিষ্ট আছেন, তিনি নূতন বাংলাকে নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া, যুগাবতার রামকৃষ্ণের মহাবাণী সফল করিয়া তুলিবার জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন। হে বাঙ্গালী! শরীর মন ও বুদ্ধিকে

সকল প্রকার আশা ও আকাঙ্খার গুরুভারে বিমর্দ্দিত না করিয়া, একমাত্র ভাগবত ইচ্ছাকে ধারণ করিবার জন্য অগ্রসর হও, ভাগবত শক্তি এই ত্রিলোকেই আজ অভিনয় করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন, মানুষের জীবনেই আজ দেবলীলা সুসম্পন্ন হইবে। আজ আপনাকে মহাকালীর চরণে উৎসর্গ করিয়া মহাশক্তিলাভের সাধনায় উদ্বুদ্ধ হও, শক্তি লাভ না করিলে, কিছুরই অধিকার তোমার লাভ করিবার উপায় নাই। যে মহাশক্তি মানুষের জীবনে অসীম ধারণসামর্থ্য জাগাইয়া তুলিবার জন্য অবতীর্ণ হইতেছেন, তিনি বিপুল চিন্তারাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া, মানুষের মানসক্ষেত্রের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছেন। হে মানব। হৃদয় প্রশস্ত কর, মানব-হৃদয়েই মহাকালীর নৃত্য আরম্ভ হইবে, হৃদয় ভরিয়া উঠিবে অপরিসীম আনন্দে ও শক্তিতে, তিনি আধারের প্রতি অঙ্গকে পূর্ণ ও শক্তিসমন্বিত করিয়া তুলিবার জন্যই আগমন করিতেছেন। শরীর মন ও বুদ্ধির অসাধারণ ধারণসামর্থ্যের উপরই নির্ভর করিতেছে আমাদের অষ্টসিদ্ধি, এই অষ্টসিদ্ধি লাভ হইলেই আমরা জগতে অপরাজেয় হইয়া উঠিব, আমাদের ইচ্ছার প্রতিকূলে তখন কোন শক্তিই তিষ্ঠিতে পারিবে না, পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ লীলা তখন অবাধে ধরণীতলে অভিনীত হইতে থাকিবে। আমরা ভবিষ্যৎ বর্ষে এই সকল কথাই বিশেষরূপে বিশ্লেষণ করিব।

ভাব-কুসুম

হৃদয়ের ভিতর কেবল কর্‌ছে হু-হু-হু। এ জ্বালা জুড়াবার নয়, এ অতৃপ্ত বাসনা কতদিনে চরিতার্থ হবে তা জানি না—বুকের মধ্যে ভীষণ দাবানল জ্বল্‌ছে হু-হু-হু। কত গ্রাম নগর, কত কানন প্রান্তর, ধনীর প্রাসাদ, দরিদ্রের পর্ণকুটীর, সর্ব্বত্র আমার উন্মত্ত হৃদয় ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু কৈ মনের মানুষ কৈ? যাকে দেখ্‌লে নয়ন তিরপিত হবে, যার অমিয় নিছানি কণ্ঠধ্বনি শুন্‌লে শ্রবণবিবর চরিতার্থ হবে, যার শিরীশকোমল অঙ্গস্পর্শে আমার রক্তমাংসের রাক্ষসী ক্ষুধা নিবৃত্ত হবে, যার সুধাবিগলিত অধরপুটে চিরপিপাসিত শুষ্ক ওষ্ঠস্পর্শে কামনার তীব্রজ্বালা চিরতরে উপশমিত হবে,

যার চন্দন-চর্চ্চিত শুভ্র নিষ্পাপ জ্যোতির্ময় শরীরের অঙ্গসৌরভে আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হবে; কৈ—কৈ—সে-হৃদয়-প্রাণ-মাতান মহাপুরুষ, কৈ সে মহাদেবতা-নারায়ণ, যিনি নররূপে পুণ্যপীঠ ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হয়েছেন? কে আছ সাধক ভক্ত, কে আছ হিতব্রতী ধৈর্য্যশীল বীর সাহসী, পাগলের অনুগামী হও! কঠোর যোগসাধনে, হোম ব্রত পূজায় বৃথা কালক্ষেপ করো না, বিশ্বাস মাত্র অবলম্বন করে' এস দুর্গম পথে, অগ্রসর হও উৎকট বাধার সঙ্গে নিয়ত সংগ্রাম কর্‌তে। জয়ে পরাজয়ে, আশায় নৈরাশ্যে ভ্রূক্ষেপ করোনা, সে স্পর্শমণি সংযোগে তোমার সকল ক্লান্তি, পথের সকল ক্লেশ অপসৃত হবে, কোন্ দূর নিবিড় বনান্তরাল হ'তে তাঁর অভয়বাণী এই সাহসই আমায় দিচ্ছে।

* * *

জীবনের স্তরে স্তরে যে কলঙ্কলেখা গভীর ভাবে অঙ্কিত হয়ে আছে, মানুষের শত চেষ্টায় তাহা নিষ্কাসিত হবে না, পঞ্চেন্দ্রিয়ের যে নিম্নমুখী লালসা—তার রাশ ঊর্দ্ধে টেনে ধরে কোন দিন কেহই তাকে ঊর্দ্ধদিকে পরিচালিত কর্‌তে পারে নি। জন্মান্তর পরেও মানুষ হীন ইন্দ্রিয়বৃত্তির কুহক জালে জড়িত হয়ে পড়েছে, এমন দৃষ্টান্ত দর্শনশাস্ত্রে নিতান্ত বিরল নহে। মানুষের চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলি, পৃথিবীর ঊর্দ্ধ অধঃ ও মধ্য প্রদেশ থেকে যে রস সঞ্চয় কর্‌ছে, সেগুলি তাদের জন্য নয়, অন্তর্দেবতার জন্য; সুতরাং এই অন্তর্দেবতার প্রকৃতির পরিপূর্ণ পরিবর্ত্তন না ঘট্‌লে ইন্দ্রিয়বৃত্তির অধোগতি নিবারণ হবে না, এই অন্তর-মানুষই আজ উন্মত্ত হয়েছে, দৈবীভোগের জন্য; কিন্তু যুগযুগান্তর ধরে সে পৃথিবীর অবরস্তরে ঘুরে বেড়িয়ে, এমন এক গোলক ধাঁধায় পড়ে গিয়েছে, যে কোন মতেই, ঊর্দ্ধের যে অপরূপ জ্ঞানজ্যোতিঃ. যার বিকাশে কোটী-জন্মের গভীর আঁধার নিমেষে অপসারিত হয়, তার সন্ধান পাচ্ছে না, তাই অনুসন্ধিৎসু ভক্তের হৃদয় কেবল জ্বল্‌ছে হু-হু করে, আর যে তার আভাসমাত্র পেয়েছে সেও অধীর আবেগে দৌড়েছে, তারও হৃদয় জ্বল্‌ছে হুহু করে'; আবার যে তার সন্ধান পেয়েছে তার বুকের মধ্যেও জ্বালা ধরেছে সেও জ্বল্‌ছে হুহু করে', কেননা আজিকার এই দিব্য লীলা, এই মুক্তির খেলা এক জনের জন্য নয়, সমগ্র মানবজাতিকেই এই নূতন খেলায় যোগদান করতে হবে—তাই আকুল কণ্ঠে উন্মত্ত হয়ে সে উচ্চৈঃ হাঁক্‌ছে—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত

মানুষের শরীর মন ও বুদ্ধির শুদ্ধি হলেই, ভগবান্ অবতরণ কর্বেন, মানুষের জীবনে, মানুষের সকল কর্ম্মেই তখন দেবতার লীলা-চাতুর্য্য প্রকাশ হয়ে পড়্বে, মানুষের অধোগতির পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে, সে চল্বে দেবতার দিব্যপ্রেরণায় উন্মাদের মত, শিশুর মত, সরল ও সত্য পথে, আনন্দের রাশি ছড়িয়ে পড়্বে তার হাসিতে, তার কথায়, তার প্রতি কর্ম্মে। অষ্টসিদ্ধি সহজ ও সরল করে দেবে, আজ যাহা অসম্ভব ও অসাধ্য বোধ হচ্ছে, সেই সকল জটিল কর্ম্মগুলিকে। কিন্তু এই শরীর মন ও বুদ্ধিকে শুদ্ধ কর্তে হলে যে তপস্যা চাই সে তপস্যা অচিরেই নবীন বাংলাকে আরম্ভ করে দিতে হবে।

• • •

আমাদের এমন একজনকে স্পর্শ করা চাই—যাঁর অভূতপূর্ব্ব আনন্দ-স্পর্শে আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে, তার আর স্পর্শশক্তি থাক্বে না, এইরূপে চক্ষু কর্ণ রসনা সকল ইন্দ্রিয়ের গতি অবাধ করে রাখ্বে; ভাগবত স্পর্শে, ভাগবত রূপে, ভাগবত রসে পরিপূর্ণ হয়ে থাক্বে তোমার সমস্তখানি। মানুষের সহস্র কঠোর বিধান একটী মানুষকেও জগতের প্রলোভন থেকে উদ্ধার কর্তে পারে নি, সে যুগে যুগে নিয়মের শক্ত বেড়ায় আপনাকে নিরাপদ বলে মনে কর্লেও, যখনই বসন্তের অনুচর স্বর্গের অপ্সরাবৃন্দ পরিবৃত হয়ে আগমন করেছে--তখনই সে যোগভঙ্গ করে' পৃথিবীর যে প্রবল আকর্ষণ তার আবর্ত্তনে চূর্ণিত হয়েছে। বর্ত্তমান যুগের বীর-সাধক নবীন দল, পৌরাণিক যুগের অষ্টাঙ্গযোগপদ্ধতির বিকৃত বিধানে আপনাকে আবদ্ধ না করে, উৎসর্গ কর আপনাকে—প্রতীক্ষা কর শরীর মন ও বুদ্ধিকে প্রসারিত করে, এই আধারেই দেবতার লীলা আরম্ভ হবে, তখনই সার্থক হবে তোমার জীবন, তখনই প্রকৃত গর্ব্ব করে বল্তে পার্বে "যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি"।

জানা ও অজানা

কাম্যবস্তুর স্বরূপ জানিলে নাকি তার যা কিছু সৌন্দর্য্য সব লুপ্ত হইয়া যায়। যে জিনিষের মধ্যে অজানা কিছু নাই, যাকে ঘিরিয়া কল্পনা আর খেলিবার অবসর পায় না, যাকে নিঃশেষ করিয়া পাইয়াছি, ধরিয়া বসিয়াছি সে ত জড়বস্তু, সে আমার বিচার বুদ্ধির তৃপ্তি দিতে পারে কিন্তু তাতে ত জীবন নাই, সে আমার প্রাণের বস্তু হইবে কিরূপে? যার সব জানিয়াছি দেখিয়াছি সে ত ফুরাইয়া গিয়াছে, কিন্তু মানুষের আনন্দের ধন যে সেই জিনিষ যা কখন ফুরায় না, শেষ হয় না, যা নিত্য নবরূপে ফুটিয়া উঠিয়া একটা নূতন চেতনা নূতন অনুভূতি জাগাইয়া তুলিয়া প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদিগকে বিস্মিত, মুগ্ধ করিতেছে। এই বিস্ময়ের, এই আকস্মিকের উদ্রেক জানা বস্তু ত কখন করে না, তাই আমার পক্ষে সে একান্তই মৃত।

প্রিয়জন আমার কাছে প্রিয়, কারণ তাকে পাইয়াও যে পাই না, ভগবানের দিকে যে ছুটিয়া চলিয়াছি, সে ত তাঁকে জানি না বলিয়া—পাইতাম যদি, জানিতাম যদি তবে দেখিতাম আমার যে প্রিয়জন তার ত শুধু—

স্তনৌ মাংসগ্রন্থী কনককলসাবিত্যুপমিতৌ
মুখং শ্লেষ্মাগারং তদপি চ শশাঙ্কেন তুলিতম্
স্রবন্মূত্রক্লিন্নং করিবরকরস্পর্ধী জঘনং—

আর "রসো বৈ" যিনি তিনি হইয়া পড়িতেন নিরাকার চৈতন্যমাত্র দর্শনের একটা তত্ত্বমাত্র। কিন্তু আমার প্রিয় নিত্য নব উষায় নব সৌন্দর্য্যে বিকশিতই হইয়া চলিয়াছে, তাই যে দেখিয়া দেখিয়াও নয়ন আর তিরপিত হইল না—ভগবান যে নিত্য নব উপলব্ধির মধ্য দিয়া আমাকে ভুলাইয়া লইয়া চলিয়াছেন আপনাকে সদাই কি একটা রহস্যের আবরণে ঢাকিয়া রাখিয়া। দূরে থাকিয়া যে প্রলুব্ধ করিতেছে, আকাঙ্খা জাগাইতেছে কিন্তু সে আকাঙ্খার পূর্ণ তৃপ্তি যাতে না হইয়া যায় সে দিকে

সাবধান—এমন জিনিষেরই পাশে না প্রাণের টানে ছুটিয়া চলিয়াছি। মানুষ যদি গন্তব্য স্থানেই পৌছিয়া যায়, লক্ষ্য যদি আঁখিতারকার সাথেই মিলাইয়া যায়, আকাঙ্খা যদি সব তৃপ্ত হইয়া পড়ে তবে মানুষের লীলা সেই দিনই ফুরাইবে, যে অগ্নি তার প্রাণকে সমিদ্ধ রাখিয়াছিল সেই দিন তাহা নির্ব্বাণ পাইবে।

কিন্তু তবুও ত প্রিয়বস্তুকে জানিতেই চাই ধরিতেই চাই—সবটুকুই জানিতে ধরিতে চাই। এ কি শুধু মায়ামরীচিকা? জানার মধ্যেও ধরার মধ্যেও কি বিশেষ সৌন্দর্য্য বিশেষ আনন্দই নাই? না-জানাই প্রধান সত্য, আর জানা বা জানার চেষ্টাটা হইতেছে ফাঁকি, খেলাটি জমাইয়া রাখিবার জন্ত? কিন্তু এও ত প্রাণ ধরিয়া বলিতে পারি না যে প্রিয় বস্তুকে জানি না—এ ত মনে হয় যেন সত্যের অপলাপই করিতেছি। সে বস্তুকে যে বিশেষরূপেই চিনি, তার অপেক্ষা বেশী চিনি জানি আর কাহাকে? ভগবান দূরে কিন্তু তাঁর অপেক্ষা নিকটে কে? ভোগ্য-বস্তু ত ভোগ করিবার জন্তই—ফুরাইয়া যায় বলিয়া তার ভোগটা নিরর্থক নিরানন্দ হইয়া পড়ে না, বরং দূর হইতে কেবল নিরীক্ষণ করিয়াই যদি নিরস্ত হই তবেই না তার বিফলতা? অন্বেষণে উল্লাস আছে কিন্তু প্রাপ্তিতে কি সুখ নাই? কর্ম্মে আনন্দ আছে, কর্ম্মফললাভে কি নাই? সাধনা আছে অথচ সিদ্ধি থাকিবে না, সিদ্ধি একটা আদর্শমাত্র এও কি হইতে পারে, না, হওয়া উচিত? উপনিষদই তবে সত্য কথা বলিয়াছেন—তাঁহাকে জানি এ কথা বলিতে পারি না, আবার তাঁহাকে জানি না এ কথাও মুখে আনিতে পারি না।

বস্তুতঃ প্রিয়কে ভগবানকে জানি না, সেই জানার মধ্য দিয়া যায় প্রতিষ্ঠা তর্কবুদ্ধির মধ্যে, বিচারের মধ্যে। এই মনের জানা মনের পাওয়া দিয়াই ধারণ করিতে পারি না সে কামনার কামনাকে। কারণ মনের প্রকৃতিই হইতেছে একটা দিক, একটা খণ্ড প্রকরণে আবদ্ধ থাকা—মন জানিতে পারে কেবল অংশবিশেষকে, স্বরূপ দূরে থাকুক রূপের সে যতটুকু জানে তাও অতি অল্প, অতিমাত্র বাহিরেরই। তাই সে জানার কাছে আসল মূল সত্তাটি চিরদিন প্রতিমুহূর্ত্তেই নব নব বর্ণসম্পাতে ফুটিয়া উঠিতেছে, তাই "যুগ যুগ ভরি, রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল"। সে যে নিগূঢ়ের অসীমের বস্তু—তাই সে মনের কাছে অচেনা অজানা। কিন্তু

এই অজানাকে জানি, বিশেষরূপে জানি, সেই জানার মধ্য দিয়া যে জানা চোখের দেখার উপর নির্ভর করে না, যে জানা মানসপ্রত্যয় নয়—যে জানা হইতেছে জ্ঞান, দিব্যদৃষ্টি, অপরোক্ষানুভূতি। এই যে তুরীয় চেতনা সেখানে যদি জাগিতে পারি, তবে সেখানে ধরিতে পাই বস্তুর আত্মার অনন্তের সবখানিই। কারণ সেখানে সান্ত দিয়া অনন্তকে ধরিতে চাই না, অনন্ত দিয়াই অনন্তকে আলিঙ্গন করি।

মনের জানা আমাদের কাছে খুব সত্য, খুব স্পষ্ট, একেবারে নিঃসন্দেহ বলিয়া বোধ হয়—যতটুকু জানি তা জানি যেন পূর্ণ দিবালোকে। আর তুরীয়ের জ্ঞান বোধ হয় কেমন একটা ভাবের নেশার আবেশ—সে যেন আঁধারে অথবা অস্পষ্টালোকে কেমন ছায়াদেহটিকে হাতড়াইয়া ধরিতে চাহিতেছি। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তাহা নয়। বুদ্ধির জানাই গোধূলির আলো আঁধারের মিশ্রণ। সেখানেই নিশ্চয়তা নাই—সকল নিশ্চয়তার মধ্যে সেখানেই জাগিতেছে আবার সন্দেহ। তুরীয়ের জানা—উপনিষদ যাহাকে বলিয়াছে বিজ্ঞান, যাহা হইতেছে চিদ্‌ঘন—কেবল তারই মধ্যে নাই কোন ছায়া কোন কুয়াশা কোন অস্পষ্টতা। চোখের দেখা যেমন স্পষ্ট দৃষ্টির দেখাও তেমনি, তাহা অপেক্ষা আরও বেশী স্পষ্ট—পূর্ণতর, রেখায় রেখায় স্ফুট। সত্যের অনন্তের এই উজ্জ্বল মূর্ত্তিকে দেখিবার জন্যই প্রাচীন ঋষিগণ প্রতিনিয়ত চাহিয়াছেন—জ্যোক্ চ সূর্য্যং দৃশে, অনিমেষ দৃষ্টিতে অবিরল যেন আমরা জ্ঞানের পরা সত্যটি নিরীক্ষণ করিতে পারি।

এই আত্মার, এই বিজ্ঞানময়ের চেতনায় প্রবুদ্ধ হইয়া যখন জিনিষ দেখি, তখন সে জিনিষ আর অজানার ঘোরে আবৃত কিছু থাকে না, তাহা উজল উদ্ভাসিত হইয়াই দেখা দেয়। শুধু তাই নয়, এই অতীন্দ্রিয়ের এই পরাজ্ঞানের দীপ্ত চেতনা মনকেও আলোকিত করিয়া তোলে, বুদ্ধিরও মধ্যে এমন একটা পরিশুদ্ধি আসে যে সেখানেও অতীন্দ্রিয়ের একটা যথাযথ প্রতিকৃতি ভাসিয়া উঠে। বুদ্ধি আর আবরক মাত্র নয়, তা হয় প্রকাশক। বুদ্ধিরও মধ্যে এমন সব রেখাসম্পাত হয়, এমন সব সংজ্ঞা জাগিয়া ওঠে যা অনির্দ্দেশ্যের অনন্তভাবকেই সুস্পষ্ট, জাগ্রত, বিগ্রহান্বিত করিয়া প্রকটিত করে। বুদ্ধির জানার মধ্যে তুরিয়ের জানা আসিয়া ধরা দেয়। ভগবান তখন অবতার হইয়া দেখা দেন, তখনি মানুষী বিগ্রহের মধ্যে সর্ব্বথা ঢালিয়া দিয়াও ভগবান তাঁহার ভাগবত সত্তাকে কিছু

খর্ব করিয়া ফেলেন না। তখনই আমার প্রেমাস্পদকে দেখি আর এক নূতন রূপে। তাই আমার অশরীরী [illegible] [illegible] [illegible] তার কেবল বাহ্যশ্রীটুকু [illegible] [illegible] [illegible] উপভোগ করি অন্তরাত্মার অন্তরেই যে নিবিড় রস [illegible] [illegible] দিয়াছে। আমি না বলিয়া যে ভাবে সুন্দর দেখি [illegible] [illegible] সব বাণি বাণি ধ্বনিয়াই সে তখন সুন্দর।

অজানায় সুরের না পাওয়ায় আনন্দ আছে—[illegible] কল্পনায় আনন্দ আছে। আবার জানায় নিবিড় [illegible] আনন্দ আছে—প্রবীণতার যে স্থির স্ফূর্তি, নবীনতার বেগ তাহার [illegible]। ফুলের সৌরভ সুষমা আছে, পক্ক ফলের আছে সুধার রস—উভয়েই সুন্দর, সবার সার্থক। না, বরং বলিব ফলেরই মধ্যে, ফুলেরও সার্থকতা। ফলে যাইয়া ফুল শেষ হইয়া হারাইয়া যায় নাই—আরও নিবিড় [illegible] হইয়াই উঠিয়াছে। অজানায় সুষমা সেই সকল কেবল আপনাকে [illegible] উধাও হইয়া চলিয়াছে, জানার মধ্যে সে সুষমা গাঢ়, ঘন, [illegible] হইয়া পরিপূর্ণ।

জাতীয় শিক্ষা

জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধীয় আলোচনা সভায় আহূত হইয়া আমরা সেদিন তথায় উপস্থিত হইয়াছিলাম। জাতির জীবনে ভগবানের কর্ম-প্রেরণা প্রবেশ করিয়াছে বটে, কিন্তু ধারণ-সামর্থ্যের অভাবে, [illegible] প্রেরণাটাই [illegible] অপরিপুষ্ট ফল প্রসব করিতেছে। তপঃশক্তির অভাবে, [illegible] বাহ্যাড়ম্বর ভিন্ন বস্তুতঃ কিছু যে গড়িয়া উঠিতেছে এরূপ বলিয়া বোধ হয় না। [illegible] দেশের অভিব্যক্তির ভিতরে নূতন শক্তিসঞ্চারে, জাতিকে নূতন ছাঁচে গড়িয়া তুলিবার যাঁহারা ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারা রাজনীতিক সামাজিক অথবা শিক্ষা সম্বন্ধীয় যে-কোন বিষয়েই আলোচনায় [illegible] কোন আইডিয়াই [illegible] [illegible] না; আমরা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

এইরূপ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমষ্টি, একদিন সংহতি শক্তিতে পরিণত হইয়া, অন্তঃসারশূন্য এই সকল অসার আড়ম্বরের কৌতুকস্তূপ ভাঙ্গিয়া দেশের সকল সমস্যার সমাধান করিবেন, একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

সুপণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ ও মোসলেম কুলপ্রদীপ ফজলল হকের আহ্বান-পত্রে আহুত হইয়া, রামমোহন লাইব্রেরিতে জাতীয় শিক্ষায় আলোচনা-সভা দেখিয়া আমাদের পূর্ব্ব ধারণা অধিকতর বদ্ধমূল হইয়াছে। দেশের শিক্ষিতজনগণ আর কতদিন চিত্তাবেগের তরল তরঙ্গে নাচিয়া কুঁদিয়া দিন কাটাইবেন? যুগযুগান্তরের বিবিধ ঘটনায় মহাশিক্ষা লাভ করিয়াও আজ তাঁহারা যে তিমিরে, কালও তাঁহারা সে তিমিরেই রহিয়া যাইতে চাহেন কি? কংগ্রেস, সোসাল কনফারেন্স, জাতীয় শিক্ষা-সভা প্রভৃতি বর্ত্তমান যুগের ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের একটা দিব্য অভিনয়বিশেষ। জাতির ভাগ্যে আজ যাহা ঘটিতেছে, তাহা এই সকল সুদক্ষ ব্যক্তি ও লেখকদিগের বক্তৃতা ও লেখনীচালনে নহে, তাহা কালের স্রোতে ভাসিয়া জাতীয় জীবনে জড়াইয়া যাইতেছে—তা সে দুঃখই হউক আর সুখই হউক, সুবিধাই হউক আর অসুবিধাই হউক। আজ আমরা একটা কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাহি—যে এইরূপ হুজুক করিয়া, দেশের প্রকৃষ্ট শক্তির অপব্যয় করিলে, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা ক্রমশঃই সুদূরপরাহত হইবে। সেদিন মোস্‌লেমলিগের মহাসভায় দাঁড়াইয়া জাতীয়দলের অন্যতম নেতা মনীষী বিপিনচন্দ্র একটা বড় স্পষ্ট কথা বলিয়াছেন—“that it struck him sometimes that they were wasting more breath in discussing schemes than was necessary. He believed they would not get responsible government on mere asking. He did not believe their demonstrations under existing conditions in India would persuade the British to grant responsible Government. Whether they would get it or not rested with the Providence.” খুব স্পষ্ট এবং জলন্ত অনুভূতি। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাসও বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভায় কর্ণধার হইয়া এইরূপ অনুভূতিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া দেশবাসীকে আপনাদের মধ্যেই পথান্বেষণের ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, কিন্তু কি মোহ? “চড়ুকে পিঠ” কিনা, ঢাকের বাদ্যে অন্তঃপুর-

যের নির্দ্দেশ পর্য্যন্ত অমান্য করিয়া, বাহিরের দিকেই সে ছুটিতে চায়।

যাহা হউক, অবান্তর কথার অবতারণা না করিয়া আমরা জাতীয় শিক্ষা সভার কথা কিছু বলিব। এত আলোচনা, এত আন্দোলন, এত বক্তৃতা, এত আয়োজন, এত অর্থব্যয়ে দেশের জনসাধারণ কিরূপ কর্ম্মী হইয়া উঠিয়াছে তাহারই একটা বিশিষ্ট নিদর্শন আমরা এই সভা হইতে লাভ করিয়াছি। "প্রবর্ত্তক" পাঠকবর্গকে তাহা দেখাইবার লোভসম্বরণ করিতে পারিলাম না।

সভাগৃহে অসাধারণ লোকসমাগম দেখিয়া মনে হইয়াছিল, বুঝিবা শিক্ষিত দেশবাসীর মতি গতি ফিরিয়াছে, জাতীয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠানক্ষেত্র দৃঢ় না হউক অন্ততঃ তদ্‌সম্বন্ধে একটা খুবই আলোচনা হইবে। বাসন্তী বিবির উৎসাহপূর্ণ বাণী বাঙ্গালী আকণ্ঠ পুরিয়া পান করিতে লাগিল, বহুরূপীর যেরূপ ক্ষণে ক্ষণে বর্ণপরিবর্ত্তন ঘটে, শ্রোতৃমণ্ডলীরও চক্ষুকর্ণ মধ্যে মধ্যে বিদুষী রমণীর বাক্‌চাতুর্য্যে লাল হইয়া উঠিতেছিল, আবার কখনও বা সাদা হইয়া যাইতেছিল। তার পর, বাসন্তী বিবি স্বতন্ত্র সভায় যোগদানের জন্য প্রস্থান করিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে লোকসমুদ্রও ভাঙ্গিয়া পড়িল, আবার তাঁর অমৃতবাণীতে শ্রবণ-বিবর সুশীতল করিবার উদ্দেশ্যে মধুমুগ্ধ মক্ষিকার মত তাহারা দৌড়াইতে লাগিল। সভাপতি মহাশয় খুব উৎসাহের সহিত অনেক মূল্যবান কথাই প্রয়োগ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে সভাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া কার্য্যালোচনা করিতে অনুরোধ করিলেন কিন্তু তাহারা চায় বাক্যছটা, তাহারা ত কার্য্য করিতে আসে নাই, তাহারা ত তথাকথিত নেতৃমণ্ডলীর মত নিষ্কর্ম্মা নহে। তাহাদের অনেক কার্য্য আছে, তবে বড় দিনের অবকাশটার অপব্যবহার যাহাতে না হয়, তাহার জন্যই তাহাদের নানা-স্থানে ঘুরিয়া বেড়ানো। অবশেষে সভাগৃহ প্রায় শূন্য হওয়ায় সভাপতি মহাশয় একটা দীর্ঘশ্বাসের সহিত সভাভঙ্গ করিতে বাধ্য হইলেন। স্বদেশ-প্রেমিক হরদয়াল নাগ মহাশয়ের আক্ষেপ ও বঙ্গীয় জাতীয় বিদ্যালয়ের বেচারা শিক্ষকবৃন্দের মর্ম্মান্তিক অন্তর্দাহ সভাগৃহ পূর্ণ করিয়া হা-হা করিতে লাগিল। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিয়া এই অদ্ভুত অভিনয়ের কথা ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী ফিরিলাম।

বাঙ্গালীর বক্তৃতা শোনা একটা নেশা হইয়া উঠিয়াছে, মোহনবাগানের ফুটবল খেলা দেখিবার জন্য ২০৲ টাকা বেতনের কেরানিও যেমন ১৲ টাকায় টিকিট কিনিয়া বসে, সেইরূপ সুবক্তার বক্তৃতা শুনিবার লালসাও

ইহাদের প্রবল। দেশের জন্ত যাঁহারা ভাবেন, যাঁহারা দেশের উন্নতিবিধানকল্পে জীবন উৎসর্গ করিবেন, তাঁহাদের চরিত্র তিল তিল করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়। হে বঙ্গীয় নেতৃমণ্ডলী—এইরূপ দেশপ্রেমিকের চরিত্র গঠন করিয়া তুলিবার তোমরা আজ পর্য্যন্ত কি আয়োজন করিয়াছ, সভায় বক্তৃতা করিয়া যদি সহস্র-সহস্র বৎসরের অধঃপতিত পরাধীন জাতির জীবন উন্নতিসোপানে আরূঢ় হইত তাহা হইলে আর ভাবনা থাকিত না।

জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য এই যে, ইহা বর্ত্তমান অবস্থায় কোন মতেই সফল হইতে পারে না, দুই চারিজন স্বদেশপ্রেমিকের আত্মোৎসর্গে এইরূপ স্থায়ী শিক্ষা-সমিতি পরিচালন আশাপ্রদও নহে এবং জাতীয় জীবনে বিশেষ ফলও দর্শিবে না। জাতি যখন অশুদ্ধ দেহ মন বুদ্ধি লইয়া বিধাতার আহ্বানে জাগিয়া উঠিয়াছিল, ভবিষ্যতের জন্ত কতটা শক্তি কতটা ধৈর্য্যের প্রয়োজন, তখন এত কথা চিন্তা না করিয়া, জাতীয় জীবনের জাগরণের নিদর্শনগুলাকেই খুব প্রকট করিয়া তুলিবার একটা প্রচেষ্টা হইয়াছিল। এই জাতীয় বিদ্যালয়ও তাহার একটা অভিজ্ঞানমাত্র। আবশ্যক হইলে আমরা বাংলার সর্ব্বত্র এই জাতীয় বিদ্যালয়-স্থাপনের ঘোরতর আন্দোলনের ইতিহাস প্রকাশ করিব। কিন্তু মহানগরী কলিকাতা ব্যতীত এই জাতীয় বিদ্যালয়ের ক্ষীণ স্মৃতি আর কোথাও বিদ্যমান আছে কিনা সন্দেহ। শিক্ষা মানুষের সকল দিকটাকেই সুপ্রসারিত করিয়া তুলে, রাজশক্তির পূর্ণ দৃষ্টি না থাকিলে জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদিগের জীবনে এইরূপ বিকাশ সম্ভবপর নহে। ভারতের ষোল আনা শিক্ষার ভার ইংরাজরাজের উপর; বৈদেশিক রাজশক্তি ভারতীয় ভাবে আমাদের কিছুতেই শিক্ষা দিতে সমর্থ নহেন; কিন্তু উপায় কি? যতটা পারা যায় ইহারই ভিতর থাকিয়া আমাদের সনাতন চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। তবে শ্রমশিল্পের শিক্ষার ভার নেতৃমণ্ডলী স্বহস্তে গ্রহণ করিলে, দেশ কিয়ৎ পরিমাণে উপকৃত হইবে। পরলোকগত তারক নাথ পালিত এই কার্য্যে যে হৃদয়ের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহার ফলে ইহা নিতান্ত নিষ্ফল হইতেছে না।

কিন্তু আমরা যাহা হইতে চাই তাহা হইবার জন্য কি করিব? আমাদের চরিত্র ভারতীয় ভাবে সুগঠিত করিয়া তুলিবার জন্য আমরা কোন শিক্ষারই আয়োজন করিব না কি? অবশ্য, এইটাই হইতেছে

জাতীয় শিক্ষাসম্বন্ধীয় জটিল সমস্যা। পুরাতন সংস্কার পরিহার করিয়া কোন্ সরল উপায়ে, এই মহাদুর্দিনে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ আশা-প্রদীপগুলিকে সমুজ্জ্বল রাখিতে পারিব, ইহা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই ভাবনার কথা।

বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির অধীন থাকিয়াও, যাঁহারা ভারতীয় চরিত্রের পরাকাষ্ঠা প্রদান করিতেছেন, ভারতীয়ভাবে প্রবুদ্ধ হইয়া যাঁহারা জাতির জীবনে সুধাধারা বর্ষণ করিতেছেন, যাঁহাদের চরিত্র অনুকরণের জন্য দেশের নূতন সম্প্রদায় আজ উৎসুক, সেই সকল দেশভক্ত, কর্ম্মবীর নেতৃমণ্ডলীর পশ্চাতে কোন্ শক্তি কার্য্য করিয়া, বর্ত্তমান অবস্থাতেই তাঁহাদিগকে ভারতীয় ভাবে গড়িয়া তুলিল, আমরা সেই শক্তিটাকেই টানিয়া প্রকট করিয়া তুলিতে চাই। বৈদেশিক শিক্ষায় সম্যক্ পারদর্শিতালাভ করিয়াও স্বামী বিবেকানন্দ কিরূপে এমন অতুল দেবচরিত্র লাভ করিলেন? মহারাষ্ট্রের লোকমান্য তিলক প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির ভিতর দিয়াও কেমন করিয়া এরূপ সনাতন চরিত্রে আপনাকে গঠিত করিয়া তুলিলেন? মাতৃপ্রেমোন্মত্ত শ্রীঅরবিন্দ আজন্ম পাশ্চাত্যের শিক্ষাদীক্ষায় দিনাতিপাত করিয়াও কেমন করিয়া ভারতীয় ভাবের এমন উৎকৃষ্ট সাধক হইয়া উঠিলেন? আজ তাহা প্রণিধান করিবার দিন আসিয়াছে। ভারতের কোটী কোটী নরনারীর তুলনায়, এইরূপ দুই একটা দেবদুর্লভ চরিত্র আকস্মিক ঘটনা বলিয়া উপেক্ষা করিলে চলিবে না। যে তপঃশক্তি ভারতের অন্তঃস্থলে থাকিয়া এই মহাবিপ্লবের দিনেও এমন দেবতা গড়িয়া তুলে, সে তপঃশক্তিকে যে-কোনও সাধনার দ্বারা বাস্তব করিয়া তুলিতে হইবে এবং পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণ-প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া সেই তপঃশক্তিসহযোগেই আমাদের ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইহাই জাতীয়-শিক্ষা। ভারতের শিক্ষা Institution করিয়া প্রদান করিতে যাইলে সে কাঠামের আকারবিশেষ হইয়া যাইবে। ভারতবর্ষের যে "হোম", যে গৃহস্থাশ্রম, তাহারই আবহাওয়ার মধ্যে ভারতের ওজঃ সঞ্চারিত হইতেছে, নিদারুণ ভাগ্যবিপর্য্যয়ে ভারত-সন্তান এই আর্য্যশক্তিকে উপেক্ষা করিলেও, সে অলক্ষ্যে মধ্যে স্বর্গের সৌরভ সমন্বিত করিয়া যে সকল ফুল ফুটাইয়া তুলিতেছে, উন্মার্গগামী ভারতসন্তান তাহার দিকে লক্ষ্য না করিয়া থাকিতেই পারে না। আজ যাঁহারা জাতির উন্নতিবিধানের জন্য এই জাতীয় শিক্ষা

প্রচলন উদ্দেশ্যে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহাদিগকে নীরবে ভারতবর্ষের এই গোপন প্রাণশক্তির সন্ধান করিতে বলি, হৃদয়ের ভক্তি ও অনুরাগ-সিঞ্চনে এই শক্তিগুলিকে পুষ্ট ও প্রকট করিয়া তুলিলে দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে প্রতি ঘরে জাতীয় শিক্ষা প্রচার হইতে আরম্ভ হইবে। আমরা আজ আভাস মাত্র দিলাম। আবশ্যক বুঝিলে আরও স্পষ্ট করিয়া সকল কথা খুলিয়া বলিব।

কুড়োন চিঠি

(১)

প্রিয়তম।

সত্য সত্যই আজ একটা অবসর পেয়েছি—সঙ্গে সঙ্গে সুযোগও এসেছে। যে সুযোগের প্রতীক্ষায় এই দীর্ঘ বৎসর কেবল আশাপথ চেয়েছিলাম, আজ মনে হয় সে সুযোগ আমার কুটীরদ্বারে অতিথিরূপে উপস্থিত—তাকে সাদরে বরণ কর্চ্ছি।

এতদিন যে সুযোগ আসে নি, তা নয়; সুযোগ এসেছিল, আবার চলে গিয়েছে মধুর আবেগের খেলায় আমি যে আত্মহারা ছিলাম। আজ সুদীর্ঘ আট বৎসর, এই দুর্ব্বহ দ্বন্দ্বময় জীবন নিয়ে অবিরাম যুদ্ধ করেছি, এই দ্বন্দ্বের প্রধান অভিনেত্রী মহাশক্তির বরপুত্র হ'ব বলে। আপনার সহিত সাক্ষাৎ, আপনার চরণে আত্মোৎসর্গ আমার জীবনে একটা বড় সুযোগ, একটা আহ্বান, আমার eternal life এর (অনন্ত জীবনের) একটা moment (মুহূর্ত), সুমহান্ হৃদয়গ্রাহ প্রেরণায় মহনীয় আহ্বান। ইচ্ছা ছিল, বড় সাধ ছিল, জীবনের এই সন্ধিক্ষণ হ'তে আরম্ভ করে, মহাকালের বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, সমস্ত টুকুই নিঃশেষ করে বলতে পারবো কিন্তু কোথায় কি যে অভাব রয়েছে বলতে পারি না—আমার অন্তরের ব্যথা আমায় টেনে যাচ্ছে, ক্ষুদ্র লেখনী শিথিল হয়ে পড়ছে, আপনি আমার অবস্থা বুঝবেন কি? আমার সমস্ত ব্যথা, সমস্ত বেদনা আপনার মর্ম্ম কি মুহূর্ত্তের জন্য স্পর্শ

করবে না ?

অতীতের গর্ভে তাকিয়ে দেখ্‌ছি—এসেছিল একটা আহ্বান, একটা অনুরাগ, যা আমার জীবনের সব সুখ দুঃখকে এক করে দিয়েছিল, যার অপার্থিব মধুর আকর্ষণে অতৃপ্ত মনের সম্ভোগতৃষ্ণা তিল তিল করে বেড়ে উঠেছিল; আজ সবটা যেন একটা অনন্ত বিরহে পরিণত হয়েছে, বর্ত্তমানের এই নিদারুণ বিরহ, এই আকুল পিয়াস আমার সমস্ত অনুভূতিকে তীব্র করে তুলেছে। কোথা থেকে কি জানি একটা বিরাট Spiritual longing (অধ্যাত্ম-শক্তির পিপাসা) আমার জীবনকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেল্‌ছে; আমি কেবল দ্রষ্টা হয়ে, সাক্ষী হয়ে দেখ্‌ছি মাত্র, আমি এ আভাসের দেবতাকে ধরতে পারছি না, আমার emotion চাই (হৃদয়াবেগ) আমার জীবনে মস্ত বড় প্রেরণা হয়ে লীলা করেছিল, তখন হয়ত ক্ষীণশক্তির সুধাপানে মুগ্ধ হয়ে, কালকে উপেক্ষা করতুম, কিন্তু এমন করে, এমন নির্ম্মমভাবে কালীর কঠোর বজ্র আহ্বান ত বাজে নাই ? কে এ, যে এতবড় Injustice (অবিচার) আমার মুক্ত কোমল বক্ষে আঘাত করলে ? ওগো ! আমি যে তাকেই চাই—আমি যে তারই জন্য জ্ঞানে অজ্ঞানে কেঁদে বেড়িয়েছি, তাকে পূজা করবার জন্যই ত আমার এই অন্তহীন আবেগ, এই দুর্জ্জয় অভিমান, এই নিরলস বিরহ। সেকি আমার অব্যক্ত অস্ফুট যন্ত্রণা বুঝ্‌বে না ? সেকি আমার ক্ষত হৃদয়ে চন্দন লেপে দিবে না ? আজ অনাগতের পানে নির্নিমেষ নেত্রে চেয়ে আছি, বসে বসে অমৃতভরা সুদূর অনাগতকে আহ্বান করছি। সে কি এ সামান্য আহ্বান, সান্ত্বনা বলেই উপেক্ষা করতেই থাকবে ! ঘটে ঘটে তার আগমনী কি বেজে উঠ্‌বে না ?

সত্য কথা, যদি না এ মর্ম্মান্তিক Injustice বোধ করতেম, তাহলে হয়তো এত শীঘ্র এ তীব্র ;বিরহ এমন অসীমভাবে অনুভূতির মধ্যে জেগে থাকৃতো না। এ আভাসের কথা যখন স্মরণ হয়, তখন আধার ভেঙ্গে যেতে চায়, আমার emotional nervous life (আবেগভরা জড় (দেহ) প্লাবিত হয়ে উঠে, আমার ধৃতিশক্তি কেঁদে আকুল হয়, অখণ্ড মিলনের তৃষ্ণা আরও বেগবতী হয়ে দাঁড়ায়, আমার তন্ত্রীগুলা বিরহের উদাস সুরে বাজ্‌তে থাকে। সেদিনকার অন্তরকাল সাক্ষাতে আপনার মুখে শুনেছিলাম "পূর্ণ আনন্দের সম্ভোগ কি—এখনও

তা জানি নাই, তার আভাসের রসেই সমস্ত আধার ভরপুর হয়ে যায়, জীবন দুয়ারে যেতে উঠি"। এ যে অতি অন্তরের বাণী, এ যে মহা সত্য কথা। কিন্তু এইখানেই ত সব তৃষ্ণা শান্ত হয় না, কেবল চায় আরও, আরও, আরও মিলন—আরও সুধা—আরও অমৃত।

আমার জীবনের কল্পনা ভেঙ্গে গেছে—আমি চাই আমার পূর্ণ সর্ব্বাঙ্গীন অটল অচল প্রতিষ্ঠা আপনার সত্তার মধ্য দিয়া। আমি চাই না অষ্টসিদ্ধি; আমি চাই না যোগসিদ্ধি—আমি চাই Infinite grace (অনন্ত করুণা), একটা অসীম মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের উপর দিব্য উন্মাদনায় প্রতিষ্ঠিত হতে চাই।

আমি জানি এ ঘটনার মূল্য নাই—আমি জানি এ অমূল্য সম্পদ, এ অহৈতুকী দান—আমি জানি এ ঐশ্বর্য্যের নিকট মহাযোগীর যোগসিদ্ধি তুচ্ছ। তাই যখন আর্য্য"মন্ত্রের" রসাস্বাদ করি, তখন বেদ বেদান্ত সব চোখের সামনে মূর্ত্তিমান হয়ে উঠে, কি তুচ্ছ তখন আমাদের ক্ষুদ্র উৎসর্গ—তুচ্ছ তখন শিক্ষা দীক্ষা, মান যশঃ পার্থিব ঐশ্বর্য্য—সবই আমার তৃণবৎ বলে বোধ হয়। তখন মনে হয় কার কৃপায় এ স্বর্গের আলো, এ স্বর্গের সৌরভ আমাদের জীবনকুঞ্জে ছড়িয়ে পড়্‌ল। তখন আপনার জীবন পানে তাকিয়ে দেখি, আপনার গর্ব্বস্ফীত বক্ষের পানে তাকিয়ে থাকি—দেখি কার কৃপাবাতাস আপনার জীবন-তন্ত্রীগুলাকে এমন সুমধুর সুরে বাজাচ্ছে, দেখি কার শক্তি কার করুণা এমন বাস্তব, এমন প্রকট, এমন প্রশান্ত-রূপে ধ্রুব হয়ে লীলা কর্‌তে চাইছে। তখন দেখি কেবল রহস্য, অপূর্ব্ব অখণ্ড ভগবদ্ রহস্য। হে অনাগত! হে প্রিয়তম! আমার অস্থিমজ্জা নিংড়ে সব রক্তটুকু ভরিয়ে দিক তোমার মঙ্গল-ঘট, মর্ম্মে মর্ম্মে ঝঙ্কারিত হয়ে উঠুক-চিরন্তন সার্থকতার মহাসঙ্গীত!!